শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস

ভূমিকা
অহিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ৭০০০০৭

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল : ১৯৪৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : আগস্ট : ১৯৬০
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর : ১৯৬৭
চতুর্থ সংস্করণ : নভেম্বর : ১৯৬৯
পঞ্চম সংস্করণ : মে : ১৯৭৮

দাম : ত্রিশ টাকা মাত্র

Dr. Srikumar Banerjee
HISTORY OF ENGLISH LITERATURE IN BENGALI
Fifth Edition
Revised by Prof. A. B. Chatterjee

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ৭০০০০৭

মুদ্রাকর :
শ্রীসাগরচন্দ্র সামন্ত
কে. বি. প্রিন্টার্স
১।১ই গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রকাশকের নিবেদন

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসের চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬ সাল হইতে পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্যাতিমান ছাত্র বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীঅহিভূষণ চট্টোপাধ্যায়কে পরবর্তী সংস্করণ পরিবর্ধন করিয়া দেওয়ার জন্য ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন।

এই সংস্করণটি বহুলাংশে পুনর্মাজিত, আগাগোড়া সংশোধিত, অধ্যায় বিন্যাসে পরিবর্তিত এবং কয়েক স্থলে পুনর্লিখিত হইয়াছে।

অধ্যাপক অহিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এই সংস্করণ প্রকাশে যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

বিনীত

শুভ ২৫শে বৈশাখ
১৩৮৫

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

ভূমিকা

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনায় হস্তক্ষেপ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, তাহা জানি। জীবদ্দশায় মাষ্টার মহাশয় অনুমতি দিয়া না গেলে এ কাজে হাত দিতে সাহসই করিতাম না।

মাষ্টারমহাশয়ের মূল বক্তব্য ঠিক রাখিয়া পাঠকের সুবিধার জন্য কোথাও কোথাও ভাষাটি সহজতর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতি-সংক্ষিপ্তির জন্য পূর্বের সংস্করণ পর্যন্ত যে সমস্ত জায়গায় ফাঁক ছিল সেই ফাঁকগুলিও ভরাট করিয়া দিয়াছি।

মাষ্টার মহাশয় যখন এই গ্রন্থ রচনা করেন, বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের মূল্যায়নের সময় তখনও হয় নাই। সুতরাং তিনি এই শতকের খ্যাতনামা দুইচারিজন সাহিত্যিক সম্বন্ধে কয়েকটি কথামাত্র বলিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই শতকের ইতিহাসটি পুনর্লিখিত হইল।

পাঠকগণের সুবিধার্থে পুস্তকের শেষে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে একটি বর্ণসূচী (Index) দিয়াছি।

আশা করি "ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস"-এর পূর্বতন সংস্করণগুলি শিক্ষক ও পাঠকসমাজের কাছে যে সহানুভূতি ও সমাদর পাইয়াছিল এবারেও তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে না।

১৫. ৪. ৭৮

অহিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বাংলা ভাষায় ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস লেখার চেষ্টা বোধ হয় এই প্রথম। এই প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভের পক্ষে প্রধান অন্তরায়—সমালোচনা-সম্পর্কিত আলোচনা ও ইহার পরিভাষার সহিত বাঙ্গালী পাঠকের আপেক্ষিক অপরিচয়। প্রত্যেক যুগের ইতিহাসে সমাজপ্রভাব ও প্রতিভাবান্ লেখকের আবির্ভাবের ফলে এক-একটি বিশেষ রকমের সাহিত্যিক গুণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও এই গুণগুলি বিশেষ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া ক্রমশঃ পাঠক-সমাজে সুপরিচিত হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে এই সমস্ত সংজ্ঞার প্রতিশব্দ এখনও গঠিত হয় নাই; সংজ্ঞানির্দিষ্ট গুণগুলি সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট নহে। সেইজন্য ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহাদের বিশেষ পরিচয় নাই তাঁহারা ইহার যুগ-পরিবর্তনের কাহিনীর ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিতে হয়ত কিছু অসুবিধা বোধ করিতে পারেন।

তথাপি বাংলা সাহিত্য এখন পরিণতির যে স্তরে পৌঁছিয়াছে তাহাতে ইহার সাধারণ পাঠকবর্গের মধ্যেও ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসের একটা মোটামুটি জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে হইলে, যে ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারা ইহা প্রগাঢ়ভাবে প্রভাবিত, তাহার সহিত পরিচয় না থাকিলে চলিবে না। আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি সেই সাধারণ পাঠকের রুচি ও প্রয়োজনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই লিখিত হইয়াছে। আমি ইহাকে তথ্য-ভারাক্রান্ত করিতে চেষ্টা করি নাই—কেবল প্রত্যেক যুগের মূলসূত্র ও প্রথম শ্রেণীর কয়েকটি লেখকের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিচয় দিতে প্রয়াসী হইয়াছি। এ বিষয়ে Home University Library-এর ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসকেই আমার আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি। আশা করি, সাধারণ সাহিত্যরসিক পাঠক এই স্বল্পায়তন বিবরণী হইতে ইংরাজী সাহিত্যের প্রসার ও ক্রমপরিণতির মুখ্য ধারাগুলি অনুসরণ করিতে পারিবেন ও ইহার শ্রেষ্ঠ লেখকদের মর্মগ্রহণে ও রসোপলব্ধি বিষয়ে সহায়তা লাভ করিবেন। এই পরিচয়ের ফলে তাঁহাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রসাস্বাদনও সহজ ও বিচারবুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে। এইরূপ ভাবে যাঁহারা অন্যান্য দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তাঁহারাও যদি বাংলাতে সেই সমস্ত সাহিত্যের ইতিহাস-সঙ্কলনে ব্রতী হন,

তবে মাতৃভাষার সমৃদ্ধিসাধন ত হইবেই ; তা ছাড়া, আমাদের পাঠক-সমাজও বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইয়া সঙ্কীর্ণ একদেশদর্শিতার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে ও সাহিত্য-বিচারে উদার ও অপক্ষপাত মনোবৃত্তি অর্জন করিতে পারিবেন।

এই গ্রন্থের অনেকগুলি অধ্যায় 'পাঠশালা' নামক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলি 'পাঠশালা' হইতে সংগৃহীত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইল। গ্রন্থের শেষ কয়েকটি অধ্যায় স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হইয়াছে।

৩১ সাদার্ন এভিনিউ
কলিকাতা ২৯
বৈশাখ ১৩৫৩

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা-সংক্রান্ত পাঠক্রমের যে সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন হইতে চলিয়াছে, তাহাতে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস বাংলার উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে অবশ্যপাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই নূতন প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থখানির পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে প্রত্যেক যুগের মুখ্য লেখকদের যথাসম্ভব বিস্তারিত পরিচয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থে এখন কেবল যুগপরিবর্তনের প্রধান সূত্রগুলিই পরিস্ফুট করা হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে যুগপ্রতিনিধি লেখকবর্গেরও যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ আলোচনার চেষ্টা হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে লেখক সম্বন্ধে যে ফাঁক ছিল এবার তাহা পূর্ণ করা হইয়াছে। মনে হয়, এই গ্রন্থের সাহায্যে আংলো-সাক্সন যুগ হইতে সাম্প্রতিক যুগের অব্যবহিত প্রাক্‌কাল পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক ইতিহাসের অনুসরণ দুরূহ হইবে না। আশা করি, এই নাতিবৃহৎ গ্রন্থখানি সুধীসমাজের প্রসন্নতা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে। তাঁহাদের নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী সংস্করণকে আরও উচ্চতর রূপ দিতে সচেষ্ট থাকিব।

৩১ সাদার্ন এভিনিউ
কলিকাতা ২৯
ঝুলন পূর্ণিমা ১৩৬৭
ইং আগস্ট ১৯৬০

গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

গত সংস্করণে কোন কোন বিষয়ের আলোচনা পর্যাপ্ত হয় নাই। বর্তমান সংস্করণে সেই সমস্ত বিষয়ের আরও সম্প্রসারিত আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইল। লেখক ও গ্রন্থের নামগুলিও বাংলা অক্ষরে ও প্রতিশব্দে যথাসম্ভব উচ্চারণ বজায় রাখিয়া দিবার চেষ্টা করা হইল। এই সমস্ত সংযোজনার ফলে গ্রন্থটি আরও পূর্ণাঙ্গ ও জ্ঞানপিপাসু পাঠকের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী হইল বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১ সাদার্ন এভিনিউ
কলিকাতা-২৯
১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৭১

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় [৬০০—১৪০০ খ্রীঃ অঃ]

বেউল্‌ফ্‌—ক্যাডমন—কিনেউল্‌ফ্‌—আলফ্রেড—চসার—ল্যাংলাণ্ড—গ্যাওয়েন অ্যাণ্ড দি গ্রীন নাইট্‌—পার্ল ... ১—১৬

দ্বিতীয় অধ্যায় [১৪০০—১৫৫০ খ্রীঃ অঃ]

ব্যালাড—মিষ্ট্রি ও মিরাক্‌ল্‌ প্লে—মরালিটি—ইনটারলিউড—প্রথম নাটক ... ... ১৭—২৪

তৃতীয় অধ্যায় [১৫৫০—১৫৯০ খ্রীঃ অঃ]

রেনেসাঁস বা নবজাগরণ—এলিজাবেথীয় যুগের প্রথমার্ধের কাব্য—গদ্য—নাটক ... ... ২৫—৪৫

চতুর্থ অধ্যায় [১৫৯০—১৬২৫ খ্রীঃ অঃ]

এলিজাবেথীয় যুগের দ্বিতীয়ার্ধের সাহিত্য—নাটক—শেক্‌শপিয়ার ও তাঁহার পরবর্তিগণ—গদ্য-সাহিত্য ... ... ৪৬—৭১

পঞ্চম অধ্যায় : প্রথম পর্ব [১৬২৫—১৭০০ খ্রীঃ অঃ]

সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্য—ডান ও মেটাফিজিক্যাল কবিগণ—মিলটন—ড্রাইডেন—রেস্টোরেশন কমেডি—হিরোইক্‌ ট্রাজেডি—গদ্য ... ... ৭২—১০২

পঞ্চম অধ্যায় : দ্বিতীয় পর্ব [১৭০০—১৭৯৮ খ্রীঃ অঃ]

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্য—ক্লাসিকাল যুগ—পোপ—উপন্যাসের আবির্ভাব—প্রবন্ধ সাহিত্য—স্যামুয়েল জনসন—রোমান্টিক যুগের পূর্বসূরীগণ—নাটক ... ... ১০৩—১৫২

ষষ্ঠ অধ্যায় [১৭৯৮—১৮৩২ খ্রীঃ অঃ]

রোমান্টিক যুগ—কাব্য—সমালোচনা ও প্রবন্ধ সাহিত্য—উপন্যাস—সাময়িক পত্রিকা ... ... ১৫৩—২০৫

সপ্তম অধ্যায় [১৮৩২—১৯০০ খ্রীঃ অঃ]

ভিক্টোরীয় যুগ—কাব্য—উপন্যাস—সমালোচনা ও গদ্য-সাহিত্য—নাটক ... ... ২০৫—২৪৪

অষ্টম অধ্যায় [১৯০০ খ্রীঃ অঃ—]

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য—কাব্য—উপন্যাস—নাটক—রম্যরচনা, ছোটগল্প, একাঙ্কিকা ... ... ২৪৫—২৯০

ইংরাজী সাহিত্যের কালানুক্রমিকা ... ২৯১—২৯৩

কয়েকটি স্মরণীয় তারিখ ... ২৯৪—২৯৮

বর্ণসূচী ... ২৯৯—৩০৮

প্রথম অধ্যায়

আংলো-স্যাক্সন ও আংলো-নর্মান সাহিত্য

[৬০০—১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ]

১

ইংরাজী সাহিত্যের পাঠকদের মধ্যে ইহার অসাধারণ প্রসার ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সুতরাং আশা করা যায় যে ইহার ক্রম-পরিণতির ইতিহাস আকর্ষণের বিষয় হইবে। ভাষার উৎপত্তি বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার। বিজ্ঞান নানাবিধ আশ্চর্য আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে অবাক করিয়া দেয়; কিন্তু ভাষার জন্মরহস্য আরও অদ্ভুত ও কৌতূহলোদ্দীপক। মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া কেমন করিয়া যে দৃশ্যমান জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের নামকরণ করে ও বর্ণমালা আবিষ্কার করে, কেনই যে সমাজের সকলে এই সমস্ত আবিষ্কার মানিয়া লয়, মানব-ইতিহাসের আদিম যুগের এই রহস্যগুলি আমাদিগকে বড়ই ধাঁধায় ফেলে। প্রথম প্রথম কয়েকটি মৌলিক ভাষার খবর পাওয়া যায়—তারপর এই মৌলিক ভাষাগুলি হইতে অসংখ্য শাখা-ভাষার উদ্ভব হয়। এই শাখা-ভাষাগুলি মূলের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কান্বিত, অথচ ইহাদের নিজেদের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মনে হয় যে যখন একই বংশোদ্ভূত এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে, তখন মূল ভাষার কয়েকটি অতি দরকারী শব্দ তাহাদের সাধারণ সম্পত্তিরূপে সঙ্গে লইয়া আসে। তাহার পর নিজ নিজ সভ্যতা, প্রয়োজন ও মানসিক উৎকর্ষ অনুযায়ী নূতন নূতন শব্দ গঠন করিয়া আপনার ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। এই হিসাবে আমাদের সংস্কৃতের সহিত গ্রীক, লাটিন ও গ্রীক-লাটিনের বংশধর ইংরাজী, জার্মান প্রভৃতি ভাষার মধ্যে নিকট-আত্মীয়তা আছে। মানুষের নিকটতম সম্পর্ক বুঝাইবার শব্দগুলি এই সমস্ত ভাষাতে প্রায়ই এক। সংস্কৃত 'পিতর্', গ্রীক ও লাটিন 'pater' ও ইংরাজী 'father'; সংস্কৃত 'মাতর্', গ্রীক ও লাটিন 'mater' ও ইংরাজী 'mother'; সংস্কৃত 'ভ্রাতর্', গ্রীক ও লাটিন 'frater' ও ইংরাজী 'brother'—এই সমস্ত শব্দ আলোচনা করিলে ইহাদের মধ্যে আত্মীয়তার বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, ইংরাজী, জার্মান এই

ভাষাগুলির সবকয়টিই Indo-Aryan (ইণ্ডো-আরিয়ান) বা Indo-Germanic (ইণ্ডো-জার্মানিক) এই মূল ভাষা হইতে উদ্ভূত।

আমাদের আলোচনার বিষয় হইতেছে ইংরাজী সাহিত্যের জন্ম ও পারণতির কথা; ইংরাজী ভাষার উৎপত্তি ইহার ঠিক অন্তর্ভুক্ত নহে। সাহিত্যের জন্ম ভাষার উদ্ভবের বহু পরবর্তী ঘটনা। ভাষা যখন অনেকটা স্থায়িত্ব ও পরিণতি লাভ করে, ইহার ব্যাকরণ-ঘটিত সূত্র-নিয়মগুলি যখন অনেকটা পাকাপাকি হয়, তখন সাহিত্য-সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়। যখন ইংরাজী সাহিত্যের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হয়, তখন ইহার নাম ছিল 'Anglo-Saxon' (আংলো-সাক্সন); তখন ইহার ভাষা বর্তমান ইংরাজী ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা'র ভাষার সঙ্গে বর্তমান বাংলা ভাষার যেরূপ প্রভেদ, বর্তমান ইংরাজীর সহিত আংলো-সাক্সনের প্রভেদ তাহা অপেক্ষাও অধিক।

২

আনুমানিক খৃষ্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দীতে জার্মান দেশ হইতে, এ্যাঙ্গল, স্যাক্সন ও জুট নামক তিনটি জাতি আসিয়া ইংলণ্ড (তখন ইহার নাম ছিল 'ব্রিটেন') অধিকার করে ও নিজেদের ভাষায় বেউল্‌ফ্‌ নামে একটি মহাকাব্য রচনা করে। বেউল্‌ফ্‌ হইতেছে তাহাদের জার্মান পূর্বপুরুষের বীরত্ব-কাহিনীর বর্ণনা। ইংলণ্ডের মাটি ও আকাশ-বাতাসের সহিত ইহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। ইহার গল্পটির সহিত আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের আংশিক সাদৃশ্য আছে।

হ্রথগার নামে এক ডেনমার্ক-দেশীয় রাজার রাজপ্রাসাদ গ্রেণ্ডেল নামে এক রাক্ষসের অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রাত্রে যখন এই প্রাসাদ আনন্দ-উৎসবে মুখরিত হইয়া উঠিত, তখন অকস্মাৎ কোথা হইতে এই রাক্ষস আসিয়া রাজানুচরবর্গের মধ্যে একজনকে লইয়া উধাও হইত ও তাহার রক্তমাংসে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। ইহার সহিত যুদ্ধ করে এমন কোন বীরপুরুষ সে দেশে ছিল না। অগত্যা রাজাকে নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। এই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং বেউল্‌ফ্‌ নামে এক প্রতিবেশী রাজ্যের রাজপুত্র এই রাক্ষস-দমনের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি হ্রথগার-এর প্রাসাদে আসিয়া রাক্ষসের নৈশ অভিযানের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার পর রাক্ষস আসিতেই দুইজনের ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আমাদের মহাভারতে ভীমের

সহিত বক, কির্মীর, হিড়িম্ব প্রভৃতি রাক্ষসের যুদ্ধের যেরূপ বর্ণনা আছে, ইহার বর্ণনাও অনেকটা সেইরূপ। শেষ পর্যন্ত বেউল্‌ক্‌ রাক্ষসের একটা বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলে রাক্ষস আর্তনাদ করিতে করিতে পলাইয়া সমুদ্রের তলদেশস্থ গুহায় আশ্রয় লইল ও সেখানে প্রাণত্যাগ করিল।

কিন্তু এখানেই বিপদের শান্তি হইল না। পরদিন রাত্রে আবার এক নূতন উৎপাত আরম্ভ হইল। রাক্ষসের মাতা পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজপুরীতে হানা দিল। আবার বেউল্‌ফের সহিত তাহার তুমুল যুদ্ধ বাধিল। শেষ পর্যন্ত রাজপুত্রের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া নিশাচর-জননী নিজ জলতলস্থ দুর্গে আশ্রয় হইল। এবার বেউল্‌ফ্‌ শত্রুকে নির্মূলে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে সেই অতল হ্রদে ঝাঁপ দিলেন। যখন সকলে ভাবিতেছে যে বেউল্‌ক্‌ নিহত হইয়াছেন, তখন শত্রু শেষ করিয়া তিনি ফিরিলেন। হ্রথগার ও তাঁহার প্রজাপুঞ্জ এই পরোপকারী বীরপুরুষকে নানাভাবে সম্মানিত করিলেন।

এবার মহাকাব্যের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হইল। বেউল্‌ক্‌ নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া কিছুকাল পরে সেখানে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন ও দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর রাজ্য পালন করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের শ্রদ্ধা ও ভক্তির অধিকারী হইলেন। কিন্তু তাঁহার জীবন-সায়াহ্নে দেশে এক দারুণ দুর্দৈব উপস্থিত হইল। মুখ হইতে অগ্নি-নিঃসরণকারী এক রাক্ষস দেশ আক্রমণ করিল। প্রজারা তাহার অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। রাক্ষস তাহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের আগুনে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধাকে ঝল্‌সাইয়া মারিত। সুতরাং ভয়ে কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে রাজী হইল না। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ রাজাকেই বহুদিন-অব্যবহৃত বর্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল। তুমুল যুদ্ধের পর রাক্ষস পরাস্ত হইল বটে, কিন্তু তাহার নিঃশ্বাসবায়ুতে দগ্ধ হইয়া বৃদ্ধ রাজাও প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকারচিত্তে মরণের অবশ্যম্ভাবিতা ও দৈবের অখণ্ডনীয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করিলেন।

সাধারণতঃ মহাকাব্যের যে সমস্ত গুণ থাকে, এই ক্ষুদ্র গল্পটির মধ্যে সে সমস্ত গুণই পাওয়া যায়। বিষয়-গৌরব, গাম্ভীর্য, উন্নত জীবনাদর্শ সমস্তই ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। অবশ্য রামায়ণ, মহাভারত বা হোমারের ইলিয়াডের মত ইহার প্রসার বা বিশালতা নাই; হিন্দু মহাকাব্যের সূক্ষ্ম নীতিবোধ ও পরিণত আদর্শ-কল্পনাও নাই। তথাপি ইহা মহাকাব্য হিসাবে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত। বর্তমান ইংরাজ জাতির যে চিরন্তন চরিত্র-

বৈশিষ্ট্য জগতের নিকট সুপরিচিত, সেই বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি এই আদিম যুগের রচনাতেও পাওয়া যায়। ইংরাজ নাবিকের জাতি; মহাসমুদ্র তাহার স্বচ্ছন্দ বিহার-ক্ষেত্র। সমুদ্রের প্রশংসা-গানে সে মুখর; সিন্ধু-কল্লোলের সহিত তাহার রক্ত-স্পন্দন এক সুরে বাঁধা। বেউল্‌ফে এই সমুদ্রপ্রীতির প্রথম অভিব্যক্তি দেখা যায়। সমুদ্রের ভীষণ সৌন্দর্যের দৃশ্য যে কবি-চিত্তকে নাড়া দিয়াছে তাহা নিঃসংশয়ে বোঝা যায়। ইংরাজ জাতির বীরত্ব, নির্ভীকতা, তাহার অদৃষ্টবাদের বৈশিষ্ট্য সবই এখানে আছে। ইংরাজের অদৃষ্টবাদ ও বাঙালীর অদৃষ্টবাদ এক জিনিস নহে। বাঙালী অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসের ফলে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন। 'ভাগ্যে যাহা আছে তাহা ঘটিবে, আমি চেষ্টা করিয়া তাহা খণ্ডন করিতে পারিব না'—বাঙালীর মনের ধারণা অনেকটা এইরূপ। বেউল্‌ফ্-এ যে অদৃষ্টবাদ আছে, তাহার চিন্তাধারা মোটামুটি এইরূপ—জানি অদৃষ্ট অকরুণ ও প্রতিকূল এবং জীবন দুঃখময়। জীবনে সুখ অনায়াসলভ্য নহে; তথাপি সঙ্কল্পে শিথিল হইব না। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রতিকূল শক্তির সহিত যুদ্ধ করিব, কেননা এই বীরত্ব এবং বীরত্বের খ্যাতিই জীবনের প্রধান কাম্য ও স্থায়ী সম্পদ। এই মহাকাব্যে ভগবানের উপর আত্মসমর্পণের পরিবর্তে আছে চরম আত্মনির্ভরশীলতা। বেউল্‌ফ্ কাব্য খৃষ্টপূর্ব যুগের মনোভাবের অভিব্যক্তি; জলদস্যুর দুঃসাহসিক জীবনের আদর্শ-কল্পনা। অবশ্য দুই শতাব্দী পরে খৃষ্টান ধর্মযাজকদের হাতে পড়িয়া ইহার মূল সুরটি স্থানে স্থানে খৃষ্টভাবাপন্ন হইয়াছে। খৃষ্টধর্মের ভগবদ্ভক্তি ও শান্তিপ্রিয়তা ইহার রণোন্মাদের সঙ্গে মিশিয়াছে। তথাপি মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে খৃষ্টধর্মের শান্ত, শীতল স্পর্শ ইহার দুর্দমনীয় বীরত্বকে বিশেষ ক্ষুণ্ণ করে নাই। এই মহাকাব্যোচিত বীরত্বময় সুর আরও যে কয়েকটি খণ্ড কবিতায় অনুসৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে—'ব্যাটল অব ব্রুনাবার' ও 'ব্যাটল অব ম্যালডন' বিশেষ প্রশংসার অধিকারী। ইহাদের মধ্যে বেউল্‌ফের ন্যায় ব্যাপক সমাজচিত্র নাই। আছে শুধু যুদ্ধমুহূর্তের বিরাট উল্লাস ও উন্মাদনা।

আংলো-স্যাক্সন কবিতায় কেবল মহাকাব্যিক বীরত্ব নাই। কিছু শোকোচ্ছ্বাসমূলক গীতিধর্মী আখ্যান-কবিতাও পাওয়া যায়। 'দি ওয়ানডারার', 'দি সিফেয়ারার', 'ডিওরস্ ল্যামেণ্ট', 'দি রুইন', এই চারটি কবিতায় কবিদের দারিদ্র্য-দুঃখজাত বেদনা ও সেই অভিজ্ঞতাপ্রসূত জীবন-দর্শন, বিপদসঙ্কুল সমুদ্রের দুর্দমনীয় আকর্ষণ, সংসারের নশ্বরতাবোধ ও জীবনের উত্থান-পতনের অনিবার্যতা হইতে সান্ত্বনালাভপ্রয়াস প্রভৃতি

অনুভূতিগুলি অতি করুণ ও মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। 'দি ওয়াইফস্ কম্‌প্লেণ্ট' ও 'দি হাসবাণ্ডস্ মেসেজ', এই দুইটি কবিতা দাম্পত্য বিরহের দুঃখ ও মিলনের আশা প্রকাশ করে। ইহাদের মধ্যে বৃহত্তরসমাজ-নিরপেক্ষ পারিবারিক জীবনের প্রণয়াকর্ষণও স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত। নিয়তিবাদে বিশ্বাস ও তজ্জনিত বিষাদ—ইহাই মহাকাব্য ও এই আখ্যানকবিতাগুলির সাধারণ সুর ও ইহাদের মধ্যে যোগসূত্র।

বেউল্‌ফের রচনার পরে আংলো-সাক্সন-যুগ আরও ৩৫০।৪০০ বৎসর পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই যুগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ইংরাজ জাতির খৃষ্টধর্মগ্রহণ।* এই ধর্ম-পরিবর্তনের ফলে ইংরাজের সাহিত্যে ও জাতীয় চরিত্রে এক গভীর পরিবর্তন আসে। ইংরাজের রুক্ষ, পরুষ ভাব ও অদৃষ্টবাদের পরিবর্তে কোমলতর মনোবৃত্তি ও ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্যাডমন (Cædmon) ও কিনেউল্‌ফ্ (Cynewulf)-এর কবিতায় এই নূতন প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। এই দুই কবি খৃষ্টের জীবন-চরিত ও তাঁহার অনুচরবর্গের দৈব কীর্তির বিষয়ে কবিতা লিখিয়াছেন—এই কবিতায় যুদ্ধপ্রিয়তা ও ভগবৎ-প্রেমের এক সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে। খৃষ্টের যে মূর্তি ইহারা কল্পনা করিয়াছেন তাহাতে জলদস্যুর দুর্ধর্ষতা ও প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে করুণা ও প্রীতির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে। প্রকৃতির শান্ত-স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের দিকেও কবিদের চোখ খুলিয়াছে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র ও কুয়াশা-ঘেরা পাহাড়-পর্বত ও অরণ্যের সীমা ছাড়াইয়া তাঁহারা প্রকৃতির মধুর-কোমল বিকাশগুলিতে দৃষ্টি দিবারও সময় পাইয়াছেন। ক্যাডমন দৈবানুগ্রহে কাব্যপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন এইরূপ একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। বাইবেলের সৃষ্টিকথা (Genesis), মিশর হইতে প্রত্যাবর্তন (Exodus) ও ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের যন্ত্রণা (Passion) অবলম্বনে তাঁহার কবিতা রচিত। ইহাদের মধ্যে 'এক্সোডাস'-এর অবস্থাসঙ্কট তাঁহার কল্পনাকে অধিক উত্তেজিত করিয়াছে। কিনেউল্‌ফের রচনা সম্বন্ধে মতপার্থক্য রহিয়াছে। তবে যেগুলির মধ্যে তাঁহার স্বাক্ষর সাংকেতিক অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে, সেগুলির প্রামাণিকতা স্বীকৃত। ক্যাডমনের সহিত তুলনায় কিনেউল্‌ফের কল্পনা আরও সাহিত্যাশ্রয়ী, আবেগময় ও বিচিত্র-বিষয়সঞ্চারী। ক্যাডমন সাধারণের কবি, কিনেউল্‌ফ শিক্ষিতদের।

* অবশ্য বেউল্‌ফের যে পাণ্ডুলিপিটি আমরা পাইয়াছি তাহা ইংলণ্ড খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে লেখা।

আংলো-সাক্সন গদ্য—এ যুগে রাজা আলফ্রেডের (৮৭১—৯০১) পূর্ব পর্যন্ত লাটিন গদ্যেরই প্রচলন ছিল। আলফ্রেডই প্রথম আংলো-সাক্সন ভাষায় গদ্যের প্রবর্তন করেন। 'আংলো-সাক্সন ক্রনিকেল' নামে সমকালীন ঐতিহাসিক বিবরণের প্রথম পর্ব তাঁহারই প্রেরণায় রচিত হয়। আলফ্রেডের পর এলফ্রিক ও উল্‌ফস্টান—এই দুইজন ধর্মযাজকগোষ্ঠীভুক্ত লেখক বাইবেলের অনুবাদ, ধর্মোপদেশ-সংকলন ও বৈদেশিক আক্রমণে ইংরাজের নৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের প্রতি দৃষ্টি-আকর্ষণকারী কিছু কিছু ইতিহাসচেতনামূলক রচনার দ্বারা গদ্য-সাহিত্যকে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া যান। ভাষার দিক দিয়াও আলফ্রেডের সাদামাটা গদ্যের সহিত এলফ্রিক এবং বিশেষ করিয়া উল্‌ফস্টানের রচনাশৈলীর প্রভূত প্রভেদ রহিয়াছে।

৩

১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বৈদেশিক অভিভবের এক প্রচণ্ড তরঙ্গ আসিয়া পূর্বতন সাহিত্য ও জীবন-ধারাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। এই সময়ে ইউরোপ হইতে নর্মানেরা আসিয়া হেস্টিংসের যুদ্ধে ইংরাজদের পরাজিত করিয়া রাজ্য দখল করিল। ইংরাজ পরাধীনতার গ্লানি ও অপমান মর্মে মর্মে অনুভব করিল এবং ইংরাজী ভাষা স্বাধীনতার সমস্ত গৌরব হারাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় কথ্য ভাষায় পরিণত হইল। আংলো-সাক্সন-যুগের সাহিত্য এই প্রচণ্ড ধাক্কায় নিজ অস্তিত্ব পর্যন্ত হারাইয়া ফেলে। সাহিত্যে ও জাতীয়-জীবনে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা পূর্ণমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করে। এক এক সময় নৈরাশ্যবাদীদের মনে হইয়াছে যে, ইংরাজী সাহিত্য বুঝি বা ফরাসী সাহিত্যের অধীন করদ-রাজ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে।

এই সময়ের বিজেতা নর্মান ও বিজিত আংলো-সাক্সনদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কটি স্কটের বিখ্যাত উপন্যাস 'আইভ্যান্ হো'তে চমৎকার ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। স্কট দেখাইয়াছেন যে, ভাষাবিজ্ঞানও কেমন করিয়া এই সম্পর্কের উপর আলোকপাত করে। নর্মানেরা প্রভু, সুতরাং ক্ষমতা ও আরাম-উপভোগের সমস্ত বিচিত্র ব্যবস্থাই তাহাদের করায়ত্ত; ইংরাজ দাস—লাঞ্ছনা ও অপমানের কাজগুলিতেই তাহাদের অধিকার সীমাবদ্ধ; গোরু-চরান, মেষ-প্রতিপালন প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর কাজও তাহাদের। ইতর প্রাণীরা যতদিন বাঁচিয়া থাকে, যতদিন তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়, ততদিন তাহাদের ইংরাজী নাম থাকে; কিন্তু যে মুহূর্তে তাহারা মরিয়া রন্ধনের

উপকরণে পরিবর্তিত হয়, ভোজ্যদ্রব্যে রূপান্তরিত হইয়া খানার টেবিলে হাজির হয়, তখনই তাহারা ইংরাজী নাম বিসর্জন দিয়া নর্মান নাম গ্রহণ করে। কাঁচা মাল ইংরাজী নামেই চলে; কিন্তু তৈয়ারী বিলাস-দ্রব্য নর্মান-নামে পরিচিত। "Sheep" কথাটি ইংরাজী, "Mutton" নর্মান; "Deer" ইংরাজী, "Venison" নর্মান ইত্যাদি। এই ভাষা-বৈষম্যের মধ্য দিয়াও তখনকার ইতিহাস সুন্দরভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

কিন্তু ভগবান যাহাদের প্রতি অনুকূল, অনিষ্টের মধ্য দিয়াই তাহাদের ইষ্ট সংসাধিত হয়। এই পরাধীনতার গ্লানির মধ্য দিয়াই এক নূতন, শৌর্য-বীর্য-সম্পন্ন, মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধ ইংরাজ জাতি গড়িয়া উঠিল। কিছুদিনের মধ্যেই বিজেতা-বিজিতের সম্পর্ক বিলুপ্ত হইয়া ইংরাজ ও নর্মান পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গেল। নর্মান ইংলণ্ডকেই নিজের দেশ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া নূতন দেশপ্রেমিকতায় উদ্বুদ্ধ হইল। রক্ত ও ধর্ম এক থাকার ফলে উভয় জাতির মিলন খুব সহজ ও সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া ওঠে। এই নূতন দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত, মিলিত জাতি স্বদেশে স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া যথেচ্ছাচারী রাজা জনের নিকট নিজ স্বাধীনতার স্বত্বাধিকার (Magna Charta) কাড়িয়া লইল। প্রথম ও তৃতীয় এডওয়ার্ডের আমলে তাহারা নিজেদের নবলব্ধ শক্তির সচেতনতায় দৃপ্ত হইয়া বিদেশ-আক্রমণে পর্যন্ত উদ্যোগী হয়। এইভাবে বহুধা-বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ-সমষ্টি হইতে এক পরাক্রান্ত, অপূর্ব-গৌরব-মণ্ডিত জাতি সংহত হইয়া উঠিল।

৪

ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়া এই মিলন-কাহিনী আরও বিচিত্র ও বিস্ময়কর। নর্মানদের মাতৃভাষা ফরাসী; নর্মানজয়ের পর দুই শতাব্দী ধরিয়া ফরাসী ভাষা ইংরাজীকে সম্পূর্ণ কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছিল। রাজ-সভায়, সভ্য-সমাজে আলাপ-আলোচনা ও ভাব-বিনিময়ে, বিচারালয়ে, আইন-সভায়—সর্বত্রই ছিল ফরাসীভাষার একাধিপত্য। ইংরাজী-ভাষা পরাধীন জাতির ভাষা, ইতর জনসাধারণের ভাষা বলিয়া সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হইতে নির্বাসিত হইয়া দেশের অখ্যাত কোণগুলিতে আত্মগোপন করিয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় রচিত সাহিত্য সাহিত্যের সমস্ত মর্যাদা হারাইয়া একদিকে পল্লীগাথার পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছিল—সমস্ত সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের অবহেলা, রাজসভা ও অভিজাতবর্গের

অনাদর ইহাকে সহ্য করিতে হয়। অন্যদিকে ইহার সাহিত্যিক উৎকর্ষ ও বিষয়-গৌরব যুগপৎ নষ্ট হইয়া ইহা ইতিহাসের শুষ্ক সারসঙ্কলন, ধর্মের নীরস তত্ত্বালোচনা ও উপদেশ-সংগ্রহে পরিণত হইয়াছিল।

এই চরম দুর্গতির মুহূর্তে জাতীয় মিলনের মহাসন্ধিক্ষণ এই অবজ্ঞাত সাহিত্যের মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করে। জাতীয় মিলনের সহিত তাল রাখিয়া ভাষা ও সাহিত্যগত মিলনও গড়িয়া ওঠে। ক্রমশঃ দুই শতাব্দীব্যাপী উপেক্ষা ও অবহেলার ধূলি-জঞ্জাল ঝাড়িয়া ফেলিয়া ইংরাজী ভাষা আবার মাথা তুলিল। ফরাসী ভাষার শব্দ, ভাব-সম্পদ ও ছন্দোবৈচিত্র্য ইহা অনায়াসেই আত্মসাৎ করিয়া নেয়। ফরাসী ভাষার সহিত সংমিশ্রণে ইহার প্রসার ও পরিধি, ইহার ব্যঞ্জনা ও প্রকাশ-শক্তিও আশ্চর্যরূপ বাড়িয়া যায়। ফরাসী ভাষার মধ্য দিয়া ইউরোপের ভাবধারা ও সভ্যজগতের মানস-সংস্কৃতি ইহার শুষ্ক-প্রায় ধমনীতে নবীন, সতেজ রক্তধারার ন্যায় সঞ্চারিত হইল এবং ইংরাজী ভাষা অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাহার অর্ধস্ফুট শৈশব অতিক্রম করিয়া পূর্ণ-যৌবনের শক্তি ও মর্যাদা লাভ করিল।

ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও পরিণতিতেও পূর্ববর্ণিত ব্যাপারের অনুরূপ দৃশ্য দেখা যায়। অবশ্য ইংরাজ ও বাঙালীর মধ্যে কোন রক্ত-সম্পর্ক ছিল না; সুতরাং রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাহাদের মিলন সম্ভবপর হয় নাই। ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়াও ইহাদের পার্থক্য এত বেশী যে ইংরাজীর প্রভাবে বঙ্গভাষা কতকটা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইলেও ইহারা এক হইয়া মিশিয়া যাইতে পারে নাই। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার যে মিলন তাহা আরও বেশী নিবিড় ও অন্তরঙ্গ। ইংরাজীভাষা নিজবৈশিষ্ট্য না হারাইয়া যতটা ফরাসী উপাদান আত্মসাৎ করিতে পারে ততটাই সে নিজ পুষ্টিবিধানের জন্য গ্রহণ করিয়াছিল। উভয়ে মিশিয়া এক নূতন ইংরাজী ভাষার সৃষ্টি হয়—ইহা কেবল ফরাসী ভাষার অনুকরণ-মাত্র নহে। ইংরাজী ও বাংলা ভাষা মিলিয়া এরূপ নূতন কোনো ভাষার উদ্ভব হয় নাই—অবশ্য ইংরাজী ভাষার বহু শব্দ বাংলা ভাষায় চালু হইয়া গিয়াছে।

৫

[১২০০—১৩০০]

চসারের আবির্ভাবের পূর্বে ত্রয়োদশ শতকে এই ফরাসী-প্রভাবিত ইংরাজী ভাষার প্রকাশ-শক্তি পরীক্ষিত হয় নানারকমে—কতক অনুকরণাত্মক ও কতক

মৌলিক কবিতার ভাববিমিশ্রতার মধ্যে। 'দি আউল অ্যাণ্ড দি নাইটিঙ্গেল' (পেচক ও বুলবুল) অনেকটা ফরাসী-প্রভাবমুক্ত ও প্রাচীন আংলো-সাক্সন কবিতার বিষণ্ন গাম্ভীর্যের ভাবানুসারী। এই দুই পক্ষীর লড়াই মানবের দুই প্রকার মনোভঙ্গীর বিরোধের রূপক-কাহিনী। বুলবুল স্ফূর্তিময় ও নিশ্চিন্ত যৌবনের প্রতীক; আর পেচক বার্ধক্যের বিষাদমাখা প্রজ্ঞার প্রতিনিধি। উভয়ের মধ্যেই ভগবদ্‌ভক্তি বর্তমান, তবে আরাধনার প্রণালী উহাদের স্বতন্ত্র। কাহার গান বেশী ভাল তাহা মীমাংসার জন্য উহারা কবিকে মধ্যস্থ মানে। কবি যদিও পেচকের অনুকূল, তথাপি তিনি মোটামুটি নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়া কাহারও সপক্ষে রায় দেন নাই। কবিতাটিতে দুই বিবদমান পক্ষী সময় সময় তাহাদের পক্ষিপ্রকৃতি ভুলিয়া মামলাবাজ মানুষের মতো জিদ ও পরস্পরের প্রতি তীব্র মনোমালিন্য দেখাইয়াছে। মোটের উপর ইংরাজী ভাষা ফরাসী প্রভাব অতিক্রম করিয়া নিজস্ব রীতি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছে—কবিতাটি ইহাই প্রমাণ করে।

ইহার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে দুইখানি ফরাসী রোমান্সের ভাবানুসরণে হ্যাভ্‌লক্‌ ও হর্ন নামে দুইটি অদ্ভুতরসাত্মক আখ্যান-কাব্য ইংরাজীতে রচিত হয়। অথচ অনুকরণের মধ্য দিয়াই ইংরাজ কবির রুচির বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ফরাসী রোমান্সের ভাব অত্যন্ত অভিজাত-গন্ধী, উহার লেখকেরা পুরাকালের ভাটের মত রাজসভার আদব-কায়দা, সমারোহময় উৎসব ও কৃত্রিমরীত্যনুসারী প্রেমের সুদীর্ঘ, ক্লান্তিকর বর্ণনা-বিশ্লেষণে আগ্রহী। কিন্তু ইংরাজ কবির শ্রোতৃমণ্ডলী সাধারণ মানুষের জনতা; তাহারা এত সূক্ষ্ম, পোশাকী ভাবের ধার ধারে না। তাহারা চায় আখ্যানের দ্রুতগতি ও রোমাঞ্চকর ঘটনাপরম্পরা। কাজেই ইংরাজ কবিরা তাঁহাদের শ্রোতৃবর্গের রুচি-অনুসারে তাঁহাদের কাব্যকাহিনীর মধ্যে ভাবের সরলতা ও বাস্তব বর্ণনার অনুপ্রবেশ করাইয়াছেন—অভিজাতবর্গের চিত্তবিনোদনের মহার্ঘ সামগ্রী জনসাধারণের স্থূল রুচি ও দুরন্ত জীবন-পিপাসা মিটাইবার উপাদানে রূপান্তরিত হইয়াছে। হ্যাভ্‌লক্‌ ও হর্ন উভয় কাহিনীতেই আমাদের বাংলা রূপকথার মত অভিভাবকহীন রাজপুত্রদের ভাগ্যবিপর্যয় ও শেষ পর্যন্ত পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার ও সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবনযাত্রার কথা বিবৃত করা হইয়াছে। হ্যাভ্‌লকে রোমাঞ্চকর ঘটনার প্রাধান্য; হর্নে প্রেমের জয় ঘোষিত।

এই যুগে কতকগুলি লোকসঙ্গীত, প্রকৃতি-বর্ণনাত্মক ও রাজনৈতিক প্রেরণামূলক গীতও রচিত হয়। তাহারা ভবিষ্যৎ যুগের ইংরাজী গীতি-কবিতার পূর্ব-সূচনা।

মিশ্র ভাষায় গান রচনা হইলে বোঝা যায় যে সেই ভাষা সাঙ্কর্য পরিহার করিয়া রক্তবিশুদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই সময়কার সত্মোজাত ইংরাজী ভাষা ও ভাব স্বরগত ঐক্যলাভের পরিচয় দেয়।

৬

[১৩৫০—১৪০০ খৃঃ অঃ]

সমস্ত ভাষারই নবার্জিত শক্তির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় শক্তিশালী প্রতিভাবান লেখকের আবির্ভাবে। তৎপূর্বে ভাষার কতটা উন্নতি হইয়াছে তাহা বোঝা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই বাংলা ভাষা ইংরাজী ভাব ও ভাষা আপনার দেহে-মনে গ্রহণ করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে এই সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের বিশেষ কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। একদিন হঠাৎ বিস্মিত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের পাঠক গদ্যে-পদ্যে সাহিত্যের এই অতর্কিত যৌবনোন্মেষ লক্ষ্য করিল; একদিন হঠাৎ দেখিল যে, যে-সমস্ত নূতন মাল-মসলা সাহিত্য-ভাণ্ডারে জমা হইতেছিল, তাহারা পুরাতনের সহিত এক হইয়া গিয়াছে ও এই নূতন ও পুরাতনের সংমিশ্রণের ফলে এক নূতন বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইংলণ্ডের চতুর্দশ শতাব্দীতে যে নূতন মিশ্রভাষা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাকে সাহিত্যিক রূপ ও সুষমা দিয়াছেন মহাকবি চসার (Chaucer) (১৩৪০—১৪০০)। চসারই এক হিসাবে আধুনিক ইংরাজী কবিতার জনক। তিনিই প্রথম মধ্যযুগের সীমা ছাড়াইয়া আধুনিক যুগে পদার্পণ করিয়াছেন। সময়ের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে চসার মধ্যযুগের লোক। মধ্যযুগ-সুলভ সাহিত্যরীতির অনেক চিহ্নও তাঁহার লেখায় বিদ্যমান। তাঁহার প্রথম বয়সের লেখার মধ্যে অধিকাংশই অনুবাদ বা পূর্বতন সাহিত্যের ছায়া অবলম্বনে লিখিত। এইসব লেখায় তিনি মোটামুটি সেই যুগের প্রসিদ্ধ ফরাসী ও ইটালীয় লেখকদের অনুসরণ করিয়াছেন।

প্রথম ও মধ্য বয়সের রচনাসমূহের মধ্যে 'দি বুক অব দি ডাচেস' (১৩৬৯) চসারের পৃষ্ঠপোষক রাজকুমার জন অব গণ্টের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু-উপলক্ষে রচিত শোকগাথা। ইহাতে মধ্যযুগের কবিকুলের প্রথানুযায়ী স্বপ্নদর্শনের রূপক-রীতিতে এই বিয়োগোচ্ছ্বাস বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু স্বপ্ন ও রূপকের ধোঁয়াটে আবরণের ভিতরেও মাঝে মাঝে চসারের বস্তুপ্রীতি ঝলসিয়া উঠিয়াছে ও প্রকৃত করুণরসও অল্পবিস্তর পরিস্ফুট হইয়াছে।

'হাউস অব্ ফেম'-এও (The House of Fame, ১৩৬৯) উর্ধ্বলোকস্থ কীর্তিনিকেতনে প্রবেশেচ্ছু ঈগল-বাহিত কবির উচ্চাভিলাষ অপেক্ষা দুরবস্থাই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়া হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে। দান্তের মত নভোচারী কবির পক্ষে এই আকাশভ্রমণ অত্যন্ত চরিত্রানুগ হইত, কিন্তু মাটির কবি চসার বায়ুমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া খুবই অস্বস্তি অনুভব করিয়াছেন। উর্ধ্বপ্রয়াণের বাহন ঈগলের সহিত তাঁহার কথাবার্তা খুবই সংক্ষিপ্ত ও দায়-সারার মত হইয়াছে এবং যত শীঘ্র সম্ভব এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি হইতে মুক্তিলাভের জন্যই তিনি অধীর। এইরূপে মহাকবি হইবার ব্যর্থ সাধনার মধ্যেই চসার নিজ কবিপ্রকৃতির সত্য পরিচয় দিয়াছেন ও নিজেকেই খানিকটা উপহাসাস্পদ করিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরস উৎসারিত করিয়াছেন। 'দি পার্লামেন্ট অব ফাউলস' (The Parliament of Fowls) চসারের আর একটি হাস্যরসপ্রধান রচনা। এখানে বিভিন্ন জাতীয় পক্ষীর মধ্যে প্রণয়ের আদর্শ ও স্বরূপ লইয়া আপাত গুরুগম্ভীর দার্শনিক আলোচনা ও তর্কনৈপুণ্যপ্রদর্শন বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডারত মানবকবিগোষ্ঠীর প্রতি পরোক্ষ ব্যঙ্গমনোভাবের প্রকাশ। বক্তাদের লঘুতা ও বক্তৃতার গুরুত্বের মধ্যে বৈপরীত্য পরিস্ফুট করিয়া কবি একটি সুন্দর কৌতুকরসসৃষ্টি করিয়াছেন।

'ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিড' (১৩৮৫ ?)-এর কাহিনী ইতালীয় খ্যাতনামা গল্পলেখক বোকাচ্চিয়োর 'ফিলোসট্রাটো'র অনুসরণে রচিত। ইহাতে কিন্তু চসারের মৌলিকতা উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিরা ক্রেসিডকে বিশ্বাসঘাতিনী প্রেমপসারিণীরূপে নিন্দা করিয়াছেন ও তাহার সহিত ট্রয়রাজপুত্র ট্রয়লাসের ভাগ্যবিড়ম্বিত প্রণয়কাহিনীকে মধ্যযুগের চির-বিশ্বস্ততার আদর্শে বিচার করিয়া উহার একটা কৃত্রিম মূল্য নির্ধারণ করিয়াছেন। চসার এই প্রেমাকর্ষণকে নীতিবিদ বা আদর্শবাদীর দৃষ্টিতে নয়, মনস্তত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। ক্রেসিডের জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ঘটনা প্রভাবে তাহার মনের অনিবার্য পরিবর্তনই তাঁহার চোখে প্রধান। ট্রয়লাসও মধ্যযুগের প্রথাবদ্ধ মনোভাবের অসহায় ক্রীড়নক নয়। তাহারও কিছুটা স্বাধীন বিচার ও বিশ্লেষণশক্তি আছে। বিশেষতঃ এই প্রণয় ব্যাপারের মধ্যবর্তী দূত প্যাণ্ডারাস একটি সম্পূর্ণ ভাববিলাসমুক্ত, বস্তুরসোচ্ছল, নির্মোহ-দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিতে অভ্যস্ত চরিত্র—তাহাকে ফলস্টাফের পূর্ব সূচনা বলা

যাইতে পারে। এই কাব্যটি ঔপন্যাসিক মনোবিশ্লেষণের ও জীবনরসিকতার প্রথম দৃষ্টান্তরূপে সমালোচকবর্গ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছে।

তাঁহার শেষ বয়সে লিখিত 'কাণ্টারবেরী কাহিনী' (Canterbury Tales) নামক অমর আখ্যায়িকা তাঁহার প্রতিভা ও সরস মৌলিকতার এক আশ্চর্য পরিচয়। এই আখ্যায়িকার মুখবন্ধে (Prologue) তিনি খুব সূক্ষ্ম লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা, উচ্চাঙ্গের রসিকতা ও সমসাময়িক সমাজের ছবি আঁকার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ইংলণ্ডের বিভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় বত্রিশ জন লোক তীর্থযাত্রী হইয়া কাণ্টারবেরীর পবিত্র পীঠ দর্শনে যাইতেছেন, ইহাই এই মুখবন্ধের বিষয়। এক হোটেলে সকলে সমবেত হইয়াছেন। হোটেলের মালিকও এই তীর্থযাত্রীর দলে সামিল হইলেন। যাত্রার পূর্বে শর্ত হইল যে, প্রত্যেকে যাইবার ও ফিরিবার পথে দুইটি করিয়া গল্প বলিয়া যাত্রীদের পথক্লেশ-অপনোদন ও মনোরঞ্জন করিবেন। যাঁহার গল্প সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে তাঁহাকে অপর সকলে সেই হোটেলেই (নতুবা হোটেল-রক্ষকের লাভ হয় না!) এক ভোজে সম্বর্ধিত করিবেন। এই উপলক্ষ্যে কিঞ্চিদধিক ত্রিশ জন যাত্রীর পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাব-ভঙ্গী, চরিত্র ও ব্যবহারগত পার্থক্যের এক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। এই মুখবন্ধে মধ্যযুগের সমাজ যেন জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত হইয়া, তাহার অফুরন্ত বৈচিত্র্য ও প্রাণশক্তি লইয়া আমাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মধ্যে চসার যে রসিকতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন তাহা মধ্যযুগে দুর্লভ। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিনিধির আকৃতি ও প্রকৃতির যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহা সূক্ষ্মদর্শিতায় অতুলনীয়। বিশেষতঃ ধর্ম-যাজক-সম্প্রদায়ের চরিত্রে যেসব অসঙ্গতি ও দুর্বলতা আছে তাহাদের প্রতি তিনি যে বিদ্রূপ-কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহার সরস কৌতুকপ্রিয়তা আধুনিক যুগেও উপভোগ্য। এই সরস ও সূক্ষ্ম বিদ্রূপশীলতা, যুগোচিত সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া স্বাধীন চিন্তার পরিচয়, সমাজ-সমালোচনার আশ্চর্য শক্তি—এ সমস্তই চসারের আধুনিকতার নিদর্শন। চসার ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্কীর্ণতা ঘুচাইয়া ইহাকে ইউরোপীয় ভাবধারার সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন; তিনি মধ্যযুগের কুসংস্কার ও ধর্মীয় গাম্ভীর্য ছিন্নভিন্ন করিয়া তাহার মধ্যে লঘু রসিকতার নির্ঝর বহাইয়াছেন ও নূতন ইংরাজী ভাষার সাহিত্য-গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এককথায় তিনি বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে ইংরাজী সাহিত্যকে প্রথম সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

৭

চসারের সমসাময়িক আর একজন ছিলেন—ল্যাংলাণ্ড (Langland ১৩৩০-?)। চসারের সঙ্গে তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা, মেজাজ ও রচনানীতির মৌলিক প্রভেদ আছে। চসার অনেকটা রাজদরবার-ঘেঁষা লোক ছিলেন; তিনি রাজ-পরিবার ও রাজসভার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত। অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গেই তাঁহার মেলামেশা ও রুচিগত ঐক্য ছিল। গরীবের কথা তিনি ভাবিতেন কম; মধ্যবিত্ত বণিক্, ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে তিনি দেখিতেন যথেষ্ট সহানুভূতির সহিত, কিন্তু এই সহানুভূতিও ছিল অভিজাত-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবান্বিত। তীক্ষ্ন পরিহাস-রসিকের মনোবৃত্তিই ছিল তাঁহার বিশেষত্ব; জীবনের অসঙ্গতি-বিশ্লেষণের দ্বারা বিদ্রূপাত্মক হাস্যরস যোগানই ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। জীবনের গভীর বেদনা, রিক্ত-বঞ্চিতদের হাহাকার, ক্ষুধাক্লিষ্ট, অত্যাচারিতদের অন্তঃরুদ্ধ ক্ষোভ, বিধাতার বিরুদ্ধে অভিমান ও বিদ্রোহ— এই সমস্ত কঠিন সমস্যার ধার ঘেঁষিয়াও চসার কোনো দিন যান নাই। তাঁহার রচনা পড়িয়া কাহারও সন্দেহ হইবে না যে, ইংলণ্ডের যে সমাজ-জীবন তাঁহাকে এত প্রচুর হাসির উপাদান যোগাইয়াছে তাহার মধ্যে এত অবিচার, এত ক্ষোভ ও বেদনা সঞ্চিত হইয়া আছে। নিরন্ন কৃষক ও শ্রমিকদের করুণ ইতিহাস তাঁহার মনে কোন সাড়া জাগায় নাই—ঐ যুগের কৃষক-বিপ্লবের বহ্নি-শিখা তাঁহার লেখায় কোন উত্তাপ সঞ্চারিত করে নাই। তিনি যে সমস্ত দুঃখের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার নায়ক-নায়িকারা হয় অভিজাতবংশীয়, নয় বড় জোর মধ্যবিত্তশ্রেণীর।

সমাজজীবনের বাস্তব বেদনার সমস্ত দুঃসহতা, জনমনের অভিমান ও বিদ্রোহের সমস্ত জ্বালা কিন্তু ল্যাংলাণ্ডের কবিতায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তাঁহার 'চাষী পিয়ার্সের স্বপ্ন' (Vision of Piers Plowman, ১৩৬৫-১৩৯৮) নামক কাব্যে জীবনের এই দুঃখময় দিক্‌টার পরিচয় পাওয়া যায়। শত শত নিরন্ন কৃষক ও শ্রমিক যে অবিচারপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থার ফলে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া দারুণ অভাবে ক্লিষ্ট ও নিষ্পেষিত হইতেছে, ল্যাংলাণ্ড সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর তুলিয়াছেন। ক্ষমতাশালী জমিদারদের অত্যাচার, রাজকর্মচারীদের ঔদাসীন্য ও অসাধুতা, সর্বশ্রেণীর মধ্যে কর্তব্যনিষ্ঠার অভাব ও ঘুষের ছড়াছড়ি, এমন কি বিচারালয়ে পর্যন্ত পক্ষপাতিত্ব, দুর্বলের বিরুদ্ধে প্রবলের আক্রমণ—এই সমস্ত রকমের মিথ্যাচার,

অবিচার ও কাপট্যই লেখক তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধের সহিত উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। আমাদের পুরাণে মুনি-ঋষিরা যেমন ধ্যানবলে পাপ ও অন্যায়কে ভস্ম করিয়া ফেলিতেন, ল্যাংলাণ্ডও যেন সেইরূপ ক্রোধানলে সমাজের সমস্ত আবর্জনা-রাশিকে পোড়াইয়া ফেলিতে চাহেন।

ল্যাংলাণ্ডের রচনাতে কাব্যের সুষমা ও মাধুর্য খুব বেশী নাই—তিনি দরিদ্রের দুঃখ মন-প্রাণ দিয়া এত তীব্রভাবে অনুভব করিতেন যে, কাব্য-সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর তিনি পান নাই। বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব কলা-কৌশলের দিকে তাঁহাকে উদাসীন করিয়াছে। তিনি এই দুঃখ-কাহিনী রূপকের (allegory) সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন। তখনকার দিনে সোজাসুজি রাজশক্তিকে আক্রমণ করা নিরাপদ ছিল না, সুতরাং রূপকের ছদ্মবেশে অপ্রিয় ও বিপদসঙ্কুল সত্য প্রকাশ করা সে সময়ের একটা রীতি ছিল। ল্যাংলাণ্ড কল্পনা করিয়াছেন যে এই সমস্ত অত্যাচার ও অবিচারের দৃষ্টান্তগুলি তিনি যেন স্বপ্নে দেখিতেছেন। তাঁহার রচনাতে স্বপ্নরাজ্যের অবাস্তবতা ও অসংলগ্নতাও অনুভূত হয়। এই অসংলগ্নতার পিছনে তাঁহার ক্রোধ ও ঘৃণার তীব্র জ্বালা সময় সময় আরও স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়।

আর এক বিষয়ে তিনি চসারের বিপরীত-ধর্মী ছিলেন। চসার তাঁহার রচনায় বাক্য ও ছন্দে নূতন পথ অনুসরণ ও পুরাতন আংলো-সাক্সন প্রথাকে বর্জন করিয়াছেন। ল্যাংলাণ্ড কিন্তু পুরাতনের পক্ষপাতী। আংলো-সাক্সনের অনুপ্রাসাত্মক বাক্‌-রীতি ও ছন্দোবৈশিষ্ট্য তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন—নূতনের মোহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। রাজসভার আশেপাশে ভাষা ও ছন্দের যে বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, বোধহয় অভিজাত-প্রতিবেশের প্রতি ঘৃণাবশতঃই তিনি সেই পরিবর্তনকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার লেখা একদিকে যেমন সঙ্কীর্ণতা-দোষে দুষ্ট হইয়াছে, তেমনি অপরদিকে লুপ্তপ্রায় পুরাতনের প্রতি অচল নিষ্ঠার গৌরবে গৌরবান্বিতও হইয়াছে।

৮

এই যুগে আরো যে সমস্ত কবিতা লেখা হয়, তাহার মধ্যে 'গাওয়েন ও সবুজ যোদ্ধা' (Gawain and the Green Knight) ও 'মুক্তা' (Pearl) নামে দুইখানি কাব্যগ্রন্থও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যদ্বয় একই কবির লেখা

বলিয়া অনুমান করা হয় কিন্তু এই কবি যে কে তাহা জানা যায় নাই। প্রথম গ্রন্থটি রাজা আর্থারের কিংবদন্তীমূলক ও অদ্ভুতরসাত্মক কাহিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট, দ্বিতীয়টি রূপকধর্মী ও বাইবেলের স্বর্গরাজ্য-কল্পনার অপার্থিবদ্যুতি-মণ্ডিত। একটির প্রেরণা রোমান্স ; অপরটি ধর্মপ্রত্যয় হইতে উদ্ভূত। প্রথমটিতে রোমান্সের মধ্যে নীতিবোধ ও দ্বিতীয়টিতে ধর্মের মধ্যে রোমান্সের সংমিশ্রণ থাকাতে, উভয় গ্রন্থই বিষয়-পার্থক্য সত্ত্বেও কতকাংশে সমধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

গাওয়েন ও সবুজ বীর এই কবিতায় এক বিপুলকায়, দীর্ঘদেহ, সবুজ পোশাক-পরিহিত, সবুজ ঘোড়ায় আরূঢ় দৈত্য আর্থারের রাজসভায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার বীর সভাসদ্‌দের এক অদ্ভুত বাজী-মূলক দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। যে কোন সভাসদ্ তাহার হস্তধৃত কুঠারের দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিতে পারে এই শর্তে যে আঘাত-কারীকে প্রত্যাঘাতের জন্য এক বৎসর পরে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। গাওয়ান এই শর্ত স্বীকার করিয়া দৈত্যের মস্তকচ্ছেদ করিল। দৈত্য তখন তাহার কাটামুণ্ড তুলিয়া লইয়া সকলের অবাক বিস্ময়ের মধ্যে অশ্বারোহণ করিয়া প্রস্থান করিল। তাহার পর গাওয়ানের প্রতিজ্ঞা-রক্ষার পালা। বৎসরান্তে ঐ যোদ্ধা-দৈত্যের সহিত দেখা করিতে যাইবার পথে সে এক অভিজাতবংশীয় যোদ্ধার দুর্গে তিন দিন অতিথি রূপে বাস করে। দুর্গস্বামী তাহার তরুণী স্ত্রীকে অতিথির চিত্তবিনোদনের জন্য রাখিয়া প্রতিদিনই শিকারে বাহির হইয়া যাইত। গাওয়ান এই তরুণী সুন্দরীর প্রলোভন জয় করে, কিন্তু তাহার নিকট হইতে রক্ষাকবচ-স্বরূপ একটি সবুজ রং-এর কোমরবন্ধ উপহার গ্রহণ করে। পরীক্ষার দিন দৈত্যের কুঠারাঘাতে একটু ছোটখাট আঁচড় ছাড়া তাহার আর কোন ক্ষতি হইল না। শেষ পর্যন্ত জানা গেল যে, ঐ বৃদ্ধ দুর্গস্বামীই সেই ছদ্মবেশী দৈত্য ও তাহার প্রলুব্ধকারিণী রমণী এক অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্না পরীরানী।

এই কাব্যখানি অদ্ভুতরসপ্রধান ও অলৌকিক-কাহিনীমূলক হইলেও প্রকৃতি-বর্ণনায়, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে ও কবিসুলভ সূক্ষ্ম অনুভূতিতে উচ্চ উৎকর্ষের অধিকারী। শিকারের বর্ণনায় ও শীত ঋতুর অস্থিমজ্জাভেদকারী হিমানী-সম্পাতের অনুভব ফুটাইয়া তোলার দক্ষতায় ইহা কবির তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও বর্ণনা-কুশলতার পরিচয় বহন করে। আর প্রলোভনের দৃশ্যগুলিতে গাওয়ানের চিত্তচাঞ্চল্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বের লক্ষণগুলি মনস্তত্ত্ববিদের মানবচরিত্রে অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। অসম্ভব, অপ্রাকৃত কাহিনীর মধ্যেও যে বস্তুনিষ্ঠতা ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া সম্ভব, এই কাব্যটি তাহারই দৃষ্টান্ত।

গাওয়ানের বিপন্মুক্তি তাহার প্রলোভন-জয়ের পুরস্কার, সুতরাং এখানে নীতির মহিমাও ঘোষিত হইয়াছে।

'মুক্তা'-নামক কবিতাটি বাইবেলের Apocalypse অধ্যায়ের কাব্য-রূপ। এক কন্যাশোকাতুর পিতা তাহার কন্যারত্ন (Pearl) হারাইয়া শোকাভিভূত হইয়া সমাধিস্থলে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ঘুমাইয়া পড়ে। নিদ্রিতাবস্থায় সে স্বপ্ন দেখে যে, সে এক অপার্থিব-জ্যোতিস্নাত দেশে নীত হইয়াছে, যেখানে স্ফটিকের পাহাড়, রজতোজ্জ্বল গাছের পাতা ও মহার্ঘ-রত্নখচিত কঙ্করভূমি দেখা যাইতেছে। উজ্জ্বল-পুচ্ছশোভিত পাখীদের আনন্দসঙ্গীত শুনিতে শুনিতে সে এক নদীর তটে পৌছিল, যাহার তলদেশের পাথরগুলি প্রবাল ও মাণিক্যের ন্যায়। তাহার বিশ্বাস হইল যে নদীর পরপারেই স্বর্গলোক। এমন সময়ে পরপারে তাহার মৃতা কন্যা প্রবাল-মুকুটপরিহিতা ও দিব্যবিভামণ্ডিতা রূপে দেখা দিয়া, তাহার অহেতুক শোকের জন্য তাহাকে মৃদু তিরস্কার করিল। শোকাতুর পিতা স্বর্গরাজ্য প্রত্যক্ষ করিল ও খৃষ্টকে ঘিরিয়া যে গীতমুখর কুমারীবৃন্দের শোভাযাত্রা অগ্রসর হইতেছে তাহার মধ্যে তাহার হারানো রতনকে আবিষ্কার করিল। পিতা তাহার কন্যার এই আনন্দময় পারলৌকিক জীবন দেখিয়া শোক সংবরণ করিল।

কবিতাটির মধ্যে নীতিকথার কিছু বেশী প্রাধান্য আছে ও বাইবেলের বর্ণনার অনুসরণ অনেক জায়গায় অতিমাত্রায় প্রকট। বর্ণনায়ও রং-এর ছড়াছড়ি। তথাপি সমস্ত ভাবাবহের মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্ম সঙ্গতি আছে, নিষ্পাপতার দ্যোতনাস্বরূপ এমন একটি শুভ্র শুচি আলোকের সৌকুমার্য বিচ্ছুরিত হইয়াছে, শোকাচ্ছন্ন পিতার অন্তরে ক্ষোভ হইতে শান্ত সন্তোষে রূপান্তরের এমন একটি স্বভাবানুগ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে যে, সমস্ত কবিতাটি পরিণত শিল্পবোধের, রং ও রেখার সার্থক বিন্যাসের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রাগাধুনিক যুগের ধর্মমূলক কবিতা উহার সংকীর্ণ বিষয়গণ্ডী ও অপ্রাকৃত কল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়াও যে শিল্পকৃতির দিক হইতে রসবোধের পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে এখানে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। কবিতাটির রচনাশৈলী লক্ষণীয়। প্রাচীন ইংরাজী কবিতার অনুপ্রাস, ফরাসী কাব্যের ছন্দ ও মিল এবং ইতালীয় কবিতার জটিল মিল-পারম্পর্য ও অনুচ্ছেদ-বিভাগ—এই সমস্তই কবি তাঁহার এই একটি কবিতায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। মধ্যযুগীয় কাব্য-জগতে ছন্দের ব্যাপারে 'মুক্তা' কবিতাটিকে একটি অসাধারণ পরীক্ষা মনে করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চসারের পরবর্তী সাহিত্য

[১৪০০—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ]

১

চসারের মৃত্যুর পর প্রায় দেড়শত বৎসর ইংরাজী সাহিত্যের অবসাদের যুগ। এই সুদীর্ঘকালে স্কটল্যাণ্ড ছাড়া ইংলণ্ডে কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যই রচিত হয় নাই। স্কটল্যাণ্ডে রাজা প্রথম জেমস, ডগলাস, ডানবার প্রভৃতি কবিরা চসারের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে সরস প্রাণধর্মিতার অভাব নাই। ইঁহারা পুরাতনের পুনরাবৃত্তির সঙ্গে কিছুকিছু নূতনত্বেরও প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু চসারের অনুবর্তী ইংরাজ কবিদের মধ্যে মৌলিকতা একেবারেই ছিল না। ইঁহারা কেবল অন্ধ, অক্ষম অনুকরণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি যে চসারকে তাঁহারা গুরু বলিয়া মানিতেন, তাঁহার কবিতার আসল সুরটুকুও তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই। তাঁহাদের হাতে কবিতা নীরস, প্রাণহীন, গদ্যময় হইয়া পড়িল।

সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা এই সৃষ্টিশক্তির দৈন্যের নানারূপ কারণ দেখান। প্রথমতঃ, এই দেড়শত বৎসর ইংলণ্ডে নানারূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার যুগ। অবশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহের সঙ্গে সাহিত্য-সৃষ্টির কোন স্বাভাবিক বিরোধ নাই। বরং অনেক সময় দেখা যায় যে, যুদ্ধের উদ্দীপনা সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে নূতন রস ও প্রাণবেগ সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু যে যুদ্ধ সাহিত্যের প্রেরণা যোগায়, তাহার পিছনে একটা প্রবল জাতীয়তাবোধ বা বীরত্বপূর্ণ, গৌরবময় আদর্শ থাকে। শক্তিক্ষয়কারী গৃহযুদ্ধ বা নীতি-জ্ঞানহীন বর্বর অভিযান কেবল ক্লান্তি, নৈরাশ্য ও অবসাদ আনে। তৈমুরলঙ্গ বা নাদির শাহের আক্রমণের মত ঘটনা, যাহা নৃশংস দস্যুতার নামান্তর মাত্র, তাহা কোন কবি-প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না। ইংলণ্ডের এই যুগে Wars of the Roses বা গোলাপের যুদ্ধ নামে বহুবর্ষব্যাপী এক গৃহযুদ্ধ ঘটিয়াছিল—রাজ-পরিবারের দুই শাখা সিংহাসনের দাবী লইয়া এই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়াছিল। এই যুদ্ধের পিছনে স্বার্থসিদ্ধি ও উচ্চাভিলাষ ছাড়া আর কোনও উচ্চতর আদর্শ ছিল না—কাজেই পরবর্তী যুগে শেক্সপিয়ারের দুই একখানি নাটক ছাড়া কাব্যসৃষ্টির উপর ইহার কোন প্রভাবই দেখা যায় না। অথচ ইহার ঠিক পরের যুগেই স্পেনীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের আত্মরক্ষার

শৌর্যময় উদ্যম সমস্ত জাতির প্রাণে সাড়া জাগাইয়াছিল ও সার্থক এবং মহান কাব্যসৃষ্টির হেতু হইয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধ নহে, যুদ্ধের প্রকৃতির উপরই নির্ভর করে ইহা সাহিত্যকে কতটা প্রভাবিত করিবে।

চসারোত্তর যুগের সাহিত্যিক দৈন্যের আরও গুরুতর কারণ আছে। এই শতাব্দী ইউরোপ ও ইংলণ্ডের মানস-ক্ষেত্রে নূতন বীজ বপনের যুগ। Renaissance বা নব-জাগরণের পূর্ব-সূচনা এই সময়েই ইউরোপের সমস্ত দেশে অনুভূত হয়। রোমক সাম্রাজ্যের শেষের দিকে গ্রীক ও লাটিন সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ কনস্টান্টিনোপলে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতনের কিছু পূর্ব হইতেই তাঁহারা ইউরোপখণ্ডে ছড়াইয়া পড়িতে শুরু করেন। ঐ পতনের পর তাঁহারা প্রায় সকলেই তাঁহাদের পুঁথিপত্তর লইয়া দেশত্যাগ করেন এবং ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদের শিক্ষার ফলে সারা ইউরোপে সাড়া পড়িয়া যায়। এই সাড়ার নামই নবজাগরণ বা Renaissance।

এই নবীন জীবনের দক্ষিণা বাতাস সর্বপ্রথম ইটালী ও ফ্রান্সে বহিতে আরম্ভ করে। গ্রীক সভ্যতার আদর্শ প্রথম এই দুই দেশেই প্রভাব বিস্তার করে। মধ্যযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ও ধর্মের শৃঙ্খল-মোচন, মুক্ত মানবের স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ, নূতন আশা ও কল্পনার উদ্দীপনা, পৃথিবী ও মানব-জীবনের প্রতি নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী, বহির্জগতে ও মনোরাজ্যে নূতন আবিষ্কার—নবজাগরণের এই সমস্ত লক্ষণই ইটালী ও ফ্রান্স হইতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং ইংলণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে। ইংলণ্ড এই নূতন ভাবধারা আত্মসাৎ করিতে, এই নূতন পরিবর্তনের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে, এত ব্যস্ত ছিল যে, সৃষ্টি করিবার কথা তাহার মনে উদয় হয় নাই। গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করা, পুরাতন কীটদষ্ট পুঁথির ভিতর হইতে সৌন্দর্য আহরণ করা, নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়া অজ্ঞাত কূলে-উপকূলে অবতরণ করা—এই সমস্ত কাজেই তাহার সমগ্র শক্তি নিযুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং এই সমস্ত নূতন মাল-মসলার ভার ঠেলিয়া সৃষ্টিশক্তির উন্মেষ একটু কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা বীজ-বপনের সঙ্গে সঙ্গেই পরিণত শস্যের শ্যামশ্রী দেখিতে চাহেন, তাঁহারা যেমন হতাশ হন, যিনি নবজাগরণের এই যুগের সাহিত্যে উচ্চ সৃষ্টি-শক্তির নিদর্শন পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহাকেও সেইরূপ হতাশ হইতে হইবে।

অবশ্য সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে প্রতিভার অভাব। প্রতিভার বাতাস নিজ ইচ্ছানুসারে বহে, তাহাকে কোন নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন করা যায় না, কোন বায়ুনির্দেশক যন্ত্রে তাহার গতিবিধি ধরা পড়ে না। সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা এই সত্য মানিতে চাহেন না বলিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ইহার কারণ খোঁজেন। হয়ত আবেষ্টনের প্রভাব একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক Taine-এর মতে, আবেষ্টনেই সাহিত্য-সৃষ্টির একমাত্র ব্যাখ্যা খুঁজিলে একদেশদর্শিতারই পরিচয় দেওয়া হয়। আনুষঙ্গিক কারণে প্রতিভার জন্ম-রহস্যের নির্ধারণ করা যায় না। অবশ্য প্রতিভাশালী লোক যে এ যুগে জন্মগ্রহণ করেন নাই তাহা বলিলে ঠিক হইবে না। কিন্তু বলা যায় যে, এ যুগের প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সাহিত্যসৃষ্টির দিকে মন না দিয়া অন্য দিকে মনোনিবেশ করেন। যে কারণেই হউক, এই যুগে প্রথম শ্রেণীর কোন সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং সেইজন্যই এ সময়ে সাহিত্যের এই দুরবস্থা।

২

এই বন্ধ্যা মরু-বালুকা-বিস্তারের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নামহীন নদী সরল ও অকৃত্রিম হৃদয়াবেগ এবং স্বতঃস্ফুরিত বীরধর্মের শ্যামল ভূখণ্ড রচনা করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইহার নাম Ballad (ব্যালাড) বা লোকগাথা। মধ্যযুগের নিষ্প্রাণতার মধ্যে কবিত্বশক্তি যে একেবারে লুপ্ত হয় নাই এই লোকগাথা-গুলি তাহারই নিদর্শন। ব্যালাডের উৎপত্তি অজ্ঞাত অতীতকালে হইলেও উহার বর্তমান রূপ পঞ্চদশ শতকে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এগুলি ক্রম-বিলীয়মান বীরযুগের শেষ অবদান। ক্ষাত্রশৌর্যের উচ্চতর অভিজাত আদর্শ ক্রমশ নিম্ন-স্তরের লোকের মনে যে ব্যাপক রসসঞ্চার করিয়াছে, ব্যালাড সেই রসেরই মৌলিক প্রতিফলন। ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী সীমান্ত-প্রদেশের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও উদার মানবিকতার উৎসার, প্রেমের বাধাবিড়ম্বিত, কিন্তু অপ্রতি-রোধনীয় উদ্দামতা, লৌকিক সংস্কার ও অতিপ্রাকৃত কুহক-মায়ার অতর্কিত অভিভব—এইগুলিই ছিল পঞ্চাদশ শতকের লোকগাথার বিশেষ উপজীব্য। পরবর্তী যুগেও যখনই কোন রোমাঞ্চকর ঘটনা জনচিত্তে বিশেষ আগ্রহ সঞ্চার করিয়াছে তখনই জনকণ্ঠে এই লোকগাথার পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে যুবরাজ চার্লসের সিংহাসন-পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা ও করুণ পরিণতি

লোকচিত্তে একটা প্রবল সমবেদনার তরঙ্গ তুলিয়া নূতন গাথার প্রেরণা যোগায়। ঊনবিংশ শতকের রোমান্টিক কাব্যে মধ্যযুগ-প্রভাবের পুনরুজ্জীবন প্রধানতঃ এই ব্যালাডকে অবলম্বন করিয়াই স্ফুরিত হয়। রোমান্টিক যুগের কোলরিজ ও কীটস এবং ভিক্টোরিয় যুগের মরিস, রসেটি প্রভৃতি কবি ব্যালাডের বহিরঙ্গগত গঠনরীতি ও বাক্য-সংযোজনার মধ্যেই উচ্চতর কলাকৌশল ও নিগূঢ়তর ভাবাবেদনের সঞ্চার করিয়াছেন। কাজেই ব্যালাডের অগ্রগতি কেবল রেনেসাঁসের যুগে সীমাবদ্ধ থাকে নাই, ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত নানা নূতন, কিন্তু সমধর্মী ভাব-প্রেরণার আশ্রয়ে সম্প্রসারিত হইয়াছে। ব্যালাড রচয়িতা হিসাবে বিংশ শতকেও কিপলিং, নয়েস, নিউবোল্ড প্রভৃতি কবির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই গাথাগুলি ব্যক্তিচিহ্নহীন, লুপ্ত-লেখক-পরিচয় রচনার কৌতূহলজনক দৃষ্টান্ত। ইহারা মহাকাব্যকে ভাঙ্গিয়া উহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যান অবলম্বনেই জন্মলাভ করিয়াছে। পরে অবশ্য ইহাদের মধ্যে গীতিকবিতার সুর সঞ্চারিত হইয়াছে, কিন্তু আখ্যানের বেগবান ধারা কখনই সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয় নাই। নদী যেমন চলিতে চলিতেই ফেনপুষ্পমালা গাঁথিয়া তোলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গে কৌতুক ছড়ায়, আবর্তরচনায় হঠাৎ অতল গভীরতার ইঙ্গিত দেয়, অথচ অফুরন্ত অগ্রগতি থামায় না, লোকগাথাও সেইরূপ আখ্যানের প্রবল আকর্ষণে বেগবান গতি রক্ষা করিয়াও প্রকৃতি-সৌন্দর্য, ভাবস্পন্দন ও অদৃষ্টকবলিত জীবনের কারুণ্যের এক একটি অনায়াস রেখাচিত্র অঙ্কিত করে। ইহার শিল্পবোধ পরিণত মননের ফল নহে, সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ততার প্রকাশ। ইহা একের রচনা হইয়াও জনতার সুরে সুর মিশাইয়াছে—রচয়িতা ইহার স্বত্ব ত্যাগ করিয়া সমগ্র জনমণ্ডলীর নিকট ইহাকে বিলাইয়া দিয়াছে। এই সমস্ত ব্যালাডে প্রত্যেক গাথারই স্তবকে স্তবকে পুনরাবৃত্ত এক-একটি ধুয়া থাকে। গানটি যখন সমবেত কণ্ঠে গীত হয়, তখন জনসাধারণ কর্তৃক এই ধুয়া-আবৃত্তির অবসরের ফাঁকে কবি আবার নূতন পংক্তি রচনা করেন। এইভাবেই ব্যালাড মুখে মুখে জন-সমাজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং যুগে যুগে গায়কের সংযোজনায় ইহার ছত্রগুলিও মার্জিত রূপ ও সমস্ত গানটি পরিবর্তিত আকার ধারণ করে। এমনও হইতে পারে যে প্রাচীন যুগে মহাকাব্য যে ভাবে রচিত, প্রচারিত ও রক্ষিত হইত, মধ্যযুগের ব্যালাডগুলিও সেইভাবে রচিত, প্রচারিত ও সংরক্ষিত।

পঞ্চদশ শতকের ব্যালাড বা লোকগাথার মধ্যে 'চেভী চেজ' (Chevy Chase) ও 'নাট ব্রাউন্ মেড' (The Nut-brown Maid) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের প্রথমটিতে ইংরেজ পার্শি ও স্কটিশ ডাগলাস-এর মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও ডাগলাসের মৃত্যুতে পার্শির শৈশব সারল্যপূর্ণ শোকোচ্ছ্বাস বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে হত্যা অপরাধে অভিযুক্ত ও নির্বাসিত প্রেমিকের সঙ্গে অভিজাতবংশীয়া প্রণয়িনীর অরণ্যবাসসঙ্কল্প প্রেমের দুর্বার আবেগের চিত্ররূপে উপস্থাপিত। 'সার প্যাট্রিক স্পেন্স', 'ক্লার্ক সণ্ডার্স', 'চাইল্ড ওয়াটার্স' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লোকগাথাগুলি কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালের চিহ্ন বহন করিলেও রীতি-অনুসরণে ও কবিত্বশক্তিতে উন্নত কাব্যমানের নিদর্শন। তৃণলেশহীন মরুভূমিতে বৃক্ষকোটরে সঞ্চিত শীতল পানীয়ের ন্যায় এই ক্লান্ত ও অবসন্ন যুগে কাব্যরস লোকচিত্তের ক্ষুদ্র সম্পুটরূপ ব্যালাডেই রক্ষিত হইয়াছে।

গদ্য-সাহিত্য

এই যুগে গদ্যসাহিত্যে বিশেষ সমৃদ্ধির নিদর্শন দেখা যায় না। প্রধানতঃ ধর্মবিষয়ক ও ধর্মের মতবিরোধের জন্য যে বাদ-বিতণ্ডা ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করিতেছিল ও জনমানসে যে তথ্য সঞ্চিত হইতেছিল এ যুগের গদ্য ছিল তাহারই অভিব্যক্তি। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে উইলিয়ম ক্যাক্সটন কর্তৃক মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার (১৪৭৬) সাহিত্যজগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। এযুগের শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনা সার টমাস ম্যালরির 'মর্টে ডি আর্থার' নামক রোমান্সগ্রন্থ (১৪৮৫)। ইহাতে রাজা আর্থারের সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী-কিংবদন্তীসমূহকে একটি সুষম, কলাসৌষ্ঠবময় রূপদান করা হইয়াছে। বিশেষতঃ, আর্থারের প্রবর্তিত বর্বর অরাজকতার প্রতিষেধক ও উন্নততর ধর্মবোধ ও সমাজনীতির বাহন, গোল টেবিল (The Round Table) নামক প্রতিষ্ঠানের অবসান ও উহাকে বাঁচাইবার অন্তিম দুঃসাধ্য-প্রয়াস, যীশুখৃষ্টের পবিত্র পানপাত্রের (The Holy Grail) সন্ধান ও আবিষ্কারের কাহিনীই উহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। আদর্শবাদের পরাজয়ের কারুণ্যময় বেদনা ও পাপ-প্রবণ মানবের স্থূল দৃষ্টি হইতে আবৃত দিব্যবিভাময় ঐশী সত্তার ক্ষণিক আবির্ভাবের রহস্যময়তা সমস্ত গ্রন্থটির মধ্যে একটি ঘনীভূত আবেশ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। ইহার মধ্যে যেমন আছে মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য ও বিস্তার, তেমনি আছে গীতিকবিতার সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি ও সুরমূর্ছনা। রোমান্সের অলৌকিক মায়া-ইন্দ্রজাল কেমন করিয়া মানুষের মনের গভীরে সংক্রামিত

হইয়া একটি নিবিড় রসাবেদন লাভ করে এই গ্রন্থে সেই অবাস্তবের বাস্তবতায় উত্তরণ-প্রক্রিয়া সার্থক হইয়াছে।

৩

নাট্য-সাহিত্য—এই যুগেই ইংলণ্ডে নাটকের ভিত্তিপত্তন হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নাটকের এই অঙ্কুরাবস্থার সহিত মানবজীবনের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না। ইহা মধ্যযুগীয় ধর্মচেতনারই একটা উপজাত ফল (by-product)। ধর্মের উৎসব-অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপেই এই নাট্যবীজের প্রথম উন্মেষ। মনে রাখিতে হইবে, এই সময়ে ইংলণ্ডে ধর্মীয় উপাসনা প্রভৃতি সমস্তই হইত লাটিন ভাষায়। জনসাধারণ এই ভাষা কিছুই বুঝিত না। উৎসব-সমারোহের সময়ে ধর্মযাজকের মন্ত্রপাঠ বা বক্তৃতাও হইত লাটিনে। জনসাধারণ ইহাও বিশেষ কিছু বুঝিত না। সুতরাং জনসাধারণকে কিছুটা বুঝাইবার জন্য খুব স্বাভাবিক কারণেই এবং পুরোহিতের অজ্ঞাতসারেই তাঁহার বচনভঙ্গীতে একটা নাটকীয় ভাবপ্রকাশের কলাকৌশল ও নাটকীয় ফলশ্রুতির অনুপ্রবেশ ঘটে।

অনেক সময়ে একাধিক পুরোহিত মিলিয়া বাইবেলে বর্ণিত ঘটনার অনুকরণ করিয়া দেখাইতেন। তাঁহাদের ভাষা অবশ্য তখনও লাটিন ছিল। এইভাবে ধর্মের উপদেশের মধ্যে দৃশ্যকাব্যের আকর্ষণীয়তা সঞ্চারিত হয় ও ধর্মোপদেশক নিজেকে কতকটা অভিনেতার আসনে বসান। ইহা আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঘটনা। তাহার পরের যুগে সত্য সত্যই দৃশ্যের (Scene) সাহায্যে ও অভিনয়-কৌশলের প্রয়োগে যীশুখৃষ্টের জীবনের ঘটনাবলী বা সাধু-ধর্মপ্রবক্তাদের অলৌকিক অভিজ্ঞতাগুলি ইংরাজী ভাষায় শ্রোতৃবৃন্দের নিকট উপস্থাপিত করা হয়। এই দুইজাতীয় নাটককে যথাক্রমে 'মিষ্ট্রি' ও 'মিরাক্ল প্লে' (Mystery ও Miracle play) নামে অভিহিত করা হইত। অবশ্য মিষ্ট্রি ও মিরাক্ল প্লের প্রভেদ ইংলণ্ডে করা হয় নাই। এই প্রভেদ ছিল ফরাসী দেশে। ফরাসীগণ ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার সময়ে এই প্রভেদের উল্লেখ করেন এবং তদবধি বিশেষ কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রভেদ উল্লিখিত হয়।

ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা-বৃদ্ধির জন্য গির্জা-গৃহের সঙ্কীর্ণ সীমায় এইসব নাট্যাভিনয়ের দর্শকদের স্থান সঙ্কুলান হইত না এবং সেইজন্য এই সমস্ত অভিনয় গির্জাগৃহের অভ্যন্তর হইতে গির্জার চত্বর বা প্রাঙ্গণে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু ইহাদের জনপ্রিয়তা, দর্শক সমাগম ও আনুষঙ্গিক হৈ-হট্টগোল বাড়িয়াই চলে। সুতরাং

শেষ পর্যন্ত ইহাদিগের অভিনয়-ব্যবস্থা বাজার বা ফাঁকা রাস্তায় করিতে হয় এবং ক্রমশঃ ইহার কর্তৃত্ব ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতে চলিয়া যায়। সাধারণ দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য এই জাতীয় ধর্মবিষয়ক নাটকের মধ্যে প্রায়ই হাস্যরস-প্রধান দৃশ্যের অবতারণা করা হইত। যীশুখৃষ্টের জন্মবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া লিখিত, The Second Shephards' Play (বা দ্বিতীয় মেষশাবকের নাটক) এবং সৃষ্টির প্রথম জল-প্রলয় অবলম্বনে রচিত Noah (নোআ) এ জাতীয় নাটকের দুইটি অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই সংমিশ্রণকে এক হিসাবে এলিজাবেথীয় যুগের tragi-comedy-র পূর্ব সূচনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

পরবর্তী যুগে মরালিটি (Morality) নামে এক নূতন শ্রেণীর নাটকের আবির্ভাব হয়। এই জাতীয় নাটকে বিষয়-নির্বাচনে নাট্যকার বাইবেলের চতুঃসীমায় আবদ্ধ না থাকিয়া স্বাধীন উদ্ভাবনী-শক্তির প্রয়োগ করিতে পারিতেন। সুতরাং বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক দিয়া মরালিটিতে কিছুটা অগ্রগতি দেখা যায়। কিন্তু উহার চরিত্রগুলি সবই অমূর্ত গুণ বা দোষ, বিদেহী রূপক-কল্পনা মাত্র। মরালিটিতে Vice বা পাপকে হাস্যরসপ্রধান চরিত্র বা ভাঁড় (clown) রূপে দেখান হইয়াছে ও তাহাকে নানা উপহাস্য দুরবস্থার মধ্যে ফেলিয়া দর্শকমণ্ডলীকে কৌতুকরস উপভোগ করান হইয়াছে। 'এভরিম্যান' (Everyman) নাটিকাটি এই মরালিটি নাটকের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহাতে মৃত্যুর আসন্ন আবির্ভাবে মানবের অসহায়, বন্ধুহীন অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এক সৎকার্য (Good deeds) ছাড়া আর কেহই মৃত্যুর পথে তাহার সহযাত্রী হইতে স্বীকৃত হয় নাই। এই স্বীকৃতিতেই মুমূর্ষুর মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। ইহার রূপক সর্বজনীন ও বাস্তব মানুষের প্রতিও প্রযোজ্য হওয়ায় ইহার মানবিক আবেদন আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণই আছে। অবশ্য Everyman-এ vice বা পাপ চরিত্রটি নাই। ভগবান একটি চরিত্র ; তাহার পর আছে মৃত্যু, বন্ধুতা, আত্মীয়তা, সম্পত্তি, জ্ঞান, সৌন্দর্য, শৌর্য ইত্যাদি। এই সবগুলিই নাটকীয় চরিত্র। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'দি পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' (The Pilgrim's Progress) যেমন রূপক হইয়াও জীবন্ত, ইহাও অনেকটা সেইরূপ।

আদিম নাটকের চতুর্থ স্তর **ইনটারলিউড** নামক বিশুদ্ধ প্রহসন। এই জাতীয় নাটক প্রমাণ করে যে হাস্যরস নাটকে আর গৌণ স্থান অধিকার করিতে রাজী নয়। উহা সমগ্র নাটকের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিতে চাহে। ইহাদের ঘটনা-সংস্থাপন ও রসিকতা খুব স্থূল ও অমার্জিত ধরনের

হইলেও ইহাদের নাটকীয় আকর্ষণ অনস্বীকার্য। জন হেউড সে যুগের সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠাবান 'ইনটারলিউড'-রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার 'দি ফোর. পি' অনাবিল হাস্যরস ও মৃদু ব্যঙ্গরসের এক ফোয়ারা বিশেষ। পামার (দেশ-বিদেশে তীর্থযাত্রী), পার্ডনার (যাহারা দক্ষিণা লইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করে), পথিকারি (ঔষধ-প্রস্তুতকারক) ও পেডলার (ফেরিওয়ালা) এই চারিজনই ফাঁকির ব্যবসায় চালাইতে ও মিথ্যাকথনে সিদ্ধহস্ত। ইহাদের মধ্যে স্থির হইল যে, যে মিথ্যাভাষণে সর্বাপেক্ষা পটু সকলে তাহার শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকার করিয়া লইবে। সকলেই কিছু কিছু মিথ্যা বলিল। কিন্তু সবশেষে পামার মন্তব্য করিল যে, সে কখনও কোন ঝগড়াটে স্ত্রীলোক দেখে নাই। এইটাই উৎকটতম মিথ্যাভাষণের দৃষ্টান্তরূপে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়াতে তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইল। এলিজাবেথীয় যুগের কৌতুকনাট্য বা কমেডি এই ইনটারলিউডেরই অপেক্ষাকৃত মার্জিত ও জীবনরসোচ্ছল পরিণতি। ইহার বাস্তবধর্মিতাও লক্ষণীয়।

এদিকে ১৫৫০-এর কাছাকাছি প্রধানতঃ গ্রীক ট্রাজেডি ও রোমীয় কমেডির প্রভাবে ইংরাজী পূর্ণাঙ্গ নাটক গড়িয়া উঠিতে থাকে। কমেডির মধ্যে লাতিন নাট্যকার প্লটাস ও টেরেন্স-প্রভাবিত 'র‍্যালফ রয়স্টার ডয়স্টার', (Ralph Roister Doister) (১৫৫৩) ও 'গ্যামার গার্টন্‌স নিড্‌ল' (Gammer Gurton's Needle) দুইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নাটক দুইটি ইংরাজী পারিবারিক আবেষ্টনের সহিত লঘু হাস্যরসের একটা সমন্বয়সাধনে চেষ্টা করিয়াছে। বিয়োগান্ত নাটক 'গর্বোডাক' (Gorboduc) (১৫৬১) রক্তপাতনের আতিশয্য ও আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের চাপে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। ইংলণ্ডের অতীত জনশ্রুতি হইতে ইহার বিষয়বস্তু সংগৃহীত, তবে সেনেকার প্রভাবও ইহার মধ্যে সুপ্রকট। পরবর্তী এলিজাবেথীয় ট্রাজেডিতেও এই হত্যা ও রক্তপাতের ধারা অব্যাহত। তবে তাহা সূক্ষ্মতর নাট্যকলা ও ভাবোন্নয়নের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া উন্নতমানের শিল্পে পরিণত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্য : প্রথমার্ধ

[১৫৫০—১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ]

১

এলিজাবেথের যুগ ইংরাজী সাহিত্যের স্বর্ণ যুগ। এই যুগে জাতীয় জীবনের একটা সর্বাঙ্গীণ স্ফুরণ সাধিত হইয়াছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে নব-বল-সঞ্চার, সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টিশক্তির বিকাশ, সমাজ-জীবনে নূতন আবিষ্কারের উন্মাদনা, জীবনের রহস্যময় বৈচিত্র্যের নিগূঢ় অনুভূতি—এই সমস্ত দিক দিয়াই এই যুগে নব নব ঐশ্বর্যের লক্ষণ পরিস্ফুট। এই বিস্ময়কর বিকাশের কারণ-নির্দেশ সহজ নহে। নদীতে জোয়ার-ভাঁটার মত জাতির জীবনেও জোয়ার-ভাঁটার খেলা আছে। কোন কোন যুগে জাতীয় জীবন শীর্ণ-সঙ্কুচিত হইয়া অভ্যাসের বালুরাশির মধ্য দিয়া কোনমতে বহিয়া যায়। আবার কখনও কখনও ইহা জাতির সমগ্র জীবনের উপর দিয়া প্রবল তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হয়—কূলে কূলে ভরা নদীর মত ইহা দুই ধারে সৌন্দর্য ও শক্তি বিস্তার করিতে থাকে।

ইউরোপে প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া এই নূতন বিকাশের জন্য বীজ-বপন চলিতেছিল। এই বীজ বপনই Renaissance বা নব-জাগরণ নামে পরিচিত। মধ্যযুগে ইউরোপের অবস্থা অনেকটা ইংরাজী আমলের পূর্বে ভারতবর্ষের মত ছিল। ধর্মের ও ধর্মমতের আধিপত্য, স্বাধীন চিন্তার অভাব, জীবনে গতানুগতিকের অনুবর্তন, শাসনক্ষেত্রে রাজশক্তির দুর্বলতার জন্য সামন্ততন্ত্রের (Feudalism) অভ্যুদয়, যথেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাব এবং ঐক্য ও সংহতির অভাব—এ সমস্তই জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়াছিল। দেশের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ছিল না; ধর্মগ্রন্থ ছাড়া আর কোন পুস্তকেরই সমাদর ছিল না। আমাদের দেশে পুরোহিতের অনুশাসনের মত ধর্মযাজকের মতামতই জীবনের ক্ষুদ্রতম ব্যাপারকেও নিয়ন্ত্রিত করিত। অজ্ঞান ও কুসংস্কারের ঘন অন্ধকার মানুষের চিন্তাশক্তি ও বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন-আবৃত করিয়া রাখিত।

এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে অকস্মাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্বদিগন্তে আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিল। এক ঘোর বিপদ অর্থাৎ কনস্টান্টিনোপলের পতন

হইতেই এই শুভ মুহূর্তটির উদ্ভব। কনস্টান্টিনোপলের যে পণ্ডিতগণ ইউরোপের দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের করধৃত আলোকবর্তিকাগুলির আলোতেই ইউরোপের অর্ধ-সভ্য জাতিগুলির সম্মুখে এক বহুকাল-বিস্মৃত, উজ্জ্বল সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

গ্রীক ও রোমীয় সাহিত্য কোনদিনই স্বাধীন চিন্তার মর্যাদা হারায় নাই। রাজনৈতিক অধঃপতনের দিনেও তাহার ললাটে এই গৌরবময় রাজতিলক ভাস্বর হইয়া ছিল। গ্রীক সাহিত্য মানবের মুক্ত আত্মার জয়গানে চির-মুখরিত, ইহার দর্শন স্বাধীন চিন্তার লীলাভূমি ও উচ্চ আদর্শের অনুধ্যানে গৌরবান্বিত, ইহার শিল্প সৃষ্টি-প্রতিভার চূড়ান্ত নিদর্শন, ইহার সংস্কৃতির প্রধান লক্ষ্য মানবের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। ইউরোপ এই সৌন্দর্যের সন্ধান পাইয়া আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল; এই নব চিন্তাধারার উগ্র মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়া সে তাহার প্রতি শিরা-ধমনীতে নব জীবনের সঞ্চার অনুভব করিতে লাগিল। চারিদিকে শৃঙ্খলমুক্তির ধুম পড়িয়া গেল। মানুষ সঙ্কীর্ণতার অন্ধ কারাগার হইতে নব জীবনের মুক্তির মধ্যে দাঁড়াইয়া এক অভূতপূর্ব আনন্দের আস্বাদ অনুভব করিল। এই অতি-পরিচিত, পুরাতন পৃথিবীর ধূসর অবগুণ্ঠন খসিয়া গেল, ইহার রূপ-রস-সৌন্দর্য মানব-চিত্তের উপর এক নূতন প্রভাব বিস্তার করিল। দেখিতে দেখিতে মানুষ নব নব আবিষ্কারের দিকেও ঝুঁকিয়া পড়িল। পর্তুগালের কলম্বস অপার সমুদ্রে পাড়ি দিয়া নূতন মহাদেশের কূলে ভিড়িলেন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইউরোপের অধিকাংশ জাতিই রাজ্যবিস্তার ও উপনিবেশ-স্থাপনের অভিযান শুরু করে। এই সকল জাতির মধ্যে ইংলণ্ডের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিও সৌরজগৎ সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কার করিলেন—পৃথিবী তাহার সনাতন প্রতিবেশী গ্রহ-উপগ্রহদের বিষয়ে সজাগ হইয়া উঠিল। লুথার ধর্মরাজ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া প্রত্যেক মানুষকে ভগবানের সঙ্গে স্বাধীন সম্পর্ক স্থাপনের অকুণ্ঠিত অধিকার দান করিলেন। মানব-মন তাহার হারানো অধিকারগুলি একে একে ফিরিয়া পাইয়া পূর্ণ আত্মানুভূতি লাভ করিল ও নিজ হৃদয়ে নবসৃষ্টির রহস্যময় স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিল।

২

ইংলণ্ডে এই নূতন আন্দোলনের যতটা প্রসার ও পরিণতি হইয়াছে সম্ভবতঃ অন্য কোন দেশে তাহা হয় নাই। ইহার ফলে সেখানে

এক নূতন জাতীয়তাবোধের উদ্ভব হইল। এই জাতীয়তাবোধ ইহার পূর্বে দুই শতাব্দী ধরিয়াই ধীরে ধীরে উদ্বোধিত হইতেছিল। এখন স্পেনের আক্রমণ-আশঙ্কায় ইহা তীব্র ও জ্বলন্ত হইয়া ওঠে। স্পেনের আক্রমণের সূচনায় সমস্ত দেশে এক বিরাট ঐক্য-স্পন্দন অনুভূত হইল। এই আক্রমণ প্রতিহত করিয়া রাণী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের দেশপ্রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এলিজাবেথই এই নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের প্রতীক ও প্রতিমা। শত শত কবি-কণ্ঠে তাঁহার জয়গান ঘোষিত হইল। শত শত যোদ্ধা তাঁহার চরণে ভক্তি-উপহার নিবেদন করিলেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া ইংরাজের অখণ্ড ঐক্যবোধ ও জ্বলন্ত দেশানুরাগ ফুলে ফলে বিকশিত হইয়া উঠিল। ইংরাজ ইউরোপীয় জাতিমণ্ডলীতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিল।

বাণিজ্য ও রাজ্য-বিস্তারেও ইংরাজ অগ্রসর হয় এই সময় হইতে। কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রধান ফল ইংরাজেরই করায়ত্ত হয়। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধও এই সময়ে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতির নব-লব্ধ শক্তি নানা দুঃসাহসিক সমুদ্রাভিযানে অভিব্যক্তি লাভ করে। ড্রেক পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন ও স্পেনদেশীয় রত্ন-জাহাজ লুণ্ঠন করিয়া ইংলণ্ডের কোষাগার সমৃদ্ধ করেন। দেশের গৌরব-বর্ধনে জীবন আহুতি দিবার জন্য রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধিয়া গেল। পৃথিবীর অজ্ঞাত, অখ্যাত ভূমিখণ্ডসমূহে ইংলণ্ডের জয়-পতাকা উড্ডীন হইল। এইরূপে ইংলণ্ডের বিশ্বব্যাপী সূর্যাস্তহীন সাম্রাজ্যের ভিত্তি-স্থাপন হয়।

৩

সাহিত্যে এই বিজয়াভিযানের কাহিনী আরও বিস্ময়কর। অল্প কথায় ইহার বিবরণ দেওয়া কঠিন। বসন্ত-পবন-স্পর্শে এক রাত্রির মধ্যে যেমন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় অগণিত নব কিশলয়ের উদ্ভব হয়, তেমনি এক অনুকূল বায়ুর প্রভাবে ইংরাজী সাহিত্য দেখিতে দেখিতে ফুলে ফলে মঞ্জরিত হইয়া উঠিল। ইংরাজী ভাষা বহুদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল, হঠাৎ সেই শক্তি এক অপরূপ সৌন্দর্যে সাহিত্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল। উষাগমে নানা নামহীন পাখীর কণ্ঠে যেমন সুরের কাকলি বাজিয়া ওঠে, তেমনি অখ্যাতনামা লেখকদের রচনায়ও গীতি-কবিতার সুর ধ্বনিত হইল। আমাদের দেশে বৈষ্ণব কবিতার মত ইংরাজী গীতিকাব্যের মধ্যে কবি-কল্পনার

অফুরন্ত নির্ঝর বহিয়া গেল। গদ্যরীতির মধ্যেও নূতন প্রাণসঞ্চার হইল। গদ্য এতদিন কবিতার অধীন করদ রাজ্যের মত ছিল—তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সুপ্রকট হয় নাই। কবিতার অলঙ্কারেই তাহার প্রসাধন ও কাব্যের উচ্ছিষ্ট-প্রসাদেই তাহার পুষ্টি ছিল। তাহার নিজস্ব একটা ছন্দ বা প্রকাশ-ভঙ্গী এ পর্যন্ত গড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু এই শৃঙ্খলমোচনের যুগে কবিতার অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া গদ্য এক স্বাধীন রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিল। অবশ্য এযুগেও সে কবিতার প্রভাব সম্পূর্ণ বর্জন করিতে পারে নাই—তাহার গতিচ্ছন্দে এখনও কাব্য-লক্ষ্মীর নূপুর-ধ্বনি শোনা যায়। তাহার নিঃশ্বাস-বায়ু এখনও কাব্য-সৌরভে আমোদিত। দুই বিরোধী শক্তির টানে তাহার পদক্ষেপ এখনও অনিশ্চিত ও কম্পমান। তথাপি এই যুগে গদ্য নিজ প্রকৃত পরিচয়ের আভাস পাইয়াছে ও কবিতার সহিত সমকক্ষতা দাবী করিবার দুঃসাহস তাহার মনে জাগিয়াছে।

এই নবজাগরণ-যুগের কাব্যে জাতীয় জীবনের প্রাণোচ্ছলতার বিস্ময়কর নিদর্শন মিলে। কাব্যের উপাদানরূপে ইহার কবিগোষ্ঠী উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিল গ্রীক ও রোমান কবিদের সৌন্দর্যপ্রধান মানবিকতা, মধ্যযুগের ধর্মপ্রভাবিত দার্শনিকতা ও আদর্শায়িত জীবন-চর্চা এবং সমকালীন ইটালী ও ফ্রান্সের সদ্যোজাত জীবনস্পৃহা-বৈচিত্র্য। তাহাদের কবি-চিত্তে বিপুল পরস্পর-বিরোধী ভাবপ্লাবন এক অদ্ভুত সমন্বয়ে বিধৃত হইয়াছিল। পূর্ববর্তী বিভিন্ন যুগের নানা বৈচিত্র্যময় কল্পনা-অনুভূতি, সংস্কার-বিশ্বাস ও নানামুখী জীবনাদর্শ এক কেন্দ্রিক সৌন্দর্যবোধের দ্বারা একীভূত হইয়া এক দুর্বার জীবনাবেগকে পুষ্ট করিয়াছিল।

এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি স্পেন্সারের (Edmund Spenser : ১৫৫২—১৫৯৯) কাব্যে এত বিচিত্র ভাব-উপাদান, পাশ্চাত্য জগতের বিবিধ কাব্যোদ্যান ও জীবনকুঞ্জ হইতে আহরিত গন্ধপুষ্পের এরূপ ঘনীভূত সারনির্যাস, সৌন্দর্যানুভূতির সর্বাত্মক আকৃতি ও নানাতন্ত্রী-ঝঙ্কৃত সুরমূর্ছনার এরূপ অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে যে, ইহা আধুনিক-পূর্ব বিশ্ব-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সমাহার-মঞ্জুষার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। আবার ইহার মধ্যে আধুনিকতার সুরও ধ্বনিত হইয়াছে প্রবল দেশাত্মবোধ, বস্তুনিষ্ঠ চেতনা ও সৃষ্টিরহস্যের মূলীভূত কারণরূপী বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যের স্বপ্নাবিষ্ট, ভাবতন্ময় উপলব্ধিতে।

এই যুগের কবিরা কিন্তু কেবল কল্পনারাজ্যের অধিবাসী ছিলেন না—তাঁহারা

প্রায় সকলেই বীর সৈনিক ও সমকালীন রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ওয়াট (Wyatt), সারে (Surrey) ও সার ফিলিপ সিড্নি (Sri Philip Sidney)—ইহারা সকলেই অভিজাতবংশীয়, যুগোচিত ক্ষাত্রধর্মের (chivalry) সাধক ও যে কোন দুঃসাহসিক কার্যে বিপদ্-বরণ ও জীবন-উৎসর্গ করিতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। ওয়াট রাজবন্দী হইয়াছিলেন, সারে রাজরোষে ঘাতকের হাতে প্রাণবলি দিয়াছিলেন ও সিড্নি জুটফেনের ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের তৃষ্ণার জল একজন আহত সৈনিককে দান করিয়া ত্যাগোজ্জল মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। ইহারা জীবনে যে ধর্ম ও আদর্শের অনুশীলন করিয়াছিলেন, যে মধ্যযুগসুলভ প্রণয়সাধনা ও ক্ষত্রিয়-বীরোচিত শিষ্টাচার ও আর্তত্রাণনীতিতে দীক্ষিত ছিলেন, তাঁহাদের সাহিত্যে তাহারই সম্যক্ প্রতিফলন হইয়াছে। তাঁহাদের জীবন ও কাব্য আন্তরিক নিষ্ঠার স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত ছিল। তাঁহারা তাঁহাদের কাব্য-সাধনায় ইটালী ও ফ্রান্সের সমকালীন দৃষ্টান্ত দ্বারা বহু পরিমাণে প্রভাবিত হইলেও, ইংলণ্ডের জাতীয় বৈশিষ্ট্য—চরিত্রের মহনীয়তা ও বিষাদপ্রবণ, ভাবগাম্ভীর্যময় আত্ম-সমীক্ষা—হইতে চ্যুত হন নাই। প্লেটো, আরিস্টটল, ফ্রান্সের প্রণয়গাথাকার কবিগোষ্ঠী (troubadours) ও ইটালীর পেট্রার্ক, এরিয়স্টো, টাসো প্রভৃতি, মধ্যযুগের জীবন-নিষ্ঠার সহিত নব-উন্মেষিত আধুনিক চেতনার সমন্বয়কারী মহাকবিদের ভাবশিষ্য হইয়াও এই তরুণ ইংরাজ কবিগণ তাঁহাদের অনুভূতির সরস মৌলিকতার জন্য নবীন জাতীয় সাহিত্যের পুরোধা হইয়াছেন—প্রাচীন চিন্তাধারার পাত্রে আধুনিক জীবনবোধের রক্তিম-ফেনোচ্ছল মদিরা ঢালিয়া তাহাই আকণ্ঠ পান করিয়াছেন। পরানুবর্তনের ভিতর দিয়াই ইংরাজী কাব্যে মৌলিক সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে।

ওয়াট (Wyatt : ১৫০৩—১৫৪২) এলিজাবেথীয় কাব্যিক নবজাগরণের অগ্রদূত। তিনি ফ্রান্স ও ইটালী হইতে গীতিকবিতার প্রতি প্রবণতা লাভ করেন। তাঁহার কাব্যসাধনার পথে প্রধান বিঘ্ন ছিল ইংরাজী কবিতার তৎকালীন ছন্দ-বিভ্রান্তি ও ঝোঁকের অনিশ্চয়তা। দীর্ঘ অনুশীলনের ফলে তিনি এই ভাষাগত বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুটা নিয়মিত শৃঙ্খলা আনেন, কিন্তু প্রয়োগের আড়ষ্টতা তিনি সম্পূর্ণ কাটাইতে পারেন নাই। সনেট, প্রেম-কবিতা ও ব্যঙ্গকবিতা—এই তিনটি ধারারই তিনি প্রথম প্রবর্তক। প্রেম-কবিতায় পেট্রার্কের অনুবর্তী হইয়াও তিনি পেট্রার্কের প্রতিটি দীর্ঘশ্বাস ও সহজে

মিইয়ে-পড়া, হতাশ মনোভাবের অন্ধ অনুসরণ করেন নাই—তাঁহার প্রেমিকের চরিত্রে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ও মনোভাবে কিছুটা আত্মসম্মানের দৃঢ়তা, সময়ে সময়ে ব্যঙ্গপ্রিয়তাও লক্ষণীয়। কিন্তু তাঁহার সর্বাধিক কৃতিত্ব হইল সনেটের প্রবর্তনে—ইংরাজী কাব্যে সনেট-ধারার পথিকৃৎ তিনিই। তাঁহার সনেটগুলিতে মিতভাষণ, সূক্ষ্ম ভাব-বৈচিত্র্য-প্রকাশ ও উন্নততর শিল্পবোধের পরিচয় মিলে। ব্যঙ্গকবিতায় তিনি রাজসভার দুর্নীতি, স্তাবকতা ও ধনের লোভে উঞ্ছবৃত্তি প্রভৃতি দোষগুলিকে উদ্ঘাটিত করিয়া তাঁহার সাহসিকতা ও আঘাত-পটুতার নিদর্শন দিয়াছেন। অবশ্য ইহার দামও তাঁহাকে দিতে হইয়াছিল।

সারে (Surrey : ১৫১৭—১৫৪৭)—ওয়াটের আরব্ধ কার্য সারে আরও অনেকটা সুসম্পন্ন করেন। তিনি ছন্দশৃঙ্খলায় তাঁহার পূর্বসূরীকে অতিক্রম করিয়াছেন ; তাঁহার ছন্দ-প্রয়োগে একটা অস্খলিত সুষমা ও বাধামুক্ত প্রবাহ দেখা যায়। তাঁহার সনেটে তিনি জেরালডিনের প্রতি তাঁহার কাল্পনিক হৃদয়াবেগের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। এই সনেটগুলিতে কিন্তু ওয়াটের সনেটের চেয়ে পেট্রার্কের অনুবর্তন কিছু বেশী ও স্বাধীন-চিত্ততার নিদর্শন কিছু কম অনুভূত হয়। প্রেম ভিন্ন অন্য বিষয়ে তিনি যে সমস্ত সনেট লিখিয়াছেন সেগুলিতে, বিশেষতঃ ওয়াটের প্রতি প্রশস্তিজ্ঞাপক সনেটটিতে, তাঁহার ভাবগাম্ভীর্য ও মর্যাদা-পূর্ণ প্রকাশরীতি উচ্চাঙ্গের কৃতিত্বের নিদর্শন। তাঁহার গীতিকবিতায় যেমন ঐতিহ্যপ্রভাব তেমনি প্রকৃতি-প্রীতিও সুপরিস্ফুট। যখন তিনি কারাগারে মৃত্যু প্রতীক্ষায়, তখন একটি মর্মস্পর্শী কবিতায় তিনি রাজসভায় তাঁহার পূর্ব-জীবনের স্মৃতিরোমন্থনপূর্ণ বর্ণনা করিয়াছেন। কৈশোরের ক্রীড়াকৌতুক, বন্ধুপ্রীতি, ভোগ-বিলাস ও লঘু-তরল প্রণয়-কলা—এক কথায় তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের ও তৎকালীন রাজসভার সমগ্র পরিবেশটি—এই কবিতায় মনোজ্ঞভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার সনেটের অঙ্গবিন্যাস, বিশেষ করিয়া মিলপদ্ধতি, পেট্রার্কের আদর্শ হইতে খানিকটা স্বতন্ত্র—ইহাকে শেক্‌সপিয়ারের সনেট-রীতির পূর্বাভাস বলা যাইতে পারে।

সারের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় কীর্তি হইল ভার্জিলের ইনিডের (Aenid) দুইটি সর্গের অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুবাদ। এই প্রথম ইংরাজী ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ। অবশ্য পথিকৃৎ হিসাবে সারের অমিত্রাক্ষর আড়ষ্ট, শ্লথগতি ও বৈচিত্র্য-হীন। তথাপি ইহাতে মহাকাব্যের ধ্বনি-গৌরব শ্রুত হয়। একঘেয়েমি এড়াইবার জন্য সারে ছন্দস্পন্দের গতি-বৈচিত্র্য না দিতে পারিলেও ভাবকে পংক্তিসীমা

অতিক্রম করাইয়া প্রবাহিত করিয়াছেন। এইরূপে একটি অপরিমেয় সম্ভাবনাপূর্ণ ছন্দোরীতি প্রথম প্রবর্তন করিয়া সারে যে একটি বৈপ্লবিক অভিনবত্বের সূচনা করিয়াছেন তাহা অনস্বীকার্য।

সার ফিলিপ সিডনি (Sir Philip Sidney : ১৫৫৪—১৫৮৬) ওয়াট ও সারের প্রায় এক যুগ পরে আবির্ভূত হন। ইতিমধ্যে পথিকৃৎদের নূতন পরীক্ষা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও দ্বিধাগ্রস্ত অভিনবত্ব অভ্যস্ত নৈপুণ্যে পরিণত হইয়াছে। এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা রোমান্টিক ও ভাস্বর-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কবি সিডনি। নূতন যুগের রাজসভাসদের রুচিবৈদগ্ধ্য ও স্বভাব-সৌজন্য মধ্যযুগের ক্ষত্রিয়বীরের আদর্শের সহিত মিশিয়া সিডনির চরিত্রে এক শৌর্যদৃপ্ত সুকুমারতা স্ফুরিত করিয়াছিল। তিনি গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই সমান সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কলাসৌন্দর্য ও ভাবৈশ্বর্য সিডনির সমস্ত রচনাতেই পরিস্ফুট। জীবনরসোচ্ছল ও উন্নত নীতির পরিপোষক কাব্যসমালোচনায় তিনিই প্রথম ব্রতী হন। কাব্য সম্বন্ধে বিষয়ী ও ছুঁৎমার্গপন্থী লোকদের যে একটি ছিদ্রান্বেষী ও অবিশ্বাসপূর্ণ মনোভাব ছিল তিনি তাহার সম্পূর্ণ নিরসন করিয়া একাধারে যুক্তিনিষ্ঠ ও আবেগময় রসবিচারের সাহায্যে উহাকে শাশ্বত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার Apologie for Poetry বা 'কাব্যের সপক্ষে' (১৫৯৫) গ্রন্থখানি ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম অনুভূতিমূলক সমালোচনা। সমালোচক সিডনি অবশ্য কোনো মৌলিকতার পরিচয় দেন নাই। তিনি মুখ্যতঃ আরিস্টটলের মতেরই প্রবক্তা। আরিস্টটলের 'পোয়েটিক্স' (Poetics)-ই সিডনির মূল অনুপ্রেরণা। তাঁহার অন্যান্য গদ্যরচনার আলোচনা গদ্য-বিভাগে করা হইবে।

সিডনির কবিতা প্রধানতঃ 'এ্যাস্ট্রোফেল ও স্টেলা' (Astrophel and Stella) (১৫৯১) নামক সনেটগুচ্ছেই সীমাবদ্ধ। তাঁহার প্রণয় শুধু কাব্যপ্রথার অনুবর্তনমাত্র নহে ; ইহা তাঁহার অন্তরের গভীর ও অকৃত্রিম অনুভূতি। যে বালিকা তাঁহার বাগ্‌দত্তা বধূ ছিল সে যখন অপরের পত্নী হইল তখন সিডনির অন্তর্গূঢ় হৃদয়াবেগ বিস্ফোরক শক্তিতে উৎক্ষিপ্ত হয়। হেলায় হারানো সুখের জন্য তীব্র অনুশোচনা, প্রণয়িনীকে লাভ করিবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, প্রেমিকা যে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও ভালবাসে তাহার জন্য মধুর তৃপ্তি, কর্তব্যবোধ ও প্রণয়াকর্ষণের মধ্যে দ্বন্দ্ব—অন্তরের এই সমস্ত তরঙ্গ-আলোড়ন—তাঁহার সনেট-গুচ্ছে সত্যনিষ্ঠা ও ভাবোন্মাদনা এই উভয়েরই দাবী মিটাইয়া একটি চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

এলিজাবেথীয় যুগের সনেট কতটা প্রচলিত রীতির অনুস্মৃতি, কতটাই বা ব্যক্তিগত আবেগের প্রকাশ, এই প্রশ্ন সমালোচকদের মধ্যে তীব্র মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার একটা কারণ হইল এই যে, সনেটের প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে কিছু কষ্টকল্পনা, উপমা ও চিত্রের অস্বাভাবিকতা এবং ভাষার জটিল মারপ্যাঁচ আছে। সুতরাং ইহাদের মধ্য দিয়া অকৃত্রিম ভাবের প্রকাশ সম্ভব কি না এ বিষয়ে সংশয়পোষণ অযৌক্তিক নহে। কিন্তু ভাষায় মণ্ডনকলার আধিক্য থাকিলেই যে ভাব কৃত্রিম হইবে এরূপ সিদ্ধান্তও যে অভ্রান্ত তাহা বলা যায় না। সনেটের গঠন ও অবয়ব-সঙ্কোচের মধ্যেই একটা কৃত্রিমতার সম্ভাবনা থাকে। সচেতন শিল্পরীতি ও ভাষার প্রয়াস-লব্ধ সংক্ষিপ্তিও স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম ভাব প্রকাশের সহায়ক না হইতে পারে। তৎসত্ত্বেও সিডনি বা শেক্‌সপিয়ারের সনেটে আবেগের উত্তাপ ও অন্তর-মথিত ভাবানুভূতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সিডনির আত্মনির্দেশ—'অন্তরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লেখ'—তাঁহার অকৃত্রিমতার নিদর্শন। তাঁহার সনেটের একটি নিজস্ব সুর আছে। রাজসভার কর্তব্য ও আমোদে-প্রমোদের মধ্যে তিনি উন্মনা ও নিঃসঙ্গ; তাঁহার অসামাজিকতার জন্য লোকে তাঁহাকে অহঙ্কৃত মনে করে; নিষ্প্রভ চন্দ্রে তিনি প্রণয়িনী-প্রত্যাখ্যাত বিষণ্ণ প্রেমিকের পাণ্ডুর মুখচ্ছবি দেখিতে পান—এই জাতীয় ভাব-ভাবনার মধ্যেই তাঁহার স্বকীয়তা পরিস্ফুট। তাঁহার দুই একটি গীতি-কবিতাও প্রেমের মনোবেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সুরে অনুরণিত। একটিতে বসন্তের স্ফুটনোন্মুখ প্রকৃতি-সৌন্দর্যের মধ্যে কবি তাঁহার প্রণয়িনীর নিকট নিজ ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা প্রকাশ করিতেছেন; প্রণয়িনীও তাঁহার অন্তঃরুদ্ধ প্রেমকে চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই, কিন্তু ধর্মের দিকে চাহিয়া প্রেমিককে আত্মসংবরণ করিতে অনুনয় করিতেছেন। প্রেমগীতির এরূপ সরল, বিশুদ্ধ সুর, এরূপ অকপট স্বীকারোক্তির মধ্যে অটুট আত্মসংযম সমগ্র এলিজাবেথীয় সাহিত্যে আর ধ্বনিত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

৪

এডমাণ্ড স্পেন্সার (Edmund Spenser: ১৫৫২—১৫৯৯) এলিজাবেথীয় যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ও যুগ-প্রতিনিধি কবি। তাঁহার বিশাল চিত্ত-মুকুরে সমগ্র যুগের মিশ্র ও জটিল সংস্কৃতি—সুপ্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় অতীতের দার্শনিকতা ও রূপমুগ্ধতা, মধ্যযুগের বেহিসাবী ভাব-কল্পনা ও ভোগবিমুখ

ধর্মসাধনা, নূতন যুগের সর্বগ্রাসী সৌন্দর্যবোধ এবং বস্তুচেতনা ও সর্বোপরি এক আত্মলীন স্বপ্ন-কুহেলির নিবিড় মায়াদীপ্তি—প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কবির মনোভূমিতে সমগ্র অতীত উহার বিরাট, বিপুল জনতা ও সমকালীন যুগের বিচিত্র অসীম সম্ভাবনাময় প্রত্যাশায় উৎফুল্ল হইয়া উদ্ভাসিত। মধুর, সর্বাঙ্গীণ পরিণতির স্বপ্ন-কল্পনায় বিভোর এবং বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের সমগ্র সৌন্দর্য-রাশিকে এক কেন্দ্রে সংহত করিবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া, তাঁহার কাব্যমানস এক উদার, সর্বসমন্বয়কারী আতিথেতায় আপনাকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কবি-কল্পনার এরূপ উচ্চাভিলাষ, এরূপ বিশ্বব্যাপী ও যুগাতিসারী প্রসার আর কখনও দেখা যায় নাই।

অবশ্য এই বিরাট নভোবিহারী পরিকল্পনা কবির কাব্যে সম্পূর্ণ সার্থক হইতে পারে নাই। স্পেন্সার ছিলেন সৌন্দর্যতন্ময় কবি। তাঁহার নিজস্ব দার্শনিক মনীষা বা বিশেষ কোন মতবাদ ছিল না। প্রচলিত দার্শনিক মতবাদকেই তিনি নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করিয়া উহাকে কল্পনা-সৌন্দর্যের রঙে রঞ্জিত করিয়াছেন ; কিন্তু যে মৌলিক দার্শনিক সমীক্ষা থাকিলে বহুযুগের বিভিন্ন জীবনচর্যাকে এক অভিনব সংশ্লেষ-ক্রিয়ার উপাদানে রূপান্তরিত করা যায় তাহা তাঁহার ছিল না। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন যুগজীবনের খণ্ডচিত্র, সংস্কার-বিশ্বাসের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি তাঁহার সৌন্দর্যসমুদ্রে ভাসমান সংযোগসূত্রহীন দ্বীপপুঞ্জের মত প্রতিভাত হইয়াছে। মধ্যযুগের রাক্ষস-দৈত্য-দানব-পরীবৃন্দ অনেকটা উদ্দেশ্যহীনভাবে, বিশৃঙ্খল অজস্রতায় পাঠকের লঘু কল্পনা ও অনির্দেশ্য ভীতি-সংস্কারের তৃপ্তিবিধান করে মাত্র। এই অতীতযুগ-চারণা আধুনিক জীবনবোধের অখণ্ড সংহতি ও নিশ্চিত বাস্তবতায় সংহত হয় নাই। এই সৌন্দর্যমত্ত পথিকবৃত্তি কোন নীতি-নিয়মিত গার্হস্থ্য জীবনের স্থির আশ্রয়েও বিরতিলাভ করে নাই। স্পেন্সারের জীবনদর্শন রেনেসাঁসের অতি-আগ্রহী প্রয়াস-সমূহের অন্যতম ; তাঁহার এই ইন্দ্রধনুবর্ণরঞ্জিত মায়া-প্রাসাদে ভ্রমণকারীর কৌতূহল তৃপ্ত হয়, কিন্তু কেহই স্থায়িভাবে বাস করিতে পারে না।

এই সমীকরণ-প্রক্রিয়ায় স্পেন্সারের প্রধানতঃ দুইটি অবলম্বন ছিল—(১) নিখিলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত সৌন্দর্য-চেতনা ও (২) রূপক-কল্পনা। তিনি চিন্তা-রাজ্যের সমুদয় বিশৃঙ্খল উপাদান, দেশ-দেশান্তরের বিকীর্ণ বস্তু ও কল্পনা-পুঞ্জ, এবং বিভিন্নমুখী আদর্শের উপর সৌন্দর্যের এক সর্বব্যাপী আস্তরণ বিছাইয়া অসমতার মধ্যে সমতা বিধান করিয়াছেন। সৌন্দর্যের কুহকমন্ত্রে আমরা সব পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া সকল পদার্থের মধ্যে একটা সাময়িক ঐক্য

অনুভব করি। কিন্তু যাহাদের মধ্যে সত্যকার ঐক্য নাই, সৌন্দর্যমন্ত্রে তাহাদিগকে কতক্ষণ এক রাখা যায়? সৌন্দর্যের স্রোত যখনই একটু মন্দীভূত হয়, সৌন্দর্যের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গীত যখনই মানস শ্রান্তি আনে, তখনই সেই মায়াজাল ছিন্ন হইয়া সহজ বৈষম্যের তীক্ষ্ণ অমসৃণতা, বিভিন্নধর্মী বস্তুর বিপরীতমুখী বিকর্ষণ প্রবল হইয়া উঠে। মায়াজগতের ঐক্য সদ্য-ঘুমভাঙ্গা বাস্তবতার রূঢ় অভিঘাতে ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায় ও শেষ পর্যন্ত আমাদের এই খণ্ড সৌন্দর্যকেই আঁকড়াইয়া ধরিতে হয়।

স্পেন্সারের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'পরীরানী' (The Faerie Queene)-র রূপক-কল্পনা ইহার সমস্ত উপকরণ-বৈচিত্র্যকে এক কেন্দ্রীয় তাৎপর্যের বন্ধনে ধরিয়া রাখার আর একটি উপায়। মধ্যযুগের কাব্যে ও ধর্মসাধনায় বহু-ব্যবহৃত এই রূপক তাঁহার হাতে এক বৃহত্তর উদ্দেশ্যে ও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। এলিজাবেথ-যুগের বহুমুখী জাতীয় জীবনের বিরাট পটভূমিকা এই রূপক-তাৎপর্যের ভাস্বর আবরণে, চন্দ্রালোকপ্লাবিত প্রান্তরভূমির ন্যায়, এক অখণ্ড সত্তারূপে আভ্যন্তরীণ বিরোধ-বৈষম্যের উঁচু-নীচু পর্বত-গহ্বরগুলিকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। স্পেন্সারের কাব্যে রানী এলিজাবেথ তাঁহার প্রখর ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী সক্রিয়তা হারাইয়া পরীরানীর মায়ারূপ ও আত্মিক শক্তির প্রতীক হইয়াছেন। তাঁহার বহুসমস্যাকণ্টকিত শাসন যেন এক অদৃশ্য, রহস্যময় শক্তির লীলাময় ক্রীড়া। তাঁহার প্রধান প্রধান সচিববৃন্দও যেন এক একটি নৈতিক গুণের প্রতিরূপ। তাঁহার রাজ্যের রাজনৈতিক ও ধর্মবিষয়ক সমস্যাগুলি যেন এক একটি দৈত্যদানবের ন্যায় এবং তাহারা রানীর জাদুমন্ত্রের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। আবার ঐ একই সমস্যা নীতি ও দুর্নীতি, পাপ ও পুণ্যের মানস দ্বন্দ্বের আকারে দেখা দিয়াছে। তাঁহার উনা কখনও সত্যরূপিণী, কখনও সত্যধর্মের অধিষ্ঠাত্রী এলিজাবেথ; ডুয়েসা কখনও মনোহররূপিণী কুটিলতা, কখনও এলিজাবেথের প্রতিদ্বন্দ্বিনী স্কটদের রানী মেরী; তাঁহার ব্রিটোমার্ট কখনও বিজয়িনী কুমারী শক্তি, কখনও বা কুমারী রাজ্ঞী এলিজাবেথের প্রতিচ্ছায়া। এইরূপে রূপকের বহুমুখী তাৎপর্য তাঁহার বিচিত্র আখ্যানবস্তুকে কেন্দ্রানুগ শাসনে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অবশ্য এই চেষ্টা যে সর্বত্র সমানভাবে সফল হইয়াছে সে কথা বলা যায় না, কোথাও কোথাও বিশেষ অসামঞ্জস্যেরও সৃষ্টি করিয়াছে। কাব্যগ্রন্থটি যত অগ্রসর হইয়াছে, এই অসামঞ্জস্যও তত প্রকট হইয়া পড়িয়াছে।

তাঁহার সমগ্র পরিকল্পনাটিই রূপকধর্মী। তাঁহার পরিকল্পিত দ্বাদশটি

সর্গের নায়কবৃন্দ এক একটি বিশেষ বিশেষ নৈতিক গুণের মূর্ত বিকাশ ; তাঁহাদের যাত্রাপথের সমস্ত পার্থিব ও অপার্থিব বাধা সেই গুণের পরিপন্থী পাপ ও প্রলোভনের সমষ্টি, তপোভঙ্গ-চক্রান্তের ছদ্মবেশী দূত। এই নায়কবৃন্দ সর্ববিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তপঃসিদ্ধ হইবেন ও ইংলণ্ডে একটি আদর্শ নীতিরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন—ইহাই ছিল স্পেন্সারের আখ্যায়িকার প্রস্তাবিত পরিণতি। কিন্তু এই রূপকাভিপ্রায় সুদীর্ঘ রচনার মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকে নাই। কবি নিজেও সবসময়ে তাঁহার বাচ্যার্থের অন্তরালশায়ী নিগূঢ়ার্থ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। পাঠকও কিছুক্ষণ পরে এই দ্বৈতার্থ-সন্ধানের শ্রান্তিকর প্রয়াস সম্বন্ধে শিথিলযত্ন হইয়া পড়ে। রূপমোহ তাহার নীতিনিষ্ঠাকে দুর্বল করে ও শেষ পর্যন্ত উহাকে একেবারে অচেতন করিয়া ফেলে। তাহা ছাড়া রূপকের সূক্ষ্ম সূত্রে জাতীয় জীবনের নানা শাখা-প্রশাখায় বিসর্পিত সমস্যাগুলিকে ঝুলাইয়া রাখার অসম্ভাব্যতা ক্রমশ পাঠকের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। অতিরিক্ত চাপে এই সংযোগসূত্র ছিঁড়িয়া পড়ে ও সাময়িকভাবে বশীকৃত বস্তুজগৎ সমস্ত মায়া-বন্ধন অস্বীকার করিয়া নিজ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। শেষ পর্যন্ত আমরা চোখে কেবল সৌন্দর্য-অঞ্জন মাখাইয়া জীবনকে সমস্ত আরোপিত আদর্শায়ন হইতে মুক্ত ও উহার নিজস্ব রূপ-জ্যোতিতে আলোকিত রূপে দেখিতে বাধ্য হই। বাস্তবতার শতফণাবিশিষ্ট মহাসর্প আর রূপক-মহামন্ত্রে বশ মানে না ; কেবল কবি-সাপুড়িয়ার বংশীধ্বনিতে আপাত-মুগ্ধ হইয়া সাময়িকভাবে উহার ফণা অবনত করে মাত্র।

অবশেষে কবির জীবন-সায়াহ্নে বাস্তবতা-বিষধর কবিকে দংশন করিয়া তাঁহার সৌন্দর্যকুঞ্জকে ঝলসাইয়া দিয়াছে। আয়রল্যাণ্ডের বিক্ষুব্ধ জনতা স্পেন্সারের দুর্গ আক্রমণ করিয়া উহাকে ভস্মীভূত করে ও কবির পরিজন এই বহ্নিলীলায় দগ্ধ হইয়া প্রাণ হারান। কবির সুখস্বপ্ন বস্তুজগতের এই নির্মম আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায় ও নিদারুণ মনঃপীড়ার মধ্যে তাঁহার জীবনাবসান ঘটে। রূপ-ও রূপক-মুগ্ধ, আদর্শ জগতে সঞ্চরণশীল কবির জীবনের এ এক মর্মান্তিক ধূলি-লুণ্ঠিত উপসংহার!

স্পেন্সারের রূপক-প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার অনুরাগী সমালোচকদের পর্যন্ত বিশেষ উৎসাহ নাই। তাঁহারা কেহই ইহাকে পুরাপুরি সমর্থন করিতে পারেন না। হ্যাজলিট রূপক-বিমুখ পাঠককে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছেন যে রূপক কাহাকেও দংশন করিবে না, উহাকে উপেক্ষা করিবার স্বাধীনতা সকলেরই আছে। সাধারণত আধুনিক সমালোচকগণ কাব্যটির নীতিতাৎপর্য ও উন্নত ভাবাদর্শকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া ইহাকে কেবল চিত্র-সৌন্দর্যের আধাররূপে, বিচ্ছিন্ন চিত্রপরম্পরার বর্ণাঢ্য শোভাসমারোহরূপে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়া থাকেন। ভাবিলে বিস্মিত হইতে

হয় যে কেমন করিয়া এক যুগের জীবন-তাৎপর্যবাহী মহাগীতি অপর যুগে কেবল জীবনবোধবিবিক্ত চিত্রশিল্প ও সঙ্গীতোচ্ছ্বাসের নিদর্শনরূপে প্রতিভাত হয়। স্পেন্সার আজ পরীরাজ্যের মায়াকল্পনার কবিরূপেই আমাদের অন্তরে আবেদন বহন করেন, গভীর জীবন-সত্যনিষ্ঠ কবিরূপে আর তাঁহার আদর নাই। রূপকের জাল ফেলিয়া তিনি অতলগভীরশায়ী যে প্রাণরহস্যকে ধরিতে চাহিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে এড়াইয়া গিয়াছে; আমরা আজ জালের রূপালি সূতার বয়ন-শিল্প, উহার রন্ধ্রপথ-নিঃসৃত রত্নদ্যুতি দেখিয়াই মুগ্ধ হই।

স্পেন্সারকে সর্বসম্মতিক্রমে 'কবির কবি' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কাব্যের বস্তুনিরপেক্ষ, বিশুদ্ধ সারনির্যাস তাঁহার রচনায় যে পরিমাণে পাওয়া যায়, শেলী ছাড়া দ্বিতীয় কোন কবিতে তাহা মিলে না। তাঁহার প্রথম রচনা 'মেষপালকের দিনপঞ্জী' The Shepherd's Calendar (১৫৭৯) হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার শেষ লেখা পর্যন্ত কবিতার ঘন গন্ধসারে সুরভিত। ইহার মধ্যে তাঁহার 'এ্যামরেটি' (Amoretti) নামে প্রেমকেন্দ্রিক সনেটগুচ্ছ আছে ও তাঁহার নিজের ও অপরের বিবাহ-উৎসব-উপলক্ষে লিখিত 'এপিথালামিয়ন' (Epithalamion) (১৫৯৪) ও 'প্রোথালামিয়ন' (Prothalamion) (১৫৯৬) মিলনের পবিত্র আনন্দ ও নির্মল, রমণীয় ভাবোচ্ছ্বাসকে অপরূপ সংযম ও সম্ভ্রমবোধের সহিত অভিব্যক্ত করিয়াছে। তিনি যে বাস্তব জীবনের দোষত্রুটি-অসঙ্গতির প্রতি অন্ধ ছিলেন না কিছু ব্যঙ্গ-কবিতা লিখিয়া তাহাও তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। স্পেন্সারের স্মৃতি আমাদের চিত্তে একটি স্নিগ্ধ, বিষাদচ্ছায়াচ্ছন্ন জ্যোতির্মণ্ডল দ্বারা বেষ্টিত—মেঘাবৃত, মৃদুপদ-সঞ্চারী, ম্লান চন্দ্রই তাঁহার কবি-প্রকৃতির সার্থক প্রতীক।

৫

এলিজাবেথীয় যুগের প্রথমার্ধে গদ্যকাব্যের উচ্চাভিলাষ ও কল্পনাবিলাসকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া এক বিকৃত, অঙ্গসুষমাহীন রূপে আবির্ভূত হইল। মধ্যযুগে উইক্লিফের (Wycliff) বাইবেল অনুবাদে বা ম্যালরির (Malory) 'আর্থারের মৃত্যু' (Morte'd Arthur) (১৪৬৯ খৃঃ অঃ)-তে যে সরল অলঙ্কারের আতিশয্যহীন, বিষয়ের প্রয়োজনানুসারী প্রকাশরীতি গড়িয়া উঠিতেছিল, নব-জাগরণের প্রথম উন্মাদনায়, নূতন ভাব ও মননের অঙ্গীকরণের তাগিদে, কবি-কল্পনার অবারিত ও সময় সময় অশোভন প্রসারে সেই আদর্শ সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হয়। ইতিমধ্যে ক্যাক্সটন (Caxton) মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন করিয়া (১৪৭৬ খৃঃ অঃ) নবযুগের সাহিত্য-সাধনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করিলেন।

এই যুগে ও পরবর্তী যুগে যে গদ্যরীতি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার মূল প্রেরণা আসে মানব-চিত্তে নানা বিচিত্র ও অভিনব ভাবের অজস্র ও বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যা-প্লাবন হইতে। এই বিহ্বল বিশৃঙ্খলার মধ্যে পরিমিতিবোধ ও সুষমার—এক কথায় শিল্পকুশল ও অভিজাতধর্মী মানস নিয়ন্ত্রণের—কোন চিহ্ন দেখা যায় না। উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার সহিত মার্জিতরুচি প্রকাশভঙ্গীর যে অসঙ্গতি তাহাই প্রধানভাবে লক্ষণীয়। মননশীল ও রুচিবান বিদগ্ধ সমাজে ভাষার যে মসৃণতা ও শিষ্টরীতি দেখা যায় তাহা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এই যুগের গদ্য কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুরুচিসম্পন্ন মধ্যরীতি অবলম্বন করিতে পারে নাই—ইহা কখনও কবি-কল্পনার আতিশয্যে উর্ধ্বগামী, কখনও বা অতিভাষণ, এমনকি অশ্লীল বর্বরতা-দোষদুষ্ট। স্থূল অতিরঞ্জনপ্রবণতা, পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতার অনুচিত আড়ম্বর, সূক্ষ্ম ভাব-দ্যোতনার অভাব ও সুমিত চিন্তা-নিয়ন্ত্রণ ও বাক্যগঠনে অক্ষমতা ইহার প্রধান লক্ষণ। লেখকের সমস্ত মন, উহার ভাণ্ডারে সঞ্চিত সমস্ত সম্পদ, অভিমত, অনুমান, যুক্তিতর্ক, কল্পনা ও ভাবোচ্ছ্বাসের এক দুর্বহ বোঝা যেন এক একটি অতিভারক্লিষ্ট, অবয়ব-সৌষ্ঠবহীন বাক্যে নিঃশেষে উজাড় করা হইয়াছে। অবশ্য এই মন্তব্যের কিছু ব্যতিক্রমও আছে। পরবর্তী যুগে বাইবেলের অনুবাদ (১৬১১) বেকনের প্রবন্ধগুলি ও হুকার (Hooker)-এর 'ধর্মশাসন বিষয়ক বিধানাবলী' (Laws of Ecclesiastical Polity) (১৫৯৩) সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য নহে।

সার টমাস মোরের (Sir Thomas More : ১৪৭৮—১৫৩৫) 'উটোপিয়া' (Utopia) (ইংরাজী অনুবাদ, ১৫৫১) ল্যাটিনে লেখা বলিয়া ইংরাজী গদ্যের ইতিহাসে ইহার স্থান নাই। তথাপি ইহাতে সে যুগের মানস-প্রবণতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর পাওয়া যায় বলিয়া ইহার বিশেষ গুরুত্ব আছে। প্রচলিত সমস্ত ধারণা সম্বন্ধে মানুষের চিন্তাধারা যে বদলাইয়া যাইতেছে, নূতন নূতন আশা-কল্পনা, জীবন-ব্যবস্থার নব নব প্রকরণ যে যুগান্তরের নূতন প্রত্যুষে মানবচিত্তে মুকুলিত হইতেছে গ্রন্থখানি তাহারই নিদর্শন। মধ্যযুগের ক্ষাত্র আদর্শ, যুদ্ধনীতি, সম্পত্তির মালিকানা, আনন্দবিমুখ ধর্মাচরণ, ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রভৃতি বিষয়ে লেখক সম্পূর্ণ স্বাধীন মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। সম্পত্তির কেহ মালিক হইবে না, কেহ নয় ঘণ্টার বেশী কাজ করিবে না, সমস্ত ধর্মমত সম্বন্ধে সহিষ্ণু মনোভাব পোষণ করা উচিত—এই সমস্ত নূতন নীতি তাঁহার গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থে ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ ঔৎসুক্য নাই, স্বাধীন চিন্তার স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তিই এখানে প্রধান। মোর প্লেটোর আদর্শবাদ ও সক্রেটিসের আত্মানুসন্ধানপর

যুক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, কিন্তু নূতন যুগে অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কারের ফলে ও বিবিধ জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার জন্য মনের যে উদারতা ও কল্পনার যে বন্ধনমুক্তি ঘটিয়াছিল তাহাও তাঁহাকে প্রেরণা দিয়াছিল। 'উটোপিয়া' শব্দটি এত ব্যাপক পরিচিতি লাভ করিয়াছিল যে, ইহা ইংরাজী ভাষায় 'অসম্ভব আদর্শ-কল্পনা' এই অর্থবাহী একটি সাধারণ বিশেষ্য পদে পরিণত হইয়াছে।

জন লিলি (John Lyly : ১৫৫৪—১৬০৬) ও সার ফিলিপ সিড্‌নি (Sir Philip Sidney : ১৫৫৪-১৫৮৬) সাহিত্যের একাধিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিলেও নূতন গদ্যরীতি প্রবর্তনের জন্যই ইঁহারা উভয়েই বিশেষভাবে স্মরণীয়। লিলির 'ইউফুইস্' (Euphues) গ্রন্থে (১৫৭৯) তিনি যে ভাষা-প্রয়োগের অভিনব ভঙ্গী উদাহৃত করিয়াছেন তাহা সমগ্র যুগসাহিত্যে অনুসৃত হইয়াছিল ও তাহা ইউফুইজম এই বিশিষ্ট নামে চিহ্নিত হইয়াছে। সিড্‌নিও তাঁহার আরকেডিয়া (Arcadia)-তে (১৫৮০) এক অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ ও সূক্ষ্ম অনুভূতিদ্যোতক গদ্য-রচনারীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল গদ্যের প্রয়োজনাত্মক রূপকে অতিক্রম করিয়া ইহাকে কাব্যসৌন্দর্য ও কল্পনাক্রীড়ার বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। ইউফুইজমের মধ্যে দুইটি ভঙ্গী সুপরিস্ফুট—(১) বাক্যাংশের মধ্যে বিপরীত ভাবদ্যোতনা, ভারসাম্য-প্রতিষ্ঠা ও অনুপ্রাস-প্রয়োগের প্রয়াস, (২) কাল্পনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞান হইতে গৃহীত, অবাস্তব, কল্পনা-প্রধান উপমা ও চিত্রকল্পের সমাবেশ। ইহার মধ্য দিয়া একটা কৃত্রিম অলঙ্করণ-প্রয়াস অতিরিক্ত মাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে। এই কৃত্রিম ভঙ্গী শেক্‌শপিয়রের অপরিণত নাটকসমূহে বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সিড্‌নির 'আরকেডিয়াতে' অন্য এক প্রকারের কৃত্রিম ভাষারীতি প্রযুক্ত হইয়াছে। জড় পদার্থকে প্রাণময় করিয়া দেখাইবার চেষ্টায় তিনি সমাসোক্তি অলঙ্কারের নির্বিচার প্রয়োগ করিয়াছেন। শিষ্টতা ও সৌজন্য এবং শ্লথ-বিগলিত, সদা-উৎসারিত আবেগাতিরেকের প্রেরণায় তিনি ভাষাকে বাঁকাইয়া চুরাইয়া, স্ফীত করিয়া, উহাতে রঙ-এর প্রলেপ মাখাইয়া ও রেশমী ঝালর ও ঝুটা মুক্তা-মালা ঝুলাইয়া উহাকে এক অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক প্রসাধন-সজ্জায় মণ্ডিত করিয়াছেন। লিলির সহিত তুলনায় তাঁহার বাক্যের গঠনসৌষ্ঠব অনেক অপকৃষ্ট ; কিন্তু তাঁহার অলঙ্কার-প্রয়োগ লিলির মত কৃত্রিম ও প্রাণহীন নহে। সৌন্দর্যসৃষ্টির অবিশ্রান্ত প্রয়াসে তিনি সময় সময় প্রাণবেগের পরিচয় দিয়াছেন ; তাঁহার উপমা ও চিত্রসমূহ কাগজের ফুলের মত কেবল বর্ণসর্বস্ব নহে ; ইহাদের মধ্যে কখনও

কখনও নূতন জীবন্ত কুসুমের সৌরভও অনুভূত হয়। গদ্যের প্রকাশ-শক্তি বাড়াইবার ও উহাকে সৌন্দর্যরসে অভিষিক্ত করার এই উৎকট প্রয়াস অবশ্য কৃত্রিম রুচির নিদর্শন ; এবং সেইজন্যই ইহা অনুকরণীয় অথবা প্রশংসার্হ নহে। পরবর্তী যুগের গদ্য এই আদর্শকে পরিহার করে। তথাপি সৌন্দর্য-সাধনার এই চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। যেমন কৃত্রিম ফুৎকার-বায়ুসঞ্চালন হইতে স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া উদ্ভূত হয়, সেইরূপ এই সৌন্দর্যানুসন্ধানের গলদ্‌ঘর্ম ও অতি-সচেতন সচেষ্টতা হইতে স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্য-উন্মেষ গদ্যের ভিতর-বাহিরকে শেষ পর্যন্ত শ্রীমণ্ডিত করিয়া তোলে।

৬

কিন্তু এলিজাবেথীয় যুগের সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব নাটক-রচনায়। এই যুগের নাট্য-সাহিত্য শুধু ইংরাজী নহে, বিশ্বসাহিত্যের গৌরব। সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ বলেন যে জাতীয়-জীবনে মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত না হইলে উচ্চাঙ্গের নাটক-রচনা সম্ভব হয় না। কাব্য-রচনা কবির নিজস্ব সৃষ্টি ; কিন্তু নাটক-রচনা এক রকমের যৌথ কারবার। কবি-কল্পনার সহিত প্রতিদিনের বাস্তব জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে। কবি তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে উপেক্ষা করিয়া নিজ নির্জন কাব্য-জগতে ধ্যান-মগ্ন থাকিতে পারেন। কিন্তু শ্রোতা বাদ দিয়া নাটক রচনা চলে না। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে তটের সহিত তরঙ্গের মৃদু সংঘাতেই নদীর জলে ঐকতান সুর বাজিয়া উঠে, সেইরূপ শ্রোতা ও লেখকের মধ্যে একাত্মতাবোধ হইতেই উচ্চাঙ্গ নাটকের জন্ম। তারপর নাটকের মধ্যে কবি-কল্পনা ও কর্মশক্তির এক আশ্চর্য সমন্বয়েরও প্রয়োজন। সমগ্র জাতি যখন এক গৌরবময় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় ও তাহা হইতে এক মহৎ কর্মপ্রেরণা লাভ করে, মাত্র তখনই নাট্য-প্রতিভার বিকাশ সম্ভব। নাটক এক বিরাট কর্মজীবনের প্রতিচ্ছবি—নির্ভীক ও উদার কর্মপ্রচেষ্টা হইতেই ইহা নিজ গতিবেগ ও উত্তেজনা আহরণ করে। ইংলণ্ডে জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে এলিজাবেথীয় যুগে এই অবস্থাই বিদ্যমান ছিল—তাই সেই যুগেই সেখানে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেক্‌শপিয়ারের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল।

এলিজাবেথীয় যুগের প্রধান কীর্তি হইতেছে ইহার অতুলনীয় নাট্য-সাহিত্য। এই নাট্য-সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও প্রসার এত অধিক যে স্বল্প পরিসরের মধ্যে ইহার একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়াও অসম্ভব। এই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে সর্বপ্রধান শেক্‌শপিয়ার। শত শত গ্রন্থে ইহার নাট্যপ্রতিভার বিশ্লেষণ ও রসাস্বাদের

চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এখনও ইহার সৃষ্টি-রহস্যের চরম তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। আমরা এই ক্ষুদ্র পরিচিতিতে শেক্‌শপিয়ার-পূর্ববর্তী নাট্যকারদের আলোচনা করিয়া পরে শেক্‌শপিয়ার ও তাঁহার পরবর্তীদের প্রতিভা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

(১৫৬০—১৫৯২)

এলিজাবেথীয় যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য ট্রাজেডি 'গর্বোডাক' (Gorboduc) বা 'ফেরেক্স ও পোরেক্স' (Ferrex and Porrex) (১৫৬১)। নর্টন ও স্যাকভিল নামক দুই নাট্যকার ইহার যুগ্ম রচয়িতা। নাটকটির উপর লাটিন নাট্যকার সেনেকার প্রভাব প্রবলভাবে অনুভূত হয়। ইংলণ্ডের কিংবদন্তীমূলক রাজা গর্বোডাকের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র ফেরেক্স ও পোরেক্সের মধ্যে রাজ্যভাগ লইয়া দ্বন্দ্ব হয় এবং ফেরেক্স পোরেক্সের দ্বারা নিহত হন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে গর্বোডাকের রাণী অর্থাৎ ফেরেক্স-পোরেক্সের মাতা পোরেক্সকে হত্যা করেন এবং শেষ-পর্যন্ত রাজ্যে গৃহযুদ্ধ লাগিয়া যায়। নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার এই নাটকের অন্যতম প্রধান অবদান।

পথিকৃৎ কমেডি হিসাবে 'রাল্‌ফ রয়েস্টার ডয়েস্টার (Ralph Roister Doister) (১৫৫৩) ও 'গ্যামার গার্টনের ছুঁচ' (Gammer Gurton's Needle) (১৫৬১), এই দুইটি নাটকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমখানির রচয়িতা নিকোলাস উডাল (Nicholas Udall) নামে একজন স্কুল শিক্ষক; দ্বিতীয়টি কাহার রচনা তাহা সঠিক জানা যায় নাই। দুইখানি নাটকই সমিল ছন্দে লিখিত এবং লাটিন নাট্যকার প্লটাস ও টেরেন্সের দ্বারা অনুপ্রাণিত। প্রথমখানির বিষয়বস্তু প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি এবং প্রেমিকাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা। বিধবা কাস্টান্স গুডলাককে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রয়স্টার নামে বাগাড়ম্বরী এক ব্যক্তি কাস্টান্সকে বিবাহ করিতে চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছিত হয়। কাস্টান্স ও গুডলাকের বিবাহে নাটকের পরিসমাপ্তি। 'গ্যামার গার্টন'-এর বিষয়বস্তু অতি অকিঞ্চিৎকর। গ্যামার গার্টনের বাড়ীর চাকরের জামা-কাপড় সেলাই করার ছুঁচ হারাইয়া যায় এবং তাহাকে উপলক্ষ করিয়া গ্যামার গার্টনের স্ত্রী এবং তাহার প্রতিবেশিনীর মধ্যে তুমুল বাদবিসংবাদের সৃষ্টি হয়। অবস্থা যখন চরমে তখন দেখা গেল যে ছুঁচটি চাকরের পাজামাতেই গাঁথা আছে।

নাটক হিসাবে এইগুলি উচ্চমানের সৃষ্টি না হইলেও পথিকৃৎ হিসাবে ইহাদের মূল্য অসীম।

শেক্‌শপিয়ারের পূর্ববর্তী নাট্যকারদের রচিত যে সমস্ত সাহিত্যধর্মী নাটক

নাট্যসাহিত্যের বিবর্তনে সহায়ক ও প্রভাবশীল, শেক্‌শপিয়ারের পূর্বসূচনারূপে এখানে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রয়োজন।

(১) অজ্ঞাতনামা নাট্যকার-রচিত ও একদা শেক্‌শপিয়ারে আরোপিত 'ফীভারশামের আর্ডেন' (Arden of Feversham) (১৫৮৬) এলিজাবেথীয় যুগে এক অসাধারণ আবির্ভাব। ইহা সম্পূর্ণরূপে রোমান্স ও উন্নত-ভাব-কল্পনা-বর্জিত ও বাস্তব পরিবার-জীবনের ট্রাজেডির পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু ইহার মধ্যে এমন একটি অন্তর্ভেদী মনস্তত্ত্ববোধ, চরিত্রের ব্যক্তিত্ববিকাশ ও জীবনচিত্রণের স্বাভাবিকতা আছে যে ইহাকে উচ্চ-নাটকীয়গুণসম্পন্ন বলিতে হয়। স্বয়ং শেক্‌শপিয়ার ছাড়া সে যুগের আর কোন নাট্যকারকে ইহার সম্ভাব্য রচয়িতারূপে কল্পনা করা দুরূহ। ফীভারশামের আর্ডেন একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় ধনী ব্যক্তি। তাঁহার পত্নী এ্যালিস্, মোস্‌বি নামে এক হীনবংশোদ্ভূত ও স্থূলপ্রকৃতি পল্লীবাসীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়েন। প্রণয়ী-যুগল এ্যালিসের স্বামীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে, এবং কয়েকবার চেষ্টার পর এই ষড়যন্ত্রে সফল হয়। কিন্তু হত্যার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা ধরা পড়ে ও চরমদণ্ডে দণ্ডিত হয়। নাটকটি মূলতঃ নীতিবাদী ; ব্যভিচার ও নরহত্যার নগ্ন বীভৎসতা ও শাস্তিমূলক পরিণতি দেখানই উহার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য নিছক নীতিবাদ-প্রচারের সাহায্যে সিদ্ধ হয় নাই। অপরাধীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, মানস-যন্ত্রণা ও তাহাদের চারিত্রিক ইতরতা পরিস্ফুট করিয়াই লেখক তাঁহার অভিলষিত লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছেন।

স্বামীর চরিত্রে দৃঢ়চিত্ততার অভাব, পত্নী ও তাহার প্রণয়ীর প্রতি মনোভাবের অনির্দেশ্যতা, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসে মেশান একপ্রকারের দুর্বল সন্দিগ্ধ চলচ্চিত্ততা তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। এদিকে সে আবার একজন দরিদ্রের ভূমি গ্রাস করিতেও কুণ্ঠিত নহে। সাধারণ ট্রাজেডির নায়কের মত তাহাকে আদর্শায়িত করার কোন চেষ্টাই দেখা যায় না। দোষেগুণে দুর্বলতায় মিশাইয়া যে সাধারণ মানুষ, আর্ডেন তাহাদেরই একজন।

মোস্‌বির হীনমন্যতা ও শ্রেণীবিদ্বেষ তাহার সমস্ত প্রেমনিবেদনের মধ্যেও পরিস্ফুট। সে এ্যালিসকে সত্য সত্যই ভালবাসে না, নিজের বংশগত হীনতার জন্য তাহার বিরুদ্ধে ক্ষোভ পোষণ করে। এ্যালিসের প্রতি তাহার প্রেম আর্ডেনের প্রতি তাহার বিদ্বেষের নামান্তরমাত্র বলা যাইতে পারে। একমাত্র এ্যালিসের চরিত্রই অনেকটা দুর্বলভাবে পরিকল্পিত। মোস্‌বির প্রতি তাহার আকর্ষণ অনেকটা আকস্মিক। এই প্রেমের কোনো নির্দিষ্ট কারণও নাটকের

মধ্যে দেখানো হয় নাই। স্বামী-হত্যার পরেই তাহার মনে অনুতাপ জাগে।

প্রণয়ী-যুগলের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, পরস্পরকে আঘাত করিবার প্রবণতা; অভিযোগবিনিময়. প্রেমবিচ্ছেদের ভীতি-প্রদর্শন, আবার পরিণামে ক্ষমা-প্রার্থনা ও পুনর্মিলন অতি স্বাভাবিক ভাবে ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার তীক্ষ্ণ বাস্তবতা-বোধ সাধারণ প্রথাবদ্ধ ও আদর্শনিষ্ঠ প্রেম-চিত্রণের সম্পূর্ণ বিপরীত।

(২) টমাস্ কীড্ (Thomas Kyd) (১৫৫৮-১৫৯৪)-এর 'স্পেনদেশীয় ট্রাজেডি' (The Spanish Tragedy) একদিকে প্রতিহিংসার উৎকট আতিশয্য-মূলক চিত্র; অপর দিকে ইহা ট্রাজেডির মূলধর্ম-প্রতিষ্ঠার সহায়ক ও শেক্‌শপিয়ারের হ্যামলেটের অগ্রদূত। এলিজাবেথ-যুগে শক্তি ও দুর্বলতা, অলঙ্কার ও কবিত্ব, অস্বাভাবিকতা ও স্বভাবধর্ম, হত্যার ছড়াছড়ি ও ট্র্যাজিক রসের স্ফুরণ কিরূপ অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত ছিল এই নাটকটি তাহার এক বিস্ময়কর সার্থক নিদর্শন। ইহার অলঙ্কার-স্ফীতি, উৎকট ভাবাতিশয্য ও অসম্ভব ঘটনাসন্নিবেশের সে যুগে কত যে ব্যঙ্গানুকৃতি (parody) হইয়াছে তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। কিন্তু এই আতিশয্য-বিড়ম্বিত মনোভাবের মধ্যেও কোথাও যেন ট্রাজেডি-উদ্বোধনের যথার্থ শক্তি, অন্তরকে মথিত করার একটা সহজ পটুতা, নিয়তি-বিধানের প্রতি একটা সম্ভ্রমবোধ প্রচ্ছন্ন আছে। কাজেই উপহাস করিতে গিয়াও আমরা অজ্ঞাতসারে ইহার প্রত্যয়-দৃঢ়তার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়ি।

সেনাপতি হিয়েরোনিমোর পুত্র তরুণ হোরেশিও বেলিম্পেরিয়ার সহিত প্রণয়-শপথ-বিনিময়কালে বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা নিহত হয়। বৃদ্ধ পিতা প্রতিহিংসা-সংকল্পে অনুপ্রাণিত হইয়া পাগলামির ভান করেন ও মধ্যে মধ্যে সত্যই পাগল হইয়া যান। হত্যাকারীর মানস-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া নিঃসংশয় হইবার উদ্দেশ্যে তিনি বেলিম্পেরিয়ার বিবাহের সময় একটি নাটকে অভিনয় করিতে রাজী হন। এই অভিনয়ের সময়ে নাটকের পাত্রপাত্রী ও দর্শক সকলের এককালীন মৃত্যুতে একটি শোকাবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। আবার বেলিম্পেরিয়ার প্রথম প্রণয়ী ডন্ এ্যাণ্ড্রিয়া যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকের হাতে হত হইবার পর প্রেতরূপে আবির্ভূত হইয়া সদাসর্বদা রঙ্গমঞ্চে অবস্থান করে এবং প্রতিহিংসা-গ্রহণের উত্তেজনা যোগায়। এই দুইটি ঘটনার সহিত হ্যামলেটের সৌসাদৃশ্য সুস্পষ্ট। হিয়েরোনিমোর উন্মত্ততা হ্যামলেটের উন্মত্ততার ন্যায় নানা অসম্ভব খেয়াল ও খাপছাড়া আচরণের ভিতর দিয়া

অভিব্যক্ত হইয়াছে। আবার নাটকের মধ্যে নাটক এবং তাহার সাহায্যে প্রকৃত দোষী নির্ণয়, ইহাও হ্যামলেটের অনুরূপ। সম্ভব-অসম্ভব সর্বপ্রকারের অতিনাটকীয় পরিস্থিতি, অজস্র রক্তপাত ও আত্মপীড়নের দৃষ্টান্ত, অতিমুখর ভাষণ ও মনস্তত্ত্বের বেপরোয়া অস্বীকৃতি এই শোণিত-প্লাবিত, কোলাহল-বধির নাটকের অঙ্কগুলিতে পুঞ্জীভূত হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও নাটকটিতে এক অদম্য প্রাণশক্তির আত্মপ্রকাশ অনুভবগম্য।

(৩) রবার্ট গ্রীনের (Robert Greene) 'যাজক বেকন ও বাঙ্গে' (Friar Bacon and Friar Bungay) মার্লোর 'ডক্‌টর ফস্টাস'-এর পূর্বসূরী। গ্রীনের 'চতুর্থ জেম্‌স্' (James IV)-এর নায়িকা-চরিত্র চরিত্র-বিশুদ্ধি ও অন্তর-সৌকুমার্যে শেক্‌শপিয়ারের নায়িকাদের অগ্রবর্তিনী। এই নাটকে যুবরাজ এড্‌ওয়ার্ড—একজন কাল্পনিক রাজপুত্র—এক অরণ্যরক্ষকের কন্যা মার্গারেটের প্রেমে পড়েন ও তাঁহার অনুচর লেসিকে এই কৃষকবালার হৃদয়-জয়ের জন্য দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করেন। লেসি কিন্তু নিজেই বালিকার প্রেমে পড়িয়া যায়। রাজপুত্র ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেও বন্ধুকে ক্ষমা করেন ও তাহাদের বিবাহের অনুমতি দেন। লেসি আবার তাহার প্রণয়িনীকে পরীক্ষা করার পর শেষ পর্যন্ত তাহার সঙ্গে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই আনন্দময় পল্লীপ্রতিবেশে রচিত নাটকে পল্লীগ্রামের সরল মাধুর্য, মুক্ত আলো-বাতাসের প্রাচুর্য ও পল্লীবালার সুকুমার প্রেমমুগ্ধতার ছবি অতি উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

'চতুর্থ জেম্‌স্' নাটকের ঐতিহাসিক অংশও কাল্পনিক। এই নাটকে ডরোথিয়া ও ইভা নামে দুইটি পূতচরিত্র, প্রেমের আদর্শে অবিচল নায়িকার দর্শন পাওয়া যায়। ডরোথিয়া বিপথগামী স্বামীর সর্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া সঙ্কট-মুহূর্তে তাহাকে রক্ষা করে। ইভা একজন কামুক লম্পটের প্রণয়-প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহার পবিত্র অন্তঃকরণের পরিচয় দেয়। ডরোথিয়ার সহিত শেক্‌শপিয়ারের জুলিয়া, ভায়োলা, ইমোজেন প্রভৃতি নায়িকাবৃন্দের একটা সহজ-লক্ষ্য সমধর্মিতা আছে। নায়িকার চরিত্রাঙ্কনে গ্রীন শেক্‌শপিয়ারের পথপ্রদর্শকের কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন।

(৪) জন লিলি (John Lyly : ১৫৫৪—১৬০৬) ইউফুয়িস রচনা দ্বারা যে নূতন গদ্যরীতির প্রবর্তন করেন তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই গদ্যরীতির বুদ্ধিদীপ্ত মনন ও সংলাপকুশলতা তাঁহার নাটকেও অনুসৃত হইতে দেখা যায়। তিনি এলিজাবেথীয় নাটকে রোমান্টিক কমেডির প্রবর্তকের মর্যাদা দাবী করিতে

পারেন। তিনি পুরাণ ও প্রাচীন লোককল্পনা হইতে তাঁহার নাটকের বিষয় আহরণ করিয়াছেন ও এই কল্পনাপ্রধান বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রূপকার্থ আরোপ করিয়া ইহার অপার্থিব মায়াকে ঘনীভূত করিয়াছেন। তাঁহার 'এনডিমিয়ন' (Endimion) তাঁহার সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত ও রীতিবৈশিষ্ট্যচিহ্নিত নাটক। ইহাতে এনডিমিয়নের প্রেম লইয়া টেলাস (পৃথিবী) ও সিন্থিয়া (চন্দ্রমা) এই উভয়ের মধ্যে প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তজ্জনিত ঈর্ষার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ডাকিনীর জাদুমন্ত্রে প্রভাবিত নায়কের চল্লিশবর্ষব্যাপী মোহনিদ্রা প্রেয়সী সিন্থিয়ার চুম্বনে অপনোদিত হইল। এই নাটকের মধ্যে সমালোচকেরা সমকালীন রাজনীতির ইঙ্গিত খুঁজিয়া পাইয়াছেন। নায়ক হইলেন রানী এলিজাবেথের প্রণয়ভাজন লিস্টার (Leicester) আর তাঁহার দুই প্রণয়িনী হইলেন স্কটল্যাণ্ডের রানী মেরী ও ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ। লিলির 'কাম্পাস্‌পি' (Campaspe) নাটকটির উৎস কাল্পনিক ইতিহাস। বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডার এই নায়িকার প্রণয়মুগ্ধ, কিন্তু নায়িকা অন্যসমর্পিতচিত্তা। শেষে আলেক্‌জাণ্ডার নায়িকার আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়ীর হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া নিজ উদারতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন।

শেক্‌শপিয়ারের রোমান্টিক কমেডিতে যে একটি অর্ধবাস্তব বা অবাস্তব ভাব-পরিবেশ ও অলৌকিক কল্প-সৌন্দর্যের স্পর্শ পাওয়া যায় তাহার প্রথম প্রেরণা আসে লিলির নাটক হইতে। নাটকীয় সংলাপের চমকপ্রদ দীপ্তি ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পথিকৃৎ রূপেও লিলি পরবর্তী নাট্যকারগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করিয়াছেন। শেকশপিয়ারের প্রথম জীবনের সব কমেডিগুলিতেই লিলির সুস্পষ্ট প্রভাব অনুভব করা যায়।

(৫) ক্রিস্টোফার মার্লো (Christopher Marlowe : ১৫৬৪—১৫৯৩) শেক্‌শপিয়ারের পূর্বসূরিগণের অন্যতম ; মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার তরুণ শক্তির পূর্ণ পরিণতির পূর্বেই, এক সরাইখানায় উচ্ছৃঙ্খল দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে তাঁহার জীবন-নাট্যের উপর যবনিকাপাত হয়। তিনি দীর্ঘতর জীবন লাভ করিলে শেক্‌শপিয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিতেন কিনা এই বিষয়ে নানাবিধ অনুমানমূলক বিতর্কের অবতারণা হইয়াছে। এই সমস্ত অনিশ্চিত সম্ভাবনা বাদ দিলেও মার্লো যাহা লিখিয়াছেন তাহার উপরই তাঁহার গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ তিনি নাটকের মধ্যে জলন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা, কল্পনার স্পর্ধিত উর্ধ্বগতি, গীতিকাব্যের মূর্ছনা ও শব্দঝঙ্কার সঞ্চারিত করিয়া ইহাকে উন্নত ধরনের আর্টে পরিণত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, এই যুগে মানুষের মন যে অপরিমিত উচ্চাভিলাষ ও অসাধ্যসাধনের আকাঙ্ক্ষার উদগ্র উচ্ছ্বাসে আন্দোলিত হইতেছিল, তিনি নাটকের চরিত্রাবলীর মধ্যে

তাহাকেও রূপ ও ভাষা দিয়াছেন। তাঁহার তৈমুরলঙ্গ (Tamburlaine) দিগ্বিজয়ের দুরন্ত বাসনায় কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে। তাঁহার মালটার ইহুদী (The Jew of Malta) অপরিমিত ধনসঞ্চয়ের নেশায় বিভোর। তাঁহার ডক্টর ফস্টাস্ (Doctor Faustus) জ্ঞানাহরণের অতৃপ্ত প্রেরণায় শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করিয়া তাঁহার আত্মাকে বিসর্জন দিয়াছেন—বুদ্ধি-সর্বস্ব সর্বজ্ঞতার কণ্টক-মুকুটের জন্য নীতি ও ধর্মজ্ঞানকে অস্বীকার করিয়াছেন। শেষে যখন চুক্তির মেয়াদ ফুরাইয়াছে ও শয়তান অঙ্গীকৃত দাবী মিটাইবার জন্য হাজির হইয়াছে তখন সেই নিঃসঙ্গ মধ্যরাত্রে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার মুহূর্তে ফস্টাসের অসহ অন্তর্দ্বন্দ্ব জ্বালাময়ী ভাষায় প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই দৃশ্যের নাটকীয় সংঘাত তীব্রতায় অতুলনীয়। 'ডক্টর ফস্টাস্'কেই মার্লোর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলা যায়।

নাট্যসাহিত্যে মার্লোর স্মরণীয় অবদানের মধ্যে দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। (১) নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত-প্রকাশের উপযোগী দৃঢ়বদ্ধ, ওজস্বী ভাষা ও নাটকে গতিশীল, সাবলীল অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন। গর্বোডাকের অমিত্রাক্ষরের আড়ষ্টতা মার্লোতে নাই। (২) জীবন্ত, প্রাণশক্তিতে ঐশ্বর্যশালী চরিত্র-সৃষ্টি। অবশ্য এই সমস্ত নাটকোচিত গুণের সঙ্গে তাঁহার কতকগুলি ত্রুটিও ছিল। (১) তাঁহার পরিধি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ—তাঁহার ভাষা ও চরিত্র-পরিকল্পনার মধ্যে বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব। (২) তাঁহার রচনায় Humour বা মার্জিত হাস্যরসের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। (৩) স্ত্রী-চরিত্র-অঙ্কনেও তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া অধিকাংশ সমালোচকই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হইলেও মার্লো শেক্‌শপিয়ারের সমকক্ষ হইতে পারিতেন না।

গ্রীন, লিলি, 'ফীভারশামের আর্ডেন'-এর অজ্ঞাত রচয়িতা, কীড্, মার্লো, সকলেই নিজ নিজ রশ্মি-বিকিরণের দ্বারা শেক্‌শপিয়ারের সম্পূর্ণমণ্ডল প্রতিভা-জ্যোতিষ্ককে পূর্ণরূপ দিতে সহায়তা করিয়াছেন। লিলির বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, গ্রীনের সুকুমার চরিত্র-কল্পনা ও সৌন্দর্যানুরাগ, আর্ডেনের রচয়িতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-কুশলতা, কীডের ট্রাজেডির উপযোগী বাতাবরণ-সৃষ্টি ও মার্লোর আবেগ-উচ্ছ্বসিত, গীতি-স্পন্দিত ভাষা-প্রয়োগ শেক্‌শপিয়ারের রাজকীয় আবির্ভাবের পথ প্রস্তুত করিয়াছে। সমসাময়িক যুগ হইতে তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করিয়া এইরূপে শেক্‌শপিয়ার-তিলোত্তমার উদ্ভব হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্য : দ্বিতীয়ার্ধ
শেক্‌শপিয়ার ও তাঁহার পরবর্তিগণ
[১৫৯০—১৬২৫ খৃঃ অঃ]

১

শেক্‌শপিয়ার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য অপরিহার্য কারণে উচ্ছ্বসিত স্তুতিবাদের মতই শোনাইবে। তাঁহার সমগ্র নাটকাবলী অভিনিবেশ সহকারে পাঠ না করিলে ইহাকে যুক্তিহীন আতিশয্য বলিয়া মনে হইতে পারে। তাঁহার সম্বন্ধে ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন রুচির সমালোচকদের মধ্যে যে আশ্চর্য ঐকমত্য রহিয়াছে, তাহা অন্য কাহারও ক্ষেত্রে হয় নাই। তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার—এই মতবাদ সর্ববাদিসম্মত। অবশ্য বার্নার্ড শ'র মত দুই একজন আধুনিক নাট্যকার শেক্‌শপিয়ারের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাহাত্ম্যে কিছু সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু, এই সংশয় মূলতঃ নাটকের নাটকীয়তা ও নাট্য-রচনার পদ্ধতি লইয়া—শেক্‌শপিয়ারের প্রতিভা খর্ব করার কোন অভিপ্রায় ইহাতে লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ, বার্নার্ড শ'র সমস্ত মতবাদের মধ্যেই একটা চমকপ্রদ অতিশয়োক্তি থাকে—যাহাতে তিনি প্রচলিত, সনাতন সংস্কারের ভিত্তি পর্যন্ত নড়াইয়া দিতে চাহেন। তাঁহার মন্তব্যের প্রকৃত লক্ষ্য পাঠক-সমাজে ঘোষণা করা যে শেক্‌শপিয়ারের বিষয়-নির্বাচন ও রচনা-পদ্ধতি বর্তমান যুগের সমস্যার সহিত সম্পর্করহিত ও ইহার সমস্ত উৎকর্ষ স্বীকার করিয়া লইলেও আধুনিককালে ইহা অচল।

শেক্‌শপিয়ারের এই সর্বস্বীকৃত চরম উৎকর্ষের কারণ কি?

(১) প্রথমতঃ, চরিত্র-সৃষ্টিতে তাঁহার সিদ্ধহস্ততা তুলনাবিহীন। তাঁহার নাটকে আমরা জীবন্ত নরনারীর সাক্ষাৎ পাই। শেক্‌শপিয়ারের প্রায় প্রত্যেক চরিত্রই প্রাণ-শক্তিতে চঞ্চল, জীবনের নিগূঢ় রসে পরিপূর্ণ; তাহাদের ভাষা, ভাব-ভঙ্গী, ব্যবহার, গভীর হৃদয়াবেগ—সমস্তই চরিত্রকল্পনার সহিত আশ্চর্যরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাধারণতঃ সাহিত্যে সৃষ্ট নর-নারীর সহিত বাস্তব জীবনের ব্যক্তিবৃন্দের একটা পার্থক্য দেখা যায়—জীবনের পূর্ণাঙ্গতা সাহিত্যে প্রায়ই প্রতিফলিত হয় না। জীবনে যে সমস্ত লোকের সংস্পর্শে আমরা আসি, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের

একটা অতৃপ্ত কৌতূহল থাকিয়া যায়—মনে হয় তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইলাম না। জ্ঞাতের পিছনে অজ্ঞাত অংশ উঁকি মারিয়া তাহাদের চারিদিকে একটা রহস্যময় প্রতিবেশ সৃষ্টি করে—তাহাদের ব্যক্তিত্বের পরিধি ও প্রসার আমাদের জ্ঞানের সীমা ছাড়াইয়া যায়। সাহিত্যে জীবনের যে খণ্ডাংশ অঙ্কিত হয়, তাহার বিশ্লেষণে কিন্তু একটা সম্পূর্ণতা থাকে। সাহিত্যিক আমাদিগের সম্মুখে যে অংশটুকু মেলিয়া ধরেন, তাহার রহস্যসূত্রটুকুও তিনি যেন আমাদের হাতে তুলিয়া দেন। শেক্‌শপিয়ারের চরিত্রাবলী কিন্তু আমাদের মনে বাস্তব জীবনের নরনারীর ন্যায় একটা অমীমাংসিত জিজ্ঞাসার উদ্রেক করে। তাহাদিগকে উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিয়াও যেন তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা কোনও শেষ সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি না। নাটকসীমার বহির্ভূত তাহাদের পূর্বজীবন ও উত্তরজীবন লইয়া আমরা নানা প্রশ্নের অবতারণা করিয়া থাকি। যেমন সত্যিকার মানুষের চরিত্র-ব্যাখ্যা লইয়া, তেমনি শেক্‌শপিয়ারের সৃষ্ট চরিত্রাবলীর প্রকৃতি-পর্যালোচনায়ও অশেষ প্রকারের মতভেদ বর্তমান। ফলস্টাফ (Falstaff) কি সত্য সত্যই কাপুরুষ ছিলেন? হ্যামলেটের (Hamlet) হৃদয়ের গভীরতম স্তরে কোন্ জীবনাদর্শ আত্মগোপন করিয়া আছে? ওথেলোর (Othello) নৃশংস দানবীয়তা কি স্বাভাবিক? রাজা লীয়রের (Lear) উদ্ভট খেয়ালকে গোড়া হইতেই পাগলামির পর্যায়ভুক্ত করা যায় কি না? ম্যাকবেথের অধঃপতনের দায়িত্ব কাহার বেশী—তাহার, না তাহার স্ত্রীর—এই সমস্ত জটিল প্রশ্ন আমাদের মনকে নানা সংশয়ে আন্দোলিত করিতে থাকে। তাহাদের মুখের কথা, নাট্যকারের ইঙ্গিত ও নির্দেশ—এ সমস্ত সাক্ষ্য যেন আমরা সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে পারি না, কিংবা মানিয়া লইলেও তাহাই যে শেষ কথা, এরূপ বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি হয় না। নাট্যে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহার পিছনের অব্যক্ত অংশ আমাদের মনকে দোলায়িত করে ও আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে সন্দেহাকুল করিয়া তোলে। ইহাই শেকশপিয়ার-সৃষ্ট চরিত্রগুলির প্রাণবন্ততার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(২) শেক্‌শপিয়ারের নাটক সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার দ্বিতীয় বিষয়, তাহাদের জনপ্রিয়তা। সুদূর এলিজাবেথীয় যুগ হইতে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত এই বিষয়ে এক আশ্চর্য রুচিগত ঐক্যের নিদর্শন মিলে। অনেক নাট্যকার যুগবিশেষের সমস্যা লইয়া কারবার করেন—ভিন্ন যুগে রুচি-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পূর্বপ্রতিষ্ঠাও ম্লান হইয়া আসে। আবার অনেকে সৌন্দর্যতত্ত্বের

উচ্চ ভূমিতে দাঁড়াইয়া প্রাকৃত জনসাধারণের রুচির অনুবর্তনকে নিন্দনীয় মনে করেন, সমকালীন সাফল্যের জন্য সনাতন আর্টকে বলি দেওয়া তাঁহারা অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে করেন। শেক্‌শপিয়ারের মধ্যে এরূপ কোন অবজ্ঞা বা আত্মাভিমানের চিহ্নমাত্র নাই। তাঁহার নাটকাবলী জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহার একটি সহজ ও স্বাভাবিক মিলন-ক্ষেত্র—কৃত্রিম শিক্ষাভিমান এই মিলনের পথে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করে নাই। শেক্‌শপিয়ার তাঁহার যুগের সমস্ত ইতর, কদর্য রুচিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, ও আশ্চর্যভাবে ইহাদিগকে বিশুদ্ধ ও সংস্কৃত করিয়া চিরসৌন্দর্যলোকে উন্নীত করিয়াছেন। সেকালের লোকে ভাঁড়ামিতে আমোদ উপভোগ করিত। শেক্‌শপিয়ারের অনেক নাটকে এই ভাঁড় আবির্ভূত হইয়া সাধারণ লোককে রস পরিবেশন করিয়াছে। কিন্তু এই স্থূল অমার্জিত হাস্য-পরিহাসের মধ্যে কবি এমন একটি সূক্ষ্ম সুর লাগাইয়াছেন, এমন একটি করুণ মূর্ছনা ঝঙ্কৃত করিয়াছেন যে তাহাতে তাহার প্রকৃতিই সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে—ভাঁড়ামির অর্থহীন প্রলাপের মধ্যে জীবন সম্বন্ধে সূক্ষ্মতম অন্তর্দৃষ্টি বিদ্যুৎস্ফুরণের মত ঝলকিত হইয়াছে। তৎকালীন শ্রোতৃবর্গ মারামারি-রক্তপাতের পক্ষপাতী ছিল—শেক্‌শপিয়ার এই রুচিও পূর্ণমাত্রায় সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাটকে এই খুনাখুনি ও রক্তপ্রবাহের মধ্যে নিয়তির নিগূঢ় লীলা, ন্যায়-বিচারের সূক্ষ্ম ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই অস্বাভাবিক সংঘটনগুলিকে এক উদার বিশ্বনীতির অঙ্গীভূত করিয়াছে। আকস্মিকের মধ্যে চিরন্তনের আবিষ্কার, বিশেষ একটি যুগের খেয়ালের মধ্যে সর্বযুগ-সাধারণ সনাতন নীতির প্রয়োগ—নাট্যকার শেক্‌শপিয়ারের উৎকর্ষের একটা মানদণ্ড।

(৩) তৃতীয়তঃ, উদার, অপক্ষপাত মনোভাব শেক্‌শপিয়ারের আর একটি বিশেষত্ব। নাট্যকারের আদর্শ—নৈর্ব্যক্তিকতা (impersonality); তিনি চরিত্র সৃষ্টি করিবেন, কিন্তু কাহারও পক্ষাবলম্বন করিবেন না। নানা লোকের মুখে তিনি নানাবিধ মতবাদ ও জীবনদর্শন আরোপ করিবেন, কিন্তু এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে তাঁহাকে ধরা-ছোঁওয়া যাইবে না। অধিকাংশ নাট্যকারই এই আদর্শ সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে পারেন না। চরিত্রাবলীর মতাভিব্যক্তির মধ্যে তাঁহাদের নিজ মানসিক প্রবণতা বা ঝোঁক নিজের অজ্ঞাতসারেই ফুটিয়া উঠে। শেক্‌শপিয়ার কিন্তু এই দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। সমালোচকগণ তাঁহার রচনা খুব সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়াও তাঁহার প্রকৃত মনোভাবের কণামাত্র আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র-সমূহের অন্তরালে তিনি

সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া আছেন। মুখোস খুলিয়া কেহ তাঁহার প্রকৃত মুখাবয়বের পরিচয় পান নাই। তাঁহার রাজনৈতিক ও দার্শনিক মতবাদ, জীবন সম্বন্ধে তাঁহার ধ্যান ধারণা, তাঁহার পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ—এ সমস্তই অনিশ্চিত ও রহস্যাবৃত। যাঁহার নিকট এ অনন্ত-বৈচিত্র্যময় মানব-প্রকৃতি একেবারে স্বচ্ছ ও অনাবৃত, তাঁহার নিজ প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তিনি রাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র কিসের পক্ষপাতী ছিলেন—হ্যামলেটের গভীর আত্ম-জিজ্ঞাসা, ফলস্টাফের আদর্শ-লেশহীন বিলাসবাদ, টাইমনের মনুষ্যজাতির প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ অবিশ্বাস, প্রস্পারোর প্রশান্ত জ্ঞান-গাম্ভীর্য ও ঈশ্বরসুলভ উদারতা, মার্কুইসিওর লঘু-তরল দৃষ্টিভঙ্গী—কোন্‌টা যে নাট্যকারের আসল প্রকৃতি ও মনোভাবের দ্যোতনা তাহা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না। তিনি এই সমস্ত পরস্পর-বিরোধী আদর্শের মধ্যে এমন সূক্ষ্মভাবে তুলাদণ্ড ধরিয়াছেন যে দাঁড়িপাল্লা কোন দিকেই অণুমাত্র হেলিয়া পড়ে নাই।

কিন্তু কোন বিশেষ চরিত্রের সহিত শেক্‌শপিয়ারকে একাত্ম করিয়া না দেখিলেও, সমগ্র নাটকাবলী হইতে তাঁহার যে ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করে তাহার গভীরতা ও প্রসারে আমরা বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়ি। সৎ-অসৎ, সংকীর্ণ-উদার, উচ্চ-নীচ সকলের প্রতি তাঁহার একই প্রকারের ক্ষমাসুন্দর স্নেহ-দৃষ্টি—কেহই তাঁহার সর্বব্যাপী সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত নয়। সকলেরই মনের কথা তিনি বুঝিয়াছেন, সকলেরই আত্মসমর্থনে তিনি মানবিকতার সন্ধান পান। তিনি সকলের সঙ্গে এক সাধারণ সমতল-ভূমিতে বিচরণ করেন; নীতিবিদের উচ্চ মঞ্চ হইতে তিনি কাহাকেও সমালোচনা করেন নাই, বিচারাসনে নিজেকে অধিষ্ঠিত করিয়া পাপ-পুণ্য অনুসারে দণ্ড-পুরস্কার বিতরণের স্পর্ধিত মনোভাবও শেক্‌শপিয়ারে নাই। যে ভগবান বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারী সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের প্রতি তাঁহার মনোভাব কি তাহা আমরা জানি না, শুধু অনুমান করিতে চেষ্টা করি। আমরা কল্পনা করিতে ভালবাসি যে ভগবান সমাজপতির রক্তচক্ষু লইয়া পাপীর বিচার করিতে চাহেন না। ভগবানের কল্পিত এই উদারস্নিগ্ধ, ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গী আমরা শেক্‌শপিয়ারের নাটকাবলীতেও পাই। যে জাতিগত বিদ্বেষ আমাদের সকলেরই অস্থিমজ্জার সহিত মিশিয়া থাকে, শেক্‌শপিয়ার তাহাকেও সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়াছেন। সেই যুগে ইহুদী জাতির বিরুদ্ধে একটা ঘোরতর বিদ্বেষ ও ঘৃণা ইউরোপের সমস্ত দেশেই বদ্ধমূল ছিল। "ঘৃণিত-কুক্কুর"—ইহাই ইহুদীকে সম্বোধন করিবার প্রচলিত প্রথা

ছিল। যাহাকে আমরা ঘৃণা করি সে ক্রমশঃ ঘৃণ্যই হইয়া উঠে—এই সনাতন নীতি অনুসারে ইহুদীরাও হয়তো ক্ষুদ্রচেতা, সন্দেহপরায়ণ, প্রতিহিংসাপ্রবণ ও অসামাজিক হইয়া উঠিয়াছিল। 'ভেনিসের বণিক' (The Merchant of Venice) নাটকের শাইলক-চরিত্র এই যুগব্যাপী ঘৃণা ও অবিচারের স্বাভাবিক পরিণতি—শেক্‌শপিয়ারও তাহার স্বভাবের বিকৃতি ও বীভৎসতা দেখাইতে কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু এই বহু-নিন্দিত ইহুদী জাতির প্রতি তাঁহার মনের কোণে যে একটি স্নিগ্ধ সহানুভূতি সঞ্চিত ছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। শাইলকের সপক্ষে যাহা বলিবার আছে তাহা তিনি অননুকরণীয় বাগ্মিতা ও অখণ্ডনীয় যুক্তি-তর্কের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। শাইলকের আত্মপক্ষ-সমর্থনসূচক অমর উক্তি—'ইহুদীর কি চক্ষু কর্ণ নাসিকা নাই? তাহার কি সুখ-দুঃখ-বোধ, মান-অপমান-জ্ঞান নাই? তাহাকে আঘাত করিলে কি রক্তপাত হয় না?'—ইহা যেন সমস্ত অবহেলিত ও নির্যাতিত মানবজাতির কণ্ঠ-নিঃসৃত প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ-ঘোষণা।

(৪) শেক্‌শপিয়ারের কবিত্ব-শক্তি ও মানুষের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে ব্যাপক বহুদর্শিতাও তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী উৎকর্ষের অন্যতম কারণ। নাট্যকারের পক্ষে নিছক কাব্যোচ্ছ্বাসের অবকাশ সীমাবদ্ধ। তিনি নিজের জবানীতে কবিতা লিখিতে পারেন না, তাঁহার সবটুকুই তাঁহার পাত্র-পাত্রীর বক্তব্যের মাধ্যমে হাজির করিতে হয়। কাজেই চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রাখিয়া নাটককে কাব্যময় করিলে তাহা অপকর্ষেরই হেতু হইয়া থাকে। কিন্তু শেক্‌শপিয়ারের ট্রাজেডির নায়কগণ ও কমেডির প্রেমিক-প্রেমিকাগণ অতি স্বাভাবিকভাবে উচ্চাঙ্গের কবিতার মধ্য দিয়া তাঁহাদের আবেগ-প্রকাশের ভাষা পাইয়াছেন। ম্যাকবেথ, রাজা লিয়র, ওথেলো, হ্যামলেট, প্রস্‌পারো, রোমিও—ইঁহাদের সকলের গভীর হৃদয়াবেগ যে অতুলনীয় কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে প্রমাণ হয় যে শেক্‌শপিয়ার নাটক না লিখিলেও কেবলমাত্র কবি হিসাবেই ইংরাজী সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিতেন।

তাহার পর, জীবন ও দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার যে সমস্ত মূল্যবান মন্তব্য আছে, তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই সুপরিচিত। এগুলি যেন অভিজ্ঞতা-সমুদ্র মন্থন করিয়া আহরণ-করা রত্ন। শেক্‌শপিয়ারের নাটক হইতে উদ্ধৃত অনেক বাক্যাংশই প্রবাদ-বাক্যের মতই লোকের মুখে-মুখে চলা-ফেরা করে। অনেকে হয়তো জানেনই না যে সেগুলি শেক্‌শপিয়ারের রচনা।

ইংরাজী ভাষার সুভাষিত-সংগ্রহে শেক্‌শপিয়ারের অবদান যত বেশী এত আর কাহারও নয়।

এই কয়েকটি মাত্র বিষয়ের আলোচনা হইতেই সাহিত্য-জগতে শেক্‌শপিয়ারের আসন যে কত উচ্চে তাহার কিঞ্চিৎ ধারণা হইবে। সমালোচকবৃন্দ যেন পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া মহাকবির গুণাবলী-নির্ণয়ে প্রশংসার চরম ভাষা ব্যবহার করেন। অপরিমেয় সৃষ্টি-রহস্যের কৌশল যদি কোন মানুষ আয়ত্ত করিয়া থাকেন, তবে সেই মানুষ শেক্‌শপিয়ার। দুর্জ্ঞেয় মানব-হৃদয় তাঁহার নিকট স্ফটিক-স্বচ্ছ; তিনি যেন ভগবানের গুপ্তচর হিসাবে তাঁহার সর্বদর্শিতার অংশভাক্ হইয়াছেন। সৃষ্টি-মন্ত্রের গোপন অক্ষরগুলি যেন সৃষ্টিকর্তা তাঁহার কানে কানে শুনাইয়াছেন। আবার অন্য এক দিক দিয়া এই মূক, বিরাট, অলক্ষিত, অথচ অভ্রান্তরূপে ক্রিয়াশীল প্রকৃতি-দেবীর সঙ্গেও তাঁহার এক নিগূঢ় সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। শেক্‌শপিয়ারের আর্ট বা শিল্পকলা এত নির্ভুল ও সূক্ষ্ম যে ইহা মানুষের কষ্টকৃত রচনা অপেক্ষা প্রকৃতির স্বতঃ-উৎসারিত সৌন্দর্যসৃষ্টির কথাই বেশী মনে পড়াইয়া দেয়। মনে হয় যেন এই বিরাট জড়প্রকৃতির দেহে যে গূঢ় শক্তি অজ্ঞাতসারে কাজ করিয়া ফুল ফোটায়, ফল পাকায়, ঋতুচক্রের আবর্তন নিয়ন্ত্রিত করে, গ্রহনক্ষত্রের নিয়মিত কক্ষ-ভ্রমণের প্রেরণা যোগায়, তাহাই যেন মুহূর্তের আত্মবিস্মৃতিতে মানবের সচেতন বুদ্ধির মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া মহাকবির অনুপম কাব্য-সৃষ্টির হেতু হইয়াছে। শেক্‌শপিয়ার-প্রতিভা নানা দিক দিয়াই লোকোত্তর বা অতিমানবিক।

২

শেক্‌শপিয়ারের পরেই এলিজাবেথীয় যুগের নাটকের অধোগতি আরম্ভ হইল বলা যাইতে পারে। তাঁহার পরবর্তী নাট্যকারেরা যথেষ্ট শক্তির অধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু শেক্‌শপিয়ারের ন্যায় ঐশ্বরিক ক্ষমতা আর কাহারও ছিল না। ক্রমশঃ নাটকের চরিত্রগুলি অস্বাভাবিক এবং নাটকীয় সমস্যাগুলি অবান্তর ও অবাস্তব হইতে আরম্ভ হইল। যে নাটক সর্বসাধারণের প্রিয় ছিল তাহা কেবলমাত্র অভিজাতশ্রেণীর চিত্তবিনোদনের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। এবং এইভাবে জীবনের সহিত চরিত্রের এবং কাব্যের সহিত নাটকের অসামঞ্জস্য বাড়িয়া চলিল। অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের লক্ষণ চারিদিকে প্রকট হইয়া উঠিল।

শেক্‌শপিয়ারের প্রায় সমসাময়িক বা কিছু পরবর্তীদের মধ্যে **বেন জনসন** (Ben Jonson ঃ ১৫৭৩—১৬৩৭) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি অত্যন্ত

স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন—শেক্‌শপিয়ারের পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়া তিনি নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই নূতন পথ নাটকের প্রশস্ত রাজপথ ছিল না। তিনি প্রধানত ব্যঙ্গপ্রধান মনোবৃত্তি লইয়া নাটক-রচনায় ব্রতী হইলেন। কাজেই তাঁহার চরিত্রগুলি অতিরঞ্জিত ও একপেশে হইয়া পড়িল। তিনি মানব-চরিত্রের বিচিত্র জটিলতা পরিহার করিয়া তাহার একটি বৈশিষ্ট্যের উপর অতিরিক্ত জোর দিলেন। ইহার ফলে তাঁহার নর-নারীরা ব্যঙ্গ-চরিত্রে (caricature) পরিণত হইল। মানুষ যদি কেবলমাত্র খেয়াল বা অভিপ্রায়ের বিকাশ হইত, তাহা হইলে মনুষ্য-চরিত্র অতি অস্বাভাবিকরূপে সরল হইয়া পড়িত। পরস্পর-বিরোধী ভাবের সমন্বয় বলিয়াই মানুষ এত দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যপূর্ণ। বেন জনসন এই সত্যকে অস্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার অসাধারণ শক্তি সত্ত্বেও তাঁহার নাটকগুলি উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। 'যার যা খেয়াল' বা 'ভিন্ন লোকের ভিন্ন বাই' (Every Man In His Humour) তাঁহার এই জাতীয় নাটকের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আর একজাতীয় নাটকেও তাঁহার এই ব্যঙ্গপ্রধান মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে —এগুলি লণ্ডন শহরের underworld বা চোর-বদমায়েস-প্রতারকদের আড্ডা ও ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে লিখিত। এই সমস্ত নাটকেও বেন জনসনের বিদ্রূপ-নিপুণতা উৎকট তীব্রতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। নাটকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের স্থান আছে সত্য ; কিন্তু ইহাকেই প্রধান স্থান দিলে নাটক ব্যঙ্গ-কবিতার একটা বিভাগ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ, ব্যঙ্গের সঙ্গে অতিরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ব্যঙ্গের বিষয়ীভূত ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহার দোষত্রুটির উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হয়। কাজেই নাটকের যে প্রধান গুণ—গভীর ও অপক্ষপাত চরিত্রাঙ্কন—এই জাতীয় নাটকে তাহা অপরিহার্যভাবেই বর্জিত হইয়া পড়ে। তথাপি এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বেন জনসনের নাটকীয় প্রতিভার এতটা বিকাশ হইয়াছে যে তিনি আমাদের সবিস্ময় শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

মনে রাখিতে হইবে যে শেক্‌শপিয়ার তাঁহার নাটক রচনায় কোনো বিশেষ নিয়ম কানুন অনুসরণ করিতেন না। নিজের অনুভূতি, অন্তর্দৃষ্টি ও শ্রোতৃবৃন্দের কথা মনে রাখিয়াই তিনি নাটক লিখিতেন। এদিকে বেন জনসন তাঁহার নাটকে প্রাচীনদিগের, বিশেষ করিয়া প্লটাস, টেরেন্সের মত নাট্যকারের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। আরিস্টটলকে অনুসরণ করিয়া লাটিন সাহিত্য-সমালোচক হোরেস বলিয়াছিলেন যে, নাট্যকারদের দেখিতে হইবে যে নাটকের সময়সীমা

যেন একদিনের বেশী না হয়, নাটকের ঘটনাসমূহ যেন একই জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় এবং নাটকের যেন 'একটিমাত্র কাহিনী' থাকে। বেন জনসন তাঁহার নাটকে এই ত্রয়ী ঐক্যের নিয়ম সযত্নে পালন করিয়াছেন। ফলে তাঁহার সৃষ্টি অনেক স্থানে আড়ষ্ট ও অপ্রাকৃত হইয়া গিয়াছে। শেক্‌শপিয়ার তাঁহার শেষ নাটক 'ঝঞ্ঝা' (The Tempest) ছাড়া অন্য কোনো নাটকেই এই ত্রয়ী ঐক্যের নিয়মকে পাত্তা দেন নাই। ফলে তাঁহার নাটক অনেক বেশী জীবন্ত ও সাবলীল হইয়া উঠিয়াছে।

চরিত্রাঙ্কনেও শেক্‌শপিয়ারের সঙ্গে বেন জনসনের একটা গভীর প্রভেদ দেখা যায়। শেক্‌শপিয়ারের কোন কোন নাটকে চোর বদমায়েস ও লম্পটদের জীবনযাত্রা বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু ইহাদের বিরুদ্ধে নাট্যকারের বিন্দুমাত্র উষ্মা বা বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায় না। তিনি তাহাদের জীবনীশক্তির উচ্ছলতা, তাহাদের কৌতুকপ্রিয়তা, জীবনকে নীতিশাসনের বন্ধন হইতে ছাড়াইয়া লইয়া পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করার ব্যাকুলতা 'ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে' নিরীক্ষণ করিয়াছেন—বিশুদ্ধ হাস্যরসের প্রস্রবণে তাহাদের দেহমনের পঙ্কিলতা ধুইয়া দিয়াছেন। এইখানেই শেক্‌শপিয়ারের মহত্ত্ব ও গৌরব—এইখানেই তাঁহার নাটকের সর্বজনীন মানবীয়তা। বেন জনসন কিন্তু সকল প্রকার অন্যায়ের প্রতি খড়্গহস্ত ও ক্ষমাহীন।

বেন জনসনের 'যার যা বাই' (Every Man In His Humour) (১৫৯৮) নাটকে তাঁহার কমেডির নূতন আদর্শ প্রথম উদাহৃত হইয়াছে। এই নাটকে বেন জনসন কয়েকটি উৎকেন্দ্রিক চরিত্রের বিশেষ খেয়াল বা ছিট প্রদর্শন করিয়া হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছেন। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহার কবিপুত্রের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য সর্বদা উদ্বিগ্ন ; এই অশান্তিই তাঁহার মনের বিশেষ খুঁত। কেহ বা স্ত্রীর চরিত্রে সর্বদা সন্দিগ্ধ। একজন শহুরে ও একজন পাড়াগেঁয়ে লোক কেবলই ঠকিতেছে। একজন প্রশাসনিক কর্মচারী কোন কিছুতেই দমে না ও সুরা-পানে অবসন্নচিত্তে সাহস সিঞ্চন করে। সর্বোপরি ক্যাপ্‌টেন বোবাডিল, শেক্‌শপিয়ারের ফলস্টাফের ন্যায় সর্বদা মিছামিছি বড়াই করে ও অবলীলাক্রমে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলে। এই সব চরিত্রের সমাবেশ নানা হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করিয়া কৌতুকরসের প্রস্রবণ বহাইয়াছে। কিন্তু চরিত্রগুলি একটাও রক্তমাংসের সমগ্র মানুষ হয় নাই। সবই এক একটা মূর্তিমান খেয়াল। কাজেই হাস্যরস কোথাও জীবনের গভীরে প্রবিষ্ট হয় নাই। বেন জনসনের একপেশে কমেডির সঙ্গে

শেক্‌শপিয়ারের জীবনরসাশ্রিত কমেডির আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তাঁহার পরবর্তী কমেডি 'বাই খোয়ানো মানুষ' (Every Man Out Of His Humour)-এ ব্যঙ্গ আরও তীব্র ও চরিত্রের খেয়ালসমূহ আরও অবিশ্বাস্য ও অতিরঞ্জিত আকারে অঙ্কিত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার স্বভাবধর্মের বিপরীতভাবে আচরণ করাইয়া পরিস্থিতিকে আরও কৃত্রিম ও ঘোরাল করা হইয়াছে। তাহার পর, এই নাটকটির কাহিনীও জমাট নহে। Humour মধ্যযুগে ডাক্তারি শাস্ত্রে শরীরস্থ রসকে বুঝাইত। বেন জনসন তাঁহার নাটকে এই শব্দটিকে চরিত্রের বিশেষ ঝোঁক বা প্রবণতা অথবা ভারসাম্যের অভাব এই অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

'ভলপোনি' বা 'শিয়ালভায়া' (Volpone or The Fox) (১৬০৫); এপিসিন বা নির্বাক সুন্দরী (Epicoene or The Silent Woman) (১৬০৭) ও জাদুকর (The Alchemist) (১৬১০) বেন জনসনের এই তিনখানি নাটকে তীব্র বিদ্রূপের জ্বালা, রূপকধর্মী চরিত্রাঙ্কন এবং সমগ্র জীবনের পরিবর্তে একক মনোবৃত্তির অতি-প্রাধান্য লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। প্রথম নাটকে অতিরিক্ত অর্থলোভ ও অর্থের আশায় মানুষের হীনতম, জঘন্যতম আচরণ; দ্বিতীয়টিতে ক্ষীণতম শব্দ-অসহিষ্ণু, সমাজ-বিমুখ ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিক খেয়াল ও তৃতীয়টিতে সোনা-তৈয়ারী-শক্তির মিথ্যা আশ্বাসের দ্বারা বহু লোককে প্রবঞ্চনা করা, নাটকের বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই জাতীয় বিষয় সর্বদেশে সর্বকালে ব্যঙ্গ-নাটকের উপাদান যোগাইয়াছে; সুতরাং এদিক দিয়া বেন জনসনের নাটকের কিছু অসাধারণত্ব নাই। বেন জনসনের অসাধারণত্ব তাঁহার মেজাজে, সকল প্রকার মানবিক দুর্বলতার প্রতি অবিমিশ্র ঘৃণায় ও তীব্র জ্বালাময় বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতায়। তিনি যেন মানুষের মধ্যে কিছুই ভাল দেখিতে পান নাই এবং সেইজন্য বেপরোয়া হইয়া, সমস্ত মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া সকল প্রকার অপরাধপ্রবণতার প্রতি চাবুক চালাইয়াছেন; কোন প্রকার দোষের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র করুণা নাই। তাঁহার নাটকে স্নিগ্ধ পরিহাস নাই, সরস আনন্দ-পরিবেশন নাই, আছে দুর্বাসার মত ক্ষমাহীন ক্রোধ ও রুদ্র অভিশাপবর্ষণ। পাঠককে কৌতুকরসে অভিষিক্ত করা অপেক্ষা তাহার মনে জুগুপ্সা সঞ্চার করাই যেন তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহার চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনা-বিন্যাস দুই-এর মধ্যেই মানুষের হেয়তম রূপ প্রকটিত করিবার জন্য ব্যঙ্গাতিরঞ্জনের প্রয়োগ করা হইয়াছে—সময় সময় এই প্রয়োগ স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তাঁহার শক্তির পরিচয়ে আমরা বিস্মিত হই, অথচ তাঁহার শক্তির প্রয়োগে আমরা কৌতুক অনুভব করিতে গিয়া আহত হই।

তাঁহার চরিত্রগুলির নামকরণেই তাঁহার রূপকধর্মী উদ্দেশ্য সুপ্রকট ; তিনি তাহাদিগের প্রত্যেককেই একটিমাত্র সর্বগ্রাসী প্রবণতার দ্বারা চিহ্নিত ও পরিচিত করিয়াছেন। Volpone (শৃগাল), Voltore (গৃধিনী), Corbaccio (ভূষণ্ডীকাক), Mosca (মক্ষিকা), Morose (গোমড়ামুখো), Subtle (অতি-চতুর), Sir Epicure Mammon (ভোগবিলাসী), Tribulation Wholesome (ভণ্ড বৈরাগী ধর্মযাজক) প্রভৃতি নামই তাহাদের চরিত্রের বিজ্ঞাপন। তাঁহার নাটকের উৎকর্ষ অনস্বীকার্য ; কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে শেক্‌শপিয়ারের কমেডির উদার সার্বভৌমতা ও মানবপ্রীতির সহিত এই সঙ্কীর্ণ-উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত, সদা-উদ্যতদণ্ড, তীব্র অবজ্ঞার দ্রাবকরসে জ্বালাময়, জীবনের দুষ্টক্ষতান্বেষী নাটকের ব্যবধান দুস্তর।

৩
কমেডি

এবারে এলিজাবেথীয় যুগের কয়েকটি বিখ্যাত নাটকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ কমেডি বা শুভান্ত নাটকের নিদর্শন ও ভাবপ্রেরণা লক্ষিতব্য। 'পূবাই-হো' (Eastward Ho) (১৬০৫), মার্স্টন (John Marston), চ্যাপমান (George Chapman) ও জনসনের (Jonson) যৌথ রচনা। ইহাতে লণ্ডনের ব্যবসায়ী সমাজের এক বস্তুরসপূর্ণ ও কৌতুকপ্রদ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ব্যবসায়ী-কন্যা অভিজাত বংশে বিবাহের ইচ্ছা পোষণ করে, কিন্তু তাহার অর্থলোভী স্বামী তাহাকে প্রতারণা করিয়া দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করে। শেষ পর্যন্ত উন্নাসিকা স্বর্ণকার-নন্দিনী তাহার পিতা ও কনিষ্ঠা ভগিনীর মনোরঞ্জন করিয়া অভাবমুক্ত হয়। এই নাটকে ব্যবসায়ী-মহলের জীবন-যাত্রা ও শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নীতিহীনতা ও স্ফূর্তিপ্রিয়তা কৌতুকমিশ্রিত সহানুভূতির সহিত চিত্রিত হইয়াছে।

ডেকার (Thomas Dekker ঃ ১৫৭০-১৬৪১) লণ্ডনের সাধারণ লোকের, বিশেষ করিয়া নিম্নশ্রেণীর, চিত্র সরস কবিত্ব ও রোমান্টিক ভাব-কল্পনার সহিত আঁকিয়াছেন। তাঁহার 'মুচির ছুটি' (The Shoemaker's Holiday) (১৫৯৯) সরল, অনাবিল আনন্দের সূর্যকিরণে অভিস্নাত। ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ সকলেই একই স্ফূর্তির প্রবাহে ভাসমান। নাটকের মধ্যে কোন গভীর চরিত্র-বিশ্লেষণ নাই, কিন্তু সমস্ত চরিত্রই খোসমেজাজী ও জীবনরসোচ্ছল। নাটকের নায়ক সাইমন আয়ার

তো এলিজাবেথীয় নাটকের এক অনবদ্য সৃষ্টি। ফলস্টাফের রসোচ্ছলতার সহিত নির্দোষ কৌতুকপ্রিয়তা এবং সস্নেহ আশ্রিতবাৎসল্য আয়ারকে এক অনন্য চরিত্রে পরিণত করিয়াছে।

"ভ্রষ্টা সতী' (The Honest Whore) (১৬০৪) ডেকারের একখানি পারিবারিক নাটক। বেলাফ্রন্ট নামে একজন চরিত্রহীন নারী তাহার প্রথম প্রণয়ীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নিষ্পাপ সংসারযাত্রায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহার পিতা ছদ্মবেশে গৃহভৃত্যরূপে তাহার সংশোধিত চরিত্রের খবরদারী ও তাহাকে প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতেছে। শেষ পর্যন্ত তাহার কন্যা যখন প্রলোভন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তখন পিতা তাহাকে আবার নিজ স্নেহক্রোড়ে আশ্রয় দিয়াছে। এখানে পিতার চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিপরীতমুখী আকর্ষণ-বর্ণনা উচ্চাঙ্গের নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দেয়।

বোমণ্ট ও ফ্লেচারের (Francis Beaumont : ১৫৮৫—১৬১৬; John Fletcher : ১৫৭৯—১৬২৫) যুগ্ম রচনা 'জ্বলন্ত নোড়ার যোদ্ধা' (The Knight of the Burning Pestle) (১৬০৭) লণ্ডনের দোকানদার-শ্রেণীভুক্ত দর্শকের মনে মধ্যযুগীয় ক্ষাত্র আদর্শ কিরূপ হাস্যকর বিকৃতি ও অতিরঞ্জনের সহিত প্রতিভাত হইতে পারিত তাহার কৌতুককর ব্যঙ্গচিত্র। মুদি ও তাহার স্ত্রী নাটক দেখিতে দেখিতে যে সব মন্তব্য করিয়াছে ও ব্যবসায়ী-শ্রেণীর রোমান্টিক ভাবলোকে উন্নয়নের যে তাগিদ দিয়াছে তাহা সেই যুগের রোমান্স ও বাস্তবতার মধ্যে সমন্বয়ে অসমর্থ, দিশাহারা সাধারণ মানুষের এক কৌতুকাবহ প্রতিচ্ছবি। ফিলাস্টার (Philaster)—শেক্‌শপিয়ার-প্রভাবিত ট্রাজেডি ও কমেডির মিশ্রণ। নায়ক চরিত্রে শেক্‌শপিরীয় নায়কের ছায়াপাত ঘটিয়াছে; ছদ্মবেশধারিণী ইউফ্রেসিয়া শেক্‌শপিয়ারের ভায়লার কথা স্মরণ করায়। শেক্‌শপিয়ারের বহু নাটকের একাধিক দৃশ্যের সারনির্যাস লইয়া নাটকের দৃশ্যগুলি রচিত। কিন্তু শেক্‌শপিয়ারের কাব্য-পুষ্পগুলি সংগ্রহ করিতে গিয়া নাট্যকারদ্বয় উহাদিগকে অনেকাংশে জীবনরসবিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। উহাদের মূল জীবনে নয়, নাট্যকারদের কল্পনায়। এই সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর, কিন্তু বাস্তব-অবলম্বনহীন। ফিলাস্টারকে প্রথম ট্রাজি-কমেডি বলা হইয়া থাকে। ইহাতে ট্রাজেডির ভয়াবহতা ও কমেডির সৌকুমার্যের সমন্বয় ঘটিয়াছে।

৪

ট্রাজেডি

টমাস হেউড (Thomas Heywood : ১৫৭৫—১৬৫০)-এর 'করুণাহতা' (A Woman Killed with Kindness) (১৬০৩) অবিশ্বাসিনী পত্নীর প্রতি আচরণে দুর্লভ ক্ষমাশীলতা ও শুধুমাত্র নৈতিক শাসনের ছবি। সমস্ত নাটকটি উন্নত ভাবাদর্শ ও মর্মস্পর্শী বিষাদের ছায়াতে সম্পৃক্ত। যে কল্পিত অপরাধের জন্য ওথেলো তাহার স্ত্রী ডেস্‌ডেমোনাকে হত্যা করে সেই অপরাধের চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়াও প্রবঞ্চিত স্বামী এ ক্ষেত্রে তাহার স্ত্রীর সাহচর্য মাত্র ত্যাগ করে। ক্রোধ নহে, বিষাদমিশ্রিত করুণাই স্বামীর প্রেরণা। শেষ মুহূর্তের অন্তিম চুম্বনের সহিত সে তাহার স্ত্রীকে যে ক্ষমা প্রদর্শন করে তাহা সেই নির্মম প্রতিশোধস্পৃহার যুগে এক অসাধারণ ব্যতিক্রম। স্ত্রীর অনুশোচনা-জাত মৃত্যুও সে-যুগের ট্রাজেডির পক্ষে এক অবিশ্বাস্য পরিণতি।

বেন জনসন, শেক্‌শপিয়ারের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকটির জনপ্রিয়তা দেখিয়া রোম-ইতিহাস হইতে বিষয়বস্তু অবলম্বনে সিজেনাস (Sejanus) (১৬০৩) ও ক্যাটিলিন (Catilin) (১৬১১) নামে দুইখানি নাটক রচনা করেন। শেক্‌শপিয়ারের রোমীয় নাটকে ইতিহাস-জ্ঞানের অভাব ও নানা তথ্যগত ভুল আছে—বেন জনসনের মত বিদগ্ধ পণ্ডিতের নিকট ইহা নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল, এবং তিনি এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য খাঁটি রোম-ইতিহাস হইতে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নাটকে সন্নিবিষ্ট করেন। শেক্‌শপিয়ারের রোম লণ্ডনেরই প্রতিচ্ছবি, রোমের জনসাধারণও ইংরাজ জনতার ন্যায় হুজুগপ্রিয়, নির্বোধ, দ্রুত মত-পরিবর্তনে অভ্যস্ত ও আকস্মিক উত্তেজনার হঠকারিত্বে প্রণোদিত। মোট কথা, শেক্‌শপিয়ার প্রধানত নির্ভরশীল ছিলেন তাঁহার ইতিহাস-জ্ঞানের যাথার্থ্যের উপর নহে, তাঁহার সর্বকালীন মানব-চরিত্রে অন্তর্দৃষ্টি ও নাট্যরস-স্ফুরণে অসাধারণ দক্ষতার উপর। সীজার ও ব্রুটাসের ন্যায় মহামানব সাময়িক ও জাতীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে অবিনশ্বর সর্বজনীন মানবতার রাজ্যে বিচরণশীল। সুতরাং শেক্‌শপিয়ার প্রত্নতত্ত্ববিশারদ না হইয়াও নৈসর্গিক নাট্যপ্রতিভার অন্তর্দৃষ্টির বলে তাঁহার চরিত্র-সমূহকে জীবন্ত ও নাটককে রহস্যময় মানব-জীবনের যথার্থ প্রতিকৃতি করিয়া তুলিয়াছেন। জনসন ঐতিহাসিক দলিল-পত্র ঘাটিয়া তথ্যগত সত্য উদ্ধার করিয়াছেন বটে, কিন্তু গভীরতর জীবনসত্য তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমানী মনের নিকট ধরা দেয় নাই।

জনসন সম্রাট টাইবেরিয়াসের চরিত্রে কুটিলতা, বলিষ্ঠতার অভাব ও অবিশ্বস্ততার সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন—তাহার প্রিয় সেনাপতি যখন তাহার ঈর্ষাভাজন হইয়াছে তখনই সে তাহাকে জনতার ক্রোধের নিকট বলি দিতে ইতস্ততঃ করে নাই। সিজেনাসের পতনের কারণ তাহার দেব-শক্তিতে অবিশ্বাস। তাহার আস্থা একমাত্র ভাগ্যলক্ষ্মীর উপর। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী যখনই তাহার উপর বিরূপ হইলেন, তখনই সে তাহার প্রতিমাকে বেদী হইতে দূরে নিক্ষেপ করিল। ট্রাজেডির নায়কে যেমন কোন গুণের আধিক্যই তাহার পতনের হেতু হয়, সিজেনাসের চরিত্রে সেইরূপ গুণাতিরেকের কোন চিহ্ন নাই। কাজেই সে ব্রুটাসের মত আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না। বেন জনসনের নাটকের চরিত্রে কোন অন্তর্দ্বন্দ্বও দেখা যায় না, অন্যায়ের পরে কেহ অনুশোচনা-পীড়িত হয় না। তাঁহার চরিত্র-কল্পনা ও মনস্তত্ত্বজ্ঞান অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের—ভাল ও মন্দ এই স্থূল শ্রেণীবিভাগই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র-ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি দেশের রীতি-নীতি, আচার-আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন, কিন্তু চরিত্রসৃষ্টির দিকে তাদৃশ মনোযোগ দেন নাই অথবা মনোযোগ দিয়াও তেমন সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। মনস্তত্ত্ববিষয়ে ও নাট্যরসস্ফুরণে বেন জনসন কতকটা উদাসীনই ছিলেন বলা যায়।

'ক্যাটিলিন'-এ ইতিহাসের আরও অন্ধ অনুসরণ দেখা যায়। কোন ঐতিহাসিক চরিত্রের অস্পষ্টতাকেই নাট্যকার তাঁহার কল্পনা-সাহায্যে আলোকিত করেন নাই। ইতিহাসের অসম্পূর্ণতা নাটকেও সমান অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। এমন কি সিসেরোর মত জগৎ-বিখ্যাত বাগ্মীও নাটকে সজীব হইয়া ওঠেন নাই, তাঁহার বক্তৃতা হুবহু ভাষান্তরিত হইয়াছে ; যে ব্যক্তিসত্তা তাঁহার বক্তৃতা ও আচরণের উৎস, তাহা অপরিচয়ের আঁধারেই আবৃত রহিয়া গিয়াছে। ক্যাটিলিনের সহিত তাহার প্রণয়িনীর সম্বন্ধ অনিশ্চয়তায় ঘেরা। তাহার ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে অতি তুচ্ছ সূত্র অবলম্বনে। যেমন কমেডি-তে তেমনি ট্রাজেডি-তে তীব্র ব্যঙ্গই জনসনের মুখ্য প্রেরণা। তিনি যে পৃথিবীর পাপরাশি ব্যঙ্গশরে বিদ্ধ করিতে ও কোপানলে দগ্ধ করিতেই বিধি-নিয়োজিত অস্ত্র—এই ধারণা তিনি কোন অবস্থাতেই ভুলিতে পারেন নাই।

ইয়র্কশায়ার ট্রাজেডি (The Yorkshire Tragedy) (১৬০৮) একদা শেক্‌সপিয়ারের রচনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ইহা আকারে ক্ষুদ্র। একজন উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি জুয়াখেলায় সর্বস্ব হারাইয়া উন্মাদ-প্রায় হইয়া যায়। এই উন্মত্ত

অবস্থায় সে স্ত্রীকে অকথ্য অপমান করে, স্ত্রীও সন্তানদিগের গলা টিপিয়া হত্যা করিতে যায়। এই পিশাচবৎ আচরণের পিছনে কিন্তু আছে পরিবারের প্রতি এক প্রকার বিকৃত মমত্ববোধ ও অনুতাপের অসহনীয় জ্বালা। নাটকটির ঘটনাস্রোত তীব্রবেগে অগ্রসর হয়। ইহার সংলাপ রুদ্ধশ্বাস ব্যক্তির হাঁপাইয়া কথা বলার ন্যায়, সময়ে সময়ে আবেগের আতিশয্যে কম্পিত ও অসংলগ্ন। সবশেষে নায়ককে বন্দী করিয়া যখন তাহার আহত স্ত্রীর নিকট আনা হইল, তখন যেন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল ও তাহার ঘাড়ে যে ভূত চাপিয়াছিল তাহা নামিয়া গেল। সে অনুতাপগ্রস্ত হইয়া সব দোষ স্বীকার করিল ও শাস্তিগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইল। এই পারিবারিক ট্রাজেডিতে কোন জটিলতা নাই, কোন অতিপ্রাকৃতের প্রভাব বা কাব্যানুরঞ্জন নাই। ইহার গতি ও পরিণতি যথাসম্ভব সরল ও দ্রুতসঞ্চারী। কিন্তু কে যে ইহার রচয়িতা তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। ইহা একখানি চমৎকার এলিজাবেথীয় ট্রাজেডি। ইহার রস কতকাংশে 'আর্ডেন অব ফীভারশাম'-এর মত।

টমাস মিডলটন (Thomas Middleton : ১৫৭০—১৬২৭)-এর 'নারীর শত্রু নারী' বা Women Beware Women (১৬১২) এক আনন্দময় বিবাহের বেদনাময় পরিণতির কাহিনী। এক ছোটখাট কুঠিয়াল, লিওনসিও (Leontio), বিয়ানকা (Bianca) নামে এক রূপবতী, সম্ভ্রান্তবংশজাত যুবতীকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে বিদেশে যাত্রা করিতে হইল। ইতিমধ্যে ফ্লোরেন্সের ডিউক শোভাযাত্রা করিয়া রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে বারান্দায় বিয়ানকাকে দেখিল ও লিভিয়া নামে একজন দুশ্চরিত্রা দূতীকে তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য পাঠাইল। বিয়ানকা কতকটা অনুনয়, কতকটা বল-প্রয়োগে ডিউকের অঙ্কশায়িনী হইতে বাধ্য হইল এবং শেষ পর্যন্ত হতাশ হইয়া তাহার অবৈধ প্রেম সম্বন্ধে বেপরোয়া হইয়া উঠিল। স্বামী ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীর আচরণে পরিবর্তন দেখিয়া ও তাহার ব্যভিচারের কথা জানিয়া একেবারে মুষড়িয়া পড়িল। প্রারম্ভের আনন্দ উপসংহারে বিষাদছায়াচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। বিয়ানকা ও ডিউক নানা হত্যাকাণ্ডের ভিতর দিয়া নিজেদের বিবাহের পথ পরিষ্কার করিল, কিন্তু বিজয়ক্ষণে তাহারাও মৃত্যু-কবলিত হইল। লিভিয়ায় অস্বাভাবিক ও নারী-জাতি-বিরুদ্ধ আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ট্রাজেডির নামকরণ হইয়াছে। এই নাটকে হত্যা ও ভয়াবহ সংঘটনের প্রাচুর্য থাকিলেও ইহা মোটের উপর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া লেখা।

মিডলটন ও রাওলে (Thomas Middleton & William Rowley)-র

যৌথভাবে রচিত নাটক The Changeling (১৬১৩) একটা অস্পষ্ট ও স্থূল গৌণ কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত না হইলে, শেক্‌শপিয়ারের ট্রাজেডির প্রায় সমতুল্য হইতে পারিত। বিয়াত্রিস (Beatrice), আলনসো (Alonso)-র নিকট বাগ্‌দত্তা, কিন্তু অন্য এক তরুণ আলসেমিরো (Alsemero) তাহার হৃদয় জয় করিল। নাটকের শয়তান-জাতীয় চরিত্র হইল বিয়াত্রিসের পিতার একজন নিম্নপদস্থ অনুচর, ডি ফ্লোরেস। সে বিয়াত্রিসকে পাইবার আশায়, কখনও স্পর্ধিতভাবে, কখনও বা বিনীতভাবে আনুগত্যের সহিত তাহার প্রতি প্রেম নিবেদন করে। বিয়াত্রিস কিন্তু তাহাকে সর্পের মত ভয় ও ঘৃণা করে। আলসেমিরো ও বিয়াত্রিস আলনসোকে তাহাদের পথ হইতে সরাইবার উপায় খোঁজে। এবং শেষ পর্যন্ত আলসেমিরো আলনসোর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তাব করে। কিন্তু বিয়াত্রিস অশুভক্ষণে ডি ফ্লোরেসকে তাহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করে। তাহার আশা ছিল যে, ডি ফ্লোরেসকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া হত্যাকার্যে নিয়োজিত করিবে। ডি ফ্লোরেস কার্য উদ্ধার করিয়া দিল বটে কিন্তু ইহার পুরস্কার-রূপে বিয়াত্রিসকেই দাবী করিয়া বসিল। যে পাপের বন্ধন তাহাদিগকে এক করিয়াছে তাহা ছাড়ান গেল না, ও বিয়াত্রিসকে ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডি ফ্লোরেসের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইল। বিবাহের পরেও এ পাপের চিহ্ন বিয়াত্রিসকে চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিল। তাহার স্বামী তাহার পাপের কথা জানিয়া ঘৃণাভরে তাহাকে ত্যাগ করিল ও বিচারালয়ে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিল। ডি ফ্লোরেস প্রথমে বিয়াত্রিসকে হত্যা করিয়া শেষে নিজেও আত্মঘাতী হইল। এই ভয়াবহ সংঘটনসমূহ ও কলঙ্কলাঞ্ছিত প্রেমের কাহিনী আশ্চর্য সংযম ও নাটকীয় শক্তির সহিত রূপায়িত হইয়াছে। ইহাতে কোন বাগ্‌বিতণ্ডা বা আলঙ্কারিক উচ্ছ্বাস নাই। হীন ঘটনা ও অপরাধপ্রবণ, নীচজাতীয় চরিত্র লইয়াও যে উচ্চাঙ্গের নাটক রচনা করা যায়, এইটি তাহারই নিদর্শন।

জন ওয়েবস্টার (John Webster : ১৫৭৫—১৬২৪)-এর দুইখানি ট্রাজেডি 'শুভ্র শয়তান' বা The White Devil (১৬.১) ও 'মালফির ডাচেস' বা The Duchess of Malfi (১৬১৪) শেক্‌শপিয়ারের পরেই এ যুগের দুইখানি সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। প্রথম নাটকটির বিষয়বস্তু সমকালীন দৃষ্টিকোণ হইতে মামুলী বলা যাইতে পারে। দরিদ্রগৃহিণী ভিট্টোরিয়ার প্রতি পাডুয়ার ডিউক আসক্ত হইলে ভিট্টোরিয়া দাবী করে যে ডিউককে তাহার স্বামী ও ডিউকের স্ত্রী উভয়কেই হত্যা করিয়া তাহাদের বিবাহের পথ পরিষ্কার করিতে হইবে। এই যুগ্ম হত্যা নির্বিঘ্নে

সম্পন্ন হইল, কিন্তু অপরাধীযুগল ধরা পড়িয়া বিচারালয়ের সম্মুখে নীত হইল। এই বিচারালয়েই ভিট্টোরিয়া-চরিত্রের অনন্যতা বিস্ময়কররূপে অভিব্যক্ত হয়। তাহার অনুপম সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি ও বেপরোয়া মনোবল তাহার বিপদ ও আসন্ন মৃত্যু-ভয়ের মধ্যেও তিলমাত্র ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। সে অভিযোগকারী ও বিচারকদের নাস্তানাবুদ করে। তীক্ষ্ণ যুক্তি ও পালটা অভিযোগের দ্বারা তার বিরুদ্ধে যাবতীয় প্রমাণকে নস্যাৎ করিয়া সে মানববুদ্ধির সমস্ত চতুরতা, উদ্ভাবনী-শক্তি ও নির্ভীকতার চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। এই রহস্যময়ী নারীর পাপ-প্রবণতাও যেমন সুস্পষ্ট, তাহার আকর্ষণী-শক্তিও তেমনি অপ্রতিরোধ্য। পাঠক তাহার প্রতি যুগপৎ ঘৃণা ও সম্ভ্রমবোধ অনুভব করে। মরণ-মুহূর্তে নির্মম নিয়তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া এ রমণী নূতন দেশ আবিষ্কারের উদগ্র উল্লাসে মুখর হইয়া ওঠে। ভিট্টোরিয়া যেন এলিজাবেথীয় যুগের অদম্য প্রাণশক্তি ও নীতিহীন, দুঃসাহসিক জীবনাদর্শের প্রতীক।

এই নাটকে অন্তরের বিশুদ্ধ বিষাদ-রস ও বাহিরের বিভীষিকাময় উপকরণ এক অদ্ভুত সমন্বয়ে মিশিয়াছে। একদিকে হত্যার নানা উদ্ভট উপায়—ছবিতে ও শিরস্ত্রাণে বিষ মাখানো—এবং হত ব্যক্তির প্রেতের প্রশান্ত আবির্ভাব পাঠককে হত-চকিত ও সংশয়-বিমূঢ় করে; অপর দিকে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে মানবাত্মার সংগ্রাম তাহাকে জীবনের মহিমা ও বিষাদময় পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন করে। প্রকৃত ট্রাজেডি ও অতিনাটকীয় কৃত্রিমতা, সূক্ষ্ম ও স্থূল এই দুইয়ের সংমিশ্রণে ও ওয়েবস্টারের নাটক এলিজাবেথীয় যুগের জীবনবোধের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে—যদিও তাঁহার নাটক এলিজাবেথের রাজত্বকালে রচিত হয় নাই, রচিত হইয়াছিল রাজা জেমসের সময়ে।

'মালফির ডাচেস'-এ ডাচেস ধর্ম, সহিষ্ণুতা ও ভাবমহিমার মূর্ত প্রতীক। সে তাহার প্রধান কর্মচারী আনটনিওকে গোপনে বিবাহ করে। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহার ভ্রাতারা তাহার উপর এক ক্ষমাহীন অত্যাচারের পালা চালায় এবং নানা হৃৎকম্পকারী উপায়ের সাহায্যে তাহার মনোবল ক্ষুণ্ণ করিতে চাহে। তাহার হস্তমর্দন করিবার অছিলায় অন্ধকারে তাহার হাতে তাহার স্বামীর কৃত্রিম ছিন্নমূল বাহু পাঠায়, মোমের পুতুলবাজীর সাহায্যে তাহাকে স্বামী ও সন্তানের হত্যার কাল্পনিক চিত্র দেখান হয়; এমন কি তাহাকে উন্মাদ করিবার জন্য তাহার সান্নিধ্যে উন্মাদ-শালার অধিবাসীদের পর্যন্ত ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এ সমস্ত অবশ্য ভীতি-প্রদর্শনের নিম্নতর স্তরের কলা-বিরোধী অপকৌশল। কিন্তু ইহারই সঙ্গে ওয়েবস্টার এরূপ

কবিত্বপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর মরণ-অনুভূতি সংযোজনা করিয়াছেন, সমাধি-মন্দিরের হিমশীতল স্পর্শ ও মৃত্তিকাময় গন্ধ, মৃত্যুর করুণ ও মহিমময় ব্যঞ্জনা অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন যে নাটকখানি দ্বারা আমরা গভীরভাবে প্রভাবিত না হইয়া পারি না। ডাচেসের চরিত্র, সেই মৃত্যু-চিন্তার অবিরত সাহচর্য ও অন্যান্য সর্বপ্রকার উৎপীড়নকে উপেক্ষা করিয়া অন্তরের দৃঢ়তা ও সৌকুমার্য না হারাইয়া দাঁড়ানোর গৌরব-দৃপ্ত ভঙ্গীতে এতই মহনীয় হইয়াছে যে তাহার হত্যাকারীরাও তাহার এই দিব্য দ্যুতির নিকট মাথা নোয়াইয়াতে বাধ্য হয়। তাহার মৃত্যুর পর হত্যাকারী ভ্রাতার মুখ দিয়া এই স্তম্ভিত ভাবমুগ্ধতার বাণী নিঃসৃত হইয়াছে :—

Cover her face : mine eyes dazzle : she died young. (অর্থাৎ ঢেকে দাও ওর মুখ : চোখ আমার ঝলসে যাচ্ছে : আহা, এ যে তারুণ্যের মৃত্যু!)

শেক্‌শপিয়ার ব্যতীত আর কোন নাট্যকারে এমন গভীরার্থদ্যোতক মর্মবিদারী কথা শোনা যায় না।

বোমণ্ট ও ফ্লেচার (Beaumont and Fletcher) : ইহারা যে শুধু ট্রাজি-কমেডি লিখিয়াছিলেন তাহা নহে, বেশ কয়েকখানি ট্রাজেডিও রচনা করেন। এই নাটকগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত The Maid's Tragedy বা 'কুমারীর ট্রাজেডি' (১৬১১) এলিজাবেথীয় নাটকের পরিপূর্ণ অঙ্গ-সৌষ্ঠবের সহিত অন্তরের সদ্য-আরব্ধ জীর্ণতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এলিজাবেথ-যুগ তখন শেষ হইয়া প্রথম জেম্‌সের রাজ্যসভার কৃত্রিম ভাববিলাস ও আত্মমর্যাদাহীন, নির্বিচার রাজানুগত্যের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। সমকালীন নাটকে, বিশেষতঃ বোমণ্ট ও ফ্লেচারের নাটকে, এই সুর-পরিবর্তন, ভাবের কৃত্রিমতার সঙ্গে নাট্যকলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সংযোগ দৃষ্ট হয়। 'কুমারীর ট্রাজেডি' নাটকে রাজা ইভাডনকে প্রণয়ীরূপে লাভ করিয়াছে, কিন্তু উহাদের অবৈধ সম্পর্ক গোপন করিয়া রাখার জন্য আমিনটর নামে এক রাজপুরুষকে নিজ বাগদত্তা আসপাসিয়াকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ইভাডনকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইতে হয়। বিবাহ-রাত্রে ইভাডন তাহার স্বামীকে জানায় যে সে রাজার প্রণয়িনী ও তাহার সহিত তাহার সম্পর্ক হইবে নামমাত্র। ইতিমধ্যে তাহার ভ্রাতা, সেনাপতি মিলানসিয়াস আসিয়া নাটকের ঘটনাধারাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়াছে। তাহার প্রখর ব্যক্তিত্ব ও ভীতি-প্রদর্শনের দ্বারা সে তাহার ভগ্নীকে অভিভূত ও তাহার প্রণয়ী রাজাকে হত্যা করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। ইভাডন রাজার প্রতি গভীর ঘৃণা দেখাইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে ও রক্তাক্ত ছুরিকা হস্তে তাহার উপেক্ষিত স্বামীর সহিত

মিলনাকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছে। এর পর স্বামী তাহাকে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করায় সে আত্মহত্যা করিয়াছে। এদিকে আসপাসিয়া পুরুষের ছদ্মবেশে আমিনটরের তরবারি-তলে প্রাণ দিয়াছে।

নাটকটির গঠন এত চমৎকার ও নাট্যকলা আবেগের তীব্রতা ও প্রকাশের ওজস্বিতার দিক দিয়া এত অনবদ্য যে ইহার চরিত্রপরিকল্পনার অসম্ভাব্যতা সহজে আমাদের চোখে পড়ে না। আমিনটর ও ইভাডন উভয়ের চরিত্রই অস্বাভাবিক ও আসপাসিয়ার চরিত্র একেবারে গতানুগতিক। আমিনটরের রাজভক্তির আতিশয্যের জন্য সে রাজার গায়ে হাত দিতে ইতস্ততঃ করিতে পারে, কিন্তু অবিশ্বাসিনী পত্নীর প্রতি তাহার মনোভাবের অস্পষ্টতার কোন সঙ্গত কারণ নাই। ইভাডনের চরিত্র আরও অবিশ্বাস্য ও মূলসূত্রহীন। তাহার আচরণের প্রেরণা দুর্বোধ্য। উচ্চাভিলাষ বা প্রণয়াবেগ কোন্‌টি তাহার মুখ্য আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত তাহা অনির্ণীতই থাকিয়া যায়। রাজার সম্বন্ধে তাহার আকস্মিক ঘৃণার উদ্রেক অকারণ মনে হয়; আবার আমিনটরের প্রেম-যাচ্ঞা আরও খামখেয়ালী ঠেকে। একমাত্র মিলানসাসের চরিত্রই সরল ও সঙ্গতিপূর্ণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় এ যুগে নাটকের কাঠামো যতই শক্ত হইয়াছে, উহার অন্তর্নিহিত ভাবপ্রেরণা ততই শিথিল ও অবাস্তব হইয়া উঠিয়াছে।

৫

১৬২৫—১৬৪২

বোমণ্ট ও ফ্লেচারের পর এলিজাবেথীয় নাটক এলিজাবেথ ও প্রথম জেমসের কাল উত্তীর্ণ হইয়া এক নূতন যুগে প্রবিষ্ট হইল। এই যুগে নাটকের নৈতিক অধোগতি ও রুচির স্থূলতা আরও প্রকট হইল, অথচ আঙ্গিকের দিক দিয়া প্রাচীন নৈপুণ্য তখনও অনেকটা অক্ষুণ্ণ ছিল। মাসিঞ্জার (Massinger), ফোর্ড (Ford) ও শার্লি (Shirley) এই অস্তগামী নাট্যসূর্যের শেষ উজ্জ্বল রশ্মিরেখা। তাহার পরই পিউরিটান নীতিবায়ুর প্রাধান্য রঙ্গালয়ের দীপকে নির্বাপিত করিয়া দিয়া জাতীয় সাহিত্যের এক কীর্তিভাস্বর অধ্যায়ের উপর সমাপ্তি-যবনিকা নিক্ষেপ করিল।

মাসিঞ্জারের (Philip Massinger : ১৫৮৪—১৬৩৯) কমেডি ও ট্রাজেডি উভয়ত্রই এই নূতনত্বের চিহ্ন লক্ষণীয়। তিনি নাটকে নূতন ভাবনাকে রূপ দিতে চাহিয়াছেন। সাধারণ দর্শকের সহিত তাঁহার যোগসূত্র ও সহানুভূতি নিতান্ত

ক্ষীণ ; তাহাদের স্থূল রুচির নিকট তিনি আত্মসমর্পণে নারাজ। দর্শকবৃন্দের দেশ-প্রেম, রাজ-ভক্তি ও রাজসভার কৃত্রিম আবহাওয়ার প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না। সাধারণ জনপ্রিয় মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেও মাসিঞ্জার ইতস্ততঃ করেন নাই। এক কথায়, নাট্যকার ও রঙ্গালয়গামী নাগরিকের মধ্যে যে একটি ভাবগত একাত্মতা এলিজাবেথীয় নাটকের প্রাণস্বরূপ ছিল, তাহা জনসন, মিডলটন, ওয়েবস্টার, বোমণ্ট ও ফ্লেচার প্রভৃতি নাট্যকারদের রচনার মধ্যে ক্রমশ শিথিল ও ভিন্নপথচারী হইতে হইতে মাসিঞ্জারে পৌছিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন মোড়ই ঘুরিল। জাতীয় মানসপ্রবণতা ও প্রাণস্পন্দনের রাজপথ ছাড়িয়া নাট্যকার ধীরে ধীরে নিজস্ব মতবাদ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনার শাখাপথ অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

মাসিঞ্জারের শ্রেষ্ঠ কমেডি—A New Way to Pay Old Debts 'দেনাশোধের নয়া রাস্তা' (১৬১৫)। এই নাটকের চরিত্রপরিকল্পনায় ও নামকরণে জনসনের প্রভাব সুস্পষ্ট। সার জাইলস্ ওভাররীচ, সার এপিকিওর ম্যামনের মাসতুতো ভাই। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপ্রবণতা, মানুষের হেয় প্রবৃত্তির উদ্‌ঘাটন-প্রয়াসও জনসন ও মাসিঞ্জারের নাটকের সাধারণ লক্ষণ। মাসিঞ্জার মোটামুটি জনসনের ব্যঙ্গাত্মক ধারারই অনুসরণ করিয়াছেন।

তাঁহার The Roman Actor বা 'রোমের নট' (১৬২৬) সিজেনাসের স্মৃতি-প্রভাবিত রোমীয় সাম্রাজ্যের ষড়যন্ত্র—হত্যা-প্রণয়লীলার নাট্য-কাহিনী। রোমসম্রাট ডোমিসিয়ান ও একজন সেনেট-সদস্যের গর্বিত ও যৌনলালসামত্ত স্ত্রী, ডোমিসিয়ার মধ্যে আসক্তি ঘটিয়াছে। ডোমিসিয়া কিন্তু একজন অভিনেতা, প্যারিসের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী। ডোমিসিয়ান প্যারিসকে হত্যা করে, কিন্তু ডোমিসিয়ার মন পায় না। ডোমিসিয়াকে শাস্তি দিবার পূর্বেই ডোমিসিয়া রাজপ্রাসাদের নারী-সমূহের সহযোগিতায় ডোমিসিয়ানের প্রাণ লইয়াছে। নাটকটির মৌলিক অংশ হইল প্যারিসকে কেন্দ্র করিয়া রোমের রঙ্গালয়-জগতের চিত্রাঙ্কন। প্যারিস অভিনয় ও নাট্যকৃতি সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব ও সমস্যার আলোচনা করিয়াছে—এইগুলি অতীত যুগের ছদ্মবেশে সমসাময়িক কালেরই ব্যাপার। আত্মপক্ষ-সমর্থনে প্যারিস যে আইন-সম্পর্কিত ব্যাপারে উন্নত স্তরের বাগ্মিতার পরিচয় দিয়েছে তাহা মাসিঞ্জারের প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। প্যারিসের চরিত্রাঙ্কনেও নাট্যকার অভিনেতৃ-জীবনের মর্মকথাটি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। ডোমিসিয়া যখন তাহার প্রণয়ের উপযাচিকা হইয়াছে, তখন প্যারিস সর্বপ্রথম আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতার নীতি অবলম্বন

করিয়াছে; কিন্তু অতিশীঘ্রই তাহার অভিনেতৃসুলভ মনোভাব, আপনাকে মৃত্যুবরণকারী বীর নায়ক রূপে প্রতিষ্ঠিত করার অভ্যস্ত সংস্কার তাহার মানবিক আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তিকে অভিভূত করিয়াছে। সে ডোমিসিয়ার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া অভিনেতার একান্ত কাম্য বীরোচিত মৃত্যুকেই বাছিয়া লইয়াছে।

The Maid of Honour বা 'সতী' (১৬২২) ম্যাসিঞ্জারের আর একখানি উৎকৃষ্ট নাটক। ইহাতে ট্রাজেডির ভাব-সমুন্নতি আছে, বীরত্বকাহিনী আছে, প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রেমপাত্র-পরিবর্তন আছে, কিন্তু ইহা রক্তপাত ও খুনের ছড়াছড়ি হইতে সম্পূর্ন মুক্ত। কামিয়ালা একটি আদর্শ ও ধর্মশীলা নায়িকা-চরিত্র। সে তাহার প্রেমাস্পদ বার্টিডো-কে শুধু বিপন্মুক্তই করে নাই, তাহাকে প্রলোভন-মুক্ত করিয়া আদর্শে স্থির রাখিয়াছে ও নিজ ধর্মালয়ে চিরকুমারী-ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহাদের প্রণয়-সমস্যার সমাধান করিয়াছে। তাহাকে সময় সময় নিষ্প্রাণ আদর্শের প্রতীক মনে হইলেও, তাহার প্রাণস্পন্দের অভাব নাই। সে শুধু বক্তৃতা করে না, হৃদয়াবেগেরও পরিচয় দেয়।

জন ফোর্ড (John Ford : ১৫৮৬—১৬৩৯) এই নাট্যধারার শেষ ধারক ও বাহক। তাঁহার দুইখানি ট্রাজেডি 'Tis a Pity She's a Whore বা 'হায় ভ্রষ্টা' (১৬২৭) এবং The Broken Heart বা 'ভগ্নহৃদয়' (১৬২৯)। প্রথমটির উপজীব্য ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে নিষিদ্ধ, সমাজ-বিগর্হিত প্রেম। গায়োভিনি ও আনাবেলা—ভ্রাতা ও ভগিনী—পরস্পরের প্রণয়াসক্ত। এ নিন্দিত প্রেমের জন্য তাহারা মোটেই লজ্জিত নহে, বরং, এক প্রকার আত্মিক উল্লাসই অনুভব করে। রোমিও-জুলিয়েটের আবেগমত্ত, যৌবনোচ্ছল প্রণয়-ভাষণ ভ্রাতা-ভগিনীর ক্ষেত্রে বড়ই বিসদৃশ শোনায়। ভগিনীর বিবাহের পর ভ্রাতা তাহাকে খুন করে ও তাহার রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড ছুরিকাগ্রভাগে রাখিয়া রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। ফোর্ডের নাটকে অসুস্থ মনোবিকার ও বিকৃত ভাবাদর্শ অতিপ্রকট, কিন্তু নিয়তি-বিধানের অনিবার্য-তাকে নাটকের মধ্যে কাব্যময় রূপ দেওয়ার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ।

'ভগ্নহৃদয়' নাটকে পেনথিয়া তাহার ভ্রাতার প্রভাবে তাহার অভীষ্ট প্রণয়ীকে ত্যাগ করিয়া অপর একজনকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সে তাহার প্রণয়ীর প্রতি অক্ষুণ্ণ প্রেম পোষণ করে, কিন্তু কখনই ধর্মে জলাঞ্জলি দিবে না। প্রবৃত্তি ও কর্তব্যের মধ্যে এই দ্বন্দ্বে সে উন্মাদ হয়। তাহার ভ্রাতা ইথোক্লাস রাজকন্যা কালানথা-কে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছে, কিন্তু ব্যর্থ প্রণয়ী, অরজিলাস, তাহাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। কালানথা এই নিদারুণ বিপৎপাতের মধ্যে নৃত্য ও গান

করিতে করিতে অতিনাটকীয় ভঙ্গীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ফোর্ড তাঁহার পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতা ও ভাবের কৃত্রিমতা সত্ত্বেও, সূক্ষ্ম ও মর্মভেদী কারুণ্যরস-সঞ্চারে সিদ্ধহস্ত। নিয়তির অপ্রতিবিধেয় বিধানে তাঁহার অবিচলিত আস্থা। তাঁহার নাটকের বাতাবরণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় শ্বাসরোধী ও আসন্ন ঝটিকার পূর্বাভাসে স্তব্ধ—ইহাতে কোথাও এতটুকু স্বচ্ছন্দ নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ নাই। এইরূপ একটি মেঘভারাতুর, বিষাদ-নিবিড় আকাশতলে এলিজাবেথীয় নাটক উহার অন্তিম শয়ন বিছাইল।

৬

গদ্য সাহিত্য

এলিজাবেথীয় সাহিত্যের গদ্যবিভাগের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন সেই যুগের বিখ্যাত মনীষী **বেকন্** (Lord Bacon : ১৫৬১-১৬২৬)। নাটক ও কাব্য ছাড়া গদ্য-রচনার ক্ষেত্রেও অসাধারণ কৃতিত্ব এই যুগের সমৃদ্ধি ও বহুমুখীনতার সাক্ষ্য দেয়। বেকন্ রাজকার্য ও রাজনীতিচর্চার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার এই বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে তিনি যে বহুদর্শিতা ও ব্যবহারনীতি-কুশলতা আহরণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত সন্দর্ভাবলীতে (Essays) উদ্ঘাটিত হইয়াছে। যে যুগে কবিরা সাধারণতঃ আদর্শবাদ ও স্বপ্নবিলাসের পক্ষপাতী ছিলেন ও নাট্যকারেরা জীবনের সূক্ষ্ম ও উচ্চতম বিকাশগুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, সেই যুগে বেকন্ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের দুর্বলতা ও রাজনীতির বক্র, কুটিল উপায়-প্রয়োগের কথাই লিখিয়াছেন। মানুষের লোভ-মোহ-দুর্বলতার সুযোগ লইয়া কিরূপে তাহাদিগকে বশীভূত করা যায়, ব্যবসায়ক্ষেত্রে কিরূপ কৌশলে প্রতিষ্ঠা অর্জন সম্ভব, রাজ্য-পরিচালনায় কূটনীতি-প্রয়োগের দ্বারা প্রজার অসন্তোষ ও বিরুদ্ধতাকে কিভাবে পরিহার করা যায়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিবেশী শক্তির মনে নিজ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিরূপে ভ্রান্ত ধারণা জন্মান যায়, এই সমস্ত কূটনৈতিক উপদেশে তাঁহার সন্দর্ভগুলি পূর্ণ। জ্ঞান, বন্ধুত্ব, মৃত্যু, উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিষয়বস্তু লইয়া তিনি যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছেন, সেগুলিও তাঁহার গভীর ও সর্বব্যাপী সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক। বেকনের ভাষা ও বাক্যবিন্যাস-রীতি বাহুল্যবর্জিত, সংক্ষিপ্ত, সূচ্যগ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও প্রবাদবাক্যের ন্যায় স্মরণীয়। রাজনীতি-চর্চা যাঁহাদের জীবনব্রত, তাঁহাদের পক্ষে বেকনের এই সন্দর্ভাবলী অমূল্য সম্পদ।

বেকন অবশ্য সমৃদ্ধ ভাষা এবং বহুবিস্তারী বাক্যবিন্যাসেও নিপুণ ছিলেন।

তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহার আর একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ The Advancement of Learning বা 'জ্ঞানবিবর্তন' গ্রন্থে।

বেকনের নৈতিক আদর্শ খুব উচ্চ ছিল না বলিয়া তিনি অনেকের নিকট নিন্দাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক এই নিন্দা তাঁহার প্রাপ্য নহে। মানুষের আদর্শ কি হওয়া উচিত তাহা তাঁহার বক্তব্য বিষয় নয়। কিভাবে চলিলে আমাদের এই বাস্তব জীবনে আধিপত্য ও প্রভাব লাভ করা যায় সেই উপায়গুলিরই তিনি নির্দেশ দিয়াছেন। যশ ও প্রভুত্ব যাহাদের কাম্য, তাঁহাদের বেকন্-নির্দিষ্ট পথে চলিতে হইবে। পার্থিব প্রতিষ্ঠার উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করিতে চাই, অথচ যে আঁকা-বাঁকা, বন্ধুর পথ এই চূড়াতে পৌছাইয়া দিতে পারে তাহার প্রতি অবজ্ঞা-সূচক নাসিকা-কুঞ্চন করিব—এই মনোবৃত্তি আদর্শবাদের প্রতি নিষ্ঠা ত নয়ই, বরং ভণ্ডামি।

গীতা ও উপনিষদের আদর্শে যেমন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বিচার চলিতে পারে না, তেমনি খ্রীষ্টধর্মের বাণী-প্রচারের (Sermon on the Mount) মানদণ্ডে বেকনের মূল্য-নির্ধারণ-চেষ্টাও অবিধেয়। চাণক্য-নীতির মত বেকনের সন্দর্ভগুলিও বাস্তব প্রয়োজন ও অবস্থা হইতেই উদ্ভূত।

বেকনের চরিত্রে একটা আদর্শবাদের দিকও ছিল। কোন কোন সন্দর্ভে তিনি সত্য, ভগবানের আরাধনা প্রভৃতি উচ্চ আধ্যাত্মিক বিষয়েরও আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনাগুলিতে গভীর আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাবনত বিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। সংসারে উন্নতির কথা লিখিতে গিয়াও তিনি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ, আকাশ-স্পর্শী মনন-শক্তি এই সমস্ত রহস্যের নিকট সম্ভ্রমে মাথা নীচু করিয়াছে। বাস্তবিক বেকনের চরিত্রের এই দুইটা দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য করা কঠিন। তাঁহার এই দ্বৈত প্রকৃতি সমালোচকের নিকট একটা প্রহেলিকার মতই রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে এই সংশয় এক অদ্ভুত মতবাদে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কেহ কেহ এমন ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে বেকনই শেক্‌শপিয়ারের নাটকাবলীর প্রকৃত রচয়িতা।

আর একদিক দিয়াও বেকনের উপর যুগ-প্রভাব লক্ষিত হয়। তিনি কেবল সাহিত্যিক নহেন, বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রেও তিনি যুগান্তকারী পরিকল্পনা প্রবর্তন করিয়াছেন। যাহাকে এখন Experimental Method বা পরীক্ষামূলক পদ্ধতি বলা হয় তাহার প্রকৃত উদ্ভাবক বেকন। অবশ্য তিনি বিজ্ঞান-দর্শনে কোনও মৌলিক আবিষ্কার করেন নাই—তিনি নূতন পথ নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র। আধুনিক

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা অনেকে বেকনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ও তাঁহার ঋণ স্বীকার করেন না। কিন্তু সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে যে বিরাট কল্পনা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল তাহার অসমসাহসিকতা আমাদিগকে বিস্মিত করে। তিনি সমস্ত জ্ঞান আত্মসাৎ করিবার মহান্ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে জ্ঞানচর্চা যেন একটা শুষ্ক, নীরস আলোচনা; জ্ঞানী জীবন হইতে দূরে থাকিয়া নিজ পাঠাগারে আবদ্ধ থাকেন। কিন্তু বেকনের যুগে জ্ঞান-আহরণ ছিল একটা অজ্ঞাত দেশ-আবিষ্কারের মত উন্মাদনাপূর্ণ। কলম্বস যেমন মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়া নূতন মহাদেশের তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, বেকনও সেইরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন নূতন রাজ্য জয় করিবার কল্পনায় বিভোর ছিলেন। জ্ঞানার্জনে এই উন্মাদনাপূর্ণ মনোভাবই বেকনের উপর তাঁহার যুগের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় প্রভাব। এলিজাবেথীয় যুগের শেষ রশ্মিরেখা তাঁহার বুদ্ধিপ্রদীপ্ত মুখের উপর পড়িয়াছে।

এই যুগের আরো কয়েকটি গদ্য রচনার উল্লেখ করিলে গদ্যরীতির বিচিত্রমুখী অগ্রগতির ধারাটি অনুধাবন করা সহজ হইবে। **রিচার্ড হুকার** (Richard Hooker : ১৫৫৪—১৬০০) তাঁহার The Laws of Ecclesiastical Polity বা 'চার্চশাসনের আইনকানুন' (১৫৯০) গ্রন্থে ধর্মবিষয়ক বাদ-বিতণ্ডার ক্ষেত্রে একটি অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ রচনা করেন ও গভীর-বিষয়-আলোচনার উপযোগী গদ্যরীতির নিদর্শন স্থাপনা করেন। Anglican Church অর্থাৎ ইংলণ্ডের চার্চের যে মধ্যপন্থী মতবাদ বাইবেলের প্রামাণিকতা ও স্বাধীন চিন্তার সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা একদিকে রোমান ক্যাথলিক ও অপর দিকে পিউরিটানের চরমপন্থিতার খণ্ডন করিয়াছে, তাহার দার্শনিক ভিত্তি সর্বপ্রথম হুকারের গ্রন্থে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। চার্চের গঠনতন্ত্র, শ্রেণীবিন্যাস ও উৎসব-অনুষ্ঠান সকল ক্ষেত্রে বাইবেলের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সমর্থিত না হইলেও যুক্তিবাদনির্ভর বলিয়াই গ্রহণীয়। হুকার বলিয়াছেন, অন্যান্য সমাজের ন্যায় ধর্ম-সমাজেও যে একটি অন্তর্নিহিত নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে, তাহা ভগবদ্-বিধানের অঙ্গীভূত বলিয়াই অবশ্যপালনীয়। গ্রন্থখানি শুধু যুক্তিবাদের জন্য নহে, শুধু ধর্মাচরণের সঙ্কীর্ণ ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য নহে, একটি উদার, সার্বভৌম চিন্তাবিস্তার ও যুক্তিনিষ্ঠতার সুদৃঢ় আস্থার জন্য মহৎভাবের ক্ষেত্রে উন্নীত হইয়াছে। ভাষার দিক দিয়া ইহা সর্বপ্রথম ল্যাটিনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। ইহার শব্দনির্বাচন, বাক্যগঠন ও ছন্দধ্বনি ল্যাটিনানুসারী হইয়াও মৌলিকতার চিহ্নাঙ্কিত। এই গদ্য যেমন উজ্জ্বল তেমনি সুসম; ইহা যুক্তিপ্রধান হইলেও উন্নত কল্পনার

অধিকারী, একদিকে পাণ্ডিত্যাভিমান ও অন্যদিকে গ্রাম্যতা দোষ হইতে সমভাবে মুক্ত।

Authorised Version of the Bible বা 'বাইবেলের প্রামাণ্য সংস্করণ' (১৬১১)—রাজা প্রথম জেম্‌সের নির্দেশে ৪৭ জন পণ্ডিত মিলিয়া বাইবেলের অনুবাদ করেন। ইহা ইংরাজী ভাষাভাষী সমস্ত খ্রীষ্টানের দ্বারা গৃহীত হইয়া ভক্তিরস ও ধর্মতত্ত্বের সংহিতার মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

ইহার ধর্মসম্বন্ধীয় প্রভাব ছাড়াও ইহার সাহিত্যিক প্রভাব, গদ্যরচনারীতি ও সাহিত্য-রচয়িতার মনোভাবের উপর ইহার যে আধিপত্য তাহাই ইহাকে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ আসন দিয়াছে। এই অনুবাদের মধ্য দিয়া Old Testament-এর কাহিনী ও ইহুদী জাতির পূর্বদেশীয় মনোভাব ও জীবনদৃষ্টি ইংরাজ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ইহা যেমন ইংরাজ জাতির ধর্মাবেগকে তীব্রতর করিয়াছে, তেমনি হয়তো তাহাদের মধ্যে ইহুদি-সুলভ সঙ্কীর্ণতা ও আত্মগরিমাবোধও পুষ্ট করিয়াছে।

কাব্যরস, চিত্রসৌন্দর্য ও সমুন্নত ভাবাবেগ যে বিশেষ কোনো পদবিন্যাস বা ছন্দপ্রয়োগের মুখাপেক্ষী না হইয়াও গদ্যে প্রবর্তিত হইতে পারে, বাইবেলের অনুবাদ তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। অনুবাদকারিগণ মূল বাইবেলকে অনুসরণ করিয়াও যথার্থ মৌলিক সৃষ্টি করিয়াছেন। ইংরাজী গদ্যের মধ্যে যে কাব্যব্যঞ্জনা, চিত্রল-তা, উদাত্ত ভাবগাম্ভীর্য ও হৃদয়-নিঃসৃত আবেগের প্রকাশ-ক্ষমতা সুপ্ত ছিল এই বাইবেল-সংস্করণে তাহা চমৎকারভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভাষা সময় সময় কাব্যকল্প সৌন্দর্যের বাহনও হইয়াছে। সে যুগে ইংরাজী ভাষায় প্রথম যৌবনের নবীনতা ও শক্তিমত্তার জোয়ার আসিয়াছিল ; তখনও ইহাকে ছাঁচে ঢালা হয় নাই বা ব্যাকরণ ও কাব্যগঠনের কড়া নিয়ম উহার স্বচ্ছন্দগতি ও অফুরন্ত প্রবাহকে শৃঙ্খলিত করে নাই। ইহাতে অনুবাদকদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। অনুবাদের প্রয়োজনে অবশ্য কোথাও কোথাও ভাবোচ্ছ্বাসকে সংযমিত ও অতিপল্লবিত বিস্তারকে সংক্ষেপিত করিতে হইয়াছিল। সর্বসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য উহার শব্দসম্ভার সাধারণের ব্যবহৃত শব্দকোষ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। তবুও ধর্মানুভূতির প্রবল আবেশ ও অপরিচিত জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারার সহিত প্রথম পরিচয়ের উন্মাদনা এই সাধারণবোধ্য ভাষাকে কাব্যগুন-সমৃদ্ধ, চিত্রধর্মী, অন্তশ্ছন্দপ্রবাহে স্খলিত ও গভীর ধর্মভাবপ্রকাশে ব্যঞ্জনা-ঋদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। শুধু ভাষা নহে, বাইবেলের ধর্মীয় ভাবধারার সহিত ইংরাজ

জাতির জীবনধারা ও মনোভাবের সহজ ছন্দটিও মিশিয়া গিয়া ইহাকে জাতীয় জীবন ও অভীপ্সার স্বচ্ছ দর্পণে পরিণত করিয়াছে। সহজ, সরল, প্রায়-নিরাভরণ গদ্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শক্তির আবিষ্কার বাইবেল অনুবাদের প্রধান কৃতিত্ব। একদিকে জন বুনিয়ান (John Bunyan)-এর মত একজন অশিক্ষিত ব্যবসায়ী, অপর দিকে কার্লাইল ও রাস্কিনের মত বিদগ্ধ লেখক নিজ নিজ রচনা-পদ্ধতিতে ইহার প্রভাবের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। অবশ্য বাইবেলের আবেগময়তা পরবর্তী যুগের যুক্তিপ্রধান ও প্রয়োজনাত্মক গদ্যের দ্বারা সংযত হইয়া ইংরাজী গদ্যরীতিতে একটি সুষ্ঠু আদর্শ-প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়ক হইয়াছে। পণ্ডিতদের স্থূল পাণ্ডিত্যপ্রকাশ, দার্শনিকদের ধোঁয়াটে ভাষা-কুহেলিকা ও সাধারণ লোকদের তুচ্ছতা ও রূঢ়তা হইতে ভাষাকে উদ্ধার করিয়া বাইবেল ইংরাজী সাহিত্যকে এবং ইংরাজের মননশীলতাকে এক উচ্চতর সৌন্দর্য-আদর্শের সন্ধান দিয়াছে।

রবার্ট বার্টন (Robert Burton : ১৫৭৬—১৬৮০) Anatomy of Melancholy বা 'বিষাদ-প্রবণতার বিচার-বিশ্লেষণ' (১৬২১) গ্রন্থে গদ্য রচনার আর একটা নূতন মেজাজ ও গদ্যরীতির আর একটা নূতন শৈলী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বিষাদ-প্রবণতার যত প্রকার শ্রেণী-বৈচিত্র্য আছে, সে সমস্তেরই এক বিরাট সংগ্রহ-কোষ। বর্তমান যুগে বিষাদকে যেমন একটি বিশেষ গোত্রীয় দার্শনিক চিন্তাশীলতার বহির্লক্ষণ মনে করা হয়, সপ্তদশ শতকে ইহার সম্বন্ধে সে ধারণা ছিল না। বিষাদপ্রবণতা কোন এক প্রকার উৎকেন্দ্রিকতা বা পাগলামির একটা প্রকারভেদরূপেই বিবেচিত হইত। শেক্‌শপিয়ার তাঁহার As You Like It বা 'যার যেমন রুচি' নাটকে Jacques বা জাকুইস্ চরিত্রে বিষাদের যে বিমিশ্র ও মোটামুটি মানবদ্বেষী ও সুস্থ-আনন্দ-বিরোধী রূপ দিয়াছেন তাহাই সে যুগে উহার স্বাভাবিক পরিচয়। বার্টনও উহাকে সকল প্রকার মানব নির্বুদ্ধিতার সারনির্যাস রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে যুগ ও দেশ অনুসারে পাগলামির অসংখ্য প্রকার-ভেদ আছে। যুদ্ধকেও তিনি ইহার অন্তর্ভুক্ত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। ইংলণ্ডে অলসতা একপ্রকার পাগলামি।

কখনও কখনও বার্টন জ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায় যুক্তিযুক্ত কথা বলেন, কখনও বা উৎকেন্দ্রিক ও তির্যকভঙ্গীপ্রধান অভিমত-প্রকাশই তাঁহার রুচিকর। কিন্তু তাঁহার মনোভাব অপেক্ষা রচনাভঙ্গীই সমধিক কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের পরিধি দেখাইবার কোন সুযোগই ছাড়েন নাই। ল্যাটিন হইতে সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি-পরম্পরা, ভঙ্গী ও মেজাজের দ্রুত পরিবর্তন ও যদৃচ্ছ অপ্রাসঙ্গিকতার প্রবর্তন,

শিশুসুলভ আনন্দে এক শব্দের সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত প্রতিশব্দের সংযোজন, সাধারণ আলোচনার মধ্যে আত্মজীবনীর উপাদান-চয়ন প্রভৃতি তাঁহার রচনারীতির কৌতুককর বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে দুইজন বিখ্যাত ফরাসী লেখক, রাবেলা (Rabelais) ও মনটেনের (Montaigne) বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

বার্টনের প্রধান ত্রুটি হইল যে তাঁহার কোন নিজস্ব জীবন-দর্শন ছিল না, তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির ভাবধারা গ্রথিত করিয়াছেন মাত্র, নিজের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ হইতে ইহাদের বিচার-বিবেচনা করেন নাই। তাঁহার তথ্যবিন্যাস দার্শনিক মতবাদের অতিসুসংবদ্ধ, পর্যায়-গ্রথিতরীতির অনুসারী—অর্থাৎ তাঁহার রচনায় দার্শনিকতার আড়ম্বর আছে, প্রকৃত দার্শনিক চেতনা নাই। তাঁহার রচনারীতিও নদীর ন্যায় নানা চপল ও মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনশীল ভঙ্গিতে গতিশীল, উহার বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে কোন মূলগত ঐক্য নাই। গদ্য যে নেহাত পদাতিক, ধরা-বাঁধা পথের পথিক নহে, উহাও যে কৌতুক-চঞ্চল, খোসমেজাজী ও স্বচ্ছন্দচারী হইতে পারে তাহার নিরিখ হিসাবেই বার্টনের রচনার মূল্য।

পৃথিবীর সাহিত্যে যে কয়েকটি স্বল্প-সংখ্যক গৌরবময় যুগ আছে, এলিজাবেথীয় যুগ তাহাদের অন্যতম। গ্রীসে পেরিক্লিসের (Pericles) যুগ, রোমে অগস্টাসের (Augustus) যুগ, ফ্রান্সে চতুর্দশ লুই (Louis XIV)-এর যুগ ও ইংলণ্ডে রোমান্টিক যুগ ইহার সহিত অনেকাংশে তুলনীয়। কিন্তু উচ্ছল প্রাণশক্তির অবারিত প্রাচুর্যে এবং চিন্তা ও কর্মের সমন্বয়ে এলিজাবেথীয় যুগের অবিসংবাদিতারই প্রাধান্য।

পঞ্চম অধ্যায়

সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্য

[১৬২৫—১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ]

১

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরাজী সাহিত্য আবার এক নূতন পথ ধরিল। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, সেইরূপ সামাজিক ও সাহিত্যিক জীবনেও প্রবল উদ্দীপনার পর শ্রান্তি ও অবসাদের ভাব আসে। এলিজাবেথীয় যুগের পর যে নূতন ধারা প্রবাহিত হইল, তাহাতে কল্পনার উঁচু সুর অনেকটা নীচু গ্রামে নামিয়া আসে। শেক্‌শপিয়ারের রচনায় কবি-কল্পনার সহিত মনন-শক্তির একটা চমৎকার সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। পরবর্তী যুগে এই সমন্বয় বিচলিত হইল। বুদ্ধি এতদিন কল্পনার সহচরী ছিল, এখন সে স্বপ্রধান হইয়া উঠিল। এখন বরং কল্পনাই বুদ্ধির অধীন হইল। অর্থাৎ কল্পনা কোন্ পথে কি ভাবে যাইবে তাহা বুদ্ধিই নির্ণয় করিয়া দিত। এই বুদ্ধি-প্রাধান্য ও কল্পনার উদ্ভট মৌলিকতা সপ্তদশ শতাব্দীর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই নূতন কবিতা-রীতির প্রতিষ্ঠাতা **জন্ ডান্** (John Donne : ১৫৭৩—১৬৩১) এবং এই কবিসম্প্রদায়ের সাধারণ নাম Metaphysical Poets বা দর্শনপন্থী বা দার্শনিক কবিসংঘ। ইহাদের কবিতাতে যে প্রধানতঃ দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা হইত, তাহা নহে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে দার্শনিকের বিশ্লেষণকারী দৃষ্টিভঙ্গী ও মৌলিক চিন্তা-প্রণালী লক্ষিত হয়। যে চিন্তাধারা বা উপমা সহজে কাহারও মনে উদয় হয় না তাহাই ইহাদের কাব্যে প্রাধান্য পায়। সৌন্দর্য-সৃষ্টি অপেক্ষা মনকে চমক দেওয়ার প্রতিই যেন ইহাদের অধিক লক্ষ্য। সুষমা অপেক্ষা অভিনবত্বের প্রবর্তনই ইহাদের অধিক কাম্য। প্রেমবর্ণনার যে চিরাগত প্রথা কাব্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহারা তাহাকে পদে পদে উল্লঙ্ঘন ও উপহাস করিয়াছেন ও তাহার অতি-মাধুর্যের মধ্যে বাস্তবতার অম্ল-লবণাক্ত স্বাদ মিশাইয়াছেন। আমাদের কিছু কিছু সংস্কৃত কাব্য ও বৈষ্ণব কবিতার মত সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজী কবিতাতেও কষ্টকল্পনার আতিশয্য দেখা যায়।

এই কষ্টকল্পনার একটা উদাহরণ দিলে ইহার প্রকৃতি বুঝা যাইবে। ডান্ 'মশকের' উপর এক কবিতা (The Flea) লিখিয়াছেন ; ইহাতে তিনি কল্পনা করিয়াছেন যে একটি মশক তাঁহাকে ও তাঁহার প্রিয়াকে পর পর দংশন করিয়া

তাঁহাদের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছে এবং উভয়ের আত্মার মধ্যে সংযোগ-সেতু হইয়াছে। সুতরাং ইহা যেন তাঁহাদের সম্মিলিত ব্যক্তিত্বের অংশ ও তাঁহাদের মিলনমন্দির স্বরূপ হইয়াছে। ডান্ সমস্ত দিক দিয়া সেই সময়কার কবিতার ভাব ও রীতির স্পর্ধিত ব্যতিক্রম। যাহা পুরাতন ও পরিচিত, যাহা মসৃণ ও সুললিত, যাহা প্রচলিত প্রথার অনুবর্তনে সহজ ও প্রত্যাশিত, তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার চিরন্তন বিদ্রোহ। প্রথানুসরণকে এড়াইতে গিয়া অনেক সময়েই তিনি দুর্বোধ্য ও ও উৎকেন্দ্রিককে বরণ করিয়াছেন। তাঁহার গভীর আবেগ, ভাবানুভূতি ও সৌন্দর্যসৃষ্টি—সকলের পিছনে আছে বুদ্ধিদীপ্ত কল্পনার তির্যক রশ্মি, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের জটিলতা ও অপ্রত্যাশিতের বিভ্রান্তকারী চমক। এই প্রবণতা প্রকাশিত হইয়াছে কোথাও বা অবিশ্বাস্য অতিরঞ্জনে, কোথাও বা মহৎ ও তুচ্ছ, সমুন্নত ও উপহাস্যের বিসদৃশ সম্মিলনে।

ডানের কল্পনাক্রীড়া ও বুদ্ধির বিদ্যুৎবিলাস এত ক্ষিপ্র ও বিচিত্রগামী যে ইহাদের অনুসরণ করা পাঠকের পক্ষে দুরূহ। এ বিষয়ে তিনি ব্রাউনিংয়ের পূর্বসূরী। তাঁহার কবিতায় ভাব বা আবেগ নানা অতর্কিত গতিপরিবর্তনে, নানা অবান্তরের প্রক্ষেপে, নানা নূতন নূতন শাখা-পথে প্রবহমানতায় বারে বারে বাঁক-ফেরা নদীর মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কেন্দ্রিকতায় স্থির হয় নাই।

তাঁহার প্রেম আদর্শায়িত নহে, শ্লেষব্যঙ্গাত্মক ও পূর্ণ মাত্রায় ইন্দ্রিয়-বিলাসী। কিন্তু তথাপি বুদ্ধির চমক ও চিন্তার সুদূর-প্রসারী ব্যাপ্তি ও অন্তর্ভেদী গভীরতার জন্য ইহা কখনই মনকে ভারাক্রান্ত ও দেহনিবদ্ধ করে না। প্রকাশভঙ্গীর মৌলিকতা তাঁহার প্রেমকবিতাকে ভাবসমুন্নতির স্তরে উত্তীর্ণ করিয়াছে। ডান্ শেষজীবনে ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তাঁহার এই সময়ের কবিতাগুলি ঈশ্বর ও মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার মহচ্চিন্তার পরিচায়ক। কিন্তু এ কবিতাগুলির প্রকাশভঙ্গীও বুদ্ধিদীপ্ত কলাকৌশলের দ্বারা চিহ্নিত।

শেক্‌শপিয়ার ও প্রায় সমস্ত এলিজাবেথ-যুগের কবির মধ্যেও যে কষ্টকল্পনার প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না তাহা নহে। কিন্তু ডানের কষ্টকল্পনা ভিন্নপ্রকৃতির। অন্য কবির ক্ষেত্রে যাহা সাময়িক অলঙ্কার মাত্র, ডানের ক্ষেত্রে তাহা এক সর্বব্যাপী, কেন্দ্রীয় প্রবণতা, তাঁহার কবিস্বরূপের গভীরতম ও অপরিহার্য আত্মপ্রকাশ। তাঁহার চিন্তা ও কবিত্বের মূলেই এই রীতি-বৈশিষ্ট্য। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদের বহুল উল্লেখ ও সার্বিক প্রসার তাঁহার কবিতাপুষ্পের মর্মকোষনিঃসৃত গন্ধ। তাঁহার কবিকল্পনা অকস্মাৎ মৃত্তিকা হইতে আকাশে উধাও হয়, জীব ও বস্তু-

জগৎ হইতে অধ্যাত্মচিন্তার রাজ্যে পক্ষ বিস্তার করে, জীবনের সহজ ভাব ও কামনাগুলিকে তত্ত্বগৌরব মাখাইয়া উহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকে এক নূতন মননিষিক্ত অনুভূতির আলোকে দুরধিগম্য করিয়া তোলে। এইজন্যই ড্রাইডেন ও পরে জনসন তাঁহাকে ও তাঁহার অনুবর্তী কবিগোষ্ঠীকে Metaphysical বা ইন্দ্রিয়াতিসারী এই আখ্যা দিয়াছিলেন।

কিন্তু এই কষ্ট-কল্পনা ও সৃষ্টি-ছাড়া চিন্তা-শক্তি সত্ত্বেও ডান্ ও তাঁহার সম্প্রদায়-ভুক্ত কবিরা প্রকৃত কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। সমস্ত ছদ্মবেশ ও অঙ্গবিকৃতির মধ্য দিয়াও তাঁহাদের প্রতিভার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়। বুদ্ধির মার-পেঁচের সহিত ভাবের আন্তরিকতা ও গভীরতার এক অপূর্ব সামঞ্জস্য ইঁহাদের কবিতায় লক্ষিত হয়। এক হিসাবে ইঁহারা কাব্য-পরিধির বিস্তার সাধন করিয়াছেন। আধুনিক যুগে মনন-শক্তির যত উন্মেষ ও পরিণতি হইতেছে, ভাব-গভীরতার স্থান যেন ততই কমিয়া আসিতেছে। কোন কবিই বর্তমান শতাব্দীতে বৈষ্ণব কবি বা রোমাণ্টিক যুগের কবিদের মত ভাবের তন্ময়তা ও একনিষ্ঠতা দেখাইতে পারেন না বা চাহেন না; নানারূপ সূক্ষ্ম, জটিল ও বিশ্লেষণকারী চিন্তাস্রোত তাঁহার ভাবের সহিত গ্রথিত হইয়া পড়ে। কবিতার মধ্যে আধুনিক কবি-মানসের উদ্‌ভ্রান্তচিত্ততা ও অস্থিরমতিত্ব প্রতিফলিত হয়। গভীরতার অভাব ব্যাপ্তি, বিস্তার ও বৈচিত্র্যের দ্বারা পূর্ণ হয়। এই বুদ্ধিবৃত্তির সক্রিয়তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নাই—ইহাই আধুনিক মনের প্রকৃত প্রবণতা। আজকাল কবির মন ভাবের ইন্দ্রজালের সম্মোহনশক্তির নিকট আত্মসমর্পন করিতে চাহে না—কারণ অতিসচেতন বুদ্ধিকে সৌন্দর্যের জাদুমন্ত্রে ঘুম পাড়ান যায় না। কোন কোন স্থলে সাময়িক প্রভাবে ভাবাবেশ হয়তো নিবিড় হইয়া আসে, কিন্তু সাধারণতঃ এই নেশা টুটিতে বিশেষ বিলম্ব হয় না। আধুনিক কবিতার এই বুদ্ধিপ্রাধান্য ডান্ ও তাঁহার সমসাময়িক কবিদেরই অবদান। এই হিসাবে তাঁহারা আধুনিকতার অগ্রদূত। প্রেম-কবিতার সনাতন Pattern বা গঠনপ্রণালী ইঁহাদের হাতে নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

২

এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কবিদের মধ্যে দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন মনোবৃত্তির পরিচয় মিলে। একদল রাজসভায় বর্ধিত; লঘু চাপল্য, ভোগ-বিলাস ও তরল আমোদ ইঁহাদের কবিতায় নৃত্যের চটুলছন্দে রূপান্তরিত হইয়াছে।

লভ্‌লেস (Richard Lovelace : ১৬১৮—১৬৫৮), **সাকলিং** (John Suckling : ১৬০৯—১৬৪২) প্রভৃতি কবিরা এই দলের অন্তর্গত। ইঁহারা জীবনের

অনিত্যতা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে, যদিও কিছুটা কৃত্রিমভাবে, সচেতন। সেইজন্যই প্রত্যেক আনন্দময় মুহূর্তটিকে নিঃশেষে উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের তীব্রতর। কিন্তু ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী যতই হাল্কা হউক, ইহাদের কবিত্বশক্তি অবিসংবাদিত। সুখ-বুদ্বুদের প্রত্যেকটি ক্ষণস্থায়ী স্ফীতি, মোহভঙ্গের প্রত্যেকটি ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস, স্মৃতির প্রত্যেকটি ছায়া-ধূসরিত পশ্চাদ্দৃষ্টি,—এই সমস্তই ইহারা নিখুঁত ছন্দ ও সঙ্গীতের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুর ন্যায় উজ্জ্বল গীতি-কবিতায় ধরিয়া রাখিয়াছেন। আবার ইহারই মধ্যে স্থানে স্থানে হঠাৎ-প্রবুদ্ধ আভিজাত্য-গৌরব, বিপদের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন বেপরোয়া ভাব ও আদর্শনিষ্ঠার জন্য প্রাণবিসর্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প এক অপ্রত্যাশিত গভীর সুর ধ্বনিত করিয়াছে।

দ্বিতীয় দলের কবিরা ধর্ম ও ঈশ্বরচিন্তার কবি। এই সময় রাজসভায় ব্যসনাসক্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের মধ্যে এক কঠোর, আনন্দবর্জিত, আত্মনিপীড়নশীল ধর্মভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়েই বিখ্যাত puritan বা ধর্মবিষয়ে অতিনিষ্ঠাবান সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। এই পিউরিটান মনোভাব দৈনিক আচার-ব্যবহারের সীমালঙ্ঘন করিয়া ক্রমশঃ সাহিত্য ও আর্টেও প্রতিফলিত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইহার নিরানন্দ, শুষ্ক পরুষতা ততটা প্রকট হয় নাই; তখনও ইহাতে কল্পনার সরস স্পর্শ, উগার ক্রীড়াশীল ফেনপুঞ্জ সংলগ্ন ছিল। এই যুগের কিছু কিছু কবির মধ্যেও ব্যাকুল ধর্ম-জিজ্ঞাসা ও ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার আন্তরিক আগ্রহ ফুটিয়া উঠিয়াছে। **হারবার্ট** (George Herbert : ১৫৯৩-১৬৩৩), **ভন** (Henry Vaughan : ১৬২২-১৬৯৫), **ক্রাশ** (Richard Crashaw : ১৬১২-১৬৪৯) প্রভৃতি কবি ধর্মশাস্ত্রবর্ণিত ভগবানের সুদূর নির্লিপ্ততায় সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে নিকটতম আত্মীয়ের মত হৃদয়ের অভ্যন্তরে অনুভব করিতে চাহিয়াছেন; প্রেমের অশ্রুপূর্ণ আবেগ ও বাষ্পরুদ্ধ প্রিয়সম্বোধন ঈশ্বর-আরাধনায় প্রয়োগ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই হিসাবে তাঁহাদের ধর্মকবিতার শ্রেষ্ঠত্ব আধুনিক যুগ পর্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে। ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও ইহাদের কবিতা হৃদয়বৃত্তির সহজ সরল প্রকাশ। অবশ্য ইহাদের প্রকাশভঙ্গী অতি প্রকটভাবে ডানের দ্বারা প্রভাবিত এবং সেই হিসাবেই এই তিন কবিকে ডানের উত্তরসূরী বলা যাইতে পারে।

রবার্ট হেরিক (Robert Herrick : ১৫৯১-১৬৭৪) এই দুই দলের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করেন। হেরিকের সমস্ত কবিতা আকারে

ক্ষুদ্র, ভাবে লঘু ও লালিত্যে সহজ ও মনোহারী। তাঁহার চটুল, আমোদপ্রিয় অন্তরের প্রতিটি রুচির বুদ্বুদ, সুন্দর ও ললিতের স্পর্শে রঙীন প্রতিটি কল্পনা, স্ফূর্তিপ্রিয় চিত্তের সংসারের অনিত্যতা-বোধজাত মৃদু বিষাদ—এ সমস্ত তাঁহার কবিতাকে ফুলের ক্ষণিক, করুণ মাধুরীতে অভিষিক্ত করিয়াছে। তাঁহার অনেকগুলি ফুলের কবিতাতেই এই লঘু স্পর্শ অনুভূত হয়। তাঁহার মধ্যে আবেগ ও অনুভূতির গভীরতা নাই, অথচ একটি করুণতার স্পর্শ আছে। অনুতাপ বা বিরাগেরও কোন স্থান নাই। এরূপ আর কোন বৈচিত্র্যপিয়াসী, প্রজাপতি-ধর্মী, সৌন্দর্যস্বপ্নচারী কবি ইংলণ্ডের আকাশ-বাতাসে রঙীন ডানা মেলে নাই।

৩

পিউরিটান মনোভাবের পূর্ণতম স্ফূর্তি ও সুন্দরতম বিকাশ হইয়াছে মহাকবি **মিলটনের** (John Milton : ১৬০৮-১৬৭৪) মধ্যে। শেক্‌শপিয়ার ও মিলটন ইংরাজী সাহিত্যের দুই প্রধান কীর্তিস্তম্ভ। ইংরাজী সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় নাই, তাঁহাদের মুখেও এই দুই নাম জনশ্রুতির মত প্রচলিত। কিন্তু ইঁহাদের মনোভাব ও সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে কী গভীর ব্যবধান! শেক্‌শপিয়ার উদার, অপক্ষপাত, মানুষের দুর্বলতার প্রতি ক্ষমাশীল ও কোনরূপ সংকীর্ণ মতবাদের বেষ্টনীর দ্বারা সীমায়িত নন। মিলটন উহার সম্পূর্ণ বিপরীত—নৈতিক উচ্চভূমিতে বিচরণশীল, নিঃসঙ্গ, ইতর জনসাধারণের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ, পাপের প্রতি অসহিষ্ণু, একপ্রকার অসহ্য পুণ্য-জ্যোতিঃ দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রজ্বলিত হোমাগ্নির ন্যায় নির্মল তিনি, নির্মমও। সাধারণ লোকের অনধিগম্য। তাঁহার কথাবার্তা, চাল-চলন, লিখনভঙ্গীতে সর্বত্র এক দৃঢ়, অনমনীয় আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। সংসারের অগ্নি-পরীক্ষায় তিনি অচল, অটল। পাপের সঙ্গে তাঁহার আপোসহীন, প্রশ্রয়হীন যুদ্ধ। সেইজন্য বলা যাইতে পারে শেক্‌শপিয়ার ও মিলটন দুই সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের প্রতীক।

মিলটনের কবিতার মধ্যে মধুর ও মহানের এক অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে। Renaissance বা ষোড়শ শতাব্দীর নব-জাগরণের মধ্যে যে দুইটি ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছিল—সৌন্দর্যানুরাগ ও নীতিবোধস্ফুরণ—তাহারা মিলটনের কাব্যের সাগরসঙ্গমে আসিয়া মিশিয়াছে। মিলটনের কবিতাবলীর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার যৌবনের সৌন্দর্য-প্রীতি ক্রমশঃ কঠোর হইতে কঠোরতর সংযমের অধীন হইয়া শেষে 'প্যারাডাইস্ লস্ট' (Paradise Lost), 'প্যারাডাইস্

রিগেন্‌ড্‌' (Paradise Regained) ও 'সামসন অগোনিস্টিস্‌' (Samson Agonistes)-এর নগ্ন, প্রশান্ত, মহান এক গাম্ভীর্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে। উপত্যকাস্থিত শ্যামল, বিচিত্র পুষ্পোদ্যান হইতে উন্নত শৈলশৃঙ্গের শ্বেত মহিমা—ইহাই যেন মিলটন-কাব্যের ক্রমবিকাশের বিবর্তন-রেখা।

মিলটনের তরুণ বয়সের রচনা 'ল্যালেগ্রো' (L'Allegro) ও 'ইল্ পেন্‌সরোসো' (Il Penseroso)-তেই তাঁহার প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মিলে। প্রথম কবিতাটিতে আমোদপ্রিয় ও দ্বিতীয়টিতে গম্ভীর-প্রকৃতি যুবকের বিভিন্ন রুচি ও দৈনিক কার্য-সূচী বর্ণিত। এই দুইটি কবিতা সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক জনসনের মন্তব্য স্মরণীয়—"তাঁহার আমোদেও চিন্তাশীলতার ছায়াপাত হইয়াছে, তাঁহার গাম্ভীর্যে চপলতার লেশমাত্র নাই।" এই উভয় কবিতাতেই কবির বিশুদ্ধ, সংযত রুচি, তাঁহার সাহিত্যিক সাধনা, অশ্রান্ত জ্ঞানানুশীলন—এক কথায় তাঁহার উচ্চ আদর্শে উৎসর্গীকৃত জীবন—উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'কোমাস' (Comus : ১৬৩৪) ও **'লিসিডাস'** (Lycidas : ১৬৩৭)-এ তাঁহার পিউরিটান মনোবৃত্তি ক্রমশঃ স্ফুটতর ও প্রখরতর হইয়াছে। আমোদমাত্রেরই দূষণীয়তা সম্বন্ধে তিনি যেন অতিরিক্ত সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। সৌন্দর্য শয়তানেরই মায়াজাল ও দুরূহ ব্রত-উদ্‌যাপনের সহিত তাহার স্বাভাবিক বিরোধিতা এই ধারণা তাঁহার মনে যেন ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে। কোমাসের সমস্ত আকর্ষণ, তাহার সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি ও নৃত্যগীত-কুশলতা তাহার নৈতিক বীভৎসতার ছদ্মবেশমাত্র। লিসিডাস-এ পাপের প্রতি তাঁহার ঘৃণা আরও তীব্র ও অনেকটা বিসদৃশভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার বাল্যবন্ধুর অকালমৃত্যুতে তিনি শোক প্রকাশ করিতেছেন ও অতীতের সৌন্দর্য-স্মৃতির অলস রোমন্থনে ব্যাপৃত আছেন। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল যে তাঁহার বন্ধু ধর্মযাজকের বৃত্তির জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। একথা মনে পড়িতেই তৎকালীন যাজকবর্গের অর্থলোভ ও কর্তব্যচ্যুতি তাঁহার মনে এক প্রচণ্ড ক্রোধের উদ্রেক করিল। তাঁহার ভাবাবেশ ও সৌন্দর্যোপভোগ এক মুহূর্তেই ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। শোকের কবিতায় এই সমস্ত অসাধু, ধর্মহীন যাজকের বিরুদ্ধে তাঁহার তীব্র রোষ-হুঙ্কার আকস্মিক বজ্র-নির্ঘোষের মত আমাদিগকে স্তম্ভিত করে।

ইহার পর মিলটন তাঁহার সৌন্দর্যময় কাব্যকুঞ্জ ত্যাগ করিয়া সমকালীন ইংলণ্ডের সংগ্রাম-মুখর, তিক্ত বাদ-বিসম্বাদে উত্তপ্ত রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ইংলণ্ডে যে রাজপক্ষ ও প্রজাপক্ষের মধ্যে সুদীর্ঘ গৃহযুদ্ধ চলিয়াছিল, মিলটন তাঁহার সমস্ত

আদর্শবাদ, দুর্জয় মনোবল ও রণোন্মাদনা লইয়া রাজার বিরুদ্ধে জনসাধারণ অথবা পার্লামেণ্টের পক্ষাবলম্বনে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন ; কবির বীণা ছাড়িয়া তীব্র জ্বালাময় গদ্যের তরবারিহস্তে তিনি প্রতিপক্ষকে আঘাত হানিতে লাগিলেন। ক্রমওয়েলের সচিবরূপে তিনি প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড-বিষয়ে সমগ্র ইউরোপে যে তুমুল বাদানুবাদ আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে ইংরাজ গণতন্ত্রের পক্ষ সমর্থন করিয়া রোষোচ্ছ্বাসপূর্ণ, বহ্নিজ্বালাময়, তীব্র-ধিক্কারমুখরিত লাটিন ও ইংরাজী পুস্তিকা-পরম্পরা প্রণয়ন করেন। এই উগ্র বাদ-বিতণ্ডার মধ্যে মিলটনের এক অপ্রত্যাশিত রুদ্রচণ্ড মূর্তি প্রকটিত হয় ; এবং এই ব্যাপারে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি দুইটি চোখ হারাইয়া অন্ধত্বের তমো-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হন।

এই রাজনৈতিক আবর্তে আত্মনিমজ্জনের বৎসর কয়টিতে কবির কাব্য-সাধনা প্রায় বন্ধই ছিল। এই সময়ে কেবল কয়েকটি সনেট-রচনায় মিলটন-প্রতিভার এক অগ্নিদীপ্ত রূপ আবিষ্কৃত হয়। যে বহ্নিবেষ্টনীর মধ্যে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইতেছিল তাহার ভাস্বর বিভা ও আরক্ত ছটা এই মুষ্টিমেয় সনেটগুচ্ছের তপঃশীর্ণ দেহে ও আন্তর দ্যুতিতে আশ্চর্যভাবে বিধৃত হইয়াছে। মিলটনের সনেট ইংরাজী সাহিত্যের এক বিশেষ গৌরব। মিলটনের হাতেই সনেট সর্বপ্রথম একটা সম্পূর্ণ জাতীয় ও ব্যক্তিগত ভাব-প্রেরণার বাহন হইয়াছে। যে সমস্ত বিষয় কবির অন্তরকে মথিত করিতেছিল, তাহারাই তাঁহার সনেটের উপজীব্য হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কখনও বা কবির ব্যক্তি-জীবনের রুচি ও অভীপ্সা, কখনও বা তাঁহার রাজনৈতিক বা ধর্মবিষয়ক গভীর অনুভূতি, কখনও বিশেষ উত্তেজনাময় সংঘর্ষণে কবিচিত্তে আগ্নেয়গিরির ন্যায় উত্তপ্ত বহ্নিস্রাব, কোথায়ও বা তাঁহার গভীর ঈশ্বরনিষ্ঠা এক অপূর্ব সংযম, উদাত্ত গাম্ভীর্য ও অস্খলিত শিল্পসুষমার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মত পরবর্তী কবিরা সনেটের মধ্যে মিলটনের মনোভাব-প্রকাশকে তূর্যনিনাদ ও সমুদ্র-কল্লোলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। মিলটনের মধ্যে কবি ও ঋষির যে অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল এই সনেট-গুচ্ছ তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

'প্যারাডাইস্ লস্ট' (Paradise Lost) (১৬৬৭) মহাকাব্য মিলটনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ইহা পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর মহাকাব্যচয়ের অন্যতম। অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর অসাধারণ অধিকার, ভাষার ওজস্বিতা ও ধ্বনি-গাম্ভীর্য, ছন্দের গতি-বৈচিত্র্য ও দূর-বিসর্পিত, অবিচ্ছিন্ন ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রবাহ—যাহাকে একজন বিখ্যাত সমালোচক গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষাবর্তনের সহিত তুলনা করিয়াছেন—

এই সমস্তই এই অমর কাব্যের অননুকরণীয় গুণ। বলা হয়, যদি দেবলোকের ভাষা কখনও মানুষের লেখনীতে ধ্বনিত হওয়া সম্ভব হইয়া থাকে, তবে তাহা মিলটনের মহাকাব্যেই হইয়াছে। এই মহাকাব্য উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিলে যেন উহার ভাষার মধ্য হইতে মৃদঙ্গধ্বনির ন্যায় এক প্রকার স্থললিত অথচ উদাত্ত-গম্ভীর স্বর উত্থিত হইয়া পাঠককে অভিভূত করিয়া ফেলে।

মিলটনের কল্পনাও উহার ভাষাদেহের উপযুক্ত প্রাণশক্তি। ইহা স্থির, অকম্পিত জ্যোতিতে অপার্থিব, অলৌকিক বিষয়সমূহকে স্বচ্ছ ও প্রত্যক্ষ-গোচর করিয়াছে। নরকের বীভৎসতা ও তীব্রজ্বালাময় আকাশ-বাতাস, স্বর্গের পুণ্য-সুরভিত শান্ত, নিষ্পাপ আদি মানব-দম্পতির রমণীয় আবাসস্থল স্বর্গোদ্যান—এই সমস্ত অপরিচিত ও অবাস্তব দৃশ্যের মধ্যেও তাঁহার কল্পনা দৃঢ়, দ্বিধাহীন পদক্ষেপে বিচরণ করিয়াছে। বিশেষতঃ নরক-বর্ণনা ও Chaos বা সৃষ্টির পূর্বে বস্তুপুঞ্জের আকারহীন, বিশৃঙ্খল অবস্থার চিত্র মিলটনের কল্পনার চরম গৌরব। মানব-মন যতখানি বিভীষিকা পরিকল্পনা করিতে পারে, মিলটনের নরক-বর্ণনা তাহার চরম সীমায় পৌছিয়াছে।

কিন্তু মিলটনের এই স্বর্গ-নরক-বিহারী কল্পনারও মানবের পরিচিত জগতে আসিয়া পদস্খলন হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি মিলটনের বিশেষ সহানুভূতি ছিল না। তাঁহার একান্ত গম্ভীর অন্তঃকরণে হাস্য-পরিহাসেরও সম্পূর্ণ অভাব। কাজেই মানবের ক্ষুদ্র জীবনের চিত্র আঁকিতে গিয়া তাঁহার বিরাট কল্পনা পদে পদে হোঁচট খাইয়াছে। আদি দম্পতির যে গার্হস্থ্য চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে তেমনভাবে স্পর্শ করে না। আদম ও ইভ যেন স্বতন্ত্র রাজ্যের অধিবাসী—আমাদের সহিত তাহাদের বিশেষ কোন একাত্মতা নাই। ইভের চরিত্রে মাধুর্য ও কমনীয়তার অভাব নাই, কিন্তু সে মাধুর্য ও কমনীয়তা যেন একান্তই কৃত্রিম। আদমের গুরুমহাশয়গিরিও আমাদের অত্যন্ত বিরক্তিজনক। ইভের সহিত কথাবার্তায় ও ব্যবহারে তাহার প্রণয় অপেক্ষা পুরুষোচিত শ্রেষ্ঠত্বাভিমানই বেশী ফুটিয়াছে। সদা-সর্বদাই এই কর্তৃত্ব-প্রিয়তার ঝাঁঝ একটা উগ্র অহঙ্কারের মত তাহার চরিত্রের সহিত জড়িত হইয়াছে। ভগবানের আদেশ-লঙ্ঘনের প্রায় সম্পূর্ণ দায়িত্বই সে তাহার সহচারিণীর স্কন্ধে চাপাইয়া নিজ অসৌজন্যের পরিচয় দিয়াছে। দাম্পত্য-সম্পর্কের এই মাধুর্যহীন চিত্র মিলটনের অজ্ঞাতসারে তাঁহার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই আহরিত হইয়াছে। স্ত্রীর প্রতি পরুষ ব্যবহার, নিজ উচ্চ আদর্শের

মানদণ্ডে তাহাকে বিচার করিবার কঠোর প্রবৃত্তি মিলটনের ব্যক্তিগত জীবনের একটা প্রকাণ্ড কলঙ্ক। ইহা তাঁহার শিল্পকর্মকেও খণ্ডিত হইয়াছে।

স্বর্গের চিত্র আমাদের বিচার-বোধকে মোটামুটি পরিতৃপ্ত করিলেও মিলটনের ঈশ্বর আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারেন না। আদমের আত্মগৌরব যেন শতগুণে বর্ধিত হইয়া প্যারাডাইস লস্ট-এর ঈশ্বর-পরিকল্পনায় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। শেক্‌শপিয়ারের সহিত মিলটনের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈপরীত্য। মিলটনের ভগবান সর্বদাই আত্মপ্রসাদে স্ফীতমনা। বিদ্রোহী দেবদূতদিগকে শাস্তি দিয়া তিনি নিষ্ঠুর আনন্দ অনুভব করেন। তিনি সর্বদাই যুক্তি-তর্কের দ্বারা নিজের ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যস্ত। ভগবানের মুখে এইরূপ বাতপ্রতিবাদমূলক উক্তি বড়ই বিসদৃশ শোনায়। মানুষকে তিনি যে পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা অপেক্ষা মানবের অসহায়তাই বেশী ফুটিয়াছে। হয়তো মানুষ ভগবানের ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিলে এইরূপ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে—সে ভগবানকে নিজের ছাঁচে না ফেলিয়া পারে না।

মানুষ যখন ভগবানের মুখে বাণী আরোপ করে, তখন তাহার মধ্যে নিজ অভ্রান্ততার গৌরব-ঘোষণার সুর অপরিহার্যভাবে ধ্বনিত হয়। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণীয় উক্তি, 'সর্ববর্ধমান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ', ইহারই উদাহরণ। কোরানেও আল্লার অনুরূপ নিঃসন্দিগ্ধতার প্রমাণ মিলিয়া থাকে। তথাপি ধর্মতত্ত্ব হিসাবে ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই অনুভব করা যায়। গীতাতে ধর্মের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব ও উদার সর্বজনীন মত অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের প্রতি পরম সস্নেহ ব্যবহারের জন্য, এই সর্বজ্ঞতার অহংকার অনেকটা চাপা পড়িয়াছে। মিলটনের ধর্মালোচনায় কিন্তু উদারতা অপেক্ষা বিশেষ সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ মতবাদেরই প্রাধান্য—কাজেই ইহা যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিপক্ষের মত-খণ্ডনের অতিরিক্ত আগ্রহের দ্বারা ভারাক্রান্ত। অথচ তাঁহার রচনা সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র নহে। তাহার উপরে তাঁহার মতবাদও আধুনিক মনের উপযোগী নহে; বর্তমান যুগ তাঁহার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে মিলটনের প্রধান উদ্দেশ্য—মানুষের প্রতি ভগবানের আচরণের সমর্থন-প্রয়াস—অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়াছে। আর সেইজন্যই প্যারাডাইস্ লস্টে ঈশ্বর অপেক্ষা শয়তানই অধিকতর জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। অনেক সমালোচকের মতে প্যারাডাইস লস্টের নায়কের গৌরব শয়তানেরই প্রাপ্য।

সুগন্ধি বৃক্ষ-স্রাবের (amber) মধ্যে মক্ষিকার মৃতদেহের মত এই সমস্ত ক্ষুদ্র

ত্রুটি মিলটনের মহাকাব্যের অতুলনীয় গুণাবলীর সহিত তুলনায় প্রায় উপেক্ষণীয়। তাঁহার মহাকাব্য হিমালয়ের শৃঙ্গের মত নিঃসঙ্গ গৌরবে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সমতলভূমির লঘু, তরল সৌন্দর্য এখানে মিলিবে না; কুটীরবাসী মানুষের হাসিকান্না এখানে নীরব; হৃদয়বৃত্তির কোন বিশেষ জটিলতার এখানে একান্ত অভাব। এখানে জীবনের গতি একদিকে সহজ, সরল; অন্যদিকে মহান, গম্ভীর, পবিত্র, মহিমময়। মিলটনের সঙ্কীর্ণতাকে উপহাস করা অতি সহজ, কিন্তু তাঁহার অলৌকিক মহিমা এ পর্যন্ত অনমুকরণীয়ই রহিয়াছে। 'প্যারাডাইজ রিগেন্ড' (Paradise Regained) (১৬৭১) প্যারাডাইজ লস্ট-এ মিলটন আদি মানবের স্বর্গচ্যুতির কথা লিখিয়াছিলেন; প্যারাডাইজ রিগেন্ড-এ যীশুখৃষ্টের আত্ম-বলিদানের মূল্যে সেই স্বর্গরাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তির কাহিনী বিবৃত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে প্রথম মহাকাব্যটিতে তাঁহার কবিকল্পনার যেরূপ সমৃদ্ধি ও উল্লাস দেখা যায়, পরবর্তী কাব্যে তাহা অনেক ম্লান ও বিষণ্ণ। হারানোর গৌরব অপেক্ষা প্রাপ্তির আনন্দ যেন অনেক কম, অনেক বিবর্ণ। শয়তানের আর পূর্বগৌরব নাই। তাহার অগ্নি নির্বাপিত ও ইচ্ছাশক্তি অনেক দুর্বল। সমস্ত কবিতা ব্যাপিয়া যীশুরই একাধিপত্য কিন্তু যীশুর ব্যক্তিত্ব কেবল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে সীমাবদ্ধ। তাঁহার প্রলোভনজয়ের মধ্যে বিশেষ কোন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। সময় সময় মিলটনের ব্যক্তিগত রুচি পর্যন্ত খৃষ্টে আরোপিত হইয়াছে। মিলটনের যৌবনে ক্লাসিক্যাল কবিতার সৌন্দর্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিত। কিন্তু এখন বার্ধক্যে তিনি খৃষ্টের মুখ দিয়া তাঁহার যৌবনের কাব্যলক্ষ্মীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি এখন ধর্ম-সাহিত্য ছাড়া আর কাহারও আনুগত্য স্বীকার করেন না। যুদ্ধ-বিগ্রহে শান্তিদূত খৃষ্টের কোন রুচি নাই। সুতরাং যুদ্ধের উন্মাদনাও তাঁহার কাব্য হইতে নির্বাসিত। স্ত্রীলোকের প্রেম ও রাজত্বের মোহ মোহভঙ্গ-পীড়িত বৃদ্ধ কবির ন্যায় যীশু খৃষ্টও উপেক্ষা করিয়াছেন। মোট কথা খৃষ্টের জয় কেবল একটা শুষ্ক নীতির জয়রূপেই আমাদের মনে কোন আবেগ সঞ্চার করে না। মিলটনের প্রকৃতিতে যে গভীর ও সৌন্দর্যবিমুখ পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহারই বিষাদমন্থর প্রতিচ্ছবিরূপে কাব্যটির যাহা কিছু আকর্ষণ।

সামসন আগোনিস্টিস (Samson Agonistes) (১৬৭১), মিলটনের অন্তিম রচনা ও গ্রীক নাট্যাদর্শে রচিত ইংরাজি নাটক। মিলটনের শেষ জীবনের করুণ আত্মকাহিনী সামসনের বিষাদময় জীবন-পরিণামের মধ্য দিয়া এই নাটকে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সামসন যেমন তাহার স্ত্রীর মোহফাঁদে পড়িয়া তাহার

যৌবনের সমস্ত দীপ্ত মহিমা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, শত্রুর হাতে বন্দী হইয়া অশেষ লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিয়াছে ও শেষ মুহূর্তে সমস্ত রঙ্গমঞ্চটি ভূমিসাৎ করিয়া তাহার শত্রুবর্গ ও তাহার নিজের জন্য একই সমাধি রচনা করিয়া বীরোচিত প্রতিশোধ লইয়াছে, মিলটনও তেমনি তাঁহার যৌবনে একাধিক স্ত্রী কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া ও শেষ জীবনে রাজনৈতিক বিরোধীদের ক্ষমতা প্রাপ্তিতে নিজের সমস্ত পদমর্যাদা ও যৌবনের দৃপ্ত আশা-ভরসা হারাইয়া খ্যাতিহীন অগৌরবে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অন্তরে এক অনির্বাণ আত্মধিক্কারের তুষানলে দগ্ধ হইয়াও মিলটন নাটকের মাধ্যমে তাঁহার শত্রুদের উপর সামসনের মত চরম প্রতিশোধের অস্ত্র নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার অন্ধতা, স্ত্রী কর্তৃক প্রতারণা, ইতরের প্রভুত্ব-স্বীকার, নিজের ও দেশের আদর্শচ্যুতি—সমস্তই তাঁহার অন্তরে যে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া জাগাইয়াছে তাহা অগ্নিস্রাবের ন্যায় জ্বলন্ত ভাষায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। নাটক হিসাবে ইহা অভিনয়ের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। কেননা ইহাতে ঘটনার গতিবেগ ও বিস্ময় নাই। ইহা সম্পূর্ণরূপে পূর্বস্মৃতিরোমন্থন, যাহা অতীতে ঘটিয়াছে বার বার তাহারই মর্মানুপ্রবেশ ও নূতন করিয়া আস্বাদন। মিলটনের সমস্ত অহঙ্কার ও আত্মপ্রত্যয়, তাঁহার বিশ্ববিধানের অমোঘতায় অদম্য বিশ্বাস ও অবিচল নীতিবোধ জীবনের এই চরম অন্ধকারময় মুহূর্তে, পরাজয়ের এই সর্বব্যাপী শূন্যতায় ও অন্তিম শিখায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কবির আত্মপরিচয়-রূপেই ইহার শ্রেষ্ঠ আবেদন।

আনড্রু মার্ভেল (Andrew Marvell : ১৬২১—১৬৭৮) ধর্মমতে যদিও পিউরিটান ছিলেন, তথাপি তাঁহার কবিতায় নিসর্গপ্রীতি ও আনন্দময়, রসোচ্ছল জীবনোপভোগস্পৃহা লক্ষণীয়। তিনি পল্লীপ্রকৃতির রূপরসগন্ধ ও পাখীর সুরের বিচিত্র কাকলির সহিত অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত ছিলেন। প্রকৃতি-প্রেমের নিবিড় অনুভূতি তাঁহার কবিতার নূতন সুর। উদ্যানে ফল ও ফুলের শোভা বর্ণনা করিতে করিতে তিনি অন্তরে এক গভীর শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন এবং প্রায় ধ্যান তন্ময় হইয়া উঠিয়াছেন। কোন কোন কবিতায় পিউরিটান-সুলভ প্রবল ধর্মবোধের সহিত প্রকৃতির সৌন্দর্যসচেতনতার চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। তাঁহার প্রেম-কবিতায় ডানের কল্পনারীতি মোটামুটি অনুসৃত হইলেও, ইহার মধ্যে বলিষ্ঠ আন্তরিকতা ও আবেগময় অনুভূতির পরিচয় রহিয়াছে। ক্রমওয়েল-এর বিজয় ও মৃত্যু উপলক্ষ্যে তিনি যে কবিতাগুলি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রথাবদ্ধ প্রশস্তি-জ্ঞাপনের ভিতর দিয়া ক্রমওয়েলের ব্যক্তিত্বের যথার্থ গুণগ্রাহিতা ও কবির অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-

নিবেদন নিঃসন্দিগ্ধভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। মার্ভেল-এর কবিতায় ডান্‌-গোষ্ঠীর দুর্বোধ্য রচনারীতি ও কল্পনাতিরেক অকৃত্রিম সরলতা ও বলিষ্ঠ প্রকাশগুণে উন্নততর উৎকর্ষ-পর্যায়ে পৌছিয়াছে।

এই সময়ে Metaphysical বা 'দার্শনিক' কাব্যের প্রেরণা দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া শেষ পর্যন্ত মিলাইয়া যায় এবং ক্লাসিক্যাল কবিতায় বুদ্ধিসর্বস্ব এবং আবেগ ও কল্পনাচ্যুত কবিতার আবির্ভাব হয়। ভাব অপেক্ষা ভাষার সৌকর্যের দিকেই কবিরা মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। মসৃণ ও বিপরীতার্থক ও সমমাত্রিক বাক্য-সমাবেশে অতি-নিয়মিত রচনারীতিই কবিতায় প্রতিষ্ঠালাভ করিল। যে সমস্ত কবির রচনার মধ্য দিয়া এই পরিবর্তনধারা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, যাঁহারা এই দুই রীতির মধ্যে সম্বন্ধ-সূত্র যোজনা করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে **কাউলি** (Abrham Cowley : ১৬১৮—১৬৬৭), **ওয়ালার** (Edmund Waller : ১৬০৬—১৬৮৭) ও **ডেনহাম্** (John Denham : ১৬১৫—১৬৬৯)-এর নাম স্মরণীয়। কাউলির মধ্যে metaphysical বা 'দার্শনিক' রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি বেশ দেখা যায়। কল্পনার আতিশয্য, ভাবসমুন্নতি-লাভের ব্যর্থ প্রয়াস; হোমার, ভার্জিল, পিনডার প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের অনুচিকীর্ষা, বিশেষতঃ wit বা কাল্পনিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য—এই সমস্তই তাঁহার অতীতাশ্রয়ী মনের নিদর্শন। কিন্তু এইরূপ মানস-প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ, যুক্তিবাদ ও বুদ্ধি-নির্ভরতা, আবেগের ক্ষীণতা ও নীরস বিবৃতি ও তথ্য-পরিবেশনের প্রতি বিশেষ ঝোঁকও দেখা যায়। এই সংমিশ্রণ ব্যাপক রুচি-পরিবর্তনের সূচনা করে। কাউলির 'সময়পঞ্জী' বা Chronicle কবিতায় তিনি তাঁহার প্রণয়িনীদের একটি কালানুক্রমিক তালিকা সঙ্কলন করিয়াছেন, তবে এই উল্লেখে আবেগের পরিবর্তে আছে ব্যঙ্গ। তাঁহার 'আশার ছলন' বা Against Hope আর একটি স্মরণীয় কবিতা ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের (wit) যে নূতন আদর্শ তিনি কাব্যে প্রবর্তন করিলেন তাহার চমৎকার উদাহরণ। এই কবিতায় তিনি আশার যে সমস্ত সংজ্ঞা রচনা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে বুদ্ধিকৌশল ও ভাবের সূক্ষ্মতা ও যাথার্থ্য আশ্চর্যরূপে অভিব্যক্ত। To The Royal Society-র মত কবিতাটি তাঁহার বৈজ্ঞানিক উৎসাহ ও বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার সুদূর-প্রসারী আশার নিদর্শন। অবশ্য আধুনিককালে কাব্যের যে ধারণা চালু হইয়াছে তাহাতে এই সব রচনাকে কবিতা না বলিয়া পদ্য বলিলেও আপত্তি করিবার বিশেষ কিছু থাকে না।

কাউলি নয়, ওয়ালারই ক্লাসিক্যাল কাব্যধারার যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা। এই রচনা-রীতির যে প্রধান লক্ষণ—ছন্দ-মসৃণতা—তাহা সর্বপ্রথম ওয়ালার-এর কবিতাতেই দেখা যায়। সুরুচি, সুষমা, পরিচ্ছন্নতা, অতিরিক্ত মার্জন-প্রসাধনের অনুশীলনে আঙ্গিক-সৌষ্ঠব-অর্জন—নবযুগের কবিতার এই সমস্ত গুণগুলিরই প্রথম প্রকাশ তাঁহার রচনায়। কাউলির সঙ্গে তুলনায় তাঁহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, বুদ্ধির মারপেঁচ অনেক কম, কিন্তু রুচিবিকারও সেই পরিমাণে কম। ওয়ালার-এর উপমা ও ভাবপ্রকাশক চিত্রকল্পনির্বাচনের পিছনে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও বিষয়োপযোগী উদ্দেশ্য দেখা যায়—এগুলি নিছক অসংযত কল্পনার উচ্ছ্বাসমাত্র নহে। তাঁহার কাব্যে শৃঙ্খলা ও সম্ভ্রমবোধই প্রধান গুণ, ভাবের মৌলিকতা অপেক্ষা প্রকাশের পরিমিত ত্রুটিহীনতাই অধিক লক্ষণীয়।

তাঁহার কবিতার মধ্যে তিনি প্রকৃতি-বর্ণনা ও সাহিত্যবিচারের প্রয়াস প্রথম প্রবর্তন করেন—এই উভয় প্রবণতাই পরবর্তী কবিদের দ্বারা বহুলভাবে অনুসৃত। তাঁহার 'কুপারের পাহাড়' বা Cooper's Hill-এ (১৬৪২) প্রকৃতিকে নীতিশিক্ষার উপায়রূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহাও ক্লাসিক্যাল রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাব্যগুণ অপেক্ষা যান্ত্রিক উৎকর্ষই ওয়ালারের কবিতায় লক্ষণীয়।

৪

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্য বিচিত্র ও বহুমুখী। গদ্যসাহিত্য এই সময়েই প্রথম স্বপ্রতিষ্ঠ হয়। নানা পরস্পর-বিরোধী প্রচেষ্টা এই সময়ে পাশাপাশি ক্রিয়াশীল। এ যুগের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে আধুনিক মনোভাবের স্ফুরণ। ষোড়শ শতাব্দীর রেনাসেন্স আন্দোলনে যাহার সূচনা, বর্তমান যুগে তাহা দৃঢ়ীভূত হইয়া সাহিত্য ও চিন্তাক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে। আধুনিক মনোভাবের প্রধান অঙ্গ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব। বেকনের রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে কল্পনার প্রচুর সংমিশ্রণ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিজ্ঞান-চেতনা কল্পনাবর্জিত হইয়া স্বপ্রধান হইয়া উঠিল। সূক্ষ্ম, ধৈর্যশীল পর্যবেক্ষণের এবং বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণের দ্বারা প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চারিদিকে প্রকট হইল। 'রয়্যাল সোসাইটি' (Royal Society) নামে প্রথম বৈজ্ঞানিক সংসদ স্থাপিত হইয়া (১৬৬২) বিচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাকে সঙ্ঘবদ্ধ ও এক সাধারণ লক্ষ্যের দিকে নিয়ন্ত্রিত করিল। এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা সাহিত্যে ও ইতিহাসে পর্যন্ত সংক্রামিত হয়। নির্ভুল তথ্য-সঙ্কলন ও যুক্তিবাদ সাহিত্য-রচনার প্রধান লক্ষণ

দাঁড়ায়। এই যুগেই গদ্যের ভাষা পদ্যের প্রভাবমুক্ত হইয়া সহজ, সরল দৈনন্দিন প্রয়োজন-সাধন ও ভাব-বিনিময়ের উপযোগী হইল। গদ্যের এই বন্ধন মুক্তির পিছনে আছে ফরাসী গদ্যের অবদান। এই যুগেই ইংরাজী গদ্য সাহিত্য আদর্শবাদের উচ্চভূমি হইতে অবতরণ করিয়া বাস্তবের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিল। ইহার সুর লঘু, ভাবাবেশমুক্ত, ব্যঙ্গাত্মক—এক কথায় বৈঠকে সম্মিলিত নাগরিক জীবনের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি হইয়া উঠিল। কবিতা-ধর্মী, কল্পনা-প্রধান গদ্যের শেষ উদাহরণ স্যার টমাস ব্রাউনের (Sir Thomas Browne : ১৬০৫-১৬৮২) Religio Medici ও Urn Burial এবং জেরেমি টেলারের (Jeremy Taylor : ১৬১৩-১৬৬৭)-এর ধর্মবিষয়ক বক্তৃতাবলী।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের সাহিত্যে এই নূতন ভঙ্গীর অভিব্যক্তি প্রধানতঃ দুইটি ধারায়—(১) ব্যঙ্গ-কবিতা ও (২) দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসন-পুনঃপ্রাপ্তির যুগের নাটক।

ব্যঙ্গ-কবিতার প্রধান রচয়িতা ও **বাটলার** (Samuel Butler : ১৬১২-১৬৮০) ও **ড্রাইডেন** (John Dryden : ১৬৩১-১৭০০)। **বাটলারের** Hudibras (১৬৭৮) পিউরিটানদের ভণ্ডামি ও ধর্মালুতার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ চাবুক—একজন পিউরিটান ব্যবসায়ী ও তাহার ভৃত্যের হাস্যজনক ব্যঙ্গচিত্র। Sir Hudibras একজন স্থূলকায়, কোপনস্বভাব, কলহপ্রিয় ব্যক্তি, সে প্রেসবিটেরিয়ান (Presbyterian) ধর্মসম্প্রদায়ের উগ্র সমর্থক। তাহার অনুচর রাল্‌ফ্ (Ralph), Independent বা স্বাধীন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, এবং তাহারা যদিও সর্বপ্রকার নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ ও উহাদের অনুরাগী জনসাধারণের ঘোর বিরোধী, তথাপি তাহারা পরস্পরের সহিত ধর্মমতের সূক্ষ্ম বিভেদের জন্য বিবদমান ও তর্কযুদ্ধে ব্যাপৃত। ইহারা প্রাকৃত জনের স্থূলরুচি আনন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া উৎসাহের আতিশয্যে বিপদ বরণ করিতে বাহির হইয়াছে। ইহারা কখনও জয়ী, কখনও পরাভূত, কখনও বেত্রাহত ও লাঞ্ছিত, কখনও কারারুদ্ধ, কখনও বিপন্মুক্ত—এইরূপ নানা অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্যে, দর্শকদের মধ্যে হাসি-বিদ্রূপের প্রচুর খোরাক যোগাইয়া, হাবুডুবু খায়। শেষ পর্যন্ত একজন ভালুক-নাচিয়ে তাহাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয় কিন্তু জনসাধারণ ভালুকওয়ালার পক্ষ হইয়া আনন্দের এই মূর্তিমান বিঘ্নদ্বয়কে নাস্তানাবুদ করে। Hudibras যে ভণ্ড তাহা দেখাইতে কবি কার্পণ্য করেন নাই—সে এক ধনী বিধবার ঐশ্বর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহার প্রতি প্রেমনিবেদন করে। তাহার

পর এক জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী শুনিয়া সে হঠাৎ অন্তর্হিত হয়। এইরূপ এক উদ্দেশ্যহীন, পারম্পর্যরহিত উপাখ্যানসমূহের মাঝেই ব্যঙ্গ-আখ্যানটির আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

এই ব্যঙ্গকবিতায় পিউরিটান মনোভাবের অত্যুৎসাহ ও ধর্মান্ধতা প্রধান আক্রমণের বিষয়। ইহার রূপ ব্যঙ্গাতিরঞ্জনমূলক। কিন্তু ইহা মানব-দুর্বলতার এত বিচিত্র শাখাপথে বিচরণশীল, এত বিভিন্ন প্রকারের মোহের স্বরূপ-উদ্ঘাটনে নিবিষ্ট যে ইহার কোন নির্দিষ্ট আকার বা কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা দুরূহ। চরিত্রসমূহের বহিরাকৃতি সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণও অতি গভীরস্তরভেদী, কিন্তু তাহাদের কোন রক্তমাংস-সমন্বিত মানবিক সত্তা নাই। সমস্ত কবিতাটিতে ব্যঙ্গের অসাধারণ তীব্রতা ও আঘাতপটুতা উদাহৃত। প্রতিটি আঘাত অসম্ভব রকমের মর্মভেদী এবং ইহার পিছনে লেখকের সমস্ত অনুভূতি কেন্দ্রীভূত। চমকপ্রদ তীক্ষ্ণ উক্তি, শ্লেষের তীব্র দংশন-পরম্পরা অনায়াস নৈপুণ্যের সহিত পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গ যেমন অজস্রভাবে বর্ষিত হয়, লেখকের অন্তরে জ্বলন্ত রোষ, ঘৃণা ও অবজ্ঞার বিস্ফোরক সঞ্চয় হইতে যেন সেইরূপ বিষাক্ত ব্যঙ্গশ্লেষের কণা নিক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত সমাজ-দিগন্তে বিকীর্ণ হইয়াছে। ছন্দের নিপুণ প্রয়োগে কাব্যের ফলশ্রুতি আরও মর্মান্তিক দাহরূপে অনুভূত হইয়াছে। সময়ে সময়ে মনে হয় যে বাটলার-এর ব্যঙ্গ উহার বিষয়কে অতিক্রম করিয়া মানুষের সমস্ত মননশীলতার ও যুক্তিবাদের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধের প্রতি ধাবিত হইয়াছে। মানুষের অবচেতন মনে যে আত্মরতি, তাহার সত্যানুসন্ধানের মূলে যে অনিবার্য ভ্রান্তি ও মোহ তাহাকে অসত্য সিদ্ধান্তে লইয়া যায়, তাহাই যেন এই সর্বব্যাপী ব্যঙ্গের মধ্যে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। মানুষের প্রকৃতিই তাহার সত্যদৃষ্টির অন্তরায়, লেখক যেন এই কথাই আভাসে-ইঙ্গিতে বলিতে চাহিয়াছেন। তাহার কোন নিশ্চিত প্রত্যয় থাকা অসম্ভব, কেননা তাহার অনুসন্ধান-প্রণালীই অনিবার্যভাবে ভ্রমাত্মক। অবশ্য মোটামুটি কয়েকটি ধর্মমতের হাস্যকর আতিশয্য দেখাইয়া বাটলার আপাতদৃষ্টিতে Anglicanism ও সাধারণ অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনবোধকেই একমাত্র নির্ভরযোগ্য আশ্রয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। যাহা হউক, হাস্যরসসৃষ্টিতে, বাক্‌ভঙ্গী ও চিন্তাপ্রণালীতে বৈদগ্ধ্যমননের পরিচয়দানে ও ব্যঙ্গের নিপুণতম আঘাত-সন্নিবেশে Hudibras একখানি অনন্যসাধারণ গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

ড্রাইডেনকে (John Dryden : ১৬৩১—১৭০০) ইংরাজী সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল রীতির সার্থক প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি নিছক নিয়ম-শৃঙ্খলা, পরিমিতি-বোধ, গঠন-সুষমা ও অত্যন্ত মসৃণ, সমগতি ছন্দরীতির কবি ছিলেন না। তাঁহার মধ্যে পূর্বযুগের কল্পনা-ঐশ্বর্য ও আবেগ-উত্তেজনারও কিছু অবশিষ্ট ছিল ; metaphysical বা দার্শনিক গোষ্ঠীর কষ্টকল্পনা ও ভাবের উদ্ভট ও অতর্কিত চাপল্য-বিলাস হইতে তিনি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ছিলেন না। তাঁহার প্রথম দিকের কাব্যে কবি-ভাবনার উচ্ছলতা, ছন্দমসৃণতা-উল্লঙ্ঘনকারী শক্তিমত্তা, উদাত্ত ও পরিপূর্ণ গীতিস্পন্দ ও মাঝে মধ্যে প্রকাশের চমৎকৃতি ক্লাসিক্যাল আদর্শের দ্বারা অপ্রভাবিত। প্রথম জীবনে তাঁহার প্রাণোচ্ছলতা ও আবেগ-প্রখরতা শৃঙ্খলা ও পরিমিতিবোধের শাসন পুরাপুরি স্বীকার করে নাই। এলিজাবেথীয় যুগের মানস-দীপ্তির ও metaphysical বা দার্শনিক গোষ্ঠীর মননভাস্বর কাল্পনিকতার শেষ ঝলক তাঁহার অপরিণত বয়সের কাব্যে উত্তাপ ও আলোক সঞ্চার করিয়াছে। এমন কি তাঁহার পরিণত রচনাতেও সময়ে সময়ে এই মনোভঙ্গী ও বিচার-বুদ্ধির স্বাধীনতা, হঠাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগের বিচিত্র গতি ও ছন্দের অভিনবত্ব, নিয়মবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অনিচ্ছা তাঁহাকে তাঁহার উত্তর-সূরীদের হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার প্রথম যুগের খণ্ড কবিতায় রুচির অনিশ্চয়তা সুপরিস্ফুট। তাঁহার 'Stanzas Written in Memory of Cromwell', দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির উপলক্ষ্যে লেখা 'Astrea Redux' ও লণ্ডনে প্লেগ ও অগ্নিকাণ্ডের বৎসর-সম্পর্কিত 'Annus Mirabilis' ক্লাসিক্যাল রীতির আদর্শে পৌঁছে নাই। এই কবিতাগুলি নানা ছন্দে রচিত। তখন পর্যন্ত দশাক্ষর পয়ারের মসৃণ সুষমা ড্রাইডেনের প্রকাশ-বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

তাঁহার শেষ বয়সের গীতি-কবিতার মধ্যে Alexander's Feast, Ode for St. Cecilia's Day এবং Ode to the Memory of Mrs. Anne Killigrew তাঁহার কল্পনাসমুন্নতি ও জটিল রীতি-বন্ধনযুক্ত, উদাত্ত-ভাবপ্রকাশক কবিতা-রচনায় দক্ষতার পরিচয় বহন করে। ইহাদের মধ্যে অলঙ্কারমুখরতা, উচ্চভাষণ, গঠন-সুষমা ও প্রকাশ-ঋজুতা ছাড়াও সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অন্তরের অকৃত্রিম আবেগের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। স্বভাব-রোমান্টিক কবি ক্লাসিক্যাল সংযম ও আঙ্গিক-নিষ্ঠা স্বীকার করিলে যে মিশ্র সৌন্দর্যের উদ্ভব হয়, এই কবিতাগুলি সেই জাতীয় সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ।

ড্রাইডেনের পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পর, তিনি তাঁহার অমর ব্যঙ্গ ও ধর্ম-কবিতাগুলি রচনায় প্রবৃত্ত হন। Absalom and Achitophel (১৬৮১, ১৬৮২), The Medal, Mac Flecknoe (১৬৮২), Religio Laici (১৬৮৩) এবং The Hind and the Panther (১৬৮৭)—এই সমস্ত কবিতা ইংরাজী ব্যঙ্গসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ইহাদের প্রেরণা কোথাও বা রাজনৈতিক, কোথাও বা ব্যক্তিগত ও সাহিত্যসম্পর্কিত, আবার কোথাও বা ধর্মালোচনামূলক। কিন্তু উপলক্ষ্য যাহাই হউক, ড্রাইডেনের রচনারীতি অপূর্ব উৎকর্ষমণ্ডিত, বিষয়োপ-যোগিতা ও লক্ষ্যবেধশক্তিতে অতুলনীয়। ইহা একদিকে পূর্বযুগের সমস্ত অনিশ্চয়তা ও অতিরেক হইতে মুক্ত; অপরদিকে ইহাতে ভাব ও ভাষা, উদ্ভাবনী কল্পনা ও বীর্যবত্তার সহজ স্ফুরণ, চমকপ্রদায়ী অভিনবত্ব ও অভ্রান্ত রুচিবোধ এ সমস্তই এক অপূর্ব মণি-কাঞ্চন-মিলনে সংসক্ত হইয়াছে। ইংরাজীতে ক্লাসিক্যাল রীতির পূর্ণ যৌবনের প্রথম বিকাশ এই ভাষায়। এই ভাষায় মার্জিত অনুশীলনও যেমন, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবপ্রেরণাও তেমনিভাবে পরিস্ফুট। সংক্ষিপ্ত চিত্রায়নে, উপমা-অলংকার প্রয়োগে, অনুভূতি ও বিচারের যথাযথ সমন্বয়ে, চরিত্রচিত্রণে বস্তু-নিষ্ঠতা ও সংকেতময়তার মিলনে এই নবজাত ক্লাসিক্যাল রীতি যেমন শিল্পে অনবদ্য, তেমনি উত্তাপে প্রাণবান ও চিত্রধর্মিতায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত রচনার মূলে, কবির অন্তরলোকে যে এক দীপ্ত প্রাণবহ্নির শিখা, দুর্মদ অথচ স্থমিত কল্পনা ও অন্তর্ভেদী মনন পরস্পর-পরিপূরকরূপে, এক মহান্ পরিণতির সহায়ক উপাদানরূপে ক্রিয়াশীল, তাহাই ইহাদের অনন্যতার কারণ।

ড্রাইডেনের ছন্দে দশাক্ষর পয়ারের অনুবর্তন ছাড়াও আবেগ-অনুরূপ নানাবিধ বৈচিত্র্যসৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। দশাক্ষর পয়ারেও তিনি নানা বৈচিত্র্য প্রবর্তন করিয়াছেন। আগাগোড়া একই বিন্যাসরীতি ও ছন্দস্পন্দ অনুসরণ না করিয়া মাঝে মধ্যে অসম্পূর্ণ অর্ধপংক্তি স্থাপন ও অনেক স্থলে দুই পংক্তির পরিবর্তে তিন পংক্তিব্যাপী অন্ত্যমিল-প্রয়োগের দ্বারা তিনি তাঁহার ছন্দে বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছেন। তাহার পর মধ্যে মধ্যে এই তৃতীয় পংক্তিকে বার-অক্ষরে (alexandrine) সম্প্রসারণ করিয়া তিনি একঘেয়েমি প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী অনুবর্তী পোপ-এর সহিত তুলনা করিলেই ছন্দ-প্রয়োগে তাঁহার বৈচিত্র্য ও স্বকীয়তা পরিস্ফুট হইবে।

ড্রাইডেনের রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-কবিতাগুলি প্রধানতঃ দ্বিতীয় চার্লসের সহিত Shaftesbury-পরিচালিত উদারনৈতিক দলের যে তীব্র বিরোধ দেখা দিয়াছিল

তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। রাজশক্তির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া গণ-আন্দোলনের স্বৈরাচার ও চরমপন্থী মতবাদকে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার যে নীতি Shaftesbury ঘোষণা করিয়াছিলেন, ড্রাইডেনের ব্যঙ্গ কবিতাগুলির অধিকাংশই তাহার ফলশ্রুতি। এই দ্বন্দ্বে তিনি রাজশক্তিরই পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কতটা সুবিধাবাদ ও কতটা আন্তরিক প্রত্যয় ছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু ড্রাইডেন-এর অতুলনীয় শক্তি ও ব্যঙ্গকবিতা-রচনায় অনুপম উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই। The Medal কবিতাতে তিনি শুধু Shabtesbury-কে নহে, তাঁহার সমর্থক গোটা উদারনৈতিক (Whig) দলকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করিয়াছেন। ইহারা দলপতির তথাকথিত বিজয়ের স্মারকচিহ্নরূপে একটি পদক ক্ষোদিত করিয়া তাহাই কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন।

Absalom and Achitophel ড্রাইডেন-এর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-কবিতা। এই কবিতাটিতে ব্যঞ্জনাশক্তির সহিত তিনি বাইবেলের একটি আখ্যানকে সমসাময়িক ইতিহাসের রূপক-আবরণরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। Old Testament-এ David-এর পুত্র Absalom যেমন Achitophel-এর প্ররোচনায় পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, এখানেও তেমনি দ্বিতীয় চার্লসের অবৈধ সন্তান, Duke of Monmouth, Shaftesbury-র কুমন্ত্রণায় সিংহাসনপ্রাপ্তির আশায় স্নেহশীল উদারহৃদয় পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। Monmouth-এর উপর ড্রাইডেন-এর একটা স্নেহমিশ্রিত প্রশ্রয় দেখা যায়—তরুণ যুবকের অবাস্তব-কল্পনারঞ্জিত মনকে বিপদগামী করা সহজ। তাঁহার সমস্ত ক্রোধবহ্নি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে কুটিল-ষড়যন্ত্রকারী, প্রতারণা-বিশারদ, অসাধারণ-মানসিক-শক্তিসম্পন্ন, রাজ্যে অশান্তি-উপদ্রব সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত, উচ্চাভিলাষী Shaftesbury-র উপর। তাঁহার ব্যঙ্গকে আরও মর্মভেদী করার জন্য ড্রাইডেন যেন অনেকটা অপক্ষপাত বিচারের ভান করিয়াছিলেন। তিনি Shaftesburyর সদ্‌গুণ অস্বীকার করেন নাই এবং তাঁহার আক্রমণকে যেন ইচ্ছা করিয়া দ্বেষমুক্ত, ন্যায়নিষ্ঠ, যথাসম্ভব অতিরঞ্জনহীন ও বিচারকের সত্যানুসন্ধানী মনোভাবপ্রসূতরূপে দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই উত্তেজনাহীন প্রশান্তির অন্তরালে তাঁহার অন্তরে যে অনির্বাণ রোষানল প্রজ্বলিত আছে তাহা কবিতাটির ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। তাঁহার স্থির, অকম্পিত হস্তে নিক্ষিপ্ত তীরগুলি অভ্রান্ত লক্ষ্যে মর্মের আরও গভীর স্তরে বিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার রূপকপ্রয়োগ এমন আশ্চর্যভাবে সার্থক হইয়াছে যে Absalom, Achitophel, Shimri, Corah, Doeg, Og প্রভৃতি ব্যক্তি-অভিধাগুলি

এক একটি সার্বভৌম-গুণবাচক তাৎপর্য লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

ড্রাইডেনের সাহিত্যিক বিতণ্ডার নিদর্শন ব্যঙ্গাতিরঞ্জনমূলক, মহাকাব্যের ছদ্মগৌরবমণ্ডিত (ম্যাক্ ফ্লেকনো) Mac Flecknoe। এই কবিতায় তিনি একজন প্রতিদ্বন্দ্বী কবি, শ্যাডওয়েলকে অত্যন্ত হেয় ও উপহাসাস্পদ করিয়া দেখাইয়াছেন। অবশ্য ড্রাইডেনের সহিত তুলনায় শ্যাডওয়েল অত্যন্ত নিম্নস্তরের লেখক—এই দুই অসমান যোদ্ধার মধ্যে দ্বৈরথ যুদ্ধের অনুষ্ঠান আমাদের নিকট অবশ্য খানিকটা বিসদৃশ মনে হয়। যেমন প্রাচীন মহাকাব্যসমূহে কোন কোন অখ্যাত সৈনিক মহাবীরের হাতে মৃত্যু লাভ করিয়া তাহাদের ন্যায্যপ্রাপ্যাতিরিক্ত প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে, তেমনি শ্যাডওয়েলও যুগের শ্রেষ্ঠ কবির হস্তনিক্ষিপ্ত দিব্যায়ুধবিদ্ধ হইয়া অমরতার স্বর্গলোকে স্থান পাইয়াছেন। অবশ্য ইতিহাসের বিচারে শ্যাডওয়েলের নিকৃষ্টতা স্বীকৃত হইলেও, সমসাময়িক কালে নাট্যকার হিসাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠা যে বিশেষ কম ছিল না ইহাও মনে রাখিতে হইবে। এই কবিতাতেও ড্রাইডেন তাঁহার পদোপযোগী সংযম ও সম্ভ্রমবোধ দেখাইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে আরও সিদ্ধকাম হইয়াছেন।

ড্রাইডেনের ধর্মালোচনামূলক কাব্য দুইটি—Religio Laici এবং The Hind and the Panther। বিস্ময়ের কথা এই যে, এই দুইখানি কাব্যে লেখক প্রায় দুই সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদের সমর্থকরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রথমটিতে তিনি Anglicanism বা ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় ধর্মের জয়গান করিয়াছেন; দ্বিতীয়টিতে, তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম অবলম্বন করার পর এই ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে ব্রতী হইয়াছেন। সে যাহা হউক ধর্মবিতণ্ডারূপ কাব্যের প্রতিকূল বিষয়ে তিনি যে এত গভীর আবেগ, অচ্ছেদ্য যুক্তিশৃঙ্খলা ও কাব্যোৎকর্ষ দেখাইতে পারিয়াছেন তাহা তাঁহার কৃতিত্বের বিস্ময়কর প্রমাণ। Religio Laici-তে মননের ঘনসন্নিবিষ্ট শক্তিমত্তার সঙ্গে গভীর-উদার সৌন্দর্যবোধ, দার্শনিক অনুভূতির জ্বলন্ত উৎসাহ, ও সংযত কল্পনার অন্তর্গূঢ় গীতিগুঞ্জন মিশিয়া যুক্তিপ্রধান বিচার-বিতর্কের এক দীপ্ত রূপান্তর সংঘটিত করিয়াছে।

The Hind and the Panther-এ প্রাণিজগতের রূপকে ধর্মতত্ত্বালোচনা করা হইয়াছে। রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মকে শান্ত-নিরীহ মৃগীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে এবং নানা বর্ণরেখা ও বিন্দুর সংমিশ্রণে চিত্র-বিচিত্রদেহ, সত্যের শুভ্র বিশুদ্ধি হইতে বিচ্যুত, হিংস্রভাবাপন্ন Anglican ধর্মকে চিতাবাঘের সহিত

উপমিত করা হইয়াছে। অন্যান্য উগ্র চরমপন্থী ধর্মসম্প্রদায়গুলি অন্যান্য হীন ও বীভৎসাকার পশুদের রূপকে চিহ্নিত হইয়াছে। সময় সময় বাহিরের রূপক ও অন্তর্নিহিত ভাবের মধ্যে সীমারেখা পরস্পরের সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। অবশ্য Anglican ধর্মমত সম্বন্ধে লেখকের কিছুটা মমতা ছিল, ধর্মান্তরগ্রহণের পরও তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের তুলনামূলক বিচারে কবি যতটা সম্ভব পক্ষপাতহীন হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার নিজের ধর্মের দিকে একটু বেশী না ঝুঁকিয়া পারেন নাই। চিন্তার সুস্পষ্টতা, প্রকাশের ঋজু শক্তিময়তা, সরল ভাবনিষ্ঠা, আখ্যানের সরসতা, প্রবচনধর্মী স্মরণীয় উক্তির প্রাচুর্য ও ছন্দের অনায়াস প্রবহমানতা ও একঘেয়েমিমুক্ত মসৃণতা—এই সমস্ত গুণসমাবেশে কাব্যটিতে কবির প্রতিভার একটি সমুজ্জ্বল পরিচয় মুদ্রিত হইয়া আছে। ছন্দের সুঠাম বন্ধনে গ্রন্থের যুক্তিতর্কধারা কোনও-রূপ বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া বরং আরো স্বচ্ছন্দ গতিতে, আরও প্রাণবেগচাঞ্চল্যে লীলায়িতরূপে অগ্রসর হইয়াছে।

ব্যঙ্গ-কবিতাই ড্রাইডেনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। সে সময়ে রাজনৈতিক ও ধর্মবিষয়ক ব্যাপারে যে তীব্র মতভেদ প্রচলিত ছিল, ড্রাইডেন তাহার এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রতিপক্ষকে তীক্ষ্ণতম বিদ্রূপাস্ত্রে বিদ্ধ করিয়াছেন। ব্যঙ্গ-কবিতা যে এত ধারাল ও মর্মভেদী হইতে পারে, তাহাতে প্রতিপক্ষকে যে এত হেয় ও হাস্যাস্পদ করিয়া দেখান যাইতে পারে, তাহা ড্রাইডেনের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং ড্রাইডেনকে এই জাতীয় কবিতার প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। তাঁহার প্রত্যেকটি পংক্তি যেন এক একটি অব্যর্থ শেলাঘাত। উপর্যুপরি কয়েকটি পংক্তি আঘাতের পর আঘাত স্তূপীকৃত করিয়া প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করে। ড্রাইডেনের পয়ারকে একজন সমালোচক যুগলাশ্ব-বাহিত বিদ্যুন্ময় রথের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

ড্রাইডেনের ব্যঙ্গ-কবিতায় আরও কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। প্রথম, কবিতার মধ্যে কূট-যুক্তিতর্কে অচ্ছেদ্য-শৃঙ্খল-রচনায় তাঁহার পারদর্শিতা অসামান্য। প্রতি যুগ্ম-পয়ারে এই শৃঙ্খলে একটি নূতন গ্রন্থি যোজনা হইয়াছে। সর্বশুদ্ধ কবিতাটি যেন একটি মার্জিত ইস্পাতের অঙ্গাবরণের (armour) মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার ব্যঙ্গ-কবিতায় একটা সনাতন সাহিত্যিক গুণ আছে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর অর্থাৎ ব্যঙ্গকবিতা একটা বিশেষ উপলক্ষ্যে রচিত হয়। এই উপলক্ষ্য সাময়িক তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি করিলেও, তাহার আবেদন

নিতান্তই সাময়িক এবং বাদ-বিতণ্ডা পুরাতন হইলে কবিতাটি একেবারে শুষ্ক ও রসহীন হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমাদের দেশে গত শতাব্দীতে ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের সহিত জড়িত বাদ-প্রতিবাদ ও বিদ্রূপাত্মক রচনা আধুনিক পাঠকের নিকট অর্থহীন কোলাহল ও ভোঁতা কাটারির খোঁচা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ড্রাইডেনের কবিতার বিষয়বস্তু পুরাতন হইলেও তাহার রস চির-নবীন। ক্ষণিক মতভেদের মধ্যে যে চিরন্তন সত্য নিহিত আছে তাহা যেন তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছেন। সাময়িক তর্কের ধূলিজাল ও ঝড়ো হাওয়া থামিয়া গেলে দৃষ্টিরোধকারী বিক্ষোভের অভ্যন্তরে যে শাশ্বত দ্বৈতভাব স্থিরভাবে বিরাজিত তাহা নজরে পড়ে। এই শাশ্বতই ড্রাইডেনের কবিতার ভিত্তিভূমি।

তৃতীয়তঃ এই সমস্ত কবিতায় চরিত্র-সৃষ্টি আর একটি লক্ষণীয় বস্তু। সাধারণতঃ ব্যঙ্গ-কবিতা ব্যক্তি-বিশেষের বিরুদ্ধেই লিখিত হয়, এবং ড্রাইডেনেরও তাহা হইয়াছে। কিন্তু প্রতি ব্যক্তিরই একটি প্রতিনিধিত্বমূলক বা সর্বজনীন রূপ আছে, উহা শ্রেণী-বিশেষের বা কোন বিশেষ চারিত্রিক প্রবণতার মূর্ত বিকাশ। ড্রাইডেনের ব্যঙ্গ-কবিতা ব্যক্তিগত সীমা অতিক্রম করিয়া এই প্রতিনিধিত্বমূলক স্তরে পৌছিয়াছে। ব্যক্তিগুলি সম্বন্ধে আজ আমাদের বিশেষ কৌতূহল নাই; তাহারা অতীত যুগের বিস্মৃতির তলে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা যে শ্রেণীর বা চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধি, তাহারা সনাতন, সকল যুগেই বিদ্যমান। কাজেই ড্রাইডেনের কবিতা সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ ও রসবোধ আজও অটুট।

৫

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ কৃতিত্ব হইতেছে ইহার নাটকে। রাজা দ্বিতীয় চার্লস তাঁহার নির্বাসনকালে ফরাসী দেশে বাস করিয়াছিলেন ও ফরাসী হাব-ভাব, আচার ও নৈতিক আদর্শ ইংলণ্ডে আমদানি করেন। এই সময়ে ফ্রান্স সভ্যতা, শিষ্টাচার ও আদব-কায়দায় ইউরোপের আদর্শ-স্থানীয় ছিল। একদিকে ইহার কথোপকথনের সরস চাতুর্য, বুদ্ধির তীক্ষ্ণ স্ফূর্তি ও আচার-ব্যবহারের সূক্ষ্ম সৌকুমার্য, অপর দিকে ইহার কলুষিত নৈতিক জীবন আমাদের যুগপৎ শ্রদ্ধা ও ঘৃণার উদ্রেক করে। ফরাসী জীবনের ভাল ও মন্দ এই দুই দিকই রাজার অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ডে পৌছিল। সাহিত্য এই সামাজিক রীতি-

নীতির প্রভাব এক নূতন ধরনের নাটকের প্রবর্তন করিল। ইহাকেই Restoration Comedy বা রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তিযুগের কমেডি আখ্যায় অভিহিত করা হয়। আমরা ইহাকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কমেডি বলিতে পারি।

এই নাটকে দেশের অধঃপতিত নৈতিক জীবন দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহার নায়ক-নায়িকাদের জীবনের প্রধান কাম্য হইতেছে আমোদ, চটুলতা ও ইন্দ্রিয়সুখ-স্পৃহা। কোনরূপ নীতির শাসন ইহারা মানে না। ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে ইহাদের মতামত অত্যন্ত বেপরোয়া ও অসঙ্কোচ। ধর্ম ও পবিত্রতা, সংযম ও সুরুচি ইহাদের নিকট উপহাসের বস্তু। সমাজের সমর্থন ও সহানুভূতি কিন্তু ইহাদেরই দিকে। যে ব্যক্তির গার্হস্থ্য জীবন এই সকল বেহায়া লম্পটের দ্বারা বিপর্যস্ত, তাহাকেই নির্বোধ ও হাস্যাস্পদ করিয়া চিত্রিত করা হয়। জীবনের করুণ ও মহান্ দিক এই নাটকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। ইহাতে জীবনের যে রূপ দর্শিত হইয়াছে তাহাতে ধারণা হয় যে জীবন যেন এক অন্তহীন, প্রমোদ-বিহ্বল বিলাস-রজনী মাত্র। এই নাট্য-সাহিত্যের সাক্ষ্য অনুসারে সহজেই বোঝা যায় যে এই যুগে ইংরাজ জাতির নৈতিক অধোগতি নিম্নতম স্তরে পৌছিয়াছিল। অবশ্য এ যুগের নাটকে তখনকার জীবনের সামগ্রিক ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন মনে করিবার কোনো কারণ নাই। শহর হইতে দূরে গ্রাম্যজীবনে এবং শহরেও সাধারণ মানুষের জীবনে নৈতিক অধঃপতন এত গুরুতর ছিল না। রাজসভা ও তাহার উপকণ্ঠেই এই দশা হইয়াছিল। এখনকার নাটক রাজসভাসদ এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় স্ত্রীপুরুষদের লইয়াই রচিত। সাধারণ মানুষের স্থান এখানে অতি সংকীর্ণ।

তবে এই নাটকের সপক্ষেও কিছু বলিবার আছে। ইহার ভাষা সূক্ষ্মাগ্র ও মার্জিত, ইহার রসিকতা শাণিত ও উজ্জ্বল, ইহার কথোপকথনের চটুল ঘাত-প্রতিঘাত নাট্যসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শেক্‌শপিয়ারের নাটকে যে পরিহাস-রসিকতা আছে, তাহা একদিকে যেমন বুদ্ধিতে ভাস্বর, তেমনি অপর দিকে গভীর ভাবাবেগে আর্দ্র ও সমবেদনায় স্নিগ্ধ। শেক্‌শপিয়ারের সহিত অন্য কাহারও তুলনা চলে না। কিন্তু শেক্‌শপিয়ারকে বাদ দিলে এবং এই নাটকের নৈতিক আবহাওয়া বরদাস্ত করিতে পারিলে অন্যান্য নাট্যসাহিত্যের সহিত তুলনায় ইহার মান খুবই উঁচুদরের। এলিজাবেথীয় যুগের উচ্চ কবি-কল্পনা এখানে নাই, কিন্তু তাহার পরিবর্তে আছে গভীর সমাজজ্ঞান এবং বিলাসসর্বস্ব মানুষের মানসিক প্রবণতার অন্তরঙ্গ পরিচয়। তাহার উপর, পূর্বতন যুগের ভাষাগত অসংযম ও ভাবগত

অতিরঞ্জন এখানে নাই—এখানে সমস্তই স্বচ্ছ, পরিমিত ও স্বভাবানুযায়ী। দোষে গুণে সপ্তদশ শতাব্দীর নাট্যসাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

এই যুগের নাট্যসাহিত্যে কমেডি ও ট্রাজেডি উভয়বিধ রচনারই পরিচয় আছে, যদিও কমেডিই যুগমানসের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। কমেডি-রচয়িতাদের মধ্যে **ড্রাইডেন, উইচারলি** (William Wycherley : ১৬৪০—১৭১৫), **ইথারেজ** (George Etherege : ১৬৩৪—১৬৯০), **কনগ্রীভ** (William Congreve : ১৬৭০—১৭২৯), **ভ্যানবার্গ** (John Vanburgh : ১৬৬৪—১৭২৬) ও **ফারকুয়ার** (George Farquhar : ১৬৭৮—১৭০৭) শীর্ষস্থানীয়।

ড্রাইডেন-এর Marriage-a-la-Mode (১৬৭২), ইথারেজ-এর The Man of Mode (১৬৭৬), উইচারলির The Plain Dealer (১৬৭৭), কনগ্রীভ-এর The Way of the World (১৭০০), ভ্যানবার্গ-এর The Relapse (১৬৯৬) এবং ফারকুয়ার-এর The Beaux Stratagem (১৭০৭) এই নাটকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই নাট্যকারদের দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ; এই বিভাজনরেখা ১৬৯৮-এ জেরেমি কোলিয়ার-এর সমকালীন নাট্যশালার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযোগ ও নিদারুণ নিন্দাবাদের দ্বারা চিহ্নিত। ড্রাইডেন, ইথারেজ, উইচারলি, ইহারা প্রথম যুগের অন্তর্গত ; কনগ্রীভ, ভ্যানবার্গ, ফারকুয়ার এই তিনজন নাট্যকার কোলিয়ার-এর আক্রমণের ফলে যেন খানিকটা সংযত এবং সুরুচি ও নীতিবোধের প্রতি কতকটা সচেতন। কিন্তু, খুব সূক্ষ্মভাবে না দেখিলে এই পার্থক্য বিশেষ চোখে পড়ে না।

ড্রাইডেনের কবিপ্রসিদ্ধির দ্বারা নাট্যকার ড্রাইডেনের নাম চাপা পড়িয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অথচ নাট্যকার হিসাবে ড্রাইডেন উপেক্ষণীয় নন। কমেডি ও ট্রাজেডি এই দুই প্রকার নাটকেই ড্রাইডেন সিদ্ধহস্ত। তাঁহার কমেডিতে সূক্ষ্মতা খুব বেশী না থাকিলেও, সেগুলি এই সময়ের অন্য নাটক অপেক্ষা বেশী জীবনানুগ ও কম রুচিবিকারগ্রস্ত।

উইচারলির মধ্যে সাধারণ যুগপ্রবণতা ও বিস্ময়কর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ছাড়াও কিছু ব্যক্তিগত বিশেষত্ব আছে। তাঁহার রুচিহীনতার আতিশয্যের মধ্যেও যেন একটা ক্ষীণ নীতিবোধের অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা যায়। শুধু যুগানুবর্তন ছাড়াও তাঁহার যেন একটা ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী, লম্পট নায়ক অপেক্ষা বিব্রত সাধারণ নাগরিকের সহিত অধিকতর নৈকট্যবোধ আছে। সাধারণ, নির্বিশেষ চিত্রের মধ্যে কোথাও কোথাও

একটা বিশেষ পরিস্থিতির স্বাতন্ত্র্য-পরিস্ফুটনপ্রয়াস দেখা যায়। তাঁহার চরিত্র-চিত্রণে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববোধ বা শ্রেণী-প্রতিনিধির মধ্যে ব্যক্তিত্বদ্যোতনার বিশেষ চিহ্ন অনুপস্থিত। তবে The Plain Dealer-এর বিধবা Blackacre ইহার ব্যতিক্রম। উইচারলির সাহিত্যিক গুণের মধ্যে জীবনানুগ অঙ্কন, সংলাপে বেগবান ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণশক্তি, রসিকতার স্ফূর্তিময় প্রকাশ ও জীবনদর্শনে উচ্চশ্রেণীর ব্যাপক নীতিভ্রষ্টতা ও যৌন শিথিলতার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত ইংরাজের একটা অসহায়, দিশাহারা ক্রোধোচ্ছ্বাসের প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করা যায়।

এই নাট্যকারগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন কনগ্রীভ। কনগ্রীভের মধ্যে যুগনাটকের সমস্ত দোষ-গুণ এবং লেখকের বিশিষ্ট মেজাজ ও শিল্পবোধ, ললিত-লঘু কল্পনার প্রভাবে, একটা উচ্চতর সংশ্লেষে মিলিত হইয়াছে। লেখক যেন বাস্তবের স্থূল মৃত্তিকা ছাড়াইয়া এক লঘু, বায়বীয় কল্পনা-সরস ভাবলোকে উঠিয়া গিয়াছেন। এই সংশ্লেষের ফলে তাঁহার রচনায় যুগের সাধারণ স্থূল রুচির উপরে একটা অনুশীলনজাত, অনায়াস-অভ্যস্ত সংলাপ-নৈপুণ্য ও শ্লেষ-শোভনতার ইঙ্গিত, এবং কদর্য বিষয়ের মধ্যেও একটু সূক্ষ্মতার মসৃণ স্পর্শ অনুভব করা যায়। দীর্ঘকালের অনুপস্থিতির পর কল্পনার মৃদু উচ্ছ্বাস যেন অশ্লীলতা ও কুরুচির সদা-আবর্তন-ক্লিষ্ট বদ্ধ আবহাওয়ায় একটু স্বস্তির স্বাদ আনে। ঘুলাইয়া-উঠা পাঁকের মধ্যে পঙ্কজের আভাস যেন ঈষৎ লক্ষ্যগোচর হইয়া উঠে। The Way of the World বা 'দুনিয়ার দস্তুর' Restoration নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটক। মিলিমাণ্ট (Millimant) ও মিরাবেল (Mirabel) যেন অনেকটা রোমাণ্টিক কল্পনা-জগতের অধিবাসী। ইহাদের প্রণয়াকৃতিতে প্রথানুবর্তন ও বুদ্ধি-প্রভাবিত কথা-কাটাকাটির মধ্যেও যেন কিছুটা হৃদয়ের আবেগ আছে। শিল্পকুশলী লেখক ইহাদের চিত্রাঙ্কনের রংকে এমনভাবে মৃদু করিয়াছেন যাহাতে ইহাদিগকে নিছক স্থূল ইন্দ্রিয়-লালসার ক্রীড়নক মাত্র মনে না হইয়া কিছুটা কল্পলোকবাসী বলিয়া বোধ জন্মে। Restoration Comedy-র কল্পনাময়তা, বাধাবন্ধনহীন জীবনোল্লাসকে রঙ্গীন শীকরোৎক্ষেপের সহিত তুলনা করিয়া পরবর্তী যুগের সমালোচক চার্লস্ ল্যাম্ব ইহাকে নীতিবিদের উগ্র ও নির্মম দণ্ডবিধান-বিচার হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন। ল্যাম্ব-এর এই ওকালতি কনগ্রীভ ও ফারকুয়ার-এর নাটক সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কনগ্রীভ-এর নাটকে মানবের কোনো নূতন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত না হইলেও, ইহাতে স্ত্রীচরিত্রের মোহিনী ও ছলনাময়ী প্রকৃতির গভীর রহস্যের উপর খানিকটা আলোকপাত হইয়াছে।

Restoration-যুগে ট্রাজেডিরও দুইটি শ্রেণী ছিলঃ (১) বীররসাশ্রিত (Heroic) এবং (২) জাতীয় ঐতিহ্যানুসারী (Traditional)। বীররসাশ্রিত ট্রাজেডির মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই, কেননা বীররসের সহিত ট্রাজেডির একটা সহজ যোগ আছে। কিন্তু এই যুগে ট্রাজেডির উপজীব্য যে বীররস তাহা সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও যুগধর্ম-বিরোধী। এই বীরত্বের আদর্শ অবাস্তব, কল্পনালোকচারী ও বিদেশের, বিশেষতঃ স্পেনের, প্রভাব-চিহ্নিত। ইহা লেখা হইয়াছিল দশাক্ষর পয়ারে ও জীবনের সহজ ছন্দ অনুসরণের কোন তাগিদ ইহার ছিল না। ইহার নায়কেরা সবই আদর্শচরিত্র, অন্তর্দ্বন্দ্বহীন, অনায়াসে দুরূহতম কচ্ছ্রসাধন ও আত্ম-বিসর্জনে সক্ষম, বিমূর্ত গুণরাশির সমষ্টি, কাজেই মানবমনে ইহারা কোন রেখাপাত করিতে পারেন নাই। কৃত্রিমতার জন্য যুগ-জীবনের সহিত এই জাতীয় নাটকের একটা দুস্তর অসঙ্গতি ছিল। যখন কমেডি স্থূল আদিরসের ক্লেদপঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন, তখন ট্রাজেডির পক্ষে এই উর্ধ্বাকাশ-বিচরণ-প্রয়াস একটা অবিশ্বাস্য কল্পনাবিলাসে পরিণত হইয়াছিল।

ডি আভেনাণ্ট (D' Avenant)-এর The Siege of Rhodes নাটকে (১৬৬২) এই ধারার সূত্রপাত। তাহার পর ড্রাইডেন-এর বহুমুখী প্রতিভায় ইহার প্রসার ও পরিণতি। ড্রাইডেন-এর Heroic Tragedy বা বীররসাত্মক ট্রাজেডি-র মধ্যে The Conquest of Granada (১৬৬৯—১৬৭০) ও Aurang-Zebe (১৬৭৫) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নাটকগুলিতে বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার কর্নেইল (Corneille)-এর প্রভাব সহজলক্ষ্য। কিন্তু কর্নেইল-এর ভাব-সমুন্নতির মধ্যে যে তীক্ষ্ণ মননের চিহ্ন দেখা যায় ড্রাইডেনে তাহা নাই এবং কর্নেইলের নায়কদের প্রলোভন-জয় যেরূপ নিগূঢ় অন্তর্দ্বন্দ্বপ্রসূত, ড্রাইডেন-এ তেমন নহে। ড্রাইডেন-এর নায়কদের আত্মদমনে কোন মনস্তাত্ত্বিক সমর্থন নাই; মনে হয় যে তাহাদের উদাত্ত আত্মলোপ কৃত্রিম ও যান্ত্রিক আচরণ। প্রেম ও সংগ্রামে অতিমানবীয় ক্ষমতার স্বাক্ষর রাখাই যেন তাহাদের অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য ও সার্থকতা। একমাত্র Aurang-Zebe-এ কিছুটা অন্তরানুপ্রবেশ ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় আছে। অন্য সমস্ত নায়কই এক ছাঁচে ঢালা। চরিত্রের এই একঘেয়েমি ড্রাইডেন ঘটনা-বৈচিত্র্যের দ্বারা পূরণ করিয়াছেন। স্বাভাবিক ভাবেই, ভাবোত্তাপ ও অনুভূতির অকৃত্রিমতা-বঞ্চিত হইয়া, এই সমস্ত নাটকের ভাষা শব্দভারাক্রান্ত ও অলঙ্কারমুখর হইয়াছে; স্থানে স্থানে ব্যঞ্জনাশক্তি ও নাটকীয় চমকসৃষ্টির পরিচয় থাকিলেও ইহাকে মোটের উপর শূন্যগর্ভ ও অযথা-স্ফীত বলিয়াই মনে হয়।

ড্রাইডেন শেষ জীবনে শেক্‌পিয়ার-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণে প্রবৃত্ত হন ; বিদেশীয় অনুস্মৃতি ত্যাগ করিয়া তিনি জাতীয় ঐতিহ্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। তাঁহার 'All for Love' (১৬৭৮) শেক্‌শপিয়ার-এর 'Antony and Cleopatra'-র যুগোপযোগী নবরূপায়ণ। ইহার ভূমিকায় তিনি শেক্‌শপিয়ার-এর অলোকসামান্য প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন ও তাঁহার পূর্ব মত পরিবর্জন করিয়া সমিল পয়ারের পরিবর্তে নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অটওয়ে (Thomas Otway : ১৬৫২—১৬৮৫) তাঁহার Orphan ও Venice Preserved (১৬৮২) নাটকে এলিজাবেথীয় ট্রাজেডির ধারার অনুসরণ করিয়াছেন। ইহা অতীত যুগের রোমান্টিক মনোভাবের এক আশ্চর্য পুনরুজ্জীবন। এই রোমান্টিকতার সহিত পরবর্তী যুগের মনন-অনুশীলনজাত ক্লাসিক্যাল গুণের এক যথাযথ সমন্বয় হইয়াছে। ইহার হৃদয়দ্রাবী করুণ রস বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রণে গাঢ় হইয়াছে। লেখকের আলঙ্কারিকতা নাটকের প্রয়োজনানুযায়ী আবেগরুদ্ধ সংলাপের দ্রুত ছন্দ-পরিবর্তন ও ভাববৈচিত্র্যের দাবী মিটাইতে সক্ষম হইয়াছে। চরিত্র-পরিকল্পনায় পারম্পর্য ও গভীরতা উভয় গুণই রক্ষিত হইয়াছে। নাটকটি বন্ধুত্বের বিষাদময় পরিণতি—অর্থাৎ মনস্তত্ত্বভিত্তিক। ঘটনাবিন্যাস অনিবার্য পরিণতির দিকে একটা সুশৃঙ্খল অগ্রসরণের সহায়ক হইয়াছে। নাটকটির কমিক অংশের সহিত ট্রাজিক অংশের সার্থক মিলন ঘটিয়াছে। সর্বোপরি সমগ্র নাটকটির মধ্যে, নিয়তির জালক্ষেপণের প্রতি স্তরে এক তিক্ত, ক্ষুব্ধ, নৈরাশ্যধূসর বিষাদের সুর একটি কেন্দ্রীয় ভাবসংহতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শেক্‌শপিয়ার এই যুগে নাটক লিখিলে হয়ত এইরূপ নাটকই লিখিতেন।

৬

১৬২৫ হইতে ১৭০০-এর মধ্যে গদ্যরীতি নানা পরিবর্তনের স্তর অতিক্রম করিয়া ক্লাসিক্যাল যুগের প্রারম্ভে আডিসন ও স্টীল-এর হাতে এক স্থির রূপ লাভ করিল। গদ্যের অগ্রগতি হইয়াছে আবেগময়, কল্পনাস্ফীত সম্প্রসারণ হইতে প্রয়োজনাত্মক এবং শিষ্টরুচি ও সহজবোধ্যতার দ্বারা নিয়মিত, সংক্ষিপ্ত গঠনের দিকে। **স্যর টমাস ব্রাউন** (Sir Thomas Browne : ১৬০৫—১৬৮৫) প্রথমোক্ত রীতির শেষ উদাহরণ। তাঁহার Religio Medici বা 'রিলিজিও মেডিচি' (১৬৪২) ও Hydriotaphia বা Urn Burial ('আর্ন বেরিয়াল' : ১৬৫৮) এই ঐশ্বর্যময়, মনন-সমৃদ্ধির চাপে বহু-বিসর্পিত, ভাবপ্রাবল্যে তরঙ্গায়িত,

জ্ঞান ও তথ্যের অবিরল প্রয়োগে ভারাক্রান্ত, অথচ অন্তশ্ছন্দের অবিচ্ছিন্ন প্রবহমানতায় সুসংবদ্ধ রীতির এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ব্রাউন ব্যবসায়ে চিকিৎসক, কিন্তু মনোভঙ্গিতে অতিপ্রাকৃতে আস্থাশীল ধর্মসংস্কারবাদী (mystic) ছিলেন। তিনি ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে অলৌকিক উপাদানের সমর্থক ও যুক্তিবাদে অবিশ্বাসী ছিলেন। সংসারের অনিত্যতা ও পদমর্যাদার ক্ষণস্থায়িত্ব—ইহাই তাঁহার রচনার প্রধান উপজীব্য। এই বিষয়ে আলোচনায় তিনি যে তাঁহার প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, পৃথিবী ও সৌরজগতের গতিতত্ত্বের যে পৌনঃপুনিক উল্লেখ করিয়াছেন ও উদ্ভট চিন্তার মধ্যে যে উদাত্ত কল্পনা ও ভাবসমুন্নতির অনুপ্রবেশ ঘটাইয়াছেন, তাহাই তাঁহার অনন্যতার নিদর্শন। কাব্যে ডান যাহা ছিলেন, গদ্যরীতিতে ব্রাউন কতকাংশে তাহার সমধর্মী।

Hydriotaphia বইখানি একটা মাঠে পঞ্চাশটি চিতাভস্মধারক পাত্রের আবিষ্কারের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এখানে তিনি মৃত্যু ও তজ্জনিত বিস্মৃতির কথা চিন্তা করিয়াছেন। অতীত যুগে বিভিন্ন দেশে সমাধিস্থ করার বিভিন্ন প্রথার আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার প্রাচীন ইতিহাসে গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে। তিনি মনে করেন যে, যত দিন যাইতেছে মৃতের সংখ্যা তত বাড়িতেছে এবং মরণের সম্ভাবনা ততই হ্রাস পাইতেছে। তিনি মনে করেন যে, তাঁহার যুগেই মৃতের সংখ্যা জীবিতের সংখ্যাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে ও মনুষ্যজীবনে দিব্যলোক শেষ হইয়া রাত্রির অন্ধকার আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপ ধারণা হইতেই তাঁহার চিন্তার উদ্ভট মৌলিকতা ও কল্পনা-প্রাধান্যের নমুনা পাওয়া যাইবে। শব্দগাম্ভীর্যের জন্য তিনি অধিক মাত্রায় ল্যাটিন শব্দাবলী প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শব্দনির্মাণ বা বাক্যগঠন খুব সুখকর নহে। ছন্দস্পন্দ সম্বন্ধে সচেতনতা, জীবন ও জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে কল্পনাত্মক কৌতূহল এবং মনোভঙ্গীর যুক্তিবিমুখ ও বিশ্বাসপ্রবণ বিশিষ্টতা গদ্যরাজ্যে তাঁহার স্বকীয়তা নির্দেশ করে। ফরাসীদেশের মনটেন ও পাসক্যাল-এর সঙ্গে তাঁহার কিছুটা স্বভাব-ধর্মের মিল আছে; কিন্তু মনটেনের ন্যায় সরল, স্বচ্ছ আত্ম-উদ্ঘাটন ও পাসক্যাল-এর ন্যায় গভীর তত্ত্বজ্ঞান এই উভয় গুণেরই তাঁহার কিঞ্চিৎ ন্যূনতা ছিল।

জেরিমি টেলর (Jeremy Taylor : ১৬১৩—১৬৬৭) ধর্মযাজকের ভাষণকে উন্নত সাহিত্যের পর্যায়ে আরূঢ় করিয়াছিলেন। হুকার যে চার্চধর্মের যৌক্তিক ভিত্তিস্থাপন করেন, টেলর তাহার উপর প্রগাঢ় অনুভূতি ও আবেগময়তার কারুকার্যখচিত সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার Holy Living and

Holy Dying বা 'পবিত্র জীবন এবং পবিত্র মৃত্যু' (১৬৫০) একখানি শ্রেষ্ঠ ধর্ম-অনুভূতিবিষয়ক গ্রন্থ। বেদী হইতে উচ্চারিত তাঁহার ভাষণ-সমূহের (Sermons) মধ্যে যুক্তি অপেক্ষা কল্পনারই প্রাধান্য ; এই কল্পনা প্রাচীন সাহিত্যপাঠে পুষ্ট ও নিসর্গপ্রীতির সংস্পর্শে রমণীয়। এলিজাবেথীয় যুগের দীপ্ত আবেগ ও সুরের উচ্ছ্বাস তাঁহার ধর্মভাষণকে কবিত্বমণ্ডিত করিয়াছে। ঈশ্বরোদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রার্থনাকে তিনি ভরতপক্ষীর আকাশমার্গে ক্রমারোহণের সহিত তুলনা করিয়াছেন। চারিপাশের সৌন্দর্যের প্রতি তাঁহার এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল যে, সময় সময় মনে হয় তাঁহার প্রার্থনায় যেন জরুরি তাগিদের অভাব আছে—মন্থর সৌন্দর্যোপভোগ যেন তাঁহার উড্ডীয়মান আবেগকে কিছুটা ভারাক্রান্ত করিয়াছে। বিবাহের অঙ্গুরীয়ের উপর তাঁহার যে ভাষণ তাহাতে দাম্পত্য প্রেমের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মিলে। তাঁহার গদ্যরীতি বহু-বিচিত্র ও কতকাংশে আধুনিক সুরসম্পন্ন। ধর্মযাজক-গোষ্ঠী যে নবজাগরণের সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করিয়াছে ও তাঁহাদের রচনায় শুধু যে ধর্ম-চেতনা আছে তাহা নয়, উহার সঙ্গে মানস বৈদগ্ধ্যেরও যে সম্মিলন ঘটিয়াছে টেলর-এর ভাষণ হইতে তাহা বেশ বোঝা যায়।

মিলটন-এর বিবাহ-বিচ্ছেদ-সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিতণ্ডামূলক পুস্তিকাগুচ্ছ (১৬৪১—১৬৬০) ও গ্রন্থের নির্বাধ প্রকাশবিষয়ক সুবিখ্যাত Areopagitica বা 'আরিয়োপ্যাজিটিকা' (১৬৪৪) তাঁহার গদ্যরীতিতে দক্ষতার নিদর্শন। মিলটন নিজে তাঁহার গদ্যরচনাকে বামহাতের লেখা বলিয়া অভিহিত করিয়া উহাকে গৌণ স্থান দিয়াছেন এবং ইহা খানিকটা ঠিকও। কবি তিক্ত বাদানুবাদে লিপ্ত হইলে তাঁহার সুরের বিশুদ্ধি ও রুচির শোভনতা যে অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়, মিলটনের গদ্য-রচনা তাহার প্রমাণ। মল্লযুদ্ধের ঘর্মাক্ত উত্তেজনায় পাণ্ডিত্য যে অনেক সময় পরুষতায় ও নৈতিক সমুন্নতি যে শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে পরিণত হয়, তাহা এই রচনা-গুলিতে উদাহৃত হইয়াছে। মিলটন ব্যক্তিগত আক্রমণে ও রুচিবিগর্হিত গালা-গালিতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের স্তরেই নামিয়াছেন। তবে প্রতিভার অপপ্রয়োগেও কিছুটা দিব্য আভা থাকে, এবং এই আভাই মিলটনের গদ্যরচনাকে আলোকিত করিয়াছে। তাঁহার বিবাহবিচ্ছেদ পুস্তিকাগুলিতে তিনি তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত অভিযোগকে সার্বভৌম বিধানের কারণরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং সাধারণ পারিবারিক ও সামাজিক জীবননিয়ন্ত্রণের জন্য বিবাহবিচ্ছেদের পথে কিছু বাধা থাকা উচিত এই লৌকিক সত্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন। তিনি প্রতিভার

অসাধারণতা ও বিশেষ দাবীর নামেই সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার 'আরিয়োপ্যাজিটিকা'তে তিনি গ্রন্থ-প্রকাশের বিষয়ে সমস্ত বাধানিষেধ প্রত্যাহারের জন্য এক উদাত্ত আবেদন জানাইয়াছেন এবং নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার ও উদার নীতির মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার গদ্য-রচনা শৃঙ্খলাহীন ও জটিল-বাক্যবিধি-বিড়ম্বিত হইলেও মাঝে মধ্যে এমন উন্নত বাগ্‌ভঙ্গী ও উদ্দীপ্ত আবেগের পরিচয় দেয় যে উহা গদ্য-সাহিত্যে এক বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আছে।

আইজ্যাক ওয়ালটন (Issac Walton : ১৫৯৩—১৬৮৩)-এর The Complete Angler বা 'মাছধরিয়ে' (১৬৫৩) ছিপে মাছ ধরার কাহিনী। ইহাই বোধ হয় একমাত্র বই, যাহাতে খেলার নেশা বা সময় কাটাইবার উপায় উৎকৃষ্ট সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। মাছ-ধরার বর্ণনার মধ্যে লেখকের প্রশান্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষামুক্ত স্বভাব, বহিঃপ্রকৃতির নীরব শান্তিময় সৌন্দর্য-অনুভবের তন্ময়তা, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা-প্রতিষেধক সহজ-উৎসারিত আনন্দ সবই এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় ছড়ান আছে। ইহারই ফাঁকে ফাঁকে লেখক কাব্যের পংক্তি স্মরণ করিয়াছেন; জীবনতত্ত্বের আনন্দময় স্বরূপে মশগুল হইয়াছেন; আর উহার প্রতিটির উপভোগের মধ্যে ভগবানের করুণা ও মানবপ্রীতির পরিচয় পাইয়াছেন। আদর্শায়িত পল্লী-জীবনানুরাগের (pastoralism) যে ধারা প্রাচীন যুগ হইতে প্রবাহিত আছে, ওয়ালটন সেই ধারাতে নিজ ব্যক্তিগত রুচি ও অভিজ্ঞতা-প্রসূত স্রোতোবেগ সঞ্চার করিয়াছেন।

বুনিয়ান (Bunyan : ১৬২৮—১৬৮৮)-এর The Pilgrim's Progress 'তীর্থযাত্রীর কাহিনী' (১৬৭৬) সেই যুগের একটি অনবদ্য রচনা। বুনিয়ান একজন অশিক্ষিত টিন-মিস্ত্রী। বাইবেল ছাড়া তাঁহার আর বিশেষ কিছুই পড়া ছিল না। কিন্তু শুধুমাত্র বাইবেল হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়া তিনি ধর্ম-জীবনের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। পাপভারক্লিষ্ট মানুষ কেমন করিয়া মুক্তিপথের পথিক হয় ও শেষ পর্যন্ত ভগবানের দর্শন-লাভে জীবন ধন্য করে, রূপকের মাধ্যমে সেই মোক্ষপথযাত্রীর মানস ইতিহাস এখানে অপূর্ব আত্মসমীক্ষা ও সত্যানুভূতির সহিত বিবৃত হইয়াছে। যে রূপকের মায়া-যবনিকায় স্পেনসার বস্তুজগৎকে কল্পলোকের প্রতিবিম্বে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন, তাহাই বুনিয়ান-এর হাতে অধ্যাত্ম রহস্যকে প্রত্যক্ষ চিত্রের মত সুস্পষ্ট ও বর্ণোজ্জ্বল করিয়াছে। এই স্বচ্ছ আবরণের অন্তরাল হইতে ভাবসত্য রক্তমাংসের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

বুনিয়ান-এর কল্পনা এত জীবন্ত এবং আবেগ ও অনুভূতি এত সর্বাত্মক যে, তাঁহার ছায়ালোক পাঠকের কাছে নিঃসন্দিগ্ধ সত্যের মত প্রতিভাত হইয়াছে। মানস অভিযাত্রার অন্তর্গূঢ় স্তরগুলি যেন মানচিত্রে লাল নীল রঙে আঁকা স্থানের ন্যায় প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে। তাঁহার কল্পিত ব্যক্তিবৃন্দের অধ্যাত্ম উৎকণ্ঠা এত তীব্র, প্রাণোচ্ছলতা এত পরিস্ফুট যে উহা রূপকের অনামিক অস্পষ্টতায় চাপা পড়ে নাই। শুধু মানুষ নহে, পথের যত বাধা-বিঘ্ন, সাধনের যত অন্তরায় সব যেন প্রাণের বিদ্যুৎশক্তিতে জীবন-স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে, মনের স্বপ্ন কায়ারূপ ধরিয়া জীব-জগতের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। বুনিয়ান সচেতন শিল্পী ছিলেন না এবং সেই জন্যই তাঁহার রচনা এত সহজ, সরল ও অকৃত্রিম। তাঁহার মোক্ষ-পিপাসা, অন্তর্জীবনের সর্বাতিশায়ী দ্বন্দ্ব, ধর্মবোধের অসহ্যজালাময় সংশয়, তাঁহার সচেতন শিল্প-প্রয়াসকে অতিক্রম করিয়া, নিজ অদম্য প্রেরণাতেই বাইবেলের সঙ্কেতসূত্র অবলম্বনে অনিবার্য বাণীরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আজ পর্যন্ত বুনিয়ানের Pilgrim's Progress বা 'তীর্থযাত্রীর কাহিনী' ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকগ্রন্থরূপে স্বীকৃত হয়। একদিকে মিলটন, অপরদিকে বুনিয়ান, পিউরিটান ভগবৎমুখীনতার অন্তরে প্রজ্বলিত ভক্তি-হোমানলের দুইটি বহ্নিদীপ্ত শীর্ষবিন্দু।

এই যুগে গদ্য রচনার ক্ষেত্রে ড্রাইডেনের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিজের বিভিন্ন কবিতা ও নাটকের ছোট-বড় মুখবন্ধে ড্রাইডেন যে গদ্য লিখিয়াছেন তাহা আধুনিক ইংরাজী গদ্যের সমতুল। বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচনা হিসাবেও ইহারা অত্যন্ত উচ্চমানের। ইহার পর আছে তাঁহার সুদীর্ঘ প্রবন্ধ Essay of Dramatic Poesy বা 'নাট্যকাব্যের উপর প্রবন্ধ' (১৬৬৮)। এই প্রবন্ধে চার বন্ধুর কথোপ-কথনচ্ছলে আধুনিক ও পৌরাণিক নাটকের গুণাগুন আলোচিত হইয়াছে এবং বিষয়বস্তু, ভাষা, ভাববিন্যাস, আঙ্গিক, দর্শকের উপর প্রভাব প্রভৃতি সবদিক হইতে নাট্যসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হইয়াছে। ড্রাইডেন যে শুধু আধুনিক ইংরাজী গদ্যের জনক তাহা নহে, তিনি ইংরাজী সাহিত্যসমালোচনারও পথিকৃৎ।

এই যুগে গদ্যের আরও নানা নূতন প্রকরণ প্রথম স্ফুরিত হইয়াছে। **ক্লারেনডন** (Edward Clarendon : ১৬০৮—১৬৭৪), History of the Rebellion বা 'বিদ্রোহের ইতিহাস' (প্রকাশিত ১৭০৪) ও **বার্নেট** (Gilbert Burnet : ১৬৪৩—১৭১৫), The History of My Own Time বা 'আমার সময়ের ইতিহাস' (প্রকাশিত ১৭৩৫) লিখিয়া ইতিহাস-সাহিত্যের ভিত্তিপত্তন করিলেন। **এভলিন** (John Evelyn : ১৬২০—১৭০৬) ও **পেপস্** (Samuel Pepys :

১৬৩২—১৭০৪) তাঁহাদের দিনলিপির মাধ্যমে গদ্যে অন্তরঙ্গতার সুর ও সমসাময়িক জীবনের ছোটখাট ঘটনার সরস তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণনার প্রবর্তন করিলেন। **কাউলি, টেম্পল** (Abraham Cowley : ১৬১৮—১৬৬৭ ও William Temple : ১৬২৮—১৬৯৯) Essay বা সন্দর্ভরচনার সূত্রপাত করিয়া অষ্টাদশ শতকের পরিণততর রচনাশিল্পের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন। আগামী যুগে গদ্যই যে পদ্যকে স্থানচ্যুত করিয়া মানব-চিন্তার নূতন নূতন আধার, রচনাশিল্পের নব নব প্রকরণ রচনা করিবে তাহার পূর্বাভাস এই যুগের শেষের দিকে আর অনিশ্চিত থাকিল না। আগামী দিনে গদ্যরাজের সিংহাসনে অধিরোহণের পথ এই ভাবে পরিষ্কার হইল।

পঞ্চম অধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্য

[১৭০০—১৭৯৮]

১

অষ্টাদশ শতাব্দী ইংরাজী সাহিত্যে যুগ-পরিবর্তনের আর একটা সন্ধিক্ষণ। ছবির বই-এর পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে যেমন প্রতি পাতায় নূতন দৃশ্য-সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত হয়, সেইরূপ সাহিত্যের ইতিহাসেও কালের পৃষ্ঠা উন্টাইলে রূপ ও আদর্শের বৈচিত্র্যে বিস্মিত হইতে হয়। প্রতি যুগই পূর্ববর্তী যুগের কতকটা অনুসরণ ও পরিণতি এবং কতকটা বিদ্রোহ ও প্রতিক্রিয়া। সপ্তদশ শতকে মননশক্তির যে প্রাধান্য ধীরে ধীরে লক্ষিত হইতেছিল, অষ্টাদশ শতকে তাহার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। কল্পনার সহিত তাহার সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্নপ্রায় হইল। মনন-শক্তি ক্রমে কল্পনাবর্জিত হইয়া, দার্শনিক প্রসার ও মৌলিকতা হারাইয়া, কেবল কতকগুলি সাধারণ, সর্বজন-স্বীকৃত নীতিকথা ও ব্যবহারিক সত্যের আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়াইল। কাব্য গদ্য-সন্দর্ভের পদ্যরূপান্তরে পরিণত হইল। স্বাভাবিকভাবে কাব্যের পরিধি অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনে সীমাবদ্ধ হইল।

এই যুগের প্রতীক কবি পোপের কয়েকটি কবিতার বিষয় নির্বাচন হইতেই এই যুগের কবিমানসের খানিকটা পরিচয় মিলিতে পারে। তাঁহার একটি কবিতাটির বিষয়বস্তু—সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্য সমালোচনার উদ্দেশ্য ও বিধেয়; অপর একটি কবিতা মানুষটির চরিত্র, নীতিবোধ প্রভৃতি লইয়া লিখিত। যে সমস্ত বিষয় গদ্যে লিখিত ও সমালোচিত হওয়া উচিত, মার্জিত ভাষায় দুই-চারিটি উপমা প্রভৃতি লাগাইয়া তাহাকে পয়ার ছন্দে ফেলিলে তাহাই কবিতা হইয়া যাইবে—এই ধারণাই যেন সে যুগে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বর্তমানে অনেকে এই সব রচনাকে 'কবিতা' বলিয়া স্বীকারই করিতে চাহেন না। পোপের দুইটি উক্তি এই কবিতার প্রকৃতির উপর বিশেষ আলোকপাত করে। প্রথম উক্তিটি—'মানুষের আলোচনার একমাত্র বিষয় মানুষই', দ্বিতীয়—'প্রকৃত কাব্য পুরাতন চিন্তারই নববেশ মাত্র, বাস্তবের অনুবর্তন'। প্রথম উক্তির দ্বারা বহিঃপ্রকৃতিকে কাব্যের গণ্ডী হইতে নির্বাসিত করা হইয়াছে; দ্বিতীয়ের দ্বারা কল্পনার লীলা ও ভাবের মৌলিকতার উপর অনুরূপ নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, এই শতকে কাব্যে উধাও কল্পনার কোনো স্থান নাই। এই যুগের সাহিত্যকে **ক্লাসিক্যাল**

সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। এই যুগকেও অনেক সময়ে ক্লাসিক্যাল যুগ বলে। ইহার অপর একটি নাম অগাস্টান যুগ।

ক্লাসিক্যাল শব্দের সংজ্ঞা-নির্দেশ মোটেই সহজ নয়; অনেকগুলি পরস্পর-সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থ-ব্যঞ্জনা ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে।

(১) যে অর্থ সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট তাহা ইহার শ্রেষ্ঠত্ববাচক। ক্লাসিক্যাল সাহিত্য সেই সাহিত্য যাহার উৎকর্ষ উচ্চতম স্তরের ও সর্বরুচিসম্মত, যাহার সম্বন্ধে কালভেদ মতভেদের অবকাশ নাই, যাহা বিভিন্ন রুচির অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মহাকাব্য কয়টি—হোমার, ভার্জিল, দান্তে ও পরবর্তী কালের শেক্‌শপিয়ার ও মিলটন—এই শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য। অষ্টাদশ শতকের লেখকদের মনে এই শ্রেষ্ঠত্বাভিমান খুব প্রবল ছিল। তাঁহারা ভাবিতেন যে পূর্ববর্তী লেখকদের অপেক্ষা তাঁহারা সর্ববিষয়েই অগ্রসর ও শ্রেষ্ঠ। এই পূর্ববর্তীদের উপর তাঁহাদের একটা অনুকম্পা-মিশ্রিত অবজ্ঞাও ছিল। এমন কি, শেক্‌শপিয়ার পর্যন্ত এই মুরুব্বিয়ানার অপমান হইতে রক্ষা পান নাই। তাঁহার প্রতিভা অস্বীকার করার মত দুঃসাহস ইঁহাদের ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার রুচি অমার্জিত, ভাষা কর্কশ ও লালিত্যহীন, ভাব দুর্বোধ্য ও সাধারণ অভিজ্ঞতার বিরোধী ইত্যাদিরূপ অভিযোগ এই যুগে অনেকের মুখেই শুনা যাইত। এমন কি, এই ধারণায় বশবর্তী হইয়া শেক্‌শপিয়ারের অনেক নাটকের মার্জিত সংস্করণের হাস্যাস্পদ প্রয়াসও ইঁহারা করিয়াছিলেন এবং এইভাবে নিজেদের বুদ্ধিহীনতা ও রসবোধের অভাবের স্থায়ী নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।

(২) ক্লাসিক্যাল শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে প্রাচীন রচনা-নীতির, বিশেষতঃ অগাস্টান যুগের ল্যাটিন সাহিত্যাদর্শের অনুগামী। রোমের সম্রাট অগাস্টানের রাজত্বকালে (খ্রীঃ পূঃ ২৭—১৪ খ্রীঃ অঃ) ল্যাটিন সাহিত্য সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌঁছিয়াছিল। ভার্জিল, ওভিড, হোরেস সকলেই এই সময়কার কবি। এই ল্যাটিন সাহিত্যের প্রতি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ সাহিত্যিকদের অতিমাত্রায় শ্রদ্ধা ছিল—তাঁহারা বিনীত শিষ্যের ন্যায় ইহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিত। নৈতিক আলোচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ—অষ্টাদশ-শতক-সাহিত্যের এই দুই প্রধান বিভাগ—ল্যাটিন কবিতারই অনুকরণ। ল্যাটিন কবিদের ভাব ও ভাষা ইংলণ্ডের সমকালীন অবস্থার উপযোগী করিয়া সেই যুগের প্রধান চরিত্রের প্রতি আরোপ করা হইত। জুভেনল, হোরেস প্রভৃতির ব্যঙ্গ-কবিতা এইরূপে ড্রাইডেন ও পোপের দ্বারা রূপান্তরিত হইয়া ইংরাজী পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতকের এই দুই

শ্রেষ্ঠ কবি যথাক্রমে ল্যাটিন কবি ভার্জিল ও গ্রীক আদি কবি হোমারের অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং নিজ মৌলিক রচনার অপেক্ষা এই সমস্ত অনুবাদের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন।

এই অত্যধিক অনুকরণ-প্রিয়তা ও আনুগত্য-স্বীকার মৌলিকতার পক্ষে প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই অন্ধ ভক্তি এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল যে, ল্যাটিন সাহিত্যের মধ্যবর্তিতা ছাড়া বহিঃপ্রকৃতি ও মনুষ্যজীবনের প্রতি লক্ষ্য করাও যেন ইহাদের পক্ষে দুঃসাহসিকতা বলিয়া মনে হইত। এই যুগের প্রতিনিধি-কবি পোপ বলিয়াছেন যে, হোমার ও প্রকৃতি একার্থ-বাচক। আমাদের দেশে ইহার অনুরূপ উক্তি—'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে।' অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বর্ণনায় ও মানব-চরিত্রজ্ঞানে হোমারের অতিরিক্ত আর কিছু জানিবার নাই। হোমারই সমস্ত ব্যাপারের শেষ কথাটি বলিয়া গিয়াছেন। হয়তো হোমার এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত নহেন—কিন্তু এই মনোভাববিশিষ্ট কবি যে স্বাধীন সাহিত্য-রচনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

এই অনুকরণপ্রবণতা অষ্টাদশ শতকের সাহিত্যে এক বিশেষ অপকর্ষের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। ল্যাটিন সাহিত্যের সহিত প্রত্যক্ষ জীবনের সংযোগ অল্পই ছিল, কারণ ইহা নিজেই গ্রীক সাহিত্যের অনুকরণ। ইংরাজী সাহিত্য আবার ফরাসী সাহিত্যের মধ্যবর্তিতায় এই ল্যাটিন সাহিত্য পাইয়াছিল। সুতরাং যে আকারে এই সাহিত্যিক প্রভাব ইংরাজী সাহিত্যে সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহা অনুকরণের অনুকরণ, তস্য অনুকরণ। সাহিত্য সুস্থ, স্বাভাবিক ও সার্বজনীন হইতে হইলে তাহা জীবনের প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি হওয়া চাই। জীবন হইতে ইহার দূরত্ব যত বেশী হইবে ততই ইহাতে প্রাণশক্তির অভাব অনুভূত হইবে। সাহিত্য-সৃষ্টিতে পরের মুখে ঝাল খাওয়া একেবারেই অচল। অন্যের চর্বিত খাদ্যে যেমন দেহের পুষ্টি হয় না, তেমনি অপরের সৃষ্ট সাহিত্যের অনুকরণে সাহিত্যিকের নিজের উৎকর্ষের স্ফূর্তি ও বিকাশ হয় না। জীবনের যে ছবি ইহাতে প্রতিবিম্বিত হয় তাহা অসম্পূর্ণ, একদেশদর্শী ও নিষ্প্রাণ। অষ্টাদশ শতকের কবিতা-সাহিত্যে তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাতে জীবনের অজস্র আলোচনা ও বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু প্রাণস্পন্দন নাই; চিরপরম্পরা-গত সাধারণ অভিজ্ঞতা আছে, কবির হৃদয় হইতে উৎসারিত নিজস্ব বাণী নাই; প্রচলিত মতবাদের চমৎকার অভিব্যক্তি আছে, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো পরিচয় নাই।

ক্লাসিক্যাল বা সনাতন-পন্থী কবিতায় কয়েকটি বিশিষ্ট মনোভাব ও গুণ আছে।

এই গুণগুলির জন্যই ভিন্নধর্মী, যথা Romantic (কল্পনাপ্রধান) ও Realistic (বস্তুতান্ত্রিক), কবিতার সহিত ইহার পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। ইহার এই সমস্ত উপাদান সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, ইহার একটি মানস প্রতিবেশ (Mental background) ও প্রকাশভঙ্গী আছে। এই কবিতার মনোভাব ধীর, উত্তেজনাহীন, আত্মসংযমশীল ; পরিচিত গণ্ডী অতিক্রমে অনিচ্ছুক ; অসামান্য ও অভিনবের প্রতি সন্দেহপরায়ণ। ভাবোচ্ছ্বাসের পরিবর্তে ভাব-পরিচ্ছন্নতাই ইহার প্রকৃতিগত লক্ষণ। কল্পনার মৌলিকতা অপেক্ষা বিষয়বস্তুর ও ভাষার সরস ওজস্বিতাই ইহার প্রধান অবলম্বন। কল্পনা ও ভাবাবেগকে ইহা দৃঢ়হস্তে নিয়ন্ত্রণ করে—গঠন-সৌষ্ঠবের (form) দিকে ইহার তীক্ষ্ণ লক্ষ্য। আবেগের আতিশয্য-জনিত অস্পষ্ট ধূম্রময়তা ইহা সযত্নে পরিহার করে। মানব-অদৃষ্টের দুর্জ্ঞেয়তা, নিয়তির অন্ধ বিধান প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয়ে রহস্যময়তার যথেষ্ট অবসর আছে, সেখানেও এই শ্রেণীর কবিতা রহস্য অপেক্ষা অমোঘ নিয়ম-শৃঙ্খলের উপরই বেশী জোর দেয়।

ভাবকল্পনা সম্বন্ধে ইহার দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যও অনেকটা অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার ভাষার একপ্রকার দৃঢ়, কঠিন সংহতি আছে। রোমান্টিক কবিরা যাহা অনির্বচনীয় তাহাকে আভাসে-ইঙ্গিতে, কতক ভাষায়, কতক ভাষাতীত ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। ক্লাসিক্যাল কবিতা কিন্তু ব্যঞ্জনাসাঙ্কেতিকতার সাহায্য না লইয়া কেবলমাত্র শব্দের সুষ্ঠু ও সুনির্বাচিত ভাষা প্রয়োগে যতটুকু প্রকাশ করা যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। প্রথমোক্তেরা বর্ণনীয় বস্তুর চারিদিকে যেন একটি রঙ্গীন বর্ণালীর সৃষ্টি করেন, শেষোক্তেরা উহাকে শুভ্র, প্রখর সূর্যালোকে দেখাইয়া থাকেন। ইহাদের কাব্যের প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ, জড়িমাহীন ও সহজবোধ্য।

অপরপক্ষে, বস্তুতান্ত্রিক লেখকদের সঙ্গেও ইহাদের প্রভেদ আছে। বাস্তবতা-প্রধান রচনায় পুঞ্জীভূত তথ্য-সমাবেশের দ্বারা কোন বিশেষ বস্তু বা দৃশ্যকে রূপায়িত করা হয়। অপরপক্ষে ক্লাসিক্যাল কাব্যে বিশেষ-উদ্দেশ্য-প্রভাবিত তথ্য-সঙ্কলনের চেষ্টা দেখা যায়। পূর্বোক্ত কবিরা যদি কোন রাজার বর্ণনা করেন, তবে তাহাতে সেই রাজার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যই ফুটিয়া উঠিবে, তাহার ব্যক্তিত্বের কোণগুলিই তীক্ষ্ণ আকার গ্রহণ করিবে। শেষোক্ত কাব্যে রাজার চিরপ্রথাগত শাশ্বত ধারণাই ব্যক্তিত্বের ক্ষীণ আবরণের মধ্য দিয়া প্রকট হইবে—সনাতন রাজমহিমাই ব্যক্তিকে আড়াল করিয়া কবির বর্ণ-তুলিকায়

অঙ্কিত হইবে। একজন ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যসূচক গুণ ও অপরজন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বমূলক গুণের উপর বেশী জোর দিবেন।

ক্লাসিক্যাল কবিতার মানস প্রতিবেশ সম্বন্ধেও দুই-চারি কথা বলা দরকার। এই শ্রেণীর কবিতা এক বিশেষ সমাজ-সংস্থান হইতে উদ্ভূত। সমাজ-মনের আধ্যাত্মিক, নৈতিক বা রুচিগত সংহতি ইহার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। সমাজের সমস্ত লোক যখন একই চিন্তা বা আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত, যখন তাহারা স্বেচ্ছায় এক গভীর ভাবগত ঐক্যের নিয়ম-শৃঙ্খলা বরণ করিয়া লয়, যখন তাহাদের মাথার উপর বায়ব আকাশের ন্যায় হৃদয়-মনের উপরও এক সীমায়িত আত্মিক আকাশ অবনত হইয়া থাকে, তখনই ক্লাসিক্যাল কবিতার উদ্ভব-যুগ। কবি সমস্ত সমাজ-মনের প্রতিধ্বনি করেন বলিয়াই তাঁহার সুরের মধ্যে এই সংহত ধ্বনিপ্রাধান্য। তাঁহার সহজ, সরল কথার পশ্চাতে সমাজের সংহত শক্তি সমাবিষ্ট বলিয়াই তাহার এত ওজস্বিতা ও প্রভাব। যুগ-মনের সমুদ্র-মন্থনে যে বিপুল আলোড়ন জাগে তাহাই শান্ত হইয়া তাঁহার কাব্য-কমণ্ডলুতে প্রবিষ্ট হয়। দান্তে ও মিলটন স্ব স্ব যুগের সমস্ত তুমুল ভাব-বিক্ষোভ ও ব্যাকুল ধর্ম-জিজ্ঞাসা নীলকণ্ঠের ন্যায় পান করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের কাব্যের এরূপ অভ্রভেদী মহিমা। কোন কবি নিজ খেয়াল অনুসারে দেশ-কাল-নিরপেক্ষভাবে ক্লাসিক্যাল কাব্য রচনা করিতে পারেন না। অবশ্য ইহার বাহ্য ভাব-ভঙ্গী অনুকরণ করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহার মর্মবাণী দেশ ও কালের অবদান।

অবশ্য সমাজ জীবনের এই ঐক্যের বিভিন্ন স্তর আছে। অদৃশ্য বিশ্বনিয়ামক শক্তির প্রতি মনোভাব হইতে সামাজিক সুরুচি ও শিষ্টাচার, এমন কি আহার-বিহার, আদব-কায়দা ও পোশাক-পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত এই সমাজ-শৃঙ্খলার অনুশাসন দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে ও হয়। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্যাপারে মিল—ইহার উপর ক্লাসিক্যাল কবিতার উৎকর্ষের তারতম্য নির্ভর করে। নিয়তির সহিত মানব-জীবনের রহস্যময় সম্পর্ক সম্বন্ধে সমাজ-মনের নিবিড় সংশয়হীন ঐক্যই গ্রীক কাব্য ও নাটকের পটভূমিকা—সুতরাং এখানেই ক্লাসিক্যাল কাব্য চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ল্যাটিন কবিতায় ইহার চেয়ে নিম্নস্তরের ঐক্য ক্রিয়াশীল—সমাজের শাশ্বত কল্যাণের জন্য যে নীতি-শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োজন, তাহাই এই সাহিত্যে মেরুদণ্ডের মত কাব্য-দেহকে ধারণ করিয়া আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী ক্লাসিকের পিছনে যে ঐক্য তাহা আরও নিম্নস্তরের। এখানে নীতি-বন্ধন শিথিল হইয়াছে ও তৎপরিবর্তে ভব্যতা ও

শিষ্টাচারের অনুশাসন সমাজ-মনকে অধিকার ও কাব্যের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে। অনিন্দনীয় আচার-ব্যবহার ও সুকুমার শীলের মৃদু শোভনতায় এই যুগের ফরাসী কাব্য পরিব্যাপ্ত। অষ্টাদশ শতকের ইংরাজী কাব্য মোটামুটি এই জাতীয় ফরাসী কাব্যেরই মনোবৃত্তিসম্পন্ন; তবে ইংরাজের জাতীয় চরিত্রে রুক্ষ ও পরুষভাবের আধিক্য থাকাতে তাঁহারা ফরাসী কাব্যের লঘু স্পর্শ ঠিক আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই। ইহার নৈতিক উপদেশ অশোভন উচ্চগ্রামে ঘোষিত; ইহার ব্যঙ্গ-কবিতায় মৃদু তিরস্কার ও সহাস্য অনুযোগের স্থলে তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী বিদ্রূপ ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের জালা প্রকাশিত। কাজেই ক্লাসিক্যাল কবিতার যাহা প্রধান গুণ সেই ধৈর্য, ন্যায়নিষ্ঠা ও সংযম, ইংরাজী ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে যে রক্ষিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ইহা নামেই ক্লাসিক্যাল, কাজে নয়।

আর একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াই এই আলোচনার পরিসমাপ্তি করা যায়। এক গ্রীক সাহিত্য ছাড়া অন্য সমস্ত সাহিত্যেই ক্লাসিক্যাল যুগের সহিত ব্যঙ্গ-কবিতার একটা নিত্য সম্বন্ধ আবিষ্কার করা যায়। এই সম্বন্ধের কারণ জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্লাসিক্যাল কাব্যে পরিমিতি ও সামঞ্জস্যবোধ খুব সূক্ষ্ম। কাজেই সমাজ-জীবনে এই ভার-সাম্য কোনও কারণে ক্ষুণ্ণ হইলে ক্লাসিক্যাল কবি তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ যত্নবান্ হন। ব্যক্তিগত ব্যবহারে উৎকেন্দ্রিকতা (eccentricity) বা সামাজিক ব্যবহারে কাপট্য, অসাধুতা, ভণ্ডামি, আত্ম-সম্মানজ্ঞানের অভাব, অমার্জিত রুচি, ধন বা পদগৌরবের জন্য অভিমান, বড়লোকের গোসায়েবী করিবার প্রবৃত্তি ইত্যাদি দোষের প্রাদুর্ভাব কবিকে অত্যন্ত পীড়িত ও প্রতিকার-চেষ্টায় উদ্বোধিত করে। কবি মনে করেন তাঁহার আসল কাজ হইতেছে নৈতিক উপদেশের দ্বারা সমাজ-মনকে সুস্থ করা এবং এই নীতি-প্রচারকে গুরুগম্ভীর দোষ হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাহার সঙ্গে অতি মৃদু, ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ব্যঙ্গের সরসতা সংমিশ্রণ করা। বলা যাইতে পারে যে, ক্লাসিক্যাল কবি অতি সাবধানে নিজেকে ব্যক্তিগত বিদ্রূপপ্রবণতা হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিবেন —তাঁহার ব্যঙ্গাত্মক মনোবৃত্তি সর্বদা অপ্রধান থাকিবে। ব্যঙ্গ নৈতিক উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করিলে, যে পরিমিতি-বোধের তিনি উপাসক তাহা তাঁহার নিজের ব্যবহারের দ্বারাই ক্ষুণ্ণ হইবে—তিনি নিজের নীতি হইতেই বিচ্যুত হইবেন। এক কথায়, ব্যঙ্গ হইতেছে ক্লাসিক্যাল কবিতার মুখ্য নহে, গৌণ উপাদান।

কিন্তু কার্যতঃ, অষ্টাদশ শতকের ইংরাজী সাহিত্যে এই কার্যক্রম ঠিকভাবে অনুসৃত হয় নাই। গৌণ উদ্দেশ্য মুখ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যঙ্গের অশোভন তীব্রতা ও অতি-প্রাধান্যের জন্য ড্রাইডেন ও পোপকে ঠিক ক্লাসিক্যাল মনোবৃত্তি-সম্পন্ন বলা যায় না। তাঁহাদের প্রচণ্ড আঘাতে আঘাতে সমাজের বিচলিত ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, আরও প্রবলভাবে আন্দোলিত হইয়াছে ও সমাজের ভিত্তি পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের নির্মম আক্রমণে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও বিদ্রোহ-পরায়ণতা আরও উত্তেজিত হইয়াছে এবং ক্লাসিক্যাল দুর্গে ফাটল ধরাইয়াছে। এই ফাটলের মধ্যে একদিকে রুসো, ভলটেয়ার, গিবন প্রভৃতি যুক্তিবাদ-প্রধান অথচ ভাবাবেশ-প্রবণ লোকদের দ্বারা, অপর দিকে টমসন, কলিন্স, কুপার প্রভৃতি বহিঃপ্রকৃতির অনুরাগী কবিদের দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের ও রোমান্টিক কবিতার বীজ উপ্ত হইয়াছে।

এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে ড্রাইডেন, পোপ অপেক্ষা আডিসন, স্টীলই খাঁটি ক্লাসিক্যাল লেখক। ইহারা ধ্বংস অপেক্ষা গঠনমূলক কার্যেই অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইহাদের কাগজ Spectator বা 'দর্শক' সমাজের বর্বরতা, আচার-ব্যবহারের পরুষ কাঠিন্য, শিক্ষা, সুরুচি ও সংস্কৃতির প্রতি অবহেলা ইত্যাদি ছোট ছোট দোষ সম্বন্ধে মৃদু বিদ্রূপের সাহায্যে জনসাধারণকে সচেতন করিতে ও পরিহাস-মিশ্রিত উপদেশের দ্বারা তাহাদিগকে মার্জিত রুচি, সৌজন্য ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। নারী-জাতির প্রসাধন-বাহুল্য, তাহাদের হাত-পাখা ঘুরাইবার বিচিত্র লীলাভঙ্গি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে ঔদাসীন্য এবং হাস্যাস্পদ অজ্ঞতা তাঁহাদের সকৌতুক ব্যঙ্গের বিশেষ লক্ষ্য হইয়াছে। স্পেকটেটার পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত অভিজাত-বংশের মহিলাদের মাথায় পালক-বসান টুপির ওজন তাহাদের ভিতরের মস্তিষ্কের ওজন অপেক্ষা অনেক বেশী। আজকাল ইংরাজী সমাজে নারী-পুরুষ সকলের মধ্যেই যে জ্ঞানানুশীলনের প্রশংসনীয় অভ্যাস ও প্রসার হইয়াছে, তাহার প্রধান ও প্রথম প্রেরণা আসিয়াছে এই স্পেকটেটার পত্রিকা হইতে। অষ্টাদশ শতকের ক্লাসিক্যাল কাব্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন ড্রাইডেন, ইহার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন পোপ, ও ইহার আতিশয্যজনিত ও ধ্বংসোন্মুখতা প্রকটিত হইয়াছে জনসনের হাতে। অবশ্য জনসনের প্রসিদ্ধি কবি হিসাবে নয়, সমালোচক হিসাবে।

৮

অষ্টাদশ-শতকীয় ক্লাসিক্যাল কবিতার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি **আলেকজাণ্ডার পোপ** (Alexander Pope : ১৬৮৮—১৭৭৪)। পোপের কবিতায় উদাহৃত হইয়াছে একদিকে প্রাচীন-ধর্মী অভিজাত কবিতার চরম উৎকর্ষ, অপরদিকে আবেগের সম্পূর্ণ অভাব। যুক্তিবাদী ও বহিরঙ্গে মসৃণ ও চাকচিক্য-প্রধান কবিতা পোপের রচনাতেই চমৎকারিত্ব লাভ করিয়াছে। পরবর্তী যুগের কবিতাতে ইহার দোষও যেমন বর্জিত হইয়াছে, তেমনি ইহার গুণও অনেকাংশে অন্তর্হিত হইয়াছে। পোপের কবিতাকে ইংরাজ কবি-মানসের বিশেষ এক আঙ্গিকের চূড়ান্ত প্রকাশ বলা যাইতে পারে।

পোপ ধীরে ধীরে তাঁহার এই রীতি-কুশলতা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম বয়সের রচনায় কিছু কিছু দ্বিধা, রীতির কিছুটা অনিশ্চয়তা, নিরুদ্ধ হৃদয়াবেগের কিছুটা অশান্ত কম্পন যেন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার রুচি-নিয়ামক কঠিন সংযম, ইস্পাত-উজ্জ্বল শাণিত দৃঢ়তা, সুশিক্ষিত অস্ত্রবিদের অভ্রান্ত লক্ষ্য ও আঘাত-নিপুণতা এবং যুক্তিনিষ্ঠ ও আবেগবিমুখ মনের ছায়াহীন খর রৌদ্রদীপ্তি তাঁহার সমস্ত কাব্যকৃতির উপর একটা প্রোজ্জ্বল ধাতব আবরণ বিছায়। পোপের কবিতার বিষয়বস্তু যাহাই হউক না কেন,—নীতিতত্ত্বের প্রতিপাদন, সাহিত্যবিচার, সমাজ-সমালোচনা, ব্যক্তিগত আক্রমণ, প্রকৃতি-বর্ণনা বা প্রাচীন মহাকাব্যের অনুবাদ অথবা ব্যঙ্গানুকৃতি—তাঁহার রীতি ও ভাষা-প্রয়োগের কোন পার্থক্য নাই। পোপ সর্ব অবস্থাতেই শুধু উদ্যতায়ুধ নহে, যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রক্ষেপনিরত।

পোপের কবিতাবলীকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণী বা গুচ্ছে ভাগ করা যায় :—(১) প্রথম শ্রেণীতে Pastorals (প্যাসটোরালস্ বা পল্লীপ্রীতিমূলক কবিতা : ১৭০৯), Windsor Forest ('উইণ্ডসর কানন' : ১৭১৩), Essay on Criticism (বা 'সমালোচন' : ১৭১১) অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। (২) দ্বিতীয় শ্রেণীতে Rape of the Lock ('বেণীসংহার' : ১৭১২—১৭১৪); এবং The Iliad (ইলিয়ড) ও The Odyssey (ওডিসি)-র অনুবাদ (১৭১৫—১৭২৬), Dunciad (বা 'রাসভায়ন' : ১৭২৮, ১৭৪৩) স্থান পাইতে পারে। (৩) তৃতীয় শ্রেণীতে Epistles and Satires ('ব্যঙ্গলিপি') ও Essay on Man ('মানুষ' : ১৭৩৩—১৭৩৪)-এর জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে।

পোপের প্রথম শ্রেণীভুক্ত রচনাবলীতে তরুণ কবির মানসিক নমনীয়তা ও লঘু কল্পনালীলা ও সৌকুমার্যবোধের কিছু চিহ্ন আছে। ভাষা এখনও প্রস্তর-ক্ষোদিত কাঠিন্য ও তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্রতা লাভ করে নাই। এগুলি দশাক্ষর পয়ারে লেখা হইলেও ইহার মধ্যে খানিকটা গতি-স্বাচ্ছন্দ্য ও ছন্দস্পন্দের তরলতা আছে। প্যাস্টোরালসে ভার্জিলের অনুকরণ করা হইয়াছে, কিন্তু অনুকরণের মধ্যেই সমকালীন জীবনারোপ বেশ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব কবিতার স্মৃতি, সার্থক উল্লেখন (allusiveness) ও মনোজ্ঞ ও ঈষৎ ক্রীড়াশীল কলাকৌশল মোটামুটি কৃত্রিমতা-দোষমুক্ত, অথচ প্রথানিষ্ঠ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তরুণ কবির সৌন্দর্যোপভোগ-স্পৃহা সাহিত্য-শাসনের অতি-সচেতন দায়িত্ববোধের দ্বারা এখনও অভিভূত হয় নাই।

'উইণ্ডসর কানন'-এ প্রকৃতির পরিচিত ও পরিমার্জিত, শহর-ঘেঁষা সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে, কিন্তু ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া কবিচিত্ত রাজনৈতিক ঈর্ষা-স্তাবকতা ও সমাজবিচারের দিকেও ঝুঁকিয়াছে। এই কবিতায় দেখা যায়, কবি ক্রমশঃ নীতিবেত্তার আসন অধিকার করিতে চলিয়াছেন। যুক্তিনিষ্ঠ সমাজ-চেতনা, বিতর্ক-নৈপুণ্য ও সূচ্যগ্র অর্থগাঢ় সংক্ষেপোক্তির প্রতি প্রবণতা কবিকে বহিঃপ্রকৃতি হইতে মানবসমাজের দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ মতভেদের কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। ভাষাপ্রয়োগের প্রথাবদ্ধতাও ধীরে ধীরে প্রবল ও অসপত্ন হইয়া উঠিতেছে।

'সমালোচনী' (Essay on Criticism)-তে কবির প্রথম যুগের কাব্য-রূপানুসন্ধান এক সুনিশ্চিত পরিণতিতে নিবৃত্তি লাভ করিয়াছে। কবি তাঁহার নূতন রীতিকে পুরাপুরি আবিষ্কার ও অধিকার করিয়াছেন। কবির কণ্ঠস্বর মানবিক তরঙ্গায়িত বৈচিত্র্য হারাইয়া যান্ত্রিক তীক্ষ্ণভাষণ ও প্রতিপাদনমূলক সূত্র-ঘোষণায় অবিচল হইয়াছে। কাব্যবিচারের মানদণ্ড-রচনা কেবল যে তাঁহার কবিতার বিষয় তাহা নহে, তাঁহার রীতি ও মনোভাবের প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই কবিতায় পোপের সাহিত্য-বিচারে সূত্রনির্দেশে কিছুটা আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি আছে। তিনি স্থানে স্থানে কবিকল্পনার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মুখ্য প্রতিপাদ্য হইতেছে যে, প্রাচীন মহাকবিদের দৃষ্টান্ত-সঙ্কলিত অনুশাসন ও নিয়মাবলীর অনুসরণেই শ্রেষ্ঠ ও ত্রুটিহীন কবিতা-রচনা সম্ভব। সুতরাং ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, তাঁহার মতে কবি অপেক্ষা অনুশাসকের স্থানই

উচ্চতর। দ্বিতীয়তঃ, তিনি এক নিঃশ্বাসে দুই পরস্পর-বিরোধী উক্তি করিয়াছেন: শ্রেষ্ঠ কবিতার উৎস হইল স্বভাবানুকৃতি; কিন্তু হোমার ও স্বভাব একার্থবাচক; সুতরাং হোমারকে অতিক্রম করিয়া মানব-প্রকৃতির প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন। হোমারের প্রতি এই অন্ধ নির্বিচার ভক্তি যে আধুনিক রচনার মৌলিকতার পরিপন্থী হইবে, এ সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি সচেতন নহেন। তৃতীয়তঃ, তাঁহার উক্তি ও বিচারগুলি স্বতন্ত্র ও পরস্পর-নিরপেক্ষ, কোন কেন্দ্রীয় তাৎপর্যে সংহত নহে। এই বিচ্ছিন্ন উক্তি-পরম্পরা কোন এক সুচিন্তিত, আভ্যন্তরীণ-সঙ্গতিবিশিষ্ট সমালোচনা-পদ্ধতি-নির্মাণে সহায়তা করে না।

তথাপি পোপের এই কবিতাটি ক্লাসিক্যাল সমালোচনারীতির একটি সর্বগ্রাহ্য আদর্শ-প্রতিষ্ঠার পথে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। কবির সূক্ষ্মতর মৌলিকতা যে সমস্ত নিয়মের ঊর্ধ্বে, তিনি যে যুক্তির বাঁধা পথে না গিয়া সরাসরি হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে তঁহার আবেদন পৌঁছাইয়া দিতে পারেন, কাব্য-বিচারে বিচ্ছিন্ন অংশ অপেক্ষা সামগ্রিকতার মর্মগ্রহণই যে বেশী দরকার ও দোষ অপেক্ষা গুণের দিকেই বেশী নজর দিতে হইবে, ঐতিহাসিক আবেষ্টনের সঙ্গে কাব্যকলার যে নিবিড় সম্পর্ক আছে ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই যে কাব্যের বিচার করা সঙ্গত—এই সমস্ত মূল সত্যই তাঁহার রচনায় স্মরণীয় স্বীকৃতি পাইয়াছে। সর্বশেষে তিনি কাব্যবিচারের মধ্যে মানবিক সহৃদয়তা ও সামাজিক বিবেকবুদ্ধির প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জীবন-সম্পর্কহীন কারুকলার যে বিশেষ মূল্য নাই, পুঁথিপত্রের সঙ্গে রীতি-নীতি. সৌজন্য-সুরুচির উচ্চমান রক্ষার প্রতিও যে সমালোচকের দায়িত্ব আছে তাহা স্বীকার করিয়া তিনি ক্লাসিক্যাল সমালোচনার মর্মকথা প্রকটিত করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে যে, এই কবিতাটি পোপের বয়স তেইশ হইবার আগেকার রচনা। সুতরাং ইহাতে সাহিত্যের যে দিক্‌নির্দেশ ও মূল্যায়নের কথা বলা হইয়াছে, তাহা পোপের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ ফল নয়। মোটামুটি ল্যাটিন কবিসমালোচক হোরেসের বক্তব্যগুলিই পোপ যুগোপযোগী করিয়া নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তাঁহার দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে তাঁহার নিজস্ব কবি-প্রকৃতি আরও সুপরিস্ফুট ভাবে দেখা দিয়াছে। তাঁহার হোমারের অনুবাদ তাঁহাকে কবিখ্যাতির শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। হোমারের সহিত পোপের প্রকৃতিগত কোন মিল ছিল না, থাকা সম্ভবও নহে। হোমারের ছন্দও পোপের দশাক্ষর পয়ারের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। হোমারের বীরযুগসুলভ সরলতা, সহজ ভাবগৌরব, সমুদ্র-

কল্লোলবৎ ধ্বনি-গাম্ভীর্য, ভাষার অলঙ্কারবিহীন প্রত্যক্ষতা ও ভাবকে চিত্রবৎ প্রতীয়মান করার অদ্ভুত ক্ষমতা পোপের শ্রমজলসিঞ্চিত, মণ্ডনকলাপ্রধান ও যুগের কৃত্রিম-আদর্শ-অনুসারী কবিকৃতি হইতে সর্বথা বিভিন্ন। তথাপি পোপের অনুবাদ হোমারের অন্তরবাণীর যথার্থ প্রতিবিম্ব না হইয়াও নিজস্ব গৌরবে মহীয়ান্। পোপের শব্দ-নির্বাচন ও সন্নিবেশে আশ্চর্য নিপুণতা, অর্থসারসংক্ষিপ্তির অনুশীলন, ভাষার মার্জিত ঔজ্জ্বল্য, শক্তি ও মর্যাদা এবং সময় সময় উচ্ছ্বসিত কাব্য-সৌন্দর্য ও কবি-কল্পনার চিত্র-উদ্বোধন-কুশলতা এই অনুবাদটিকে ইংরাজী ক্লাসিক্যাল যুগের একটি মহত্তম কাব্য-নির্মিতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই কবিতাটির সমালোচনা প্রসঙ্গে পোপের সমসাময়িক এক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন—কবিতাটি সুরচিত বটে, কিন্তু ইহা হোমার নহে।

The Rape of the Lock বা 'বেণীসংহার' ও Dunciad বা 'রাসভায়ন'-এ পোপের মানস গঠনে যে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-প্রবণতার উপাদান ছিল তাহা অবিমিশ্র প্রাধান্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার আগের রচনায় যাহা বিষয়ান্তরের অন্তরাল হইতে মাঝে মধ্যে উঁকি দিয়া পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করিত, এখন তাহাই মূল প্রেরণা ও সর্বাত্মক মনোভঙ্গীরূপে দেখা দিল। তথাপি এখানেও ব্যঙ্গ অতিরঞ্জিত ভাবকল্পনা ও মহাকাব্যের কৌতুকানুকৃতির ছদ্মবেশে, হাস্যরসের সহচররূপে আবির্ভূত হইয়াছে—উহার মারাত্মক হিংস্রতা ও আঘাতের নিষ্ঠুর আনন্দ যেন খানিকটা মৃদু ও মোলায়েম হইয়া আত্ম-উদ্ঘাটন করিয়াছে। কবি যেন নিছক মজা করিবার জন্য, কৌতুকরসে আপ্লুত হইয়া, অনেকটা পরিহাসাত্মক লঘুতার সহিত তাঁহার শাণিত ছুরিকা চালাইয়াছেন। কিন্তু এই হাসির আবরণ দিয়া কবি-মনের ক্রোধ ও ঘৃণা, উহার নিদারুন জিঘাংসা-বৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রাখা সম্ভব হয় নাই—এক-একটি আঘাতের অপ্রত্যাশিত তীব্রতা, আক্রমণের পাত্রকে মর্মান্তিক বেদনা দিবার একটি সুপরিকল্পিত অভিপ্রায় যেন অকস্মাৎ মখমলের কোষ হইতে গুপ্ত ছুরিকার ন্যায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আরও একটি ব্যাপারে কবির সত্যিকার উদ্দেশ্য অনাবৃত হইয়াছে—এই আক্রমণের কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও মনোমালিন্য। কবি যেন একটি নৈর্ব্যক্তিক, সমাজকল্যাণকামী ইচ্ছার পিছনে, একটি বৃহত্তর পটভূমিকার আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া তাঁহার ব্যক্তিগত, দীর্ঘকাল-পোষিত ক্ষোভের প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য এই আঘাতোন্মুখিতা Dunciad-এই বেশী প্রকট। তুলনায় The Rape of the Lock-এ লঘু হাস্যপ্রিয়তারই প্রাবল্য।

The Rape of the Lock বা 'বেণীসংহার' হইল মহাকাব্যের ব্যঙ্গানুকৃতি-জাতীয় গ্রন্থ। ইহাতে পোপ দুই অভিজাতবংশের মধ্যে একটা তুচ্ছ কলহের পরিণতিকে মহাকাব্যোচিত ছদ্মগাম্ভীর্যের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। একটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া তরুণীর একগুচ্ছ কেশ কাটার ফলে একটা গুরুতর বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। উভয়পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল ও হোমারের মহাকাব্যের ন্যায় উভয় পক্ষেই অতিপ্রাকৃত শক্তিপুঞ্জ যোগ দিয়া সমস্ত ব্যাপারটিকে ঘোরাল করিয়া তুলিল। এই অতিপ্রাকৃত শক্তির বর্ণনায় পোপের লঘু কল্পনা অসামান্য লীলাবিলাস প্রকটিত করিয়াছে। নারীর প্রসাধন-কলা, তাহার ক্ষুদ্র ঈর্ষা-প্রতিযোগিতা, তাহার বিলাস-কক্ষের গন্ধসার, তাহার বেশভূষার বাহার—এ সমস্তই পোপের কবিতায় এক অপূর্ব হাসির খোরাক হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্রের উপর মণ্ডনকলার এমন সার্থক প্রয়োগ, সামান্য বিষয়ের প্রতি এমন অসামান্য ভাবস্ফীতির আরোপ, তুচ্ছ প্রবৃত্তিসমূহের এরূপ মহাকাব্যসুলভ ব্যঙ্গ-উন্নয়ন ইংরাজী সাহিত্যে আর নাই।

Dunciad বা 'রাসভায়ন'-এ পোপ মহাকাব্যের আঙ্গিক ও ভাষণ-সমুন্নতির প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিযোগীদের হাস্যাস্পদ করিবার হীন উদ্দেশ্য লইয়া। এখানে ব্যক্তিগত আক্রোশ এত পরিস্ফুট যে কলাসংযম ও কল্পনার স্বচ্ছন্দলীলা অনেকাংশে ব্যাহত হইয়াছে। এই কাব্যে পোপ কল্পনা করিয়াছেন যে, অবিদ্যাদেবী তাঁহার প্রিয়পুত্রকে মূর্খতার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছেন। কবিতাটির প্রথম সংস্করণে শেক্‌শপিয়ারের বিখ্যাত টীকাকার, **টিবল্ড** (Theobald) এই সম্মানের পদে বৃত হইয়াছেন ; কিন্তু শেষ সংস্করণে **কলি সিবার** (Colley Cibber) নামে এক বিখ্যাত নাট্যকার এই গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কাব্যের রূপক এত বহুব্যাপ্ত ও জটিল, ইহার মধ্যে এত কষ্টকল্পনা ও আড়ষ্টতা আছে, ব্যঙ্গাতিরঞ্জনের প্রয়োগ সময় সময় এত অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক হইয়াছে এবং আক্রমণের বিষয়ীভূত অধিকাংশ ব্যক্তি এতই অখ্যাত ও নগণ্য যে, সমস্ত কাব্যটিই আমাদের মনে কোনো রেখাপাত করিতে পারে না, বরঞ্চ একটা অপ্রীতিকর ধারণা উৎপাদন করে। মাঝে-মধ্যে চমৎকার পংক্তি আছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে কাব্যটি ব্যর্থ।

তৃতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে, অন্ততঃ কয়েকটি কবিতায়, পোপের যথার্থ শক্তি নিহিত। The Essay of Man বা 'মানুষ' নামক কবিতাটি দার্শনিক কবিতার আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে। পোপের মনে দার্শনিক কবি হইবার যে

উচ্চাভিলাষ বহুদিন যাবৎ লালিত ছিল তাহা এই কবিতায় রূপ পাইয়াছে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে পোপের দুই দিক দিয়া যোগ্যতার অভাব ছিল—(১) তাঁহার কোন সুনির্দিষ্ট, অন্তঃসঙ্গতিপূর্ণ, জীবনবোধদ্যোতক দার্শনিক অনুভূতি ও মতবাদ ছিল না। তিনি তাঁহার সমস্ত ভাব-ভাবনা টুকরা টুকরা করিয়া অপরের নিকট আহরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাদের পিছনে তাঁহার বুদ্ধিগত সমর্থন থাকিলেও অন্তরানুভূতির গভীরতর যোগ নাই। মনের যে উত্তাপ ও দীপ্তিতে বিচ্ছিন্ন ভাবসমষ্টি এক অখণ্ড জীবন-ব্যাখ্যায় সংহত হয় তাহা পোপের একেবারেই ছিল না। (২) দ্বিতীয়ত, তাঁহার অভ্যস্ত পয়ার-ছন্দ দার্শনিক বিচারের সূক্ষ্ম, সুদূরগামী ও নানা-আপত্তিখণ্ডনকারী মননের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। তাঁহার পংক্তিযুগল ভাবের একটি খণ্ডাংশকে, চিন্তার একটি সূত্রকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে উপস্থাপিত করে; পরবর্তী যুগ্মপংক্তিতে আবার একটা নূতন ভাবাংশের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। কাজেই এইরূপ পংক্তিসমষ্টির সমন্বয়ে কোন দার্শনিক আলোচনা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। এই দিক দিয়া পোপ অপেক্ষা ড্রাইডেন অনেক বেশী পারদর্শী ছিলেন। ড্রাইডেনের পয়ার-পরম্পরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াও পরস্পরসংশ্লিষ্ট; তাঁহার যুক্তিনিষ্ঠ মনের উৎসাহ ও দীপ্তপ্রত্যয় পয়ারের রূপগত ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়া উহাদের মধ্যে এক ভাবসঙ্গতির সেতু রচনা করিয়াছে। পোপের মানস উৎসাহ পয়ারের গঠনকে অনবদ্য করিয়া ও তাঁহার শব্দ-সন্নিবেশকে মাজিয়া-ঘষিয়া উজ্জ্বলতার পরাকাষ্ঠায় উপনীত করিয়াই নিঃশেষিত হইয়াছে। ভাব অপেক্ষা ভাষার প্রতিই তাঁহার মনোযোগ বেশী।

পোপের Moral Essay বা 'নৈতিকসন্দর্ভ' ও তদপেক্ষা তাঁহার Satires and Epistles বা 'ব্যঙ্গলিপি' তাঁহার কাব্যোৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ব্যঙ্গের সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত আঘাত কত মর্মান্তিক হইতে পারে, অন্তরের কত গভীর মূলে বিদ্ধ হইতে পারে, পোপের এই শেষ স্তরের রচনাতে তাহা উদাহৃত হইয়াছে। এই রচনাসমূহে তিনি একটি দার্শনিক নির্লিপ্ততা ও বিশুদ্ধ সমাজ-হিতৈষণার ভান করিয়াছেন; তাঁহার ক্রোধকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া উহাকে অপক্ষপাত ন্যায়নিষ্ঠার বহিরাবরণে উপস্থাপিত করিয়াছেন। মেজাজকে প্রসন্ন ও উত্তেজনাহীন রাখিয়া, কৌতুককর আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া, শিষ্টসমাজ-প্রচলিত কথ্যরীতি ও বাগ্‌ধারার প্রয়োগ করিয়া তিনি ইহাদিগকে সুরুচি ও সুনীতির বাহনরূপে পরিচিত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এই খোশমেজাজ ও ক্রীড়াশীল রুচির অন্তরাল হইতে তাঁহার অন্তরের বিদ্বেষ ও রোষানল ক্ষণে ক্ষণে স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি

করিয়াছে; হাসিতে হাসিতে তিনি প্রতিপক্ষের বক্ষে আমূল ছুরিকা বসান। স্বীয় বন্ধু ডক্টর আরবুথনটের নিকট তিনি যে ব্যঙ্গকাব্যলিপি (The Satire to Dr. Arbuthnot) পাঠান তাহাতে তিনি সে যুগের নেতৃস্থানীয় লেখক আডিসনের উপর যে তীব্র আক্রমণ করেন, তাহা হইতেই পোপের ব্যক্তিগত চরিত্র ও কবিমানসের সুন্দর ধারণা পাওয়া যায়। আটিকাস (Atticus) এই ছদ্মনামে তিনি আডিসনের উপর যে তীব্র জালাময় দ্রাবকরস নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা অস্থিচর্মশিরাস্নায়ু ভেদ করিয়া অন্তরাত্মা পর্যন্ত যেন উহার দাহশক্তি বিস্তার করিয়াছে। সাহিত্যের আক্রমণ যে জল্লাদবৃত্তির এত কাছাকাছি যাইতে পারে, কলমের খোঁচায় যে এত প্রচুর রক্তক্ষরণ হইতে পারে, শ্রেণীগত সাধারণ লক্ষণের পিছনে যে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি এত নিষ্ঠুর শর-সন্ধান সম্ভব, ঈর্ষা ও ঘৃণার আবেগ যে ঘৃণাস্পদের এমন অবিস্মরণীয় রেখাচিত্রে আপন অনপনেয় ছাপ রাখিতে পারে, তাহা পোপের কবিতা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। ড্রাইডেনের আকিটোকেলের চিত্র ইহার সহিত তুলনায় অনেক বেশী উদার, মর্যাদাময় ও বৃহত্তর পটভূমিকায় বিন্যস্ত। ড্রাইডেনের আঘাত-বর্ষণের মধ্যেও আমরা সার্বভৌম বিস্তারের, মুক্ততর দিঙ্-মণ্ডলের ও প্রসন্ন মনোভাবের আস্বাদ পাই। পোপের আক্রমণ শুধুমাত্রই পীড়াদায়ক ও শ্বাসরোধী।

পোপের দোষ-ত্রুটিগুলিকে, তাঁহার প্রতিভার অভাবাত্মক দিকটাকে বড় করিয়া দেখান খুব সহজ; এবং প্রধানত ইহাই হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহার কবিকৃতির অনন্যতাকেও অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার সুমার্জিত বিন্যাসরীতি, তাঁহার অতন্দ্র শিল্পবোধ, তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযোগী উপায়-কৌশল ও সর্বোপরি তাঁহার ব্যঙ্গ-কবিতার অদ্ভুত সাফল্য পরবর্তী ইংরাজী সাহিত্যে আর পুনরাবৃত্ত হয় নাই। তাঁহার নিজের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও তুলনারহিত। পোপের ধারা যাঁহারা অনুসরণ করিয়াছেন—প্রায়র (Prior), গে (Gay) প্রভৃতি—তাঁহারা লঘুরীতির ও ক্ষুদ্র বিষয়ের কবি। তাঁহারা নূতন ঢং-এ পল্লীকবিতা লিখিয়াছেন; কেহ বা শহরে রাস্তা চলার বিপদের তির্যক-কটাক্ষপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়াছেন; কেহ কেহ বা পশু-কবিতায় (fables) নূতন তাৎপর্য আরোপ করিয়া উহার উপভোগ্যতা বাড়াইয়াছেন ইত্যাদি। মোট কথা, এই জাতীয় কবিতা অবসর-বিনোদনের সুন্দর উপায় কিন্তু কাব্য হিসাবে অমরতালাভের কোন গুণই ইহাদের নাই।

অষ্টাদশ শতকের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল উহার কাব্য-ভাবিত বা

poetic diction। ইহার শব্দনির্বাচন গদ্যরীতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই যুগের কবিদের ধারণা ছিল যে, সাধারণ্যে প্রচলিত শব্দ কাব্য-মর্যাদার পরিপন্থী ; সেইজন্য কবিতায় ল্যাটিন-অনুকারী গুরুগম্ভীর গুণবাচক শব্দের প্রয়োগই ইহারা পছন্দ করিতেন। ক্লাসিক্যাল কবিতার রীতিপ্রবণতা উহাকে বিমূর্ত (abstract) ও সাধারণীকৃত (universal) ভাবের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। মর্যাদাই উহার প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং এই সমস্ত মননপ্রধান ও জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-সংস্পর্শহীন ভাবের উপযুক্ত ভাষার সন্ধানে কবিরা সহজ বা বস্তু-নির্দেশক শব্দের পরিবর্তে অতিস্ফীত, দীর্ঘ-বিস্ফারিত, পরোক্ষ-বর্ণনামূলক শব্দ নির্বাচন করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহারা সোজাসুজি বস্তু বা পদার্থের নাম না করিয়া গুণবাচক শব্দের দ্বারা তাহাদের নির্দেশ করিয়াছেন। মাছের পরিবর্তে the finny tribe, বা 'পাখ্‌নাওয়ালা জাতি', পাখির পরিবর্তে the winged tribe, বা 'ডানাওয়ালা জাতি', বন্দুকের পরিবর্তে the murderous tube বা 'মারাত্মক নল', চা-এর পরিবর্তে the cup that cheers but not inebriates, বা 'যে পানপাত্র স্ফূর্তি আনে কিন্তু মত্ত করে না' প্রভৃতি অদ্ভুত সংযোজনা ইহাদের কবিতাকে ভারাক্রান্ত ও আড়ম্বরপূর্ণ করিয়াছে। সহজ ও চালু শব্দ ব্যবহার করাকে কবিরা অপমানজনক ও অকবিজনোচিত মনে করিতেন। সমুদ্রকে Sea না বলিয়া বলিতেন main ; আকাশকে Sky বলিলে মর্যাদাহানি হইত, firmament বলাই ছিল দস্তুর ; নীল বুঝাইতে কোন কবিই blue লিখিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না, লিখিতেন azure ইত্যাদি।

এই অভ্যাস এত ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইত যে, শেষ পর্যন্ত ইহা একটি ব্যাধিতে পরিণত হয় ও ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ভাবের অকৃত্রিম অনুভূতি প্রকাশের বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। অষ্টাদশ শতকের কবিতা পড়িলে মনে হয় যে কবি যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া, প্রকৃতির রূপরসগন্ধ ও অন্তরের সজীব স্পন্দনকে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া, আভিধানিক সংজ্ঞাসংকলনে ও বিমূর্ত ভাবের অনুশীলনে ব্রতী হইয়াছেন। এই শতকের একেবারে শেষ পাদে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এই কৃত্রিম প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তির প্রতিবাদ তোলেন ও নিজের কবিতায় ইহার বিপরীত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেন। উনবিংশ শতকের অলঙ্কারপ্রিয় কোনো কোনো কবি এই প্রথার মাঝে-মধ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু ব্যাপক অনুসরণের পরিবর্তে বিরল ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রেই ইহা ঘটিয়াছে।

এই যুগের পোপ-ধারা-অনুসারী একজন প্রধান কবি **ডাঃ জনসন**

(১৭০৯—১৭৮৪)। জনসন কবি অপেক্ষা সাহিত্য-সমালোচক ও সন্দর্ভ-রচয়িতারূপেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের রুচিনিয়ামক ও যুগনেতা হিসাবে তিনি ড্রাইডেন ও পোপের উত্তরসাধক ঐতিহ্যবাহক। তাঁহার কবিখ্যাতি তাঁহার 'লণ্ডন' (১৭৩৮) ও The Vanity of Human Wishes বা 'বাসনামরীচিকা' (১৭৪৯) এই দুই কবিতার উপর নির্ভরশীল। এই কবিতাদ্বয়ে তিনি রোমীয় নীতিবিদ্ ও ব্যঙ্গাত্মক কবি জুভেনালকে আদর্শ-রূপে অনুসরণ করিয়াছেন। পোপের সহিত তুলনায় জনসনের ভাব-তীব্রতা ও শিল্প-মার্জনা অনেক কম, কিন্তু তাঁহার আন্তরিক অনুভূতি ও ব্যক্তিসত্তার নীতি-নির্ভর দৃঢ়তা অনেক বেশী। সেইজন্য তাঁহার রচনার মধ্যে মসৃণতার অভাব, কিন্তু গভীর ও একনিষ্ঠ জীবন-দর্শনের ছাপ দৃঢ়তর। তাঁহার নীতিবাণীগুলি মামুলি হইলেও ব্যক্তিক অনুভবের স্পর্শে প্রাণস্পন্দিত। নীতিনিষ্ঠতা তাঁহার নিকট কেবল কবির আত্মশ্রেষ্ঠত্ব-ঘোষণার উপায়মাত্র নহে, তাঁহার জীবন-সাধনা ও মনোগত অভিপ্রায়ের অকৃত্রিম প্রকাশ। কিন্তু সমস্ত মিলাইয়া দেখিতে গেলে জনসনের কাব্যপ্রচেষ্টা খুব উচ্চমানের কিছু নহে। বিখ্যাত সাহিত্যনিয়ামক ডাঃ জনসনের লেখা বলিয়াই তাঁহার কবিতা আজও চালু আছে।

অলিভার গোল্ডস্মিথ (Oliver Goldsmith: ১৭২৮-১৭৭৪)-এর The Traveller বা 'পথিক' (১৭৬৪) ও The Deserted Village বা 'ত্যক্তগ্রাম' (১৭৭০) অনেকটা পোপের রচনাভঙ্গীতে লেখা দুইটি ক্ষুদ্র গাথাকাব্য। মানস গঠনে গোল্ডস্মিথ পোপের সম্পূর্ণ বিপরীত—উদার, সরল, আত্মভোলা ও জগতের প্রতি প্রীতিরসে পূর্ণ। সুতরাং তাঁহার কবিতায় পোপের তীব্র, নির্মম ব্যঙ্গের লেশমাত্র নাই। তথাপি গোল্ডস্মিথের উপর পোপের পয়ার ছন্দ, কাব্যের রীতিবৈশিষ্ট্য ও নীতিপ্রধান মননশীলতার প্রভাব সুপরিস্ফুট। 'পথিক' এই কবিতায় কবি নিজে ইউরোপের যে সমস্ত দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অধিবাসীদের জাতীয় চরিত্রের একটি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়াছেন। তুলনামূলক আলোচনার ফলে কবি এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, সব জাতির সুখ-দুঃখের পরিমাণ প্রায় সমান ও ইহা নির্ভর করে সেই দেশের শাসন-ব্যবস্থার উপর নহে, ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর। 'ত্যক্তগ্রাম' কবিতাটিতে কবির পল্লীপ্রীতি এক করুণ, বিষাদময় সুরে অভিব্যক্ত হইয়াছে—অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে কৃষিনির্ভর, প্রাচীন জীবন যে উৎসাদিত হইতেছে, নিরীহ পল্লীবাসী যে গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিতে কিংবা দেশান্তরিত হইতে বাধ্য হইতেছে, পল্লীজীবনযাত্রার

সবটুকু আনন্দরস ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক-মাধুর্য যে ক্রমেই নিঃশেষিত হইতেছে, শোষকের অত্যাচারে যে কৃষক পিতৃপিতামহের বাসভূমি হইতে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, ইহার বেদনা কবি গভীরভাবে অনুভব ও আন্তরিকতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি, নাগরিক জীবন ও যন্ত্রশিল্পের ব্যাপ্তির প্রতি বিতৃষ্ণা, পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ গোল্ডস্মিথকে অনেকটা রোমান্টিক কবিগোষ্ঠীর পূর্বসূরী হিসাবে চিহ্নিত করে। কিন্তু ক্লাসিক্যাল যুগের কতকগুলি বহিরঙ্গগত লক্ষণ যুগচিহ্নস্বরূপ তাঁহার কাব্যদেহে সংলগ্ন আছে। সেইজন্য গোল্ডস্মিথকে ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক কবিদের যোগসূত্র বলা যাইতে পারে।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে পোপ-রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও নূতন রোমান্টিক প্রবণতার অভ্যুদয় দেখা যায় তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে। পোপের রচনারীতি শতকের শেষ পর্যন্ত অনুসৃত হইয়াছে কিন্তু তাঁহার ভাবানুগত্য শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতেই অনেকটা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পোপ যে ধাঁচের কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি এত উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য লাভ করেন যে, তাঁহার পরবর্তী কোনো কবির ঐ জাতীয় কবিতা লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করা আর সম্ভব ছিল না। সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবেই পোপধর্মী কবিতার বলিতে গেলে পোপেই শেষ।

৩

এই শতকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা উপন্যাসের আবির্ভাব। আমরা রূপকথায় শুনি যে, একদা চারিবন্ধু দেশভ্রমণে বাহির হইয়া একস্থানে কতকগুলি ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত অস্থিস্তূপ দেখিতে পান। পরে প্রত্যেকে মন্ত্রপ্রভাবে এই অস্থিগুলি পুনরায় যোজনা করিয়া এক সিংহের কংকালে পরিণত করেন এবং সর্বশেষে উহাদের মধ্যে যিনি মন্ত্রসাধনায় সর্বাপেক্ষা পারদর্শী তিনি ইহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। রূপকথাতে ইহাও কথিত আছে যে, ঐ সিংহ প্রাণ পাইয়া তাহার প্রাণদাতাদিগকেই সর্বপ্রথম উদরস্থ করে। উপন্যাসের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধেও ঐ রূপকথার কাহিনী প্রয়োগ করা যায়। উপন্যাসের মৌলিক উপাদানগুলি একক-ভাবে ও অবিন্যস্ত অবস্থায় বহুপূর্ব শতাব্দী হইতেই বিদ্যমান ছিল। গল্প, সাহিত্যের অগ্রজ না হইলেও, যমজ সহোদর। স্মরণাতীত কাল হইতে গল্প বলিবার ও শুনিবার প্রবৃত্তি ক্রিয়াশীল। তারপর গল্পের সহিত গৌণ-সম্পর্কান্বিত চরিত্র-সৃষ্টি নাটক ও মহাকাব্যে দৃষ্ট হয়। পরবর্তী স্তরে কাল্পনিক বা অবিশ্বাস্য কাহিনীকে

নিখুঁত ও নিপুণ তথ্যসমাবেশের দ্বারা সত্য বলিয়া চালাইবার চেষ্টাও ভাবী উপন্যাসের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে।

অলীক কাহিনীকে সত্য ঘটনা হিসাবে সাহিত্যে উপস্থাপিত করিবার ইংলণ্ডে প্রথম কৃতিত্ব **ড্যানিয়েল ডি' ফো**-র (Daniel Defoe : ১৬৬০—১৭৩১)। তাঁহার 'রবিনসন্ ক্রুশো' (Robinson Crusoe : ১৭১৯) কাহিনীতে চরিত্র-সৃষ্টি ও বিভিন্ন নরনারীর চরিত্রগত ঘাত-প্রতিঘাত ছাড়া উপন্যাসের আর সমস্ত লক্ষণই আছে। জনহীন দ্বীপে পরিত্যক্ত নাবিকের অসহায় মনোভাব ও ধীরে ধীরে প্রতিকূল অবস্থাকে আয়ত্তে আনিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া খুব সূক্ষ্ম না হউক বাস্তবানুগ বটে। ইহার মধ্যে প্রায়ই ভগবানের মাহাত্ম্য-ঘোষণা ও নীতিপ্রচার প্রবল হইয়া উঠিয়া খাঁটি উপন্যাসের সুরকে চাপা দিয়াছে। অবশ্য অনেক খাঁটি উপন্যাসেও এই দোষ বর্তমান। বস্তুতঃ নীতির শাসন ছাড়াইয়া উঠিতে উপন্যাসকে বহুদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। 'রবিনসন্ ক্রুশো'-তে বিশেষ উচ্চাঙ্গের চরিত্র-বিশ্লেষণ না থাকিলেও, ডি-ফোর এই ক্ষমতার পরিচয় আমরা পাই তাঁহার Moll Flanders বা মোল ফ্লাণ্ডার্স নামে এক কুলটার আত্মজীবনীতে। এই গ্রন্থটির কথা মনে রাখিলে ডি-ফোকেই প্রথম ইংরাজ ঔপন্যাসিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যের সরকারী ইতিহাসে প্রথম ঔপন্যাসিক হিসাবে স্বীকৃতি পান **রিচার্ডসন** (Samuel Richardson : ১৬৮৯-১৭৬১)। এই রিচার্ডসন একজন পুস্তক ব্যবসায়ী ছিলেন। বইএর ভিতর অপেক্ষা বাহিরের সহিত পরিচয়ই তাঁহার বেশী ছিল ; সাহিত্যরসবোধ অপেক্ষা ব্যবসায়-বুদ্ধিই তাঁহার প্রখরতর ছিল। পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি কোনরূপ সাহিত্য-সাধনার পরিচয় দেন নাই এবং নিতান্ত গতানুগতিক ভাবে নিজ ব্যবসায় চালাইয়াছিলেন। উপন্যাস লিখিবার পক্ষে তাঁহার একটিমাত্র যোগ্যতা—নারী-হৃদয়ের রহস্যে বিশেষ অভিজ্ঞতার খ্যাতি তিনি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিবেশিনী ঝি-চাকরানীর দল তাহাদের প্রেমপত্র লিখাইবার প্রয়োজন হইলে তাঁহার শরণাপন্ন হইত। এবং তাহাদের উক্তিই ছিল রিচার্ডসনের জ্ঞানের উৎস। তাঁহার বয়স যখন পঞ্চাশ বৎসর তখন একজন প্রকাশক কয়েকখানি আদর্শ পত্র রচনার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের ফলেই হইল যুগান্তকারী সৃষ্টি—ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'পামেলা' (Pamela : ১৭৪০)।

ঘটনা ও চরিত্র-সৃষ্টি, ইংরাজী গদ্যসাহিত্যে এই উভয় উপাদানই স্বতন্ত্রভাবে

বর্তমান ছিল। স্যার ফিলিপ সিডনির 'আরকেডিয়া'-কে প্রথম গদ্যকাহিনী বা উপাখ্যান বলা যায়। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে আডিসনের Spectator বা 'দর্শক' পত্রিকায় স্যার রোজার ডি কভার্লি নামক জমিদার-তনয়ের যে চিত্র অঙ্কিত হয় তাহাকে গদ্যে চরিত্র-চিত্রণের এক মনোজ্ঞ আদর্শ বলা যাইতে পারে। রিচার্ডসনের কৃতিত্ব হইল ইহাদের উভয়ের সংযোগে এক অদ্ভুত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইয়া উপন্যাসের অভিনব রসসৃষ্টি করা। 'পামেলা' প্রতিপন্ন করিল যে, যেমন রন্ধনের সামান্য উপকরণ নিপুণ পাচকের হাতে উপাদেয় ভোজ্য-বস্তুতে পরিণত হইতে পারে, তেমনি অতি সাধারণ, অকিঞ্চিৎকর বিষয়ও রসানুভূতির দ্বারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে। 'পামেলা' এক চাকরানীর কাহিনী। তাহার প্রভুপুত্র তাহার প্রণয়াসক্ত হইয়া তাহার নিকট কুৎসিত প্রস্তাব করে, কিন্তু পামেলা কিছুতেই এই মুনিব-তনয়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিল না। তাহার সাংসারিক জ্ঞান অতি প্রখর ও নীতিবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এবং সেইজন্যই সে সমস্ত প্রলোভন জয় করিয়া নিজেকে এক অভেদ্য দুর্গমধ্যে রক্ষা করিতে পারিল। এই দৃঢ়তার ফল সে হাতে-হাতেই পাইল। তাহার মুনিবপুত্র শেষ পর্যন্ত তাহাকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল এবং এই প্রস্তাবে সে সঙ্গে সঙ্গেই সম্মত হইল। পামেলার লেখা পত্রাবলীর সাহায্যে মুনিবপুত্রের অনুসরণ ও তাহার নিজের প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার বিভিন্ন পর্যায়গুলি এমন কৌতূহলোদ্দীপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ঘটনাবলীর মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু না থাকিলেও আমরা ইহা পড়িতে বিরক্তি অনুভব করি না। মানুষের জীবনের ইতিহাস যে সর্ব অবস্থাতেই মানুষের চিত্তাকর্ষক ও রস-সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে, 'পামেলা' তাহাই প্রতিপন্ন করে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্তমান গতিশীলতার যুগে 'পামেলা'র কাহিনীর গতিবেগ অত্যন্ত মন্থর বলিয়া মনে হয় এবং উপন্যাসটির দীর্ঘতাও সময়ে সময়ে ক্লান্তিকর হইয়া উঠে। রিচার্ডসনের শ্রেষ্ঠ রচনা ক্লারিসা হার্লো (Clarissa Harlowe : ১৭৪৮) নামক উপন্যাসের বিষাদময় পরিণতিতে লেখকের করুণ-রস-সৃজনে অদ্ভুত নিপুণতার পরিচয় মিলে।

রিচার্ডসনের এই নূতন সৃষ্টি অধিকাংশ পাঠকেরই শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল, কিন্তু সংশয়বাদীরও একেবারে অভাব ছিল না। এই সংশয়বাদীরা প্রশংসার পরিবর্তে বিদ্রূপ ও উপহাসের দ্বারা এই নবীন আবির্ভাবকে বরণ করিয়াছিলেন। পামেলার ব্যবহারে ও রিচার্ডসনের গল্প বলিবার ভঙ্গী ও মন্তব্যের

মধ্যে একটা হাস্যকর দিকও ছিল। চাকরানীর সতীত্ব রক্ষার জন্য অতিরিক্ত উদ্বেগ অথচ অত্যাচারকারীকে বিবাহ করিবার আগ্রহ; সামান্য কারণে অতিরিক্ত উত্তেজনা ও বান্ধবীকে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার জানাইবার জন্য ব্যগ্রতা, এবং লেখকের দ্বারা এই আত্মসম্মানজ্ঞানহীন ব্যবহারের পোষকতা ও অনুমোদন এক পরিহাস-রসিকের ব্যঙ্গপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিল। এই রসিকটির নাম ফিল্‌ডিং (Henry Fielding : ১৭০৭-১৭৫৪)।

ফিল্‌ডিং পামেলার ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণরূপে (parody) জোসেফ আণ্ড্রুজ (Joseph Andrews) নামে একটি উপন্যাস রচনা করিলেন (১৭৪২)। ইহাতে তিনি পামেলার এক ভ্রাতা জোসেফের অবতারণা করিয়া তাহাকে তাহার প্রভুপত্নীর প্রণয়ের শিকাররূপে চিত্রিত করিলেন। জোসেফও নিজ ভগিনী পামেলার ন্যায় নিজ সতীত্ব (!) রক্ষার জন্য কোমর বাঁধিল এবং নানারূপ কলা-কৌশলের সাহায্যে প্রভু-পত্নীর হাত হইতে নিস্তার পাইবার চেষ্টা করিল। স্ত্রীলোকের পক্ষে যাহা শোভন, পুরুষের পক্ষে তাহা বিসদৃশ। এই বিসদৃশতাকে প্রকট করিয়া ফিল্‌ডিং রিচার্ডসনের রচনার মধ্যেও যে একটা হাস্যজনক অসঙ্গতি আছে তাহা পরিস্ফুট করিয়াছেন।

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, যাহারা উপহাস করিতে আসে, তাহারা শেষ পর্যন্ত উপাসনাকারীদের দলে ভিড়িয়া যায়। ফিল্‌ডিং-এর ক্ষেত্রেও তাহা হইয়াছিল। তিনি অপরকে ঠাট্টা করিতে গিয়া নিজ প্রতিভার বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ ছাড়িয়া তিনি মৌলিক উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিলেন ও অষ্টাদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস টম জোন্‌সের (Tom Jones : ১৭৪৯) রচয়িতারূপে প্রসিদ্ধ হইলেন। এই উপন্যাস ভাবে-ভঙ্গীতে, ধরন-ধারণে, চরিত্রাঙ্কন-রীতি ও টীকা-টিপ্পনীতে রিচার্ডসনের উপন্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কোথায় গেল রিচার্ডসনের গম্ভীর হাস্যলেশহীন বর্ণনা-পদ্ধতি, কোথায় বা তাঁহার আনুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ-প্রণালী, কোথায় বা তাঁহার ব্যবসায়-বুদ্ধি-প্রভাবিত নীতি-প্রচার। ফিল্‌ডিং হাস্যরসে, বিদ্রূপে, লঘু-তরল ইঙ্গিত ও কটাক্ষে, অফুরন্ত প্রাণশক্তির লীলা-প্রাচুর্যে, সরস বর্ণনাভঙ্গী ও অবান্তর বিষয়-বাহুল্যে, ক্ষমা-স্নিগ্ধ এবং উদার মনোভাবে পাঠকের সহিত একটা মধুর, হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বন্ধ-স্থাপনে রিচার্ডসনের বদ্ধ ঘরের সব কয়েকটা জানালা খুলিয়া দিয়া তাহার ভিতর দক্ষিণা বায়ুর হিল্লোল বহাইয়া দিলেন। অতিসতর্ক শুচিবায়ুগ্রস্ত নৈতিকতা, নিষ্ক্রিয়

ওজনে পাপ-পুণ্য বিচার করিয়া দণ্ডপুরস্কার-বিতরণ তাঁহার একান্ত অরুচিকর ছিল। তাঁহার নায়ক টম্ জোন্স্ বারবার প্রলুব্ধ হইয়াছে ও রূপমোহের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু তাহার উদার সরলতা, কোমল পরদুঃখকাতর হৃদয় ও স্বার্থলেশহীন মনোবৃত্তি তাহার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষালন করিয়াছে। তাহার জীবনও নানা বিচিত্র ঘটনা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। এইভাবে ঘটনা-বৈচিত্র্য ও চরিত্র বিশ্লেষণ উভয়ই উপন্যাসটির আকর্ষণের হেতু হইয়াছে। রিচার্ডসনের উপন্যাসে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু ঘটনার গতি অতি মন্থর। ফিল্ডিং-এ বিশ্লেষণ খুব সূক্ষ্ম নহে, কিন্তু বর্ণিত জীবনযাত্রা গতিবেগে চঞ্চল। অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডের নাগরিক ও গ্রাম্য জীবনের অতি জীবন্ত ছবি আমরা এই উপন্যাসে পাই। অবাধ স্ফূর্তি আমোদ, প্রচণ্ড কর্মতৎপরতা, বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশে জটিল ঘাত-প্রতিঘাত, শক্তির অজস্রতা, ঘটনা-প্রবাহের অশ্রান্ত ঘূর্ণিপাক, ব্যক্তিত্বের তীব্র, উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি, এই সমস্ত দিক দিয়া টম্ জোন্স্ই উপন্যাসের ভবিষ্যৎ গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়াছে।

নবজাত উপন্যাসের রূপবৈচিত্র্যের সম্ভাবনা কত বেশী তাহা **স্টার্নের** (Laurence Sterne : ১৭১৩-১৭৬৮) 'ট্রিস্ট্রাম শ্যাণ্ডি' (Tristram Shandy) (১৭৬০-১৭৬৭) ও A Sentimental Journey বা 'বেদনশীলের ভ্রমণ-কাহিনী' (১৭৬৮) নামে দুইখানি উপন্যাসে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই দুইখানি উপন্যাসের মধ্যে উপন্যাসের একটি মৌলিক উপাদান—ঘটনার ধারাবাহিকতা একেবারেই নাই। গল্প, লেখকের মর্জি ও খেয়াল অনুসারে, কখন একেবারে নিশ্চল—কখন বা দীর্ঘপদক্ষেপে মাঝে অনেকখানি ফাঁক রাখিয়া ধাবমান। শ্রেণীবদ্ধ তারকা-চিহ্নগুলি (* * *) গল্পের এই পৌর্বাপর্বের অভাবের জলন্ত সাক্ষ্য। গল্পের ফাঁক খেয়ালী কল্পনার অতি-পল্লবিত প্রাচুর্যে পূর্ণ হইয়াছে। স্টার্নের প্রধান গুণ অতি-সূক্ষ্ম রসানুভূতি ও ভাববিলাস, বিশেষতঃ করুণ রসে ও হাস্যরসে সিদ্ধহস্ততা ও চরিত্রসৃষ্টি। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রদের মধ্যে টোবি চাচা (Uncle Toby) অমর হইয়া থাকিবে। বিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে মনে হয় 'ট্রিস্ট্রাম শ্যাণ্ডি'-তে স্টার্নের পদ্ধতি বর্তমান শতকের অবচেতন মনের ঔপন্যাসিকদের পদ্ধতির মত।

স্মলেট্ (Tobias George Smollett : ১৭২১-১৭৭১) খানিকটা ফিল্ডিংয়ের সমধর্মী; কিন্তু ফিল্ডিংয়ের সংবেদনশীল মন তাঁহার নাই। রূঢ় ও

অমার্জিত বস্তুবাদই স্মলেটের প্রধান প্রবণতা। মানব সমাজের প্রতি তাঁহার যে নৈরাশ্য-জনিত ক্রোধ তাহাই তাঁহার উপন্যাসের মুখ্য প্রেরণা। তাঁহার উপন্যাসের কাঠামো চোর-বদমাইস-ভবঘুরেদের যদৃচ্ছা-প্রণোদিত ভ্রমণকাহিনী হইতে গৃহীত। তাঁহার নায়কদের চরিত্র প্রধানতঃ বহিরঙ্গমূলক—তাহারা সর্বদাই দেশ হইতে দেশান্তরে ধাবমান। এই সদা-চঞ্চল গতিবেগ ও মুহুর্মুহু দৃশ্য-পরিবর্তনের জন্য তাহাদের অন্তঃপ্রকৃতি বিশ্লেষণ-সাহায্যে স্পষ্টীকৃত হয় নাই। ট্রনিয়ন (Trunnion) ও বোলিং (Bowling)-এর মত নাবিক জাতীয় কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র খুব সজীব ও শ্রেণী-প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহার নায়কগণ উহাদের বে-আইনী কার্যকলাপ ও অসামাজিক মনোবৃত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সুখময় পরিণতি লাভ করিয়াছে; সুতরাং স্মলেট তাঁহার সমাজ-বিদ্বেষ সত্ত্বেও সমাজের সাধারণ মূল্যমান স্বীকার করিয়া উহার সহিত আপোস-রক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার শেষ উপন্যাস হামফ্রি ক্লিংকার (Humphrey Clinker)-এ (১৭৭১) তাঁহার মনোভঙ্গীর প্রসন্নতা ও জীবনপ্রীতি প্রতিফলিত হইয়াছে। ম্যাথিউ ব্রাম্বল তাঁহার প্রশান্ত, ক্ষোভোত্তীর্ণ, স্নিগ্ধ বার্ধক্যের প্রতিচ্ছবি। এই উপন্যাসে তিনি রিচার্ডসনের ন্যায় পত্র-বিনিময়-পদ্ধতির সাহায্যে ঘটনার অগ্রগতি ও চরিত্রের বিকাশ দেখাইয়াছেন। এই প্রণালী অবলম্বনের জন্য একই কথা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে কত বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে, সেইজন্য প্রতিটি ব্যক্তির চরিত্রবৈশিষ্ট্যের উপর মনস্তত্ত্ব-সম্মতরূপে জোর দেওয়ার প্রয়োজনও হইয়াছে। মোট কথা, হামফ্রি ক্লিংকার-এ লেখকের বাস্তববোধের সহিত মানবপ্রীতি সংযুক্ত হইয়া উহা কতকটা কোমল ও পরিমার্জিত রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

অলিভার গোল্ডস্মিথ (Oliver Goldsmith : ১৭২৮-১৭৭৪) শুধু কবিই ছিলেন না। The Vicar of Wakefield বা 'ওয়েকফিল্ডের ধর্মযাজক' (১৭৬৬) নামে একটি উপন্যাস লিখিয়া তিনি ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। এই উপন্যাসটি বহু পরিমাণে লেখকের আত্মজীবনীর উপাদানে গঠিত। ইহাতে একটি মনোজ্ঞ পারিবারিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ডাক্তার প্রিমরোজ সরল, সাংসারিক-জ্ঞানশূন্য ভাল মানুষ কিন্তু তাঁহার চরিত্রে ধর্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা আছে। তিনি লোককে বিশ্বাস করিয়া ঠকেন, কিন্তু মানবের প্রতি আস্থা হারান না। এই জাতীয় চরিত্র ইংরাজ জাতির অত্যন্ত প্রিয় ও বহু ঔপন্যাসিকের দ্বারা পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। বুদ্ধি অপেক্ষা ভালবাসা যে শ্রেষ্ঠতর, সহানুভূতিপূর্ণ কোমল

হৃদয় যে মস্তিষ্কের অপূর্ণতার সমস্ত দোষের প্রতিষেধক, সরল আচরণ যে মানুষের প্রধান চরিত্র-গৌরব এই নীতিগত সত্যই উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্র-বিকাশে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই উপন্যাসে চরিত্র-বিশ্লেষণের জটিলতা বা দুরূহ জীবন-সমস্যা নাই, আছে সরল বিশ্বাস, মৃদু ব্যঙ্গরসিকতা ও প্রসন্ন জীবনবোধ।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে বিস্ময়বোধের ও কল্পনার যে পুনরুদ্বোধন রোমান্টিক কবিতার আবির্ভাবের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিল তাহার প্রভাব উপন্যাসেও দেখা যায়। **হোরেস ওয়ালপোল** (Horace Walpole : ১৭১৭-১৭৯৭)-এর The Castle of Otranto বা 'অট্রান্টোর দুর্গ' (১৭৬৪), **মিসেস্ র‍্যাডক্লিফের** (Mrs. Radcliffe : ১৭৬৪-১৮২৩)-এর The Mysterious Udolpho বা 'রহস্যময় উডল্‌ফো' (১৭৯৪) ও **ম্যাথিউ লুইস** (Matthew Lewis : ১৭৫৭-১৮১৮)-এর Ambrosio or The Monk অর্থাৎ 'আমব্রোসিও বা পুরোহিত' (১৭৯৫), Tales of Terror বা 'রোমাঞ্চ-কাহিনী' (১৭৯৯) ও Tales of Wonder বা 'বিস্ময়-কাহিনী' (১৮০১) প্রভৃতি উপন্যাস অতিপ্রাকৃতের প্রতি যুগরুচির আকর্ষণ, গায়ে-কাঁটা-দেওয়া ভৌতিক কাহিনীর প্রতি নবজাগ্রত মানসপ্রবণতার পরিচয় বহন করে। অবশ্য এই রোমাঞ্চ বা রহস্যসৃষ্টি খুব কাঁচা ধরনের; ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্ব-জ্ঞান বা উন্নত কলাকৌশল কিছুই নাই। এই উপন্যাসগুলি কেবল মানুষের আদিম ভীতিসংস্কার, অজ্ঞাত রহস্যের অনুভূতিতে এক প্রকার অসহায় অথচ উপভোগ্য বিস্ময়শিহরণ জাগাইবার উদ্দেশ্যে লেখা। সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদিগকে গথিক উপন্যাস বলা হয়।

হোরেস ওয়ালপোল মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রার সহিত অতিপ্রাকৃত অনুভূতি মিশ্রিত করিয়া ইহাকে একটা বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেশ-সমর্থন দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যুক্তিবাদের আবহাওয়ায় লালিত বলিয়া তাঁহার মধ্যে কবিসুলভ সাঙ্কেতিকতা ও সূক্ষ্ম রহস্যদ্যোতনার অভাব। তাঁহার চরিত্রসৃষ্টিও অত্যন্ত আড়ষ্ট; সুতরাং যুগের রুচি-পরিবর্তনের ইঙ্গিত ছাড়া তাঁহার উপন্যাসের আর কোন বিশেষ মূল্য নাই।

মিসেস্ র‍্যাডক্লিফ এই ভূতাবিষ্ট ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি মনের মধ্যে এক প্রকার অনির্দেশ্য বিভীষিকা, এক অস্ফুট বিপদের পূর্বাভাস জাগাইতে সিদ্ধহস্ত। জীবনের আলো-আঁধারির মধ্যে প্রবেশের শক্তি তাঁহার অন্য ঔপন্যাসিকের সহিত তুলনায় অসাধারণ। তাঁহার

প্রকৃতি-বর্ণনাও বিচিত্র ও সূক্ষ্ম-অনুভূতিসম্পন্ন। এবিষয়ে পরবর্তী যুগের রোমান্টিক কবিগোষ্ঠীর তিনি পথ-প্রদর্শক। তাঁহার ভৌতিক আশঙ্কা-উদ্রেকের মধ্যেও সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার পরিচয় মিলে। কিন্তু এক দোষে তাঁহার এই সমস্ত গুণাবলী ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি শেষ পর্যন্ত সমস্ত অলৌকিক ঘটনার একটা তথ্যগত, বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়াছেন। পাঠক যখন আবিষ্কার করে যে স্বাভাবিক ঘটনাকে অতিপ্রাকৃত রূপে চালাইবার চেষ্টা করিয়া লেখিকা তাহাকে ফাঁকি দিতে চাহিয়াছেন, তখন তাহার মনে অবিশ্বাস বদ্ধমূল হয় ও সে আর লেখিকার মায়াজালে ধরা দিতে চাহে না। লেখকের মনে যদি একটা সহজ অপ্রাকৃত সংস্কার না থাকে, যদি তিনি অন্তত সাময়িকভাবে অলৌকিক অভিজ্ঞতাকে অবিসংবাদিত সত্যরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না থাকেন, তবে পাঠকের মনে রহস্যানুভূতি কখনই সংক্রামিত হয় না। মিসেস্ র‍্যাডক্লিফ্ এখানেই ব্যর্থ হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্র-কল্পনার দুর্বলতা ও উপন্যাসের অনাবশ্যক অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যও তাঁহার জনপ্রিয়তা ও শাশ্বত সাহিত্যিক মূল্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কিন্তু তিনি যে ইঙ্গিত দিয়াছেন পরবর্তী রোমান্টিক যুগের কবিরা তাহাকে সম্প্রসারিত ও উন্নততর কলাবোধের সাহায্যে রূপান্তরিত করিয়া সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

লিউইস তাঁহার Monk বা 'পুরোহিত' নামক উপন্যাসের জন্য Monk এই অভিধায় পরিচিত হইয়াছেন। তিনি শয়তান-জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি করিয়া বায়রনের সৃষ্ট নায়ক-গোষ্ঠীর পূর্বাভাস দিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসে কোনো গভীর জীবনবোধ বা ভাবাবহের বাস্তবতা নাই; তাঁহার চরিত্রসৃষ্টিও অতিনাটকীয় এবং অবিশ্বাস্যরূপে একমুখীন। এই রহস্যধর্মী উপন্যাসগুলির একমাত্র সার্থকতা এই যে, ইহারা জাতীয় মানসের ক্রমবর্ধমান রোমান্স-প্রবণতার ইঙ্গিতবাহী।

৪

অষ্টাদশ শতক প্রধানতঃ গদ্য-রচনার যুগ। উনবিংশ শতকের কবি ও সমালোচক ম্যাথিউ আর্নল্ড ইহাকে "অতি-প্রয়োজনীয় যুক্তিবাদ ও গদ্যের" যুগ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। এই যুগে আধুনিক গদ্যরীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতকের গদ্য কবি-কল্পনার সংমিশ্রণে আর্দ্র, সুদীর্ঘ বাক্য-বিন্যাসে শ্লথ-মন্থর এবং দৃঢ় ও সরল পদক্ষেপের পক্ষে অনুপযুক্ত। অষ্টাদশ শতক গদ্যের এই উভচর-বৃত্তি উচ্ছেদ করিয়াছে—কাব্যের সুমধুর অথচ শ্বাসরোধকারী

আলিঙ্গন হইতে ইহাকে মুক্ত করিয়া ইহাতে স্বচ্ছন্দ গতি ও স্বাধীন সত্তা অর্পণ করিয়াছে। এই গদ্যের প্রধান কর্তব্য হইল বিবৃতি, যুক্তি-সাহায্যে প্রতিপাদন এবং সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় তত্ত্বালোচনা ও তথ্যসন্নিবেশ। ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, সন্দর্ভ-রচনা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই সপ্তদশ শতকেই ইহার কার্যকারিতা ও ক্রমোন্নতি পরিস্ফুট হইয়াছে। এই গদ্যের ভাষা সাধারণতঃ একটু গুরুগম্ভীর, আড়ম্বরপূর্ণ ও ল্যাটিন-বহুল; কিন্তু বাক্যগুলি হ্রস্ব, সংক্ষিপ্ত ও সুগঠিত। এই শতকের প্রকাশ-ভঙ্গী সামান্যরূপ পরিবর্তিত হইয়া, কতকটা গাম্ভীর্য ও আড়ম্বরের বোঝা হালকা করিয়া, বর্তমান যুগেও বজায় আছে।

অষ্টাদশ শতকীয় গদ্যরীতির মধ্যে **আডিসন** (Joseph Addison : ১৬৭২-১৭১৯), **স্টীল** (Richard Steele : ১৬৭২-১৭২৯) ও **সুইফ্‌টের** (Jonathan Swift : ১৬৬৭-১৭৪৫) নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী অভিজাত সম্প্রদায়ের নিকট হইতে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের জন্য শিক্ষাপ্রসার ও রুচিপ্রকর্ষের সহায়তায় প্রস্তুত হইতেছিল, এই লেখকেরা তাহাদেরই প্রতিনিধি ও পথিকৃৎ। অষ্টাদশ শতকের মধ্যবিত্তদের মধ্যে সুনীতি ও সুরুচির পুনরাবির্ভাব, পারিবারিক জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ধর্মবোধ-নির্ভরতা ও কোমল ভাববিলাসের প্রতি প্রবণতা এইসব লেখকেরই অবদান। রেস্টোরেশন যুগের ফরাসী-প্রভাব-দূষিত ও নীতিহীন অভিজাতসুলভ আচার-আচরণকে অপসারিত করিয়া জাতীয় জীবনচর্যাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্বও ইহাদের।

আডিসন ও স্টীলের রচনায় এই রুচি-বিবর্তন ও অন্তরের সুকুমার বৃত্তির স্ফুরণের চিহ্নই লক্ষ্য করা যায়। তাঁহাদের সন্দর্ভসমষ্টি, ট্যাটলার (১৭০৯) ও স্পেক্‌টেটার (১৭১১) এই দুই সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দুইটি পত্রিকাকে ইংরাজী সাময়িক পত্রিকার অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। ট্যাটলার সপ্তাহে তিনবার বাহির হইত। ট্যাটলার উঠিয়া যাইবার পর স্পেক্‌টেটার বাহির হয়। ইহা ছিল দৈনিক পত্রিকা। প্রত্যেক সংখ্যাতেই একটি প্রবন্ধ বা রচনা থাকিত। সাহিত্য, রাজনীতি, সামাজিক কুসংস্কার সমস্ত কিছুর উপরই প্রবন্ধ লেখা হইত।

ইংরাজ জাতিকে রুচিগত স্থূলতা ও বর্বরতা, আত্মাভিমানের উৎকট আতিশয্য ও আচরণের মাত্রাহীন অসঙ্গতি হইতে উদ্ধার করিয়া সুস্থ, সু-মিত ও শোভন আচারে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এই সকল প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিগত যুগে যে

প্রকাশ্য ও কুণ্ঠাহীন উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজ-জীবনকে কলুষিত করিয়াছিল ও সমকালীন সাহিত্যে একটা গাঢ় কলঙ্কচিহ্ন আঁকিয়াছিল, তাহার পরিবর্তে ধর্ম ও নীতিবোধের মৃদু নিয়ন্ত্রণ, সৌজন্য-ভব্যতার একটা স্বয়ংবৃত শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যেই আডিসন ও স্টীল লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। ইহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল মৃদু পরিহাস ও সস্নেহ তিরস্কার। ইহারা কখনও নীতিশিক্ষকের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানপূর্ণ, উচ্চমঞ্চারোহী ক্রোধবহ্নিদীপ্ত মেজাজ লইয়া তাঁহাদের কার্যে ব্রতী হন নাই। সেইজন্যই তাঁহাদের সাফল্য হইয়াছিল অভূতপূর্ব।

আডিসন ও স্টীল তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য 'স্পেকটেটার ক্লাব' নামে একটি মিলন-সংস্থার কল্পনা করিয়াছেন ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদিগকে ইহার সদস্য করিয়া তাহাদের বিভিন্ন মতবাদের আলোচনার মাধ্যমে তাহাদিগকে চরিত্রবৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সার রোজার ডি কভারলি ও স্পেকটেটার বা 'দর্শক' ছদ্মনামধারী লেখক নিজে খুব জীবন্ত চরিত্ররূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। সার রোজার পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র জমিদার—তিনি শান্তিপূর্ণ ও সংঘাতহীন পল্লী-অঞ্চলে তাঁহার প্রজাদের লইয়া, তাহাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হইয়া একচ্ছত্র আধিপত্য ভোগ করেন। তাহারা যাহাতে নিয়মিত গির্জায় যায়, রবিবারের ধর্মভাষণ মনোযোগ দিয়া শোনে, সেদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কেহ যদি সে সময় ঘুমাইয়া পড়ে, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহাকে উচ্চকণ্ঠে তিরস্কার করিয়া ধর্মযাজকের ভাষণে বাধা সৃষ্টি করিতেও কুণ্ঠিত হন না। ধর্মোপদেশের সময় নীরব অমনোযোগ অপেক্ষা সরব প্রতিবাদ যে আরও অশোভন, এ বোধ তাঁহার নাই। তিনি যখন মাঝে-মধ্যে শহরে আসেন ও শহরের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে যান, তখন পাড়াগেঁয়ে মানুষের হাস্যকর বোকামি বা অনুচিত আচরণ তাঁহার ব্যবহার ও বচনে প্রকাশ হইয়া পড়ে। মোটের উপর তিনি একজন উদারহৃদয়, অথচ উৎকেন্দ্রিক এবং কৌতুকপূর্ণ চরিত্ররূপে আমাদের প্রীতি আকর্ষণ করেন। তাঁহার মধ্য দিয়া অষ্টাদশ শতকের উচ্চ-কোটি জীবনের কেতাদুরস্ত আদর্শ ও অতিমার্জিত রুচির একটা প্রতিযোগী বিকল্প জীবনচর্যার দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে।

আডিসন ও স্টীলের নীতিশিক্ষা অতি সুকৌশলে ও পরোক্ষভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহারা নীতি-বিচ্যুতির গুরুতর ফল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিয়া, সমাজে হাস্যাস্পদ হইবার ভয়কেই বড় করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। পরলোকে অনন্ত নরকভোগ অপেক্ষা ইহলোকে সামাজিক অশ্রদ্ধাই যে সামাজিক জীবের

মনে অধিকতর প্রভাবশীল হয় এই মনস্তত্ত্বজ্ঞানটুকুর সার্থক প্রয়োগ তাঁহারা করিতে পারিয়াছেন। সে যুগে রাজনৈতিক মতভেদের তীব্রতা সমাজে নানাবিধ অশান্তি ও উৎকণ্ঠার প্রধান কারণ ছিল। সুতরাং প্রাবন্ধিকদ্বয় পরমতসহিষ্ণুতা ও বিভিন্ন দলের মধ্যে সামাজিক সৌজন্যরক্ষার উপকারিতা দেখাইয়া একাধিক কৌতুককর প্রবন্ধ লিখিয়া এই উৎকট ব্যাধির প্রশমন করিতে চাহিয়াছেন।

তাঁহাদের রচনার বিষয়-বৈচিত্র্য সত্যই বিস্ময়কর। সুপ্রতিবেশীরূপে বসবাসের কলাকৌশল, পরিবারজীবনের কর্তব্য, প্রকৃত সৌজন্যের লক্ষণ, সমাজে নারী-জাতির প্রকৃত স্থান, বেশভূষা, আমোদ-আহ্লাদ ও পড়াশুনা সম্বন্ধে সুষ্ঠু ও শোভন আদর্শ ইত্যাদি সমস্ত লঘু গুরু বিষয়ই তাঁহাদের রচনায় আকর্ষণীয় ও সুস্পষ্টভাবে একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাহিত্যে বিষয়ের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অপেক্ষা উপস্থাপনা কৌশল ও সঠিক রুচি-সংস্কারের উপরই যে লেখকের সাফল্য নির্ভর করে এই রচনাগুলিতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কাল্পনিক কাহিনীর সহিত ঔপন্যাসিক উপাদান, দার্শনিক আলোচনার সহিত রুচির সূক্ষ্মতা, নীতি-প্রচারের সহিত সরস, কৌতুককর দৃষ্টান্ত, অমূর্ত ভাবের সহিত ছোট-খাট সমাজচিত্র ও লোকব্যবহারের বিবরণ মিশাইয়া ও এই মিশ্র বিষয়বস্তুকে পরিমিত, সর্বজনবোধ্য, রসাশ্রয়ী ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া আডিসন ও স্টীল এক নূতন সাহিত্যভঙ্গী প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহাকে অনেকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সন্দর্ভ অথবা প্রবন্ধ বা Personal essay বলেন। পরবর্তীকালে রোমান্টিক যুগে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবন্ধ খুবই জনপ্রিয় হয় এবং তাহার এই জনপ্রিয়তা আজও অটুট আছে। বর্তমানে ক্ষেত্রবিশেষে ইহাকে রম্যরচনাও বলা হয়।

এই যুগ্ম লেখকের মধ্যে ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা নির্দেশ খুবই দুরূহ। তাঁহারা পরস্পরকে এত গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছেন যে, তাঁহাদের রীতিপার্থক্য চোখে পড়ে না। সাধারণতঃ বলা হয় যে, স্টীল একটু বেশী আবেগপ্রবণ ছিলেন ও আডিসনের পরিমিতি-বোধ, শৃঙ্খলাজ্ঞান ও যুক্তিনিষ্ঠতা অধিক ছিল। এই যৌথ কারবারে আডিসনই যে প্রধান অংশীদার ছিলেন ও স্টীল কিছু গৌণ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

জোনাথান সুইফ্‌ট্ (Jonathan Swift : ১৬৬৭—১৭৪৫) ভাষাদর্শের দিক দিয়া আডিসন ও স্টীলের সহযোগী, কিন্তু ভাবপ্রেরণা ও ব্যক্তিসত্তার রহস্যময় জটিলতার দিক দিয়া একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ। মানববিদ্বেষ তাঁহার যেন অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। মানবজীবন-যাত্রা ও উহার

সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহার এক নিদারুণ অবজ্ঞা ছিল ; উহার হেয়তা ও অকিঞ্চিৎকরত্ব দেখাইবার জন্য তিনি সর্বদাই বদ্ধপরিকর। মানুষের নীচতা, স্বার্থপরতা, কপটতা, মিথ্যাপরায়ণতা, নিষ্ঠুরতা, আত্মম্ভরিতা, ধর্মের নামে অনাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁহার আক্রমণের রীতি এতই বহুমুখী ও মর্মান্তিক যে, এ সম্বন্ধে চিন্তা করিলেই মন যেন একটা আতঙ্ক ও জুগুপ্সায় অভিভূত হইয়া পড়ে। জীবনের শেষ পর্যায়ে সুইফ্‌ট্ উন্মাদ হইয়া যান। মনে হয়, তাঁহার এই অপ্রকৃতিস্থতা ও মানববিদ্বেষ কোন দুর্বোধ্য সূত্রে পরস্পর-সম্পর্কিত। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার বন্ধুত্ব, প্রেম প্রভৃতি সুকোমল হৃদয়বৃত্তি অনুশীলনের যথেষ্ট অবসর ছিল এবং মানুষ হিসাবে তিনি কোমল, দয়াশীল ও ক্ষমাপ্রবণ ছিলেন। তিনি পোপ, আরবুথনট প্রভৃতি মনীষী-গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ সহযোগী ছিলেন এবং স্টেলা ও ভানেসা এই সাঙ্কেতিক নামে পরিচিতা দুইটি রমণী যে তাঁহার প্রেমে আত্মহারা হইয়াছিলেন ও তাঁহার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। ইহাদের প্রতি লেখা তাঁহার চিঠিপত্রের মধ্যে যে অকৃত্রিম হৃদয়োচ্ছ্বাস, প্রেম-সুরভিত অন্তরের যে মধুর আত্ম-উদ্ঘাটন, শিশুর ন্যায় কলকাকলিমুখর আদর-সোহাগের যে অজস্র উৎসার ছত্রে ছত্রে ক্ষরিত হইয়াছে তাহা দেখিলে এই লেখকই যে মানববিদ্বেষী সুইফ্‌ট্ তাহা মনে হয় না। কালকূটে ভরা এই বিশ্ববিদ্বেষীর অন্তরে কোথায় এক সুধাপাত্র লুকান ছিল, যেখান হইতে অবিরত মাধুর্যধারা নির্গত হইয়াছে। সুইফ্‌ট্ মনস্তাত্ত্বিকের নিকট এক দুর্বোধ্য প্রহেলিকা—কোন জানা নিয়মের মানদণ্ডে তাঁহার বিপরীত-উপাদান-গঠিত ঘৃণা ও প্রেম এই দুই পরস্পর-বিরোধী কোটির মধ্যে ঘূর্ণায়িত মানসলোকের ব্যাখ্যা করা যায় না।

সুইফ্‌টের প্রথম রচনা A Tale of a Tub বা 'টবকাহিনী' ও The Battle of the Books বা 'বইয়ের যুদ্ধ' (১৭০৪) তাঁহার সাহিত্যরীতি ও তির্যক-কটাক্ষপ্রবণ ব্যঙ্গ-মনোভাবের নিদর্শন। প্রথম বইটিতে ধর্মসংস্থানের সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত শ্লেষাত্মক উক্তি করিয়াছেন তাহাতে যে ধর্মের মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই ও ধর্ম সম্বন্ধে তিনি যে কিরূপ হীন ধারণা পোষণ করেন তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কল্পনা করিয়াছেন যে তিনটি প্রধান খৃষ্টানসম্প্রদায় যিশু খ্রীষ্টের তিন পুত্র ; তাহারা আপন আপন পছন্দমত তিন রঙের পোশাক করিয়া লইল এবং তাহাদের যত কিছু তর্ক ও মতভেদ সবই পোশাকের বিভিন্ন রং লইয়া ; অর্থাৎ ধর্মসম্প্রদায়ের মতভেদের কারণ যে অতি তুচ্ছ বা অকারণ ইহাই তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

সুইফ্‌ট নিজে ধর্মযাজক ছিলেন; একজন ধর্মযাজকের এই মনোভাব সত্যই বিস্ময়কর। সুইক্‌ট্‌ অবশ্য ইংলণ্ডীয় চার্চ বা ধর্মসম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বন করিয়াই অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়কে তুচ্ছ কলহ হইতে নিরস্ত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যুক্তি সমস্ত ধর্মেরই মূলোচ্ছেদকারী এবং সুইক্‌ট্‌ শ্লেষ-প্রয়োগের দ্বারা তাঁহার আপাতধর্মানুগত্যের তলে তলে এই সর্বধ্বংসী বারুদই স্থাপন করিয়াছেন।

The Battle of the Books বা 'বইয়ের যুদ্ধ' পুস্তকে প্রাচীন ও আধুনিক লেখকদের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব-নির্ধারণ প্রসঙ্গে সুইফ্‌ট্‌ তাঁহার তিক্ত মনোভাব ও ব্যঙ্গপ্রয়োগে অদ্ভুত নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এই যুদ্ধে প্রাচীনদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু এই পক্ষ-গ্রহণ তাঁহার একটা ছল মাত্র। তিনি এই উপলক্ষ্যের সুযোগ লইয়া পণ্ডিতমহলের যত কিছু দোষ-ত্রুটি, তাঁহাদের পাণ্ডিত্যাভিমান, ঈর্ষা-কলুষিত মনোবৃত্তি, শিষ্টাচার-লঙ্ঘন ও যুক্তিবিচারের অপপ্রয়োগকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করিয়াছেন। সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রিচার্ড বেন্‌ট্‌লীকে নাস্তানাবুদ করাই এই পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য এই বিতর্কে বেন্‌ট্‌লীর মতই যথার্থ ছিল, তাহা সুইফ্‌টের ব্যঙ্গকে বিন্দুমাত্র সংযত বা প্রভাবিত করে নাই।

সুইফ্‌টের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ Gulliver's Travels বা 'গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত' (১৭২৬)। এই বইখানি আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব কতকগুলি ঘটনা ও উদ্ভট রূপকথাধর্মী কল্পনার সমাবেশ। এ যেন আরব্য-রজনীর একটা পাশ্চাত্য-দেশোচিত সংস্করণ। কিন্তু এই দৃশ্যতঃ নির্দোষ, শিশু-চিত্তরঞ্জন, অপ্রাকৃত রসের কাহিনীর মধ্যে মানবের প্রতি নির্মমতম, মানবমর্যাদার সম্পূর্ণ উন্মূলনকারী আক্রমণ প্রচ্ছন্ন আছে। মানুষের ইতিহাস-বিশ্রুত সভ্যতা ও সংস্কৃতি, তাহার জয়যাত্রার গৌরব, তাহার জ্ঞানসাধনা ও কর্মমহিমাকে যে এরূপ একান্তভাবে ধূলিসাৎ করা যায়, তাহার আদর্শস্বপ্নকে বালকের হাতে বায়ুস্ফীত বেলুনের মত এমন শোচনীয়ভাবে টুটাইয়া চুপসাইয়া দেওয়া যায়, সুইফ্‌টের পূর্বে বা পরে অন্য কোন লেখক তাহা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে এরূপ অকল্পনীয় সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। সুইফ্‌ট্‌-মেঘনাদ রূপক-মেঘের অন্তরাল হইতে এই মারাত্মক অস্ত্রক্ষেপণ করিয়াছেন বলিয়া ইহা যেন ইন্দ্রজালবৎ আমাদের বিস্ময়-স্তম্ভিত করে—আমরা যে আহত হইয়াছি, বিস্ময়ের আধিক্যে তাহাই আমাদের খেয়াল থাকে না। এই আঘাত-পরম্পরা এত নিখুঁত পরিমিতি-জ্ঞানের সহিত পরিকল্পিত, বিভিন্ন দিক হইতে অস্ত্রবর্ষণ এমন অভ্রান্তভাবে কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের দিকে

পরিচালিত, লেখকের বর্ণনাভঙ্গীর ছদ্ম-সরলতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পিছনে এমন মারাত্মক উদ্দেশ্য সুকৌশলে প্রচ্ছন্ন থাকে যে সাধারণ পর্যটকের অদ্ভুতরস-প্রধান কাহিনী যে কিরূপ নিগূঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মানবের প্রতি চরম আঘাতে, তীব্রতম শ্লেষ ও নিষ্ঠুরতম অবমাননায় রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না। যখন বুঝি, তখন আমাদের সমস্ত অন্তরাত্মা এক দুর্বোধ্য আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে।

গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত চার খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম দুইটি লিলিপুট ও ব্রবডিংনাগের বৃত্তান্ত আজও শিশুচিত্তরঞ্জক। রূপকার্থে লিলিপুট ও ব্রবডিংনাগ-এ মানব-প্রকৃতিকে দুই বিপরীত প্রকারের দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করা হইয়াছে। অবশ্য উভয়বিধ প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি একই দাঁড়াইয়াছে : মানুষ ছোটর কাছে বড় ও বড়র কাছে ছোট হইয়া নিজ চিরন্তন ক্ষুদ্রত্বেরই পরিচয় দিয়াছে। তৃতীয় খণ্ড লাপুটাতে দর্শন-বিজ্ঞান সমস্ত মর্যাদা হারাইয়া এক খেয়ালখুশীর অর্থহীন খেলাতে পরিণত হইয়াছে। যে অমরত্বের আশা মানুষের ঐশ্বরিক পরিচয়রূপে অভিনন্দিত, সুইক্‌ট্ তাহাকে সমস্ত মর্যাদাচ্যুত করিয়া, জৈব প্রকৃতির অসহায়, নৈরাশ্য-পীড়িত বিড়ম্বনারূপে, অদৃষ্টের মুক্তিহীন অভিশাপরূপে দেখাইয়াছেন। সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ও গ্লানিকর আঘাত আসিয়াছে শেষখণ্ডে—যেখানে সুইক্‌ট প্রাণিজগতের তুলনায় মানুষকে অবজ্ঞেয় ও হীনতর করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। মানুষ এককালে ঘোড়াকে নিজের বাহনে পরিণত করিয়াছিল, সুইক্‌টের কাহিনীতে ঘোড়া তাহার প্রতিশোধ লইয়াছে—এখানে ঘোড়া প্রভু, মানব দাস, এবং ঘোড়ার প্রভুত্ব মানবের তুলনায় উন্নততর মনীষা ও পরিচালনা-শক্তির নিদর্শন। ঘোড়ার পায়ের লাথি খাওয়াইয়াই সুইক্‌ট্ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, ভগবানের নিকটতম আত্মীয়, জ্ঞানে ও চিন্তায় শীর্ষস্থানীয় মানবের জীবনকাহিনীর উপর যবনিকাপাত করিয়াছেন।

সুইক্‌ট্ অষ্টাদশ শতকে জন্মিলেও এবং ঐ যুগের লেখক-গোষ্ঠীভূত হইলেও তাঁহার আত্মা একক, নিঃসঙ্গ, যুগ-বন্ধন-উত্তীর্ণ। তাঁহার মনে যে বিষম ঝড় বহিত, ভাব-চিন্তার যে অবিরাম উত্থান-পতন অশান্ত সমুদ্রের ন্যায় আলোড়ন সৃষ্টি করিত, বিশ্ববিধানের প্রতি যে সুগভীর অনাস্থা তাঁহাকে কক্ষচ্যুত উল্কার ন্যায় বিকৃত কল্পনার নানা মরুপথে অস্থিরভাবে ছুটাইত, তাহা ঐ যুগের সমষ্টিগত প্রভাব হইতে আসে নাই। তবে যুগের ব্যঙ্গপ্রবণতা তাঁহাকে নিজ মনোবিকার-প্রকাশের পথনির্দেশ দিয়াছে। যুগের ক্ষুদ্র ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ঈর্ষাদ্বেষ-

শ্লেষ-বিদ্রূপকে তিনি যেন একটা নিখিল-ব্যাপ্ত প্রসার, একটা সৃষ্টিতাৎপর্যবাহী গভীরতা দিয়াছেন—মানুষের দোষত্রুটি সম্বন্ধে যুগচেতনা তাঁহার মধ্যে যেন মানব-প্রকৃতির সর্বাত্মক অমর্যাদা ও অবজ্ঞার প্রত্যয়-গভীরতা লাভ করিয়াছে।

ইতিহাস ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এই নূতন গদ্যরীতির কীর্তিস্তম্ভ প্রোথিত। সুইফ্‌টের প্রায় ষাট বৎসর পরে **গিবনের** (Edward Gibbon : ১৭৩৭—১৭৯৪) আবির্ভাব। তাঁহার Decline and Fall of the Roman Empire বা 'রোম-সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন' ইতিহাসের অবিনশ্বর কীর্তি। ইহার গুরুগম্ভীর অথচ সুনিয়ন্ত্রিত ও ছন্দনিয়মিত বাক্যবিন্যাস ভারী-বুট-পরা সৈনিকদলের সমতালে পদক্ষেপের কথা স্মরণ করায়। এই ভাষা বিষয়-গৌরবের সম্পূর্ণ উপযোগী। মাঝে মাঝে গাম্ভীর্যের ছদ্মবেশে শ্লেষ ও বক্রোক্তি ইহার উপভোগ্যতা আরও বাড়াইয়া দেয়।

রাজনৈতিক বক্তৃতা নিশ্চয়ই অমরত্বের জন্য কল্পিত হয় নাই। সাময়িক প্রয়োজনে যাহার জন্ম, প্রয়োজন ফুরাইলে তাহাকে কেহই মনে রাখে না। ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী চার্চিলেরও জ্বালাময়ী, উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা যুদ্ধের শেষে যে নীরবতা নামিয়া আসিয়াছে তাহাতে বিলীন হইয়াছে। এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম বাগ্মিপ্রবর **এডমণ্ড বার্ক** (Edmund Burke : ১৭২৯—১৭৯৭)। তাঁহার বক্তৃতাবলী পার্লিয়ামেণ্ট সভাগৃহ হইতে সাহিত্যের গৌরব-লোকে উন্নীত হইয়া সেখানে চিরস্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ যে, বার্ক সাময়িক আলোচনার মধ্যে চিরন্তনের সুর আনিয়া দিতে পারেন। আমেরিকার স্বাধীনতা-লাভের জন্য বিদ্রোহ ও ফরাসী-বিপ্লব আজ সুদূর অতীতের ঘটনা। এই বিষয়-গুলি সম্বন্ধে বার্কের মতবাদও যে একেবারে অভ্রান্ত তাহা বলা যায় না। স্বাধীনতার যিনি পক্ষ-সমর্থনকারী, স্বৈরাচারের তিনি ঘোরতর বিদ্বেষী। স্বাধীনতার সঙ্গত ও অসঙ্গত ব্যবহারের মধ্যে সীমারেখা যে অনেক সময়ই অস্পষ্ট এবং অপব্যবহারের দায়িত্ব যে সর্বত্র বিদ্রোহী প্রজাপুঞ্জের নহে, উপরন্তু অতীত কুশাসনের শোচনীয় অপরিহার্য পরিণতি, এই সত্য তিনি অনেক সময় নিজ বদ্ধমূল সংস্কারের জন্য স্বীকার করিতে চাহেন নাই। তথাপি কোন বিষয়ে তাঁহার মত ভ্রান্ত বা পক্ষ-পাতদুষ্ট হইলেও তাঁহার বক্তৃতা রাজনৈতিক বিজ্ঞতা ও উদার শাসন-নীতিবিষয়ক উপদেশের মহামূল্য রত্নভাণ্ডার। রাজনীতি তাঁহার নিকট সুবিধাবাদ নহে, একটা গুরুতর নৈতিক দায়িত্ব। "জাতির ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ—উদার মনোভাব, সুদূরপ্রসারী কল্পনা ও অবিচলিত ন্যায়নিষ্ঠা ভিন্ন অসম্ভব"; "বৃহৎ সাম্রাজ্য ও ক্ষুদ্র মন একসূত্রে

গ্রথিত হইতে পারে না" ; "বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে প্রীতি ও হৃদয়ের বন্ধনই অচ্ছেদ্য, পশুবলের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ সূক্ষ্ম সূত্রের মতই অসার ও ক্ষণভঙ্গুর"—এই জাতীয় বহু জ্ঞানগর্ভ বাক্য তাঁহার বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

বার্কের বক্তৃতার মধ্যে এমন একটা গভীর সুর শোনা যায়, যাহা উপরের বায়ুতাড়িত ফেন-বুদ্বুদ মাত্র নহে, পরন্তু হৃদয়ের গভীরতম আলোড়নের অভিব্যক্তি। যাহা তিনি সমস্ত প্রাণ দিয়া অনুভব করিতেন, সমস্ত হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া আয়ত্ত করিতেন, তাহাই তাঁহার বক্তৃতায় আত্মপ্রকাশ করিত। ইহার মধ্যে শুধু ভাষার ইন্দ্রজাল নাই, আছে প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও প্রবল বিশ্বাস। তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে কতকগুলি অসাধারণ বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার মনে যুক্তিবাদের সঙ্গে গভীর ধর্মভাব, অতীতের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও একপ্রকার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (mysticism) মিশ্রিত ছিল—কাজেই তাঁহার আলোচনায় নিছক বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়া আরও গূঢ়তর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাইত। সমাজ-বিবর্তন সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা সাধারণ যুক্তিবাদী হইতে স্বতন্ত্র ছিল। যুক্তিবাদীর বিশ্বাস যে, সমাজ-গঠনে কেবল মানুষের সুবিধাবাদেরই প্রভাব দেখা যায়—আদিম যুগের বিপদ-বাহুল্যই তাহাকে সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা শিখাইয়াছিল ও সমাজের ভিত্তিস্থাপনে প্রণোদিত করিয়াছিল। বার্ক এই সমাজ-সংস্থাপনের পিছনে নিগূঢ় দৈবশক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করেন—ইহা যেন ভগবানের সৃষ্টি-রহস্যের একটা ক্ষুদ্রতর বিকাশ। সুতরাং সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ, তাহার বিবর্তনের প্রত্যেকটি রেখা, অতীত যুগের প্রত্যেক আচার ও সংস্কার তাঁহার নিকট পবিত্র। এই সমাজের অনেক দোষত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু যুক্তিবাদী সংস্কারকের অত্যুগ্র সংস্কার-প্রচেষ্টা তাঁহার চক্ষে পরশুরামের মাতৃহত্যার মতই একটা মহাপাপ। যদি কোন পরিবর্তন অপরিহার্য হয়, তাহা ধীরে ধীরে, সশ্রদ্ধভাবে, অতীত ইতিহাসের ধারার সহিত মিলাইয়া করিতে হইবে। পিতৃপিতামহের স্মৃতিজড়িত প্রতিষ্ঠানগুলিকে নূতন পরিকল্পনার পরীক্ষা-ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করিলে চলিবে না। তাঁহার এই মতবাদগুলির দ্বারা বার্ক রক্ষণশীলদের দার্শনিক ভিত্তি রচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত গুণের জন্যই সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠা চিরন্তন।

অষ্টাদশ শতকের গদ্য-লেখকদের মধ্যে আর এক ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য—যিনি যুগের শেষার্ধের একচ্ছত্র সাহিত্য-সম্রাট ছিলেন। **ডঃ জনসন** (Dr. Samuel Johnson : ১৭০৯—১৭৮৪) তাঁহার জীবন-চরিতকার বস্‌ওয়েলের

অনুগ্রহে, আমাদের অত্যন্ত সুপরিচিত। বোধ হয় অতীতের কোন লোকই এত জীবন্ত মূর্তিতে, জীবনের প্রতি কার্যে, অঙ্গভঙ্গী ও কথোপকথনে, ভবিষ্যৎ যুগের চোখের সামনে প্রতিভাত হন নাই। ডঃ জনসনের মেজাজ একটু রূক্ষ, ধরন-ধারণ জবরদস্তী ও প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু, আচার-ব্যবহার একটু মুরুব্বিয়ানার ঝাঁজযুক্ত, কিন্তু তাঁহার বাহ্য কঠোরতার অন্তরালে একটি কোমল, দয়ার্দ্র, বন্ধুবৎসল হৃদয় লুক্কায়িত ছিল। তিনি তাঁহার চারিদিকে একটি সুহৃদমণ্ডলী গঠন করিয়া তাহাদের সহিত সাহিত্যালোচনায় সময় কাটাইতে ভালবাসিতেন। লেখক হিসাবে তিনি খুব বড় ছিলেন না, কিন্তু সরস সুযুক্তিপূর্ণ কথোপকথন ও বাদ-প্রতিবাদে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তর্কশক্তিতে তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিত। যে কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার দুঃসাহস দেখাইত তাহাকেই তিনি সুতীক্ষ্ণ তর্কাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ছাড়িতেন। এই সমস্ত তর্কযুদ্ধের যে বিবরণ তাঁহার জীবন-চরিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার উপস্থিতবুদ্ধি, প্রতিবাদীর যুক্তিখণ্ডনের অপূর্ব কৌশল ও বলিবার দৃঢ় ভঙ্গীতে বিপক্ষকে একেবারে ধরাশায়ী করার ক্ষমতার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

তাঁহার লিখিবার ও কথোপকথনের ভাষার মধ্যে প্রচুর প্রভেদ দেখা যায়। তাঁহার রচনার ভাষা শব্দ-ভারাক্রান্ত, দীর্ঘবাক্য-বিড়ম্বিত ও ল্যাটিন-বহুল; মুখের ভাষা সরস, তীক্ষ্ণ, বাহুল্য-বর্জিত ও মর্মভেদী। জনসনের সাহিত্য-সমালোচনা ও গ্রন্থাদি সম্পর্কে মতামত তাঁহার সমসাময়িকদের দ্বারা প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত। তিনি কোনও বিষয়ে মত প্রকাশ করিলে তাহা প্রত্যেক সাহিত্যিক মজলিসে প্রচারিত হইত, দেখিতে দেখিতে তাহা চূড়ান্ত বিচারের মর্যাদা লাভ করিত। অবশ্য পরবর্তী যুগে তাঁহার এই মর্যাদা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ও তাঁহার মতের বিরুদ্ধে নানারূপ প্রতিবাদ শোনা গিয়াছে। তাঁহার রসজ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। ক্লাসিক্যাল গণ্ডীর বহির্ভূত কোন লেখকের অনভ্যস্ত প্রণালী তাঁহার অনুমোদন লাভ করিতে পারিত না। তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারাও প্রভাবিত হইত। মিলটন গণতন্ত্রের পক্ষপাতী ও রাজবিদ্রোহী ছিলেন বলিয়া, জনসন তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার যোগ্য সমাদর করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক কবি গ্রে (১৭১৬—১৭৭১) ইংরাজি কাব্য-সাহিত্যে নূতন ধরনের রচনার প্রবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু জনসন তাঁহার সে মৌলিকতা অবহেলা করিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ-বাণে বিদ্ধ করিয়াছেন। তবে জনসনের নিজস্ব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাঁহার রস-বিচার প্রায় অভ্রান্ত ও অনবদ্য

ছিল। তাঁহার বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ, সঙ্গতি-অসঙ্গতিবোধ এত প্রখর, তাঁহার বিচার-শক্তি এত সজাগ ও আবেশ-জড়িমাহীন ছিল যে, অনেক সময় তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি সমস্ত অবান্তর প্রসঙ্গ ভেদ করিয়া একেবারে বিচার্য বিষয়ের মর্মস্থলে পৌছিয়াছে। বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসমালোচক এলিয়ট জনসনের এই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

ডঃ জনসনের শেক্‌শপিয়ার-সমালোচনায় তাঁহার ক্লাসিক্যাল-সুলভ নিয়মানুবর্তিতার মধ্যেও যে বাধা-বন্ধনহীন, স্বাধীন কল্পনাস্ফুরণের প্রতি একটা ব্যক্তিগত রুচিনির্ভর অনুরাগ ছিল তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। একদিকে যুগ-সংহিতার অনুসরণে তিনি শেক্‌শপিয়ারের নানা দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছেন। শেক্‌শপিয়ারের ট্রাজেডির দুঃসাহসিক পরিকল্পনা, তাঁহার নীতিবিধানের স্পর্ধিত উল্লঙ্ঘন, তাঁহার অলঙ্কার-বহুল ভাষার অতিমণ্ডনজনিত কৃত্রিমতা, তাঁহার শ্লেষ ও যমক প্রয়োগের প্রাচুর্য—এই সমস্তই জনসনের মনে একটা বিরূপভাবের উদ্রেক করিয়াছে। এমন কি, তিনি এই মহাকবির ট্রাজেডি অপেক্ষা কমেডিকেই উচ্চতর স্থান দিয়াছেন। কিন্তু তথাপি জনসনের সচেতন বিচার-বুদ্ধির বিরুদ্ধে তাঁহার অবচেতন মনে শেক্‌শপিয়ারের লোকোত্তর প্রতিভা সম্বন্ধে একটা স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার ভাব সদাজাগ্রত। তিনি তাঁহার সহজ সংস্কার-বশে শেক্‌শপিয়ার-প্রতিভার গভীরে অনুপ্রবেশ করিয়া উহার উদার মানবিকতা ও সর্বাতিশায়ী জীবনসত্য উপলব্ধি করিয়াছেন। শেক্‌শপিয়ারের নাটকের গঠন সম্বন্ধে ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গীতে যে সমস্ত খুঁত ধরা পড়ে, তিনি তাঁহার স্বচ্ছ সত্যানুভূতিনিষ্ঠ দৃষ্টিতে তাহাদের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, নাটকে স্থান ও কালের ঐক্যের যথার্থ প্রয়োজন নাই; দর্শকের কল্পনাশক্তির দ্বারা স্থান-কালের পরিবর্তনগুলি সহজেই অনুভব করা যায়। তাঁহার বক্তব্য—কমেডি ও ট্রাজেডির উপাদান একসঙ্গে মিশ্রিত করা শাস্ত্রবিগর্হিত হইলেও জীবনে উহাদের সংমিশ্রণ সর্বদাই ঘটিতেছে; সুতরাং রসাভাস না ঘটাইয়া দর্শকের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া রাখার জন্য এই সুর-পরিবর্তন একটি অত্যাবশ্যকীয় উপায়। এইভাবে জনসন তাঁহার সহজ বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বের অবাস্তব কুহেলিকাজালকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া শেক্‌শপিয়ারের রসোপলব্ধির পথ অনেক পরিমাণে নিষ্কণ্টক করিয়াছেন। শুধু সুস্থ ও সবল সাহিত্যবোধ ও অকৃত্রিম অনুভূতির সাহায্যে প্রতিভা-রহস্য যতখানি ভেদ করা সম্ভব জনসন তাহা করিয়া উনবিংশ শতকের রোমান্টিক শেক্‌শপিয়ার-সমালোচনার সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির ও দার্শনিক সমীক্ষার প্রথম সোপানটি রচনা করিয়া যান।

জনসনের সাময়িক পত্রিকা The Rambler বা 'ভ্রাম্যমাণ' (১৭৫০—১৭৫২), এবং The Idler বা 'অলস' (১৭৫৮—১৭৬০), আডিসন ও স্টীল-প্রবর্তিত ধারার অনুসরণ। এই সন্দর্ভসমূহ জনসনের প্রাজ্ঞ জীবনবিচার, আতিশয্য-বর্জিত, সংযত শুভবুদ্ধির পরিচয়। তাঁহার জীবন-বিষয়ক চিন্তা ও মন্তব্য অতি স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত; অথচ ইহাদের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও মৌলিক অনুভূতির চিহ্ন সুস্পষ্ট। তাঁহার ভাষার মধ্যে এমন একটা স্থির, অভ্রান্ত বিচারবুদ্ধি, বিজ্ঞতার এমন একটি প্রশান্ত পরিচয়, মননশীলতার এমন একটি নিঃসংশয় আত্মপ্রত্যয় আছে যে, ইহাদের দ্বারা পাঠকের মনে আনন্দ অপেক্ষা সম্ভ্রমই বেশী জাগে। আডিসন ও স্টীলের প্রীতিস্নিগ্ধ, পাঠকের সহিত অন্তরঙ্গ হৃদ্যতায় আকর্ষণীয়, সরস বাক্‌ভঙ্গীতে উপভোগ্য রীতির সহিত জনসনের রীতির পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। স্পেকটেটরের জীবনরসভূয়িষ্ঠতার সঙ্গে তুলনায় জনসনের সন্দর্ভগুলির জীবনবোধ যেন পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্কীর্ণ দেওয়ালের দ্বারা অবরুদ্ধ।

জনসনের একমাত্র উপন্যাস Rasselas (রাসেলাস: ১৭৫৯)। রাসেলাস যদিও বাহ্যত উপন্যাস, ইহার অন্তর-প্রকৃতি কিন্তু নীতি-প্রধান জীবনচর্চার। এই বিষণ্ণ দুঃখস্বীকৃতি জনসনের জীবন-সমীক্ষার ফল। যতই নীতি-নির্দেশ পালন করা যাউক না কেন, দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব নয়; জীবনে অপ্রত্যাশিত আঘাত অনিবার্য। কাজেই লেখক নীতির বিধানকে বাস্তব অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে সংশোধন করিয়া লইয়া সামাজিক মানুষকে এই ঈষৎ-তিক্ত, সুলভ-আশাবাদরিক্ত জীবনদর্শন শান্তচিত্তে স্বীকার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার রচনা প্রাচ্যদেশসম্বন্ধীয় হইলেও ইহাতে প্রাচ্যদেশসুলভ বর্ণবহুল জীবন-প্রতিবেশের অভাব। ভাষা গুরু-গম্ভীর, অলঙ্কারবহুল ও অতি সাধারণ ভাবের বাহন হইলেও অনাবশ্যক রকমে পাণ্ডিত্যাভিমানপূর্ণ। এক কথায় বলিতে গেলে, সাহিত্য হিসাবে রাসেলাসের কোনো দামই নাই।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে আডিসন ও স্টীলের হাতে গদ্যের কাঠামো ঠিক হইয়া যাইবার পরে, এই শতকের শেষার্ধে বহু প্রতিষ্ঠাবান গদ্য-লেখকের আবির্ভাব হয়। এই সময়ে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকসংখ্যাও অনেক বাড়িয়া যায়। সুতরাং লেখার সমজদারেরও অভাব ছিল না। এই লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে **হিউম** (David Hume: ১৭১১—১৭৭৬), দার্শনিক ও অর্থনৈতিক প্রাবন্ধিক; **কুপার** (William Cowper: ১৭৩১—১৮০০), **হোরেস্ ওয়ালপোল**

(Horace Walpole : ১৭১৭—১৭৯৭), **চেস্টারফিল্ড** (Lord Chesterfield : ১৬৯৪—১৭৭০) ও **লেডী মেরী ওয়ার্টলী মণ্টেগু** (Lady Mary Wortley Montagu : ১৭২০—১৮০০) তাঁহাদের সরস, বিবিধ বর্ণনা ও জীবন-সমালোচনায় সমৃদ্ধ ও অন্তরঙ্গ সুরের পত্রাবলীর দ্বারা গদ্যসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন।

রাজনৈতিক রচনার মধ্যে Junius বা 'জুনিয়াসের পত্রাবলী'র (১৭৬৯ —১৭৭১) একটি বিশিষ্ট ও অনন্য স্থান আছে। এই পত্রাবলীর লেখক যে কে তাহা নিসংশয়রূপে নির্ধারিত হয় নাই। অনেকের অনুমান যে, ইনি ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য সার ফিলিপ ফ্রান্সিস (১৭৪০—১৮১৮)। এই পত্রাবলীর মধ্যে তৎকালীন রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর এক অসাধারণ তীব্র ও শক্তিশালী আক্রমণ করা হইয়াছে। এই আক্রমণ সব সময়ে ব্যক্তিগত-বিদ্বেষশূন্য নহে ; জায়গায় জায়গায় ইহা ন্যায়নিষ্ঠা ও যথার্থ-দর্শনের সীমা পর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছে। ইহার আতিশয্য ও ক্ষমাহীনতা, ইহার ঐতিহাসিকতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। তথাপি এই সমস্ত দোষ-ত্রুটি ধরিয়াও ইহাতে রাজনৈতিক বিতণ্ডার একটি পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাচীন রোমের দেশপ্রেমিক ও বাগ্মীরা দেশকল্যাণবোধের যে সমুন্নত, ভাবগৌরবমণ্ডিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন জুনিয়াস অনেকাংশে উহা দ্বারাই অনুপ্রাণিত। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগের প্রাদুর্ভাব লেখকের কল্পনায় ও অনুভূতিতে যেন আগুন ধরাইয়া দিয়াছে এবং এই বহ্নিজ্বালার দীপ্তি ও দাহ যেন তাঁহার সমস্ত রচনায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি রোমের আদর্শ-প্রভাবিত হইলেও স্বদেশ-ঐতিহ্যের প্রভাবও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার দাবী ও সংস্কারপ্রয়াস জাতীয় সংবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি যদিও তৃতীয় জর্জকে প্রথম চার্লসের পরিণতির কথা স্মরণ করাইয়াছেন, তথাপি কার্যত তিনি চরম-পন্থা-বিরোধী। তিনি রাজার মাথায় শুভবুদ্ধি ঢুকাইতে চাহেন, রাজমস্তক দেহবিচ্ছিন্ন করিবার পক্ষপাতী নহেন।

তাঁহার ভাষায় ওজস্বিতা, অসাধারণ শ্লেষ-নৈপুণ্য, জটিল সমস্যার বিশদ উপস্থাপনা, স্মরণীয় তীক্ষ্ণাগ্র উক্তি-গ্রন্থন ও প্রচণ্ড আবেগকে তীক্ষ্ণ মনীষার সাহায্যে শিল্পীসুলভ সংযমে আনিয়া নিজের অভিপ্রায়ানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করার শক্তির অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার উদ্দেশ্যের নিঃস্বার্থ সাধুতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও তাহার সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠতাকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

৫

অষ্টাদশ শতকের কবিতার মধ্যে দুইটি বিপরীত ধারা প্রবাহিত হইয়াছে: (১) ক্লাসিক্যাল রীতির অনুবর্তন; (২) রোমান্টিক মনোভাবের অঙ্কুরোদ্গম ও ক্রমবিস্তার। কল্পনাশক্তি (Imagination) কবিতার মুখ্য উপাদান। ইহাকে বাদ দিয়া কবিতা কখনই দীর্ঘকাল সুস্থ জীবন যাপন করিতে পারে না। কাজেই অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে কাব্যে কল্পনাক্রীড়াকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা, ইহার অফুরন্ত বৈচিত্র্যকে এক ছাঁচে ঢালিবার প্রবৃত্তি ভিতরে ভিতরে সৌন্দর্য-পিয়াসী কবিচিত্তকে পীড়িত করিতেছিল। সেইজন্য ক্লাসিক্যাল রীতির সর্বময় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে একটা অসন্তোষ মাথা তুলিতে লাগিল। এই অসন্তোষ বাহ্যতঃ ক্লাসিক্যাল রীতির প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়াছে—ইহার শ্লেষ, যুক্তিবাদ, নৈতিক আলোচনার ধারা বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু অলক্ষিতে একটা উতলা ভাব, একটা গূঢ় অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ইহাদের কাব্যের আত্মপ্রসাদকে বিচলিত করিয়াছে। এই অভাববোধকে মিটাইবার জন্য কবিরা নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহাদের আসল এবং গোপন উদ্দেশ্য কিন্তু কাব্য-রাজ্যে রোমান্সের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

ক্লাসিক্যালের ন্যায় রোমান্টিক শব্দেরও সংজ্ঞা অত্যন্ত জটিল ও সুদূরপ্রসারী। ব্যাপক অর্থে ইহাকে 'বিস্ময়-বোধের পুনরুদ্বোধন' বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর নবীন সৌন্দর্য অতি-পরিচয়ের ফলে আমাদের চোখে নীরস হইয়া যায়—শ্যাম দূর্বাদলে শিশিরবিন্দুর ঝলমল আভা অভ্যাস ও পুনরাবৃত্তির ফলে আমাদের আর আকর্ষণই করে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ হইতে কবির পার্থক্য এই যে, তাঁহার চোখে এই চির-নবীন সৌন্দর্যবোধ নীলাঞ্জনের মতই জড়াইয়া থাকে।

সুতরাং পৃথিবীর ও মনুষ্য-জীবনের শুষ্ক, শীর্ণ মূর্তি কবির নিকট সর্বদাই সৃষ্টি-প্রারম্ভের আদিম-বিস্ময়মণ্ডিত। কিন্তু কবিও যুগ-প্রভাবের অধীন। পৃথিবীর সহিত আমাদের পরিচয়ের মেয়াদ যতই দীর্ঘতর হইতেছে ততই তাহার বিস্ময়ের দিকটা কমিয়া গিয়া তাহার শৃঙ্খলা ও নিয়মবন্ধনের দিকটাই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। যে সূর্যোদয়ের মহিমা আমাদের বৈদিক মন্ত্রে প্রত্যক্ষ দেবতার আবির্ভাবের ন্যায় অভিনন্দিত হইয়াছে, তাহা আমাদের নিকট একটা জ্বলন্ত জড়-পিণ্ডের বাধ্যতামূলক কক্ষাবর্তন মাত্র। যে প্রাকৃতিক নিয়ম-রহস্য আমাদের পূর্বপুরুষের অজ্ঞাত ছিল তাহা বিজ্ঞান আমাদের আয়ত্তাধীন করিয়াছে, সুতরাং আদিম যুগের বিস্ময়-বোধ আধুনিকদের মনে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। অবশ্য সমস্ত সৌর-জগতের অপরিমেয় বিশালতা ও অগণিত গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য

নিয়মশৃঙ্খলের অস্তিত্ব এখনও কবি-কল্পনাকে নূতন ভাবে অভিভূত, উত্তেজিত ও তাহার মনে একপ্রকার নূতন বিস্ময়-চমকের সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু মোটের উপর বিজ্ঞানের অগ্রগতি সমস্ত প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর যেরূপ তীক্ষ্ণ সন্ধানী আলোক-ক্ষেপ করিয়াছে, তাহাতে ইহাদের রহস্যচ্ছায়াচ্ছন্ন কোণগুলি ক্রমেই অনেক সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে। এই হিসাবে পূর্বগামীদের সহিত তুলনায় আধুনিক যুগের কবিদের একটু বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। অনেক সময়ে বলা হয়, সভ্যতার অগ্রগতির অর্থই হইল কবিতার পশ্চাদপসরণ।

অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভ হইতেই অর্থাৎ যে যুগে কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও কবিতার আঙ্গিকে ক্লাসিক্যাল রীতির প্রভাবই প্রবল ছিল তখন হইতেই এই বিস্ময়-বোধের পুনরুদ্বোধন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার নানা ক্ষীণ অথচ বিচিত্র চেষ্টা চলিতেছে।

প্রথম, বহিঃপ্রকৃতির প্রতি মনোযোগ। ক্লাসিক্যাল যুগের কবিতায় বহিঃপ্রকৃতির স্থান অতি গৌণ। নাগরিক জীবনে প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের বিশেষ সুবিধা থাকে না; বিশেষতঃ সেই নাগরিক জীবন যদি দ্বন্দ্ব-কোলাহলে মুখর ও হিংসা-বিদ্বেষের অস্বাভাবিক উত্তেজনায় চঞ্চল থাকে, তবে প্রকৃতি দেবীর আকর্ষণ স্বাভাবিক-ভাবেই কমিয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের কাব্যে যে প্রকৃতি-বর্ণনা দেখা যায়, তাহা অত্যন্ত মামুলী, রসহীন ও কতকগুলি বাঁধা-ধরা বুলির পুনরাবৃত্তি মাত্র। গাছ-পালা, ফুল, নদী-পর্বত প্রভৃতি বর্ণনা করিতে হইলে কবিরা নিজ প্রত্যক্ষ দৃষ্টির কোন প্রমাণ দিতেন না—পূর্বতন কবিদের মধ্যবর্তিতায় তাঁহারা ইহাদের রসোপ-ভোগ করিতেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিছু কিছু কবির মনোযোগ এই সময়ে বহিঃ-প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট হইল। প্রকৃতির সনাতন অথচ চির-নবীন সৌন্দর্যআস্বাদনের আগ্রহ তাঁহাদের পর্যবেক্ষণ-শক্তিকে নূতনভাবে উত্তেজিত করিল।

স্কট্‌ল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চল ও ইংলণ্ডের গ্রাম্য এলাকায় অনেক কবি, ড্রাইডেন ও পোপের প্রভাবমুক্ত ছিলেন। তাঁহারাই এ যুগে প্রকৃতির বন্দনাগীতির সুরকার। Seasons বা 'ঋতুচক্রের' বিখ্যাত কবি **টমসন** (James Thomson : ১৭০০ —১৭৪৮) বিভিন্ন ঋতুর আবর্তনে বহিঃ-প্রকৃতির পরিবর্তনশীল মুখশ্রীর ছবি অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণ তুলিকায় আঁকিলেন। বিশেষতঃ প্রকৃতির বর্ণোচ্ছ্বাস, তাহার রঙের বিচিত্রলীলা ও রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শের বিপুল সমারোহ তাঁহার চোখে নিখুঁতভাবে ধরা পড়িল। দীর্ঘ ব্যবচ্ছেদের পরে এমন একজন কবি আসিলেন যিনি বইএর পাতার অন্তরাল হইতে বা পাঠাগারের জানালা দিয়া, প্রকৃতিকে দেখেন নাই। তাঁহার ভাষা অবশ্য অনাবশ্যকরূপে শব্দবহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ ছিল; সময়ে অসময়ে

নীতিমূলক ভাবোচ্ছ্বাসপ্রবণতাও তাঁহার রচনাকে গুরুভার-পীড়িত করিয়াছে। তথাপি পুরাতন রচনারীতির জীর্ণতার ভিতর দিয়া তাঁহার কবিতার মধ্যে এক নূতন ভাবের স্পন্দন ধরা যায়।

টমসনের অপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম The Castle of Indolence বা 'আলস্যমন্দির' (১৭৪৮)। ইহা স্পেন্সারের অনুকরণে রচিত রূপকধর্মী দুই সর্গের একটি কবিতা। প্রথম সর্গে আলস্যের দুর্গে বন্দীদের দুঃখদুর্দশা ও রোগ-ভোগের বর্ণনা; দ্বিতীয় সর্গে শ্রম কর্তৃক আলস্যের জয় ও তাহার দুর্গ ধ্বংসের বর্ণনা। কাব্যটির শ্লথ, মন্থর, স্পেন্সারীয় ছন্দোবিন্যাস ও স্বপ্নাবেশপূর্ণ কল্পনা-সৌন্দর্য অষ্টাদশ শতকের যুধ্যমান, তর্কপ্রবণ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

বহিঃপ্রকৃতির যে উপাসনা এইভাবে সুরু হয় তাহা প্রায় এক শতাব্দী পরে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় চরম পরিণতি লাভ করে। বহিঃপ্রকৃতির আকর্ষণ ক্রমশঃ চক্ষুকে ছাড়াইয়া কবিদের অন্তরলোকে নিজ মায়া বিস্তার করে। বহিঃ ও অন্তঃ-প্রকৃতির মধ্যে একটা নিবিড়, অন্তরঙ্গ যোগের ধারণাও ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া ওঠে। বাহ্য প্রতিবেশ ধীরে ধীরে কবির অন্তর-বিচ্ছুরিত কামনার আলোকে রঞ্জিত হয়। অন্তর ও বাহিরের এই নিবিড় আত্মীয়তা-বোধের ফলে বহিঃপ্রকৃতির স্বরূপ ইংরাজী সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন অর্থ পরিগ্রহ করে। মানবের অতৃপ্ত, পীড়িত মন যেন বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে শান্তি ও গভীর পরিতৃপ্তি খুঁজিতে উৎসুক হইয়া ওঠে। এমন কি, মানুষের অন্তরের যে গভীরতম রহস্যবোধ, ভগবানকে বুঝিবার ও তাঁহার সহিত মিলিবার যে পরম আকূতি, তাহাও যেন এই বহিঃপ্রকৃতির মধ্যেই এক অপূর্ব সমাধান লাভ করিল। কবির যেন প্রত্যয় জন্মিল যে প্রকৃতি কেবল চক্ষুর বিলাস নহে, গভীরতম ধ্যান-ধারণা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিষয়। কবিরা তাহার মধ্যে ঐশীলীলার নিগূঢ়তম বিকাশ ও ভগবানের স্পষ্টতম আবির্ভাবের প্রমাণ আবিষ্কার করিয়া প্রাণের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তাহাকে নিবেদন করিলেন। এইরূপে এক অভিনব নিসর্গ-কবিতার সৃষ্টি হইল ও আমাদের আদিম বিস্ময়বোধ এক নূতন চেতনা-প্রাবল্যের বিপুল শক্তি লইয়া নবজন্ম-পরিগ্রহ করিল। এই প্রকৃতি-চেতনা John Dyer বা জন ডায়ারের (১৭০০—১৭৫৮) Grongar Hill বা 'গ্রোংগার পাহাড়' কবিতায় পরিস্ফুট। এই কবিতা পড়িলে প্রকৃতিচিত্রণে পোপের দিন হইতে কবিগোষ্ঠী, অন্ততঃ কিছু কবি, যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহার প্রমাণ মিলে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের পর্যবেক্ষণ কবির মনে এক স্বপ্নাবেশময় চিন্তামগ্নতা জাগাইয়াছে। কবির সূক্ষ্ম ভাবচেতনা একদিকে যেমন প্রকৃতির উপর একটা ক্ষীণ রহস্যবোধ

বিস্তার করিয়াছে, অন্যদিকে আবার প্রত্যেকটি পদার্থ-বর্ণনায় মামুলী ঝাপসা চিত্রের পরিবর্তে রঙে ও রেখায় যথাযথ প্রত্যক্ষতার ছাপ দিয়াছে। সমগ্র প্রকৃতিচিত্রণের মধ্যে একটা কল্পনানুভূতিগত ঐক্যও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

টমসনে সুরু হইয়া যে দৃষ্টিভঙ্গী ওয়ার্ডসওয়ার্থে পরিণতি লাভ করিয়াছে, **কুপার** (William Cowper : ১৭৩১—১৮০০) তাহার মধ্যবর্তী পর্যায়ের কবি। তাঁহার জীবনযাত্রাপ্রণালী ড্রাইডেন-পোপ প্রভৃতি লণ্ডনবাসী কবির জীবন হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। শান্ত নির্জন পল্লীবাসে, একটি নিঃসম্পর্কীয় পরিবারের স্নেহাঞ্চলের আশ্রয়ে, বন্ধুত্ব ও ভালবাসার স্নিগ্ধ কোমল আবেষ্টনে, নাগরিক উত্তেজনা ও আঘাত-প্রতিঘাতকে সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া তাঁহার জীবন-ধারাটি তাঁহার নিজের অতি প্রিয় ধীরগতি আউস নদীটির মতই প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু অতি নিস্তরঙ্গ নদীতেও যেমন আকস্মিক আবর্তের সৃষ্টি হইতে পারে, সেইরূপ তাঁহার শান্তিময়, ঘটনাবিরল জীবনেও এক ঘোরতর বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছিল। তাঁহার অতি কোমল, সংসার-বিরাগী মনে একপ্রকার আধ্যাত্মিক নৈরাশ্যভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তিনি ভগবানের স্নেহাশ্রয় হইতে চিরদিনের মত বিচ্যুত হইয়া অনন্ত নরকবাস ও উদ্ধারহীন যন্ত্রণাভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছেন। এই ধারণা সময় সময় এরূপ তীব্র হইয়া উঠিত যে, তিনি উন্মাদ-রোগাক্রান্ত হইতেন। এবং এই আসন্ন চিত্তবিকারের ছায়াতলেই তাঁহার কবিতা রচিত হইয়াছে।

কুপারের কবিতা সাধারণতঃ অতি সহজ ও সরল। তাঁহার শান্ত জীবনের ছোট ছোট কাজ ও অবসরগুলির বর্ণনা ও তাহারই ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার কোমল, সহানুভূতি-স্নিগ্ধ মনে যে সমস্ত চিন্তা ও ভাবের উদয় হইত তাহাদের অভিব্যক্তি, ইহাই তাঁহার কবিতার বিষয়বস্তু। সংসার হইতে প্রতিহত হইয়া তাঁহার মনন-শক্তি ও কৌতূহল বহিঃপ্রকৃতির প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃতি-বর্ণনা এক দিকে অনন্যকর্মার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তির ও অপর দিকে পারিবারিক সৌভাগ্যবঞ্চিত হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি-ভালবাসার স্নেহার্দ্র স্পর্শের পরিচয় দেয়। তাঁহার স্নেহ-বুভুক্ষিত মন প্রকৃতির মধ্যে চোখের সৌন্দর্য-তৃপ্তি ছাড়া একটা গভীরতর শান্তি-উৎসের সন্ধান পাইয়াছিল—প্রকৃতির মধ্য দিয়াই তিনি যেন ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করিতেন। কাজেই তাঁহার নিসর্গ-কবিতা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পূর্বসূচনা, আধ্যাত্মিক সুরে বাঁধা। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার কবিতা উচ্চাভিলাষহীন জীবনের পরিপূর্ণ শান্তি ও সন্তোগে ভরপুর, কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলেই বুঝা

যাইবে যে, ইহার পিছনে এক ভয়াবহ সম্ভাবনা তাহার দীর্ঘ শীর্ণ প্রেতচ্ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে। সূর্যালোকে ঝলমল তুষারক্ষেত্রের সূক্ষ্ম শ্বেত আবরণের নীচে যেমন হ্রদের জলরাশি তাহার সমস্ত ক্ষুব্ধ আলোড়ন লইয়া বহির্গমনের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ কুপারের কবিতায় শান্তি ও আনন্দের বহিরাবরণের তলে এক সুগভীর, উদ্বেল-প্রায় অশ্রুসমুদ্র প্রচ্ছন্ন আছে।

শহুরে অথবা কেতাবী কৃত্রিমতা হইতে প্রকৃতির স্বাভাবিকতার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ —ইহা ক্লাসিক্যাল প্রভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অন্যতম চিহ্ন হইলেও, ইহাই সব নহে। অনেক কবি সমসাময়িক বাদবিতণ্ডার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া মানসিক তৃপ্তিলাভের জন্য অতীতের দিকে ফিরিয়া তাকাইতে সুরু করেন। ইহা রোমান্টিকতার একটি বিশেষ চিহ্ন। বর্তমানের প্রতি বিরাগও অতীতে প্রত্যাবর্তনের প্রবৃত্তিকে জাগরিত করে। কিন্তু শুধুমাত্র প্রবণতাই নবযুগস্থষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নহে। নূতন কিছু করার প্রতিভা চাই। কাজেই যে পর্যন্ত না এইরূপ প্রতিভার আবির্ভাব হয় সে পর্যন্ত অতীতের অনুকরণই বর্তমান-বিরাগী কবিদের প্রধান অবলম্বন হয়। অষ্টাদশ শতকের চতুর্থ ও পঞ্চম পাদে, মধ্যযুগ ও আরও সুদূর অতীতকাল ক্লাসিক্যাল-বিরোধী লেখকের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। অতীতের নানাবিধ বিচিত্র আচার-ব্যবহার, কুসংস্কার, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক মনোভাব—এগুলি সবই শুষ্ক যুক্তিবাদের দ্বারা পীড়িত মনকে আকর্ষণ করিতে থাকে।

কেল্ট ও ইংরাজদের পূর্বপুরুষের আদিম আবাসস্থল স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার নানা অপ্রাকৃত উপাখ্যান ও অলৌকিক সংস্কার গ্রে, কলিন্স, ওয়ার্টন-ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি কবিদের কল্পনাকে প্রভাবিত করে। শুধু আদিম যুগ নহে, ঐতিহাসিক অতীতও কবিতার বিষয়বস্তু হইল। অবশ্য এই অতীত-পন্থী কবিতার কাব্যমূল্য খুব উচ্চ নহে। অতীতের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপনের জন্য যে ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা গ্রে ভিন্ন এই কবিদের অন্য কাহারও ছিল না। এই জীবন-যাত্রার ভিত্তি পর্যন্ত ইহারা পৌছাইতে পারেন নাই—বর্তমানের সহিত তুলনায় ইহার আচার-ব্যবহারের ও সমাজ-ব্যবস্থার পার্থক্য, ইহার ধর্মবিশ্বাসের কল্পনা-প্রবণতা, ইহার উপরিভাগের রঙের ঘটাই ইহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। সুতরাং রোমান্টিকধর্মী হইলেও এই সমস্ত কাব্যও কৃত্রিমতা দোষ হইতে মুক্ত নহে। ইহাদের আসল মূল্য এই যে, ইহারা আগামী যুগের রোমান্টিক কবিতার পথ নির্দেশ করিয়াছে। যুক্তির নিরবচ্ছিন্ন শাসনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইহারা দীর্ঘকাল-সুপ্ত

কল্পনা ও ভাবাবেগের কুম্ভকর্ণ-নিদ্রা বৈধ ও অবৈধ, সহজ ও কৃত্রিম, যে কোন উপায়ে ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিয়াছে। ফলের তুলনায় চেষ্টাটা অবশ্য একটু অতিরিক্ত। কল্পনার সাবলীল সৃষ্টির পরিবর্তে মন্ত্রোচ্চারণ ও উপকরণ-বাহুল্যের মাত্রাই যেন অত্যধিক হইয়াছে। বিখ্যাত সমালোচক ডঃ জনসন এই কবিদের এই গলদ্ঘর্ম প্রচেষ্টাকে বারবার তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও গ্রে (Thomas Gray: ১৭১৬—১৭৭১) ও **কলিন্সের** (William Collins: ১৭২১—১৭৫৯) কবিতার একটা চিরস্থায়ী মূল্য আছে। গ্রে'র Elegy বা 'শোকগাথা' ও কলিন্সের Ode to Evening বা 'সন্ধ্যাস্তোত্র' এই দুই কবিতার মধ্যে বহিঃপ্রকৃতির প্রতি ঘনীভূত অনুরাগ ও ভাব-ব্যঞ্জনার মধ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলিকে সমগ্রভাবে রূপায়িত করার সার্থক চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই যুগের শেষের দিকে অর্থাৎ ষষ্ঠ ও সপ্তম পাদে অতীত-প্রীতি এক উদ্ভট ও অসাধারণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কবিযশঃপ্রার্থীরা পরের লেখাকে নিজের লেখা বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সময় ঠিক ইহার বিপরীতই ঘটিয়াছে। তৎকালীন নিবিড় অতীত-মোহের সুযোগ লইয়া অন্ততঃ দুইজন লোক নিজেদের রচনা অতীত যুগের কাব্যের পুনরুদ্ধার বা অনুবাদ-রূপে প্রচার করিয়াছেন। মৌলিকতার কৃতিত্ব পরিহার করিয়া প্রাচীন কবির অনুবাদকরূপে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা হইতেই বুঝা যায় যে, সে যুগে বর্তমানের প্রতি বিরক্তি কী তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। **ম্যাকফার্শন** (James Macpherson: ১৭৩৬—১৭৯৬) তাঁহার ওশিয়ান কাব্যে (Ossian) কেল্ট জাতির সুদূর অতীতের বিস্মৃতি-বিলুপ্ত এক মহাকবির বাণী আধুনিক ভাষায় রূপান্তরিত করার দাবী করিয়াছেন। জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত, প্রাক্তন গৌরবের করুণ-স্মৃতিমাত্র-সম্বল, বন্য প্রকৃতির বিষাদচ্ছায়ার সহিত সহানুভূতি-সূত্রে গ্রথিত, জাতীয় জীবনের মর্ম হইতে উদ্ভূত দীর্ঘনিশ্বাস এই কাব্যের ধ্বনিবহুল, বিলম্বিতগতি গদ্যছন্দের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। মহাকবি গ্যেটে ম্যাকফার্শনের রচনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন, কিন্তু ডঃ জনসন প্রথম হইতেই এই সমস্ত রচনার মৌলিকতায় সন্দিগ্ধ ছিলেন। পরে প্রাচীন ভাষাবিদ্ ও অতীত ইতিহাসে বিশেষজ্ঞদের নিকট এই জুয়াচুরি ধরা পড়িয়াছে। তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ম্যাকফার্শনের কাব্যে আধুনিক মনোভাবই অতীতের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হয়তো হাইল্যাণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে এই জাতীয় কিছু বিচ্ছিন্ন খণ্ড কবিতার সন্ধান তিনি পাইয়া থাকিতেও পারেন। কিন্তু তাহার সমগ্র রূপ ও আকার তাঁহার নিজেরই

সৃষ্টি। ম্যাকফার্শনের ব্যক্তিগত কবিকল্পনার মধ্যেই এই তথাকথিত প্রাচীন মহাকাব্যের কলেবর-স্ফীতি ও বর্ণনা-ভঙ্গী-গৌরবের উদ্ভব-রহস্য নিহিত।

এই জুয়াচুরির দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি আরও করুণ ও মর্মস্পর্শী। পনের বৎসরের ছেলে **চ্যাটারটন** (Thomas Chatterton : ১৭৫২—১৭৭০) কবি-প্রতিভার তাগিদ অনুভব করে। তাহার পিতা ছিল ব্রিস্টল নগরের এক গির্জার কর্মচারী। বালকের মনে মধ্যযুগের শিল্প, স্থাপত্য, সৌন্দর্যরীতি, ইহার চিত্রিত পুঁথি ও গির্জার নানাবর্ণ-রঞ্জিত কাচের জানালা গভীর রেখাপাত করিল—সে মধ্যযুগের স্বপ্নে বিভোর হইয়া মন্দিরের স্বপ্নালোকিত কক্ষগুলির মধ্যে বিচরণ করিত। এই ধ্যান-তন্ময় অবস্থার মধ্যে তাহার মনে হইল যে সে নিজের কবিতাগুলি এক মধ্যযুগীয় কাল্পনিক কবির নামে চালাইবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে বালক একদিন হঠাৎ প্রচার করিল যে, সে মন্দিরের মধ্যে এক পুরাতন সিন্দুকে রক্ষিত হস্তলিখিত পুঁথি ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে তাহার মধ্যে রাউলি (Rowley) নামক এক কবির রচনা আবিষ্কার করিয়াছে। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি স্বরচিত কবিতা মধ্যযুগের ইংরাজী ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া সে প্রকাশ করিল। প্রথমের দিকে জাল দলিল দস্তাবেজের সাহায্যে সে বহু পণ্ডিত, পুস্তকপ্রকাশক প্রভৃতিকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত রহস্য ধরা পড়িয়া গেল। পঞ্চদশ শতাব্দীর ভাষা ও কাব্যপ্রয়োগ-রীতি সম্বন্ধে চ্যাটারটনের বিশেষ জ্ঞান ছিল না—সে কবিতাগুলি আগাগোড়া আধুনিক-ভাষায় লিখিয়া অভিধানের সাহায্যে কয়েকটি শব্দের মধ্যযুগীয় প্রতিশব্দ প্রয়োগ করিয়াছিল মাত্র। আশ্চর্যের বিষয় যে, এইরূপ কৃত্রিম প্রণালীতে লিখিত হইয়াও কবিতাগুলি তাহাদের কাব্যরস হারায় নাই। চ্যাটারটন প্রকৃত কবি; ভাষার অপরিচয় ও দুরূহতা তাহার কবিত্ব-প্রবাহকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাহার ভাষার নিটোল পরিপূর্ণতা ও ইন্দ্রজালকৌশল পরবর্তী যুগের মহাকবি কীটসের কথা মনে পড়াইয়া দেয়। কিন্তু তখনকার কালে এই সমস্ত গুণের সমজদার লোক খুব বেশী ছিল না। চ্যাটারটন তিন বৎসর জীবিকার্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল—কিন্তু অবশেষে সম্পূর্ণ হতাশ ও নিরুপায় হইয়া মাত্র আঠার বৎসর বয়সে আত্মহত্যার দ্বারা নিজ যন্ত্রণার অবসান করে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের "ভানুসিংহের পদাবলী" এইরূপ রহস্যপ্রিয়তায় এক সুন্দর উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের পরিহাস-প্রবৃত্তি অবশ্য নিজ আত্মীয়-বন্ধু-মণ্ডলীতেই সীমাবদ্ধ ছিল—তিনি বাহিরের সাহিত্য-জগৎকে ঠকাইতে চেষ্টা করেন নাই। জীবিকার্জনের প্রয়োজনও

রবীন্দ্রনাথকে এই পথে প্রণোদিত করে নাই। ভানুসিংহ ছদ্মনাম গ্রহণ রবীন্দ্রনাথের নিছক কৌতুকপ্রিয়তারই একটি দৃষ্টান্ত। চ্যাটারটনের ছদ্মনাম গ্রহণ প্রয়োজন-ভিত্তিক এবং তাহার পরিণতিও অত্যন্ত করুণ।

এই অতীত-সম্পর্কিত জুয়াচুরির মধ্যে কিন্তু **পার্সি** (Thomas Percy : ১৭২৯—১৮১১) তাঁহার Reliques of Ancient English Poetry (১৭৬৫) প্রকাশিত করিয়া অতীতের যথার্থ পুনরুদ্ধারসাধনে সহায়তা করেন। তিনি ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সীমান্ত-অঞ্চলে যে সমস্ত লোকগাথা (ballads) জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল তাহাদের সংগ্রহ ও সম্পাদনার দ্বারা রোমান্টিক কবিদের মধ্যযুগপ্রীতিকে এক অভিনব ও রোমাঞ্চকর সুধাভাণ্ডারের সন্ধান দিলেন। পার্সির Reliques না বাহির হইলে স্কটের কবিতা সম্ভবই হইত না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোল্‌রিজ, কীটস্ প্রভৃতি বহু রোমান্টিক কবিও এই গাথা-কবিতা বা কথিকার আত্মাকে এক নূতন ব্যঞ্জনাময় রূপ দিয়াছেন। সেই দিক দিয়া রোমান্টিক কবিমনের বিকাশে পার্সির দান অসামান্য।

এই সময়ের যে সমস্ত কবি অষ্টাদশ শতকের মনোবৃত্তির বিপরীত-ভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের নিকট স্পেন্সার ও মিল্টন সশ্রদ্ধ অনুকরণের পাত্র হইলেন। স্পেন্সারের স্বপ্নময়, অবাস্তব সৌন্দর্য ও মিলটনের প্রকৃতির সহিত সূক্ষ্ম-সম্পর্কান্বিত, চিন্তাশীল বিষাদ-প্রবণতা ইহাদিগকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিল। এই যুগে ধর্মসংশ্লিষ্ট বিষাদের মূল কবি **ইয়ং** (Edward Young : ১৬৮৩—১৭৬৫)। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ Night Thoughts বা 'নৈশচিন্তা' কাব্য (১৭৪১—১৭৪৫)। ইয়ং মৃত্যুবিভীষিকা, জীবনের ক্ষণিকতা ও অমরত্বের আশা প্রভৃতি ধর্মবিষয়ক আলোচনার সহিত সমাধিক্ষেত্রের করুণ, বীভৎস ভাবাসঙ্গ ও রাত্রির ঘনান্ধকার প্রতিবেশ মিশাইয়া এই যুগ-সন্ধিক্ষণের কাব্যে এক দুঃখবাদের সুর প্রবর্তন করিলেন। ইহা কতটা আন্তরিক, কতটাই বা আলঙ্কারিক দুঃখবিলাস তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। তাঁহার ভাষা যুগধর্মোপযোগী শব্দাড়ম্বরপূর্ণ, অলঙ্কার-বহুল ও নীতি-প্রচার-ভারাক্রান্ত ; তথাপি মাঝে মধ্যে এক একটি শব্দ বা বাক্যাংশে যেন একটা গভীরতর প্রত্যয় ধ্বনিত হয়। তাঁহার শোকাশ্রু এত প্রচুর ধারায় প্রবাহিত যে, সময় সময় সন্দেহ হয় যে এই দুঃখতরঙ্গিণী তাঁহার নিজের মানস প্রতিবিম্ব দেখিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। দুঃখের পিছনে যেন একটা কৃত্রিম দুঃখবিলাস-উপভোগ-ইচ্ছাই উঁকি মারে। সে যাহা হউক, যে যুগে একটা সুলভ আশাবাদ, ভগবানের সঙ্গে একটা সহজ বোঝাপড়া, যুক্তির সরল পথে চলিয়াই ধর্মজীবনে শান্তিলাভের

একটা অনায়াস প্রত্যাশাপূরণ সমস্ত ধর্মসাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ ছিল, তখন ইয়ং এই অশান্ত অন্তরের অপ্রশমিত ক্ষোভ, শোকের অনির্বাণ জ্বালা ও সান্ত্বনালাভের দুরূহতার উপর জোর দিয়া, রোমান্টিক বিষাদের এক নূতন উৎসমুখ শুধু ইংরাজী নহে, সমুদয় ইউরোপীয় সাহিত্যে উন্মুক্ত করিলেন।

টমসন, গ্রে, কলিন্স প্রভৃতি মুখ্য কবিদের উপরও স্পেন্সার ও ইয়ংয়ের প্রভাব লক্ষিত হয়। গ্রে ও কলিন্সের খণ্ড কবিতায় মিলটনের ভাব ও ভাষার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি অনুভূত হয়। টমসনের কবিতায় রোমান্টিক কবি স্পেন্সারের প্রভাব সুপরিস্ফুট। ইয়ং অন্তর্মুখী কবি। এই সমস্ত কবিদেরই কবিতায় মৃদু, শান্ত বিষাদপ্রবণতার ভাব ড্রাইডেন ও পোপের ঐহিকসুখসর্বস্ব, আত্মতৃপ্ত ভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এইরূপে তিলে তিলে রোমান্টিক যুগের চিত্তক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল। কবি-মনোরাজ্যের দূরদিগন্তে যে কুহেলিকা-জাল বিস্তৃত, যে মেঘপুঞ্জ সঞ্চিত হইতে লাগিল, তাহারই নেপথ্য-অন্তরালে কবি-কল্পনার নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, রহস্যবোধের অভিনব বিস্ময় বিদ্যুৎবিকাশের ন্যায় আবির্ভাবের অবসর-প্রতীক্ষায় রহিল। নূতন শতাব্দীর উষাগমের কিছু পূর্বেই এই অরুণোদয় কাব্যজগতের এক নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটিত করিল।

বার্নস (Robert Burns : ১৭৫৯—১৭৯৬) প্রায়-অশিক্ষিত কৃষক ; কৃত্রিম নাগরিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসেন নাই। কাজেই তাঁহার ভাব-প্রবাহ সভ্য সমাজের বিধি-নিষেধের দ্বারা বদ্ধ নহে। তাঁহার ভাষারও সহজ অকুণ্ঠিত এবং গ্রাম্য প্রকাশভঙ্গী, প্রচলিত সাহিত্যিক প্রথার আড়ষ্ট গতি ও শব্দ-বাহুল্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। সকল প্রকার ভাব-বর্ণনাতেই তিনি অতুলনীয় ; তাঁহার কাব্যে সর্বত্রই তীব্র বেগবান্ প্রাণস্পন্দন ও স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি অনুভূত হয়। তাঁহার প্রেম-কবিতায় এক দুর্বার, সঙ্কোচহীন অথচ সহজ আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হইয়াছে—প্রত্যেকটির মধ্যে যেন উষ্ণ রক্তধারা প্রবাহিত। কবি ভালবাসা লইয়া আদর্শ-বাদের স্বপ্নজাল বুনেন নাই, উহার আধাররূপে কোন অতীন্দ্রিয় মায়ালোকও সৃষ্টি করেন নাই। প্রেম তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ উপভোগের বিষয় : ইহার বাস্তব স্পর্শ তাঁহার রক্তে যে উন্মাদনা জাগাইয়াছে তাহাই যেন তিনি কবিতার ছন্দে ও ভাষার ঋজু ওজস্বিতায় ফুটাইয়াছেন। প্রেমের সর্ববিধ ভাব-বৈচিত্র্য—মিলনের আনন্দ, বিদায়ের বেদনা, আহ্বানের আদর-সোহাগ, অভিমানের ক্ষুব্ধ ঔদাসীন্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজয়ের গ্লানি ও প্রত্যাখ্যানের নির্মম আঘাত—সমস্তই তাঁহার কবিতায় প্রগাঢ় অনুভূতিতে তরঙ্গায়িত হইয়াছে! তাঁহার ব্যঙ্গ ও শ্লেষ-কবিতায়,

সাধারণ মানবত্বের মহত্ত্ব-প্রচারে ও আভিজাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণাতেও এক অভ্রান্ত লক্ষ্য ও বিদ্যুৎশিখার ন্যায় মর্মভেদী দাহিকা শক্তির পরিচয় মিলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যক্ষেত্রে শুষ্ক নৈতিকতা, যুক্তিবাদ ও কেবলমাত্র চোখে দেখা, ভাবধারায় অস্নাত বস্তুপুঞ্জের যে কঠিন মৃত্তিকাস্তূপ জমা হইয়াছিল, এই প্রতিভার বরপুত্র অখ্যাত প্রাদেশিক ভাষায় রচনাকারী কৃষক কবি তাঁহার অপূর্ব হল-চালনার দ্বারা সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিলেন। কাব্যের ভিতর দিয়া আমাদের সনাতন মানবজীবনের হাসি-কান্না, মৈত্রী-বিরোধের প্রবল ভাগীরথী-স্রোত বহাইয়া, ক্ষেত্রকে গুল্মকণ্টকহীন ও উর্বর করিয়া, ইহাকে আগামী যুগের অভাবনীয়রূপে প্রচুর ও বিচিত্র শস্য-সম্ভারের জন্য উপযোগী করিয়া তুলিলেন।

বার্নস অপেক্ষা **ব্লেক** (William Blake : ১৭৫৭—১৮২৭) রোমান্টিক যুগের সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তাঁহার জীবন ও কবিতার প্রাণস্বরূপ। ব্লেক অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদ, সাধারণ জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভবকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া খাঁটি অধ্যাত্ম দৃষ্টিকে অবলম্বন করিয়াছেন। ধ্যানালোকে তিনি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার কবিতায় সেই ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিগুলিকেই তিনি রূপ দিয়াছেন। তাঁহার চোখের সম্মুখে তিনি দেবদূতগণকে স্বর্গ হইতে ওঠা-নামা করিতে দেখিতেন ; ঘুমন্ত শিশুর নিকট শ্বেতবস্ত্রপরিহিত পরীগণ সুখ-স্বপ্নের উজ্জ্বল দৃশ্যাবলী উন্মুক্ত করিত। জগতের সমস্ত জটিলতা ও গ্রন্থিবদ্ধ মিথ্যাপাশ তিনি শিশুসুলভ সরল, বিশ্বাস-ভরা দৃষ্টিতে ছিন্ন করিয়াছেন।

সৃষ্টিরহস্য তাঁহার কাব্যের মূল প্রেরণা। মানবজীবন একদিকে তাঁহার নিকট আনন্দ-কোলাহলে মুখর ক্রীড়াভূমি, অন্যদিকে সন্ধ্যাগমে অন্ধকার-ভীরু, মাতার স্নেহ-শীতল ক্রোড়ের জন্য উন্মুখ, শিশুর অসহায় ভীতি-বিহ্বলতায় করুণ ও রহস্যমণ্ডিত। তাঁহার The Songs of Innocence ('সারল্যের গান', ১৭৮৯) ও The Songs of Experience ('অভিজ্ঞতার সুর')—একই জীবনের দুই দিকের চিত্র। এই কাব্যগ্রন্থ দুইখানি স্বচ্ছ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে জ্যোতির্ময় ও অপার্থিব সৌন্দর্যের ইঙ্গিতে অর্থগূঢ়। শিশু যখন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ অজ্ঞানাবস্থা হইতে পার্থিব অভিজ্ঞতায় প্রথম পদক্ষেপ করে, তখন যে সমস্ত ব্যাকুল, উত্তরহীন প্রশ্ন তাহার কৌতূহল-বিস্ফারিত চক্ষে নামহীন ভয়ের ছায়াপাত করে, সেই ভয়ের হিমস্পর্শ ব্লেক তাঁহার অনেক কবিতায় সার্থক ব্যঞ্জনার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আবার, এই জগতের রূঢ় নির্মম বাস্তব ও কলুষকালিমার সহিত সংস্পর্শে আসিয়া আমরা যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি অনেক কবিতাতে তিনি তাহার ছাপ রাখিয়া

গিয়াছেন। ব্লেকের কবিতায় শান্ত ও রুদ্র, সুকুমার ও কঠিন—এইরূপ দুই বিপরীত-ধর্মী ভাবের সার্থক সমন্বয় হইয়াছে। একই ঈশ্বর যে নিরীহ মেষশাবক ও হিংস্র ব্যাঘ্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা তাঁহার নিকট সৃষ্টিরহস্যের দুর্জ্ঞেয়তার প্রমাণ ও প্রতীক। ভগবানের কল্যাণহস্ত হইতে শান্তি ও বজ্র কেন একসঙ্গে নামিয়া আসিয়াছে এই চিরন্তন সমস্যা তাঁহার মনকে প্রশ্নমথিত করিয়াছে। ব্যাঘ্রের জলন্ত, উল্কাপিণ্ডবৎ চক্ষুতে তিনি স্রষ্টার সুবিপুল, বজ্রকঠোর শক্তির অগ্নিশিখা প্রত্যক্ষ করিয়া মূঢ়, স্তম্ভিতভাবে ইহার কারণ-জিজ্ঞাসু হইয়াছেন।

একদিক দিয়া দেখিতে গেলে ব্লেকের অধ্যাত্মবাদ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলীর আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা অধিকতর একনিষ্ঠ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার আত্মজীবন-কাহিনীতে তাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টির উদ্বোধনের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বিভিন্ন দৃশ্যগুলি যুক্তি-শৃঙ্খলায় বদ্ধ, ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা সহজবোধ্য করিয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন—তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের নিগূঢ় রহস্যকে সর্বসাধারণের অনুভবগম্য করিতে প্রয়াসী এবং কতকাংশে সফলও হইয়াছেন। শেলীর আকাশ-বিহার পর্যন্ত যুক্তিবাদের রজ্জুধৃত। ব্লেক কিন্তু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের একেবারেই ধার ধারিতেন না, এমন কি যুক্তির প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত তিনি স্বীকার করেন নাই। তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও সাধারণ পাঠকের বোধশক্তির ব্যবধানের মধ্যে সেতুরচনার জন্য কোন উপকরণই তিনি সংগ্রহ করেন নাই। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, তাঁহার শেষ বয়সের রচনাগুলি একেবারে দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে—পাঠকের সহিত কবির যোগসূত্র একেবারেই ছিন্ন হইয়াছে। তাঁহার ভবিষ্যৎ-বাণী-সংবলিত পুস্তিকাগুলিতে (Prophetic Books) যে ভাষা ও রূপক-প্রণালী ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা তাঁহার নিজের মনের কুহেলিকাজালেই সমাচ্ছন্ন—তাঁহার মনে যে সমস্ত অজ্ঞাতনামা, অস্পষ্ট, অর্ধভাস্বর ছায়ামূর্তি বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে, তাহারা পাঠকের মনে কোন সুস্পষ্ট আলোকরেখার বেষ্টনীতে ধৃত হয় না। সত্য কথা বলিতে গেলে একেবারে উন্মাদ না হইলেও, ব্লেক ঠিক স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন না; অন্ততঃ তাঁহার শেষজীবনের কবিতাগুলি লিখিবার সময়ে তিনি যে সব সময়ে প্রকৃতিস্থ থাকিতেন না, তাহা কবিতাগুলি পড়িলেই বুঝা যায়।

বরং তাঁহার গদ্য গ্রন্থ The Marriage of Heaven and Hell ('স্বর্গমর্ত্যের মিলন', ১৭৯০)-এ তাঁহার জীবনদর্শনের কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেখানে কবি আমাদের জানাইয়াছেন যে চক্ষু-কর্ণের সাক্ষ্য ভ্রান্তির দ্বার, যুক্তিতর্ক

শয়তানের বেড়াজাল, নিয়মসংযম বিষয়ে ধর্মের অনুশাসন মূর্তিমান পাপ ; নিজ কল্পনার অনুসরণ ও সুস্থ, স্বাধীন প্রবৃত্তির নির্ভীক চরিতার্থতা-সাধনই পবিত্র কর্তব্য। এই মৌলিক দার্শনিকতার পটভূমিতেই তাঁহার কবিতাগুলি রচিত। ব্লেক উষাগমের বহু পূর্বে প্রায় মধ্যরাত্রিতে, রোমান্স-নিশীথিনীর ডাক শুনিতে পাইয়াছিলেন। রোমান্টিক কবিবংশের তিনিই প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। এক হিসাবে রোমান্টিক কবিদের অপেক্ষাও তাঁহাকে বেশী রোমান্টিক বলা যাইতে পারে। তাঁহার উদ্দাম কল্পনার ধারে কাছেও কোনো রোমান্টিক কবি ঘেঁষিতে পারেন নাই। ব্লেক যে শুধু কবি ছিলেন তাহা নহে, তিনি ছবিও আঁকিতেন এবং চিত্রকর ব্লেক কবি ব্লেক অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন নহেন। তাঁহার কোনো কোনো দুর্বোধ্য কবিতার অর্থ তাঁহার ছবির সাহায্যে বোঝা যায়।

এই যুগে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে নাটকের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে নাই। তবে নাটকের ভাবপ্রেরণায় দুই বিপরীতমুখী চিন্তাধারার দোলা একটা মৃদু আন্দোলন জাগাইয়াছিল। প্রথম ধারার প্রভাবে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে Sentimental Comedy বা গার্হস্থ্য জীবনের করুণ রসের আতিশয্যমূলক এক শ্রেণীর নাটকের আবির্ভাব হয়। Restoration Comedy অর্থাৎ রেস্টোরেশন যুগের মিলনান্ত নাটকে যে স্থূল, ইন্দ্রিয়-ভোগ-প্রধান, নীতিহীন, গার্হস্থ্য শুচিতার প্রতি উপহাসাত্মক, সুরুচি ও শোভন আচরণের বিরোধী সমাজচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, সেন্টিমেন্টাল কমেডি ছিল তাহারই প্রতিক্রিয়া। ইহাতে মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থ ও ব্যবসায়ীকে উপহাসের পাত্র না করিয়া স্নেহশীল, কোমলতা-প্রবণ, স্বল্প-কারণে-অশ্রুবিগলিত চরিত্ররূপে দেখান হইয়াছে। জেরিমি কোলিয়ারের আক্রমণে বিধ্বস্ত রেস্টোরেশন যুগের শেষ নাট্যকারদের—ভানব্রা ও ফার্কুয়ার-এর—মধ্যে এই রুচি-পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেখা যায়। কিন্তু **কলি সিবার** (Colley Cibber), **কেলি** (Hugh Kelley), **কাম্বারল্যাণ্ড** (Richard Cumberland), প্রবন্ধকার এবং আডিসনের সাথী **স্টীল** (Steele) প্রভৃতির নাটকে ইহা পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই জাতীয় নাকে-কাঁদা, প্যাঁচপ্যাচানি নাটক বিশেষ জনপ্রিয়তা বা উচ্চতর কলা-কৌশল কোনটাই লাভ করে নাই।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয় এবং দুইজন কুশলী নাট্যকারের সাক্ষাৎ মেলে। ইহারাই দ্বিতীয় ধারার বাহক। ইহাদের একজন হইলেন কবি ও প্রবন্ধকার গোল্ডস্মিথ যাঁহার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে

এবং অপরজন শেরিডান (R. B. Sheridan : ১৭৫১-১৮১৬)। এই দুইজন নাট্যকার অতিরিক্ত গম্ভীর ও ছিঁচকাঁদুনে নাটকের পরিবর্তে নির্দোষ হাস্যরসপূর্ণ ও ফুলের-ঘায়ে-মূর্ছা-না-যাওয়া বলিষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া নাট্যকলার ভারসাম্যের পুনরুদ্ধার করিলেন। অবশ্য গোল্ডস্মিথ অথবা শেরিডান-এর, বিশেষতঃ প্রথমোক্তের, সৃষ্ট চরিত্রে কোমল মৃদু ভাবপ্রবণতার অভাব ছিল না; কিন্তু একদিকে তাঁহারা যেমন অতি কোমলতা ও চোখের জলের আতিশয্য পছন্দ করেন না, তেমনি অন্যদিকে রেস্টোরেশন নাট্যকার-গোষ্ঠীর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল, বে-পরোয়া, কুরুচি-কলঙ্কিত মনোভাবের সমর্থনও তাঁহাদের নাটকে পাওয়া যায় না। গোল্ডস্মিথের The Good-natured Man বা 'শান্তশিষ্ট মানুষটি' নাটকে ভালমানুষ, অথচ চরিত্রদৃঢ়তাহীন ব্যক্তিকে উপহাসাস্পদ করা হইয়াছে, তবে তাহার প্রতি সহানুভূতি উদ্রেকের চেষ্টাও আছে। তাঁহার She Stoops to Conquer বা 'নতির জয়' নামক নাটকে হাস্যরস আরও উতরোল, ভুলভ্রান্তি আরও উপভোগ্য ও ভাবঘন, মিলন-মধুর মুহূর্তেরও কৌতুক-অভিষেক আরও বাস্তবরসপূর্ণ হইয়াছে। গল্পটির কাহিনীও অত্যন্ত কৌতুককর। সার চার্লস্ মার্লো নিজের ছেলের সহিত তাঁহার বাল্যবন্ধু হার্ডকাসলের মেয়ের বিবাহ দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই উদ্দেশ্যে মার্লোর ছেলে তাহার বন্ধু হেস্টিংসের সহিত হার্ডকাসলের বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এক সরাইখানায় হার্ডকাসলের প্রথমপক্ষের পুত্র টোনি লামকিন মার্লো ও তাহার বন্ধুকে হার্ডকাসলের বাড়ীর নিশানা দেয় কিন্তু বলে যে উহা একটি সরাইখানা। মার্লো সেখানে হার্ডকাসলকে সরাইখানার মালিক ও নিজের বাগদত্তাকে সরাইখানার ঝি মনে করিয়া বিষম অপদস্থ হয়। শেষ পর্যন্ত সার চার্লসের আগমনে সমস্ত ভ্রান্তির নিরসন এবং শুভবিবাহ নিষ্পন্ন হয়। হেস্টিংসও হার্ডকাসলের দূরসম্পর্কীয় এক তরুণীর প্রেমে পড়ে এবং তাহাদের বিবাহ হয়। নাটকটির কাহিনী ও চরিত্রচিত্রণ এত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে যে, আজ পর্যন্ত নাটকটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। ব্যঙ্গ অপেক্ষা কৌতুকপ্রিয়তাই নাটকটির মূল লক্ষ্য।

গোল্ডস্মিথের She Stoops to Conquer-এর মত শেরিডানের দুইখানি নাটক The Rivals বা 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৭৭৫) ও The School for Scandal বা 'কুৎসাক্ষেত্র' (১৭৭৭) এখনও অক্ষুণ্ণ জনপ্রিয়তা ও মঞ্চ-সাফল্যের অধিকারী। এই নাটকদ্বয়ে নাট্যকার বাথের (Bath) ন্যায় সমুদ্রতীরস্থ ছুটি-উপভোগের স্থানটির স্ফূর্তিবাজ, খেয়ালী, প্রতিবেশীর নিন্দা-কুৎসা প্রচারে উৎসাহী,

ফ্যাসানপন্থী সমাজের চমৎকার, উপভোগ্য ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়াছেন। সংলাপে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, লেখকের আনন্দময় মেজাজ ও সমাজ-সমালোচনার সরস তীক্ষ্ণতা শেরিডানের নাটকের বৈশিষ্ট্য। তথাকথিত সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজের নরনারীর কথা ও কাজের মধ্যে অসামঞ্জস্য, নৈতিক আচরণে ভণ্ডামি, বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় অভিভাবকদের সহিত তরুণতরুণীদের সংঘর্ষ—এই সমস্তই হইল শেরিডানের নাটকের উপজীব্য। The Rivals-এ পিতা নিজের ইচ্ছামত পুত্রের বিবাহ দিতে চান, অথচ পুত্র নিজের পছন্দকরা প্রণয়িনীকে বিবাহ করিবেই। ইহা হইতেই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি। দুইজনেই কিন্তু পরস্পরের অজান্তে একই মেয়েকে পছন্দ করে এবং তাহা হইতেই নানা কৌতুককর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সব জানাজানি হয় এবং তাহাতেই নাটকের স্নিগ্ধ পরিসমাপ্তি। এই নাটকের মিসেস ম্যালাপ্রপের চরিত্র ইংরাজী নাটকের চিত্রশালায় এক অমর স্থান পাইয়াছে। এমন কি এই চরিত্র হইতে উদ্ভূত একটি গুণবাচকশব্দ ম্যালাপ্রপিস্‌ম্ (malapropism) ইংরাজী অভিধানে পর্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে। এই শব্দটির অর্থ—শব্দের মানে না জানিয়া উহার হাস্যকর অপপ্রয়োগ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রোমান্টিক যুগ
[১৭৯৮—১৮৩২]

১

রোমান্টিক যুগ ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে এলিজাবেথীয় যুগের ন্যায় আর একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এক হিসাবে এলিজাবেথীয় যুগ অপেক্ষাও ইহার আবেদন আরও সার্বভৌম, অন্তত ভারতীয় মনের নিকট ইহার আবেদন আরও বেশী ব্যাপক। এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্যের পটভূমিকায় আছে কর্মবহুল, কীর্তি-ভাস্বর, অসাধ্যসাধনে উন্মুখ জাতীয়তাবোধ। ড্রেক ও র‍্যালের পৃথিবী-প্রদক্ষিণ ও নব দেশাবিষ্কার, প্রবল আক্রমণোদ্যত বৈদেশিক শত্রুর ধ্বংস, সদ্যজাগ্রত জাতীয় জীবনের উদ্দীপনা, অপরিমিত আশাআকাঙ্ক্ষায় স্ফীত উদগ্র কল্পনা, দিকে দিকে অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ গণ্ডীর প্রসারণ—এই প্রতিবেশের মধ্যে শেক্‌শপিয়ার-বেকনের সাহিত্য অভ্রভেদী গৌরবে মাথা তুলিয়াছে। যে সকল জাতির অদৃষ্টে এই ঐতিহ্যসম্পদ্ নাই—তাহাদের নিকট ষোড়শ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের মহিমা প্রকট হইলেও ইহার মর্মস্পর্শিতা সহজ নহে। বিশেষ করিয়া ভারতবাসী সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রযোজ্য। আমরা শেক্‌শপিয়ারের প্রতি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে অধিষ্ঠিত দেবমন্দিরের ন্যায় সবিনয় শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ্য পাঠাই। তাঁহার অভিজ্ঞতা যে কোনও দিন আমাদের হইবে এরূপ আশা করিতে পারি না। বাস্তবিক যে বাত্যাবিক্ষুব্ধ, দুরবগাহ মহাসমুদ্রে অবতরণ করিয়া শেক্‌শপিয়ার তাঁহার অমূল্য রত্নরাজি আহরণ করিয়াছিলেন, যে নরকাগ্নি-প্রোৎক্ষিপ্ত, কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশির মধ্যে তাঁহার ঐশী দৃষ্টি অর্জিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের কোনকালে অধিগম্য হইবে বলিয়া ভরসা হয় না। অতএব এলিজাবেথীয় যুগের সহিত আমাদের দুস্তর ব্যবধান কেবল সপ্রশংস রসানুভূতি দ্বারাই সীমিত। ইহার মর্মে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে শুধু দুরূহ নহে, অসম্ভব।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে কাব্যধারা উদ্ভূত হইল, তাহার সহিত আমরা একটা নিবিড় আত্মীয়তাবোধ, এমন কি সম্পূর্ণ একাত্মতাও অনুভব করি। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমাদের জীবনের চরম সাধনা ও পরম আদর্শ যেন এই যুগের কবিতাতেই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। আমাদের সমৃদ্ধি ও রিক্ততা, যেখানে আমরা শক্তিশালী ও যেখানে আমরা দুর্বল—সমস্তই যেন এই যুগের কাব্যে মূর্ত হইয়াছে।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যেন আমাদেরই সনাতন ঋষির মত প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের জ্যোতির্ময় আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন। শেলী যেন উপনিষদের স্রষ্টার ন্যায় বিশ্বের অণুপরমাণুতে 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' ঐশী লীলার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। আমাদের বাস্তব-বিড়ম্বিত ব্যর্থ জীবনের করুণ অসহায়তা, আমাদের আদর্শলোকে পক্ষবিস্তারের ক্ষণস্থায়ী, ক্লান্ত প্রচেষ্টা যেন তাঁহার গীতিকবিতায় অপরূপ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যোপাসনা আমাদের প্রকৃতিগত ধর্ম কিনা, তাহা খুবই অনিশ্চিত—হয়ত আমাদের সদাজাগ্রত, তীক্ষ্ণ ধর্মজ্ঞানের প্রবল অভিভব হইতে আমাদের সৌন্দর্যবোধ কোনও দিন সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করে নাই। তথাপি যখন আমরা কীট্‌সের অবিমিশ্র সৌন্দর্যরসে অভিষিক্ত কবিতা পাঠ করি, পৃথিবীর আদিম যুগের যে শৈশবকল্পনা ক্রীড়াচ্ছলে নানা সুন্দর রূপক ও দেবমূর্তি উদ্ভাবন করিয়াছিল তাহার বিস্ময়কর পুনর্বিকাশ দেখিতে পাই, তখন যেমন আমাদের মানস-জগতের এক দীর্ঘদিনরুদ্ধ দ্বার খুলিয়া যায় ও আমরা যেন বৈদিক-ঋষি-কল্পিত সপ্তাশ্ববাহিত, অরুণ-সারথি সূর্য ও কুহেলিকা-জাল হইতে উদ্ভূত রক্তিম-বসনা উষাদেবীর সৃষ্টি-রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন করি। আমরা যেন অনুভব করি যে 'আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' অথবা 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'—এই বোধ শুধু ভারতীয় মনের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে, ইহা বিশ্বমানবের মননশীল প্রকৃতির জন্মগত অধিকার। মানবহৃদয়ের সনাতন সৌন্দর্যবোধ ও রহস্যানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই এই রোমাণ্টিক যুগের কবিতা সমগ্র বিশ্বমানবের সাধারণ উপভোগের বিষয়। তাই এত সহজে আমাদের অমর কবি রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের সুরটি ধরিয়া ইহাকে আমাদের পরিচিত প্রতিবেশের মধ্যে, আমাদেরই জীবন-বীণায়, নূতন ব্যঞ্জনা ও বিস্তারের সহিত ঝঙ্কৃত করিতে পারেন।

অবশ্য এই কাব্যের সৌন্দর্যসৃষ্টির পশ্চাতে ফরাসী-বিপ্লবের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ শক্তির প্রেরণা আছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী ও বাইরনের কবিতায় এই বিপ্লব-ঝটিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বহিয়া গিয়াছে। ফরাসী দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন ও নেপোলিয়নের সহিত গণতন্ত্রকামীদের জীবনপণ যুদ্ধ—ইহারাই এই যুগের কাব্যের সামাজিক পটভূমিকা। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ধ্যান-সমাহিত শান্তিবাদের পিছনেও আছে বিপ্লবের তুমুল আলোড়নের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি। তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে শত্রু-আক্রমণ-প্রতিরোধের অনমনীয় দৃঢ়-সংকল্প, ন্যায় ও ধর্মের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, আত্মিক শক্তির উপর একান্ত নির্ভরের ছাপ মুদ্রিত। তিনি

যেন তূর্যধ্বনি করিয়া দেশকে হৃদয়-দৌর্বল্য, তুচ্ছ সুবিধাবাদ ও বণিকবৃত্তির লোলুপতা পরিহারপূর্বক নৈতিক সাহসের বর্মাবৃত হইয়া শত্রুর সম্মুখে নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান হইতে আহ্বান করিয়াছেন। শেলীর কবিতার প্রত্যেক ছত্রই যেন এই বাত্যাবিক্ষুব্ধ বিপ্লবসিন্ধুর লবণশীকরসিক্ত। তাঁহার আশাবাদী কল্পনা ধ্বংস-লীলার পশ্চাতে এক নিখুঁত সমাজ ও নীতি-ব্যবস্থার উজ্জ্বল ছবি, এক অনবদ্য কল্পলোকের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করিয়াছে—ঝঞ্ঝাতাড়িত তরঙ্গ-বিক্ষোভের পরপারে স্বর্ণময় যুগের সপ্তবর্ণ-রঞ্জিত ইন্দ্রধনু-প্রসার দেখিয়াছে। বাইরনের কবিতায় এই ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব এক প্রবল উচ্ছৃঙ্খল ঘূর্ণীবায়ু-রূপে প্রাচীন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে। তাঁহার তীব্র, সর্বব্যাপী শ্লেষে অতীতের ভগ্নাবশেষগুলি যেন ধূলিকণার ন্যায় দিগ্‌বিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। বিপ্লবের বারুদে সনাতন সমাজনীতির সুদৃঢ় প্রাকার ফাটিয়া পড়িলে বাইরনের শ্লেষ-সম্মার্জনী যেন ইহার চূর্ণীকৃত উপাদানগুলিকে আবর্জনাস্তূপের শেষ আশ্রয়স্থলে ঝাঁটাইয়া কেলিতে উন্মুখ। কোলরিজের প্রথম যুগের কবিতায় ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিক মতবাদের নৈতিক সমর্থন আছে। তবে এগুলি কবির অপরিণত রচনা। উত্তরজীবনে তিনি কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের আদর্শকে সমর্থন করিলেও ঐ বিপ্লবে যে নিষ্ঠুর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হইয়াছিল তাহাকে তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন। একমাত্র কীট্‌সের কবিতায় সমসাময়িক রাজনৈতিক সংঘটনের কোন উল্লেখ নাই। ইহার একটি কারণ এই যে, কীট্‌স্ যখন লিখিতে আরম্ভ করেন সে সময়ে ফরাসীবিপ্লবের আদর্শবাদ ও ভাবোন্মাদনা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং তরুণ কবি বহির্জগৎকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সৌন্দর্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং যে স্বচ্ছ, সহজাত অন্তদৃষ্টির বলে সত্য, শিব ও সুন্দরের অভিন্নত্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহারই অনুশীলনে ব্যাপৃত ছিলেন।

ফরাসী বিপ্লবের মত আন্দোলন আমাদের ইতিহাসে ঘটে নাই ইহা সত্য—তথাপি ইহার তাৎপর্য গ্রহণ করিতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সহিত তুলনায় ফরাসী-বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য—ইহার সর্বজনিক প্রসার ও আবেদন। ইহার সুদূরপ্রসারী আলোড়ন দেশ-কালের গণ্ডী ছাড়াইয়া নিখিল মানবের চিত্ততটে প্রহত হয়। সংশ্লিষ্ট বহির্ঘটনাপুঞ্জকে ছাড়াইয়া ইহার সাঙ্কেতিক ও আধ্যাত্মিক মহিমা ভাবরাজ্যের ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ করে। ইহা কেবল শাসন-প্রণালী ও রাজ্যব্যবস্থার পরিবর্তন নহে; ইহা হইল চিন্তা ও কর্মজগতের খর্বকারী সকল প্রকার শৃঙ্খল হইতে মানবমনের মুক্তিঘোষণা। কাজেই সকল যুগের ও সকল দেশের লোকই ইহার সহিত হৃদয়ের নিগূঢ় আত্মীয়তা

অনুভব করে। ইহার প্রাণপ্রদায়ী বায়ুহিল্লোলে বিশ্বমানবের চিত্ত নব-নব আশা-আকাঙ্ক্ষায় মুকুলিত হইয়া উঠে—তাহার কল্পনার সম্মুখে অভূতপূর্ব সম্ভাবনার স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। সেই জন্যই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী ও বাইরনের কবিতা আজও আমাদের এত বিপুলভাবে উদ্দীপ্ত করে; সেই জন্যই রোমান্টিক কবিদের সহিত আমরা আজও এত নিকট-আত্মীয়তা অনুভব করি। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী ফরাসী বিপ্লবের রক্তকলুষিত ঘটনাপুঞ্জের বন্ধনমুক্ত হইয়া এক সার্বভৌম আদর্শের পতাকারূপে আমাদের চিত্তাকাশে উড্ডীন হইতে থাকে। বস্তুতঃ ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ বর্তমানের শোষণ ও পীড়নবিক্ষুব্ধ সমাজে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক রহিয়াছে। ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগে রাজা রামমোহন রায়, স্থান ও কালের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া, প্রতীচ্যের এই উদাত্ত ঘোষণা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেন ও ফ্রান্সকে দ্বিতীয় মাতৃভূমিরূপে অভিনন্দন জানান। এই ধাত্রীস্তন্যরস-পুষ্ট হইয়াই ভারতবাসী ইউরোপের উন্নতিশীল জাতিসমূহের ভ্রাতৃসম্বন্ধ অনুভব করিয়াছে এবং এই অধিকারবলেই, কর্মশক্তিতে বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিয়াও, কাব্য ও চিন্তা-জগতে তাহাদের সহিত সমানতালে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছে।

২

রোমান্টিক যুগ প্রধানতঃ কাব্যের জন্যই বিখ্যাত। এই যুগের কবিকুলকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। প্রথম ভাগে অগ্রজ কবিগণের মধ্যে পড়েন—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (William Wordsworth : ১৭৭০—১৮৫০), কোলরিজ (S. T. Coleridge : ১৭৭২—১৮৩৪), সাদে (Robert Southey : ১৭৭৪—১৮৪৩) ও স্কট (Sir Walter Scott : ১৭৭১—১৮৩২)। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম তিনজনকে lake poets বা হ্রদ-অঞ্চলের কবি বলা হইয়া থাকে; কারণ এই তিন বন্ধু-কবি বহুদিন ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সীমান্ত বরাবর রমণীয় হ্রদ-অঞ্চলে বসবাস করিয়া কাব্যচর্চা করিয়াছিলেন। সাদে প্রচুর লিখিলেও কবি হিসাবে তাঁহার বিশেষ উৎকর্ষ বা প্রসিদ্ধি নাই; কয়েকটি শিশুপাঠ্য কবিতার মধ্য দিয়াই তাঁহার নাম আজও বাঁচিয়া আছে।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলরিজ এই দুই বন্ধুকেই যুগ্মভাবে রোমান্টিক যুগের প্রবর্তক বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাদের যুগ্ম রচনা Lyrical Ballads বা লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্‌-এর প্রকাশ হয় ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে এবং এই বৎসরকেই রোমান্টিক

যুগের উদ্বোধনকাল বলা হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে লিরিক্যাল ব্যালাড্স্-এর দ্বিতীয় সংস্করণে এক ভূমিকা লিখিয়া ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ অষ্টাদশ শতকের কবিতা হইতে বর্তমান কবিতাগুলি আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়া কি ভাবে নূতন তাহা সবিস্তারে আলোচনা করেন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ তাঁহার খণ্ডকবিতাগুলির জন্যই বিখ্যাত, যদিও তাঁহার আত্মজীবনীমূলক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এবং চৌদ্দখণ্ডে সমাপ্ত Prelude নামক কবিতাটিকেই তাঁহার প্রধান কীর্তি বলিয়া ধরা হয়। কোলরিজের কল্পনা, আবেগপ্রবণতা ও কবিত্বশক্তি হয়তো ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ অপেক্ষা বেশীই ছিল; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাশক্তি তাদৃশ প্রবল না হওয়ায় এবং অহিফেনের বশীভূত হইয়া পড়ায় তিনি তাঁহার শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। উত্তর জীবনে তিনি দর্শন ও সাহিত্যসমালোচনার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। স্কট ইহাদের সমসাময়িক এবং বন্ধুস্থানীয় হইলেও তাঁহার প্রতিভা ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখী। তাঁহার কবিতাগুলি ছিল মধ্যযুগের বিষয়বস্তু ও জীবনধারা অবলম্বনে রচিত গাথা মাত্র। গাথা কবিতায় তরুণ কবি বাইরনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না পারিয়া উঠিয়া উত্তরজীবনে তিনি কবিতা লেখা ছাড়িয়া দেন ও উপন্যাস রচনা করিয়া তাহাতেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

দ্বিতীয় ভাগে কনিষ্ঠ কবিগণের মধ্যে আছেন বাইরন (Lord Byron: ১৭৮৮—১৮২৪), শেলী (P. B. Shelley: ১৭৯২—১৮২২) ও কীট্স্ (John Keats: ১৭৯৫—১৮২১)। বাইরন ৩৬, শেলী ৩০ ও কীট্স্ ২৬—সকলেই তরুণ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন; কিন্তু তাহারই মধ্যে তাঁহারা যে কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাদের নাম ইংরাজী সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও কোলরিজের মত, তরুণ রোমান্টিকদের খ্যাতিও তাঁহাদের গীতিকবিতা ও খণ্ডকাব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে তাঁহাদের কিছু কিছু নাতিবৃহৎ রচনাও আছে। বাইরনের দীর্ঘ কবিতার মধ্যে আছে চারি খণ্ডে সমাপ্ত Childe Harold's Pilgrimage ('চাইল্ড হ্যারল্ডের তীর্থযাত্রা') যেখানে কবি তাঁহার নিজের ইউরোপ ভ্রমণের চিত্র আঁকিয়াছেন এবং চব্বিশ সর্গের ব্যঙ্গাত্মক মহাকাব্য Don Juan ('ডন জুয়ান')। গ্রীসে কবির আকস্মিক মৃত্যুর সময়েও তিনি ইহা লিখিতেছিলেন এবং কবিতাটি অসম্পূর্ণ। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহু পদ্যকাহিনীও আছে—যাহাদের বর্ণনার ওজস্বিতা, ভাষার সাবলীলতা ও পাঠককে অভিভূত করিয়া ফেলার ক্ষমতা, বয়োজ্যেষ্ঠ স্কটকে গাথা রচনায় ইস্তফা দিতে বাধ্য করে। বাইরনের Manfred (ম্যানফ্রেড), Cain (কেইন) প্রভৃতি নাট্যকাব্যও

তাঁহার অনস্বীকার্য শক্তির বিশেষ দৃষ্টান্ত। বর্তমানে বাইরনের শ্রেষ্ঠত্ব তত বেশী স্বীকৃত না হইলেও, তাঁহার জীবদ্দশায় এবং তারও পরে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সমস্ত রোমান্টিকদের মধ্যে বাইরনের জনপ্রিয়তা এবং প্রভাবই সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। ইউরোপে বাইরনকে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মনে করা হইত। শেলী বেশ কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা লিখিলেও Alastor ('এ্যালাস্টর'), Adonais ('অ্যাডোনিস') ও Epipsychidion ('এপিপসাইকিডিয়ন') ব্যতীত অন্য কোনো কবিতাই জনপ্রিয় হয় নাই। তাঁহার নাটক Hellas ('হেলাস') ও Cenci ('সেন্সি')-র উল্লেখই যথেষ্ট, সমালোচনার প্রয়োজন নাই। অবশ্য গীতিনাট্য Prometheus Unbound ('প্রোমিথিউসের মুক্তি') ইংরাজী সাহিত্যে এক অনন্য সৃষ্টি। গ্রীকপুরাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত Endymion ('এণ্ডিমিয়ন') ও অসমাপ্ত Hyperion ('হাইপেরিয়ান') কীট্‌সের দীর্ঘ কবিতাগুলির মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। ইহা ছাড়া তিনি বেশ কয়েকটি রূপকথা-আশ্রয়ী লম্বা পদ্যও লিখিয়াছিলেন। এইগুলির মধ্যে Eve of St. Agnes ('সেন্ট আগনিসের সন্ধ্যা'), Isabella বা Pot of Basil ('ইসাবেলা' বা 'বেসিল গাছের টব'), Lamia ('লামিয়া') প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কবিতাগুলি সবই সুমিষ্ট এবং আজ পর্যন্ত পাঠসুখকর। কিন্তু মাঝে মাঝে দুই-একটি স্মরণীয় পঙক্তি ও কয়েকটি উদ্ধৃতিযোগ্য বাক্য ব্যতীত কবিতাগুলিতে উচ্চাঙ্গের আর বিশেষ কিছু নাই।

৩

এইবার কবি বিশেষের আলোচনা ছাড়িয়া রোমান্টিক যুগের প্রধান বিশেষত্ব ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোচনা-প্রসঙ্গে রোমান্টিক যুগের যে পূর্বলক্ষণগুলি উল্লিখিত হইয়াছিল, এই সময়ে তাহারই পূর্ণ পরিণতি লাভ ঘটে।

প্রথমতঃ, এই যুগের নিসর্গ-কবিতা অতুলনীয়। প্রকৃতির সহিত মানবের সংস্পর্শ ও নিবিড় অন্তরঙ্গতা এ যুগে যেরূপ বিস্তার ও ব্যাপকতা লাভ করে, তাহা পূর্বযুগে অচিন্ত্যনীয় ছিল। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ উপভোগে কবির ইন্দ্রিয়-সমূহ অভূতপূর্ব সূক্ষ্ম চেতনার পরিচয় দিল। প্রকৃতির মুখের প্রত্যেকটি রেখা ও আলোছায়ার খেলা, তাহার সঙ্গীতের সূক্ষ্মতম রেশ অনুরণন, তাহার বর্ণের অফুরন্ত বৈচিত্র্য ও গন্ধের ক্ষীণতম প্রবাহ কবির অনুভূতিকে উদ্বেল করিল। শুধু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতির অন্তরতম রূপটি অনুভব করা যায় না—বাহিরের রূপের চারিদিকে আত্মার যে সুকুমার জ্যোতির্মণ্ডল বিস্তৃত আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে

ধ্যানময় অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির প্রয়োজন। প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালবাসা, নিবিড় একাত্মতাবোধ কবির এই ধ্যানচক্ষু খুলিয়া দিল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির সহিত মানব-চিত্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূচক যে দার্শনিক মতবাদ নিজ প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভিত্তিতে প্রচার করিলেন, তাহা এই যুগের সমস্ত কবিই অল্পবিস্তর গ্রহণ করেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মূল সুরের সহিত সকলেই সুর মিলাইলেন। টমসন, গ্রে, কলিন্স, কূপার প্রভৃতি কবিগণ যে বিশিষ্ট মনোভাব নিজ নিজ কবিতায় বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিতরূপে প্রকাশ করিতেছিলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে পৌছিয়া তাহা এক অখণ্ড, প্রগাঢ় দার্শনিক এবং অতীন্দ্রিয় অনুভূতির রূপ লাভ করিল। প্রকৃতি ও মানব-মনের আদান-প্রদান, ভাববিনিময় যুগ-কবিতার প্রধান আশ্রয় ও উপজীব্য হইয়া উঠিল।

এই যুগের কাব্যে প্রকৃতিবর্ণনার বৈচিত্র্য এত বেশী যে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। ফুল ও পাখী সম্বন্ধেই বিভিন্ন কবির কল্পনার লীলাবৈচিত্র্যের কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পুষ্পকবিতাগুলি ফুলের বর্ণ ও গন্ধ সম্বন্ধে তাদৃশ সচেতন না হইলেও তাঁহার তপস্বী সাধকের মন সৌন্দর্যহীন, অতি সাধারণ, পথিপার্শ্বে অনাদৃতভাবে উৎপন্ন ফুলগুলির মধ্যেও বিশেষ প্রেরণা পাইয়াছে। এই দরিদ্রের দুলালগুলির উপেক্ষিত ম্লান সৌন্দর্য, তাহাদের অস্বীকৃত মহিমা তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে মানবের শিক্ষণীয় অনেক গুণ তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন ও ইহাদের বর্ণনাব্যপদেশে গার্হস্থ্য জীবনের উপযোগী বহু নীতি-কথা প্রচার করিয়াছেন। শেলীর পুষ্পকবিতায় ফুলের বহিঃসৌন্দর্যের বর্ণনা ও রসোপলব্ধি আছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আছে ইহার শিশিরাশ্রুসিক্ত, ক্ষণস্থায়ী জীবনের করুণ আবেদন, মানব জীবনের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন সূক্ষ্ম চেতনাবোধ ও অসীম-ব্যঞ্জনা। শেলীর নিকট ফুল একদিকে মানুষের মত জীবন্ত ও সূক্ষ্ম-অনুভূতিশীল, অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য-মাল্যের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত। কীট্‌স্‌ আবার ফুলের বর্ণগন্ধাত্মক রূপটিই বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। মাটির রস কি নিগূঢ় প্রক্রিয়ায় পুষ্পের বিচিত্র পেলবতা ও বর্ণপ্লাবনে বিকশিত হইয়া উঠে তাহারই সূক্ষ্ম ও সুকুমার অনুভূতি কীট্‌সের বর্ণনায় মূর্ত। কীট্‌সের কবিতা পড়িতে পড়িতে ফুলের কোমল স্পর্শ যেন আমাদের অনুভবে ধরা দেয়, তাহার শীতল সুরভি যেন আমাদের চারিপাশে ঘন বায়ুমণ্ডল সৃজন করে। শেলীর কবিতার মত কীট্‌সের কবিতায় ক্ষণস্থায়িত্বের জন্য শোক তাহাকে অপার্থিব ইঙ্গিতে রহস্যময় করে না; তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটিকে বরঞ্চ আরও নিবিড় ও মোহময় করিয়া তোলে। পুষ্পসৌন্দর্যের নিখুঁত বর্ণনা ও রসোপভোগের মধ্য দিয়া

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকটিত করিয়াছেন তাঁহার নীতিপ্রচার; শেলী তাঁহার অসীমের উপলব্ধি ও উর্ধ্বলোক-প্রয়াণ; আর কীট্‌স তাঁহার সৌন্দর্য-পিপাসা ও মৃত্তিকার মাধ্যাকর্ষণের নিগূঢ় অনুভূতি।

পক্ষী-সম্বন্ধীয় কবিতাতেও এই তিন কবির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ফুটিয়াছে।—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পাখীর উপর অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহার To a Skylark বা 'চাতকের প্রতি' কবিতায় বাস্তব পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তাঁহার অভ্যস্ত নীতি-প্রতিপাদন-প্রয়াসের সম্মিলন ঘটিয়াছে। The Cuckoo বা 'কোকিল' কবিতায় কিন্তু নীতিপ্রতিপাদন একেবারেই নাই—তাহার পরিবর্তে আছে বাস্তব-বিলোপী অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। তৃতীয় একটি কবিতায় কবি নাইটিঙ্গেলের উচ্ছ্বাসময় আবেগকম্পিত স্বরলহরী অপেক্ষা ঘুঘুর করুণ আত্মসমাহিত মৃদু কূজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আবেগের কবি নহেন, উচ্ছ্বাসলেশহীন ভাব-তন্ময়তার কবি, স্মৃতিচারণার কবি। কাজেই তাঁহার বিচার তাঁহার প্রকৃতি-অনুযায়ীই হইয়াছে। The Green Linnet বা 'সবুজ লিনেট' কবিতায় কবি সূর্যকরোজ্জল, প্রভাত-প্রফুল, আলো-ছায়া-চঞ্চল উদ্যান-শোভার সহিত লিনেট পাখীর একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন।

শেলীর পক্ষীসম্বন্ধীয় কবিতার মধ্যে To The Skylark বা 'চাতকপক্ষীর প্রতি' নামক কবিতাটি সর্বাপেক্ষা বেশী প্রসিদ্ধ। এই কবিতায় যে মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। শেলীর পাখী মাটির সহিত সমস্ত সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া আকাশমার্গে উধাও হইয়াছে: সূর্যাস্তের বর্ণপ্লাবনে স্নাত, তাহার আভারঞ্জিত মেঘপুঞ্জে বিলীন চাতকের যেন মাটির সহিত কোনো সম্পর্কই নাই। তাহার গান অগ্নিস্তম্ভের ন্যায় ভাস্বর, রজত-শুভ্র জোৎস্নাধারার ন্যায় সর্বপ্লাবী; আবার প্রভাতম্লান চন্দ্রকিরণের ন্যায় ঠিকমত চক্ষুগোচর না হইলেও অনুভূতিতে অলক্ষ্যভাবে সুপ্রতিষ্ঠ। শেষ পর্যন্ত কবি অনুমান করিয়াছেন যে, জীবনমৃত্যুর যে চিরন্তন রহস্য মানবের চিন্তাধারাকে ব্যাহত ও তাহার গানকে আকস্মিক ও ছেদবহুল করে, পাখী কোন অলৌকিক উপায়ে যেন সেই রহস্যের মর্মভেদ করিয়াছে। এবং সেই জন্যই তাহার গান এত স্বতঃস্ফূর্ত, এত বাধাবন্ধহীন ও এরূপ দিব্যভাবপূর্ণ। এই পাখীর গানকে উপলক্ষ্য করিয়াই সেইজন্য কবির সমস্ত ব্যাকুল আত্মজিজ্ঞাসা, ব্যর্থ আদর্শানুসরণের সমস্ত অশান্ত চিত্তবিক্ষোভ মুক্তিলাভ করে। ছন্দের হ্রস্ব প্রসার ও ক্ষিপ্র গতিতে, উপমার মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনে ও সুরের তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী মূর্ছনায় পাখীর আকাশ-বিহারের তীব্র প্রেরণা ও তাহার ডানার

দ্রুত, অশান্ত ঝাপট আশ্চর্যরূপে ধ্বনিত হইয়াছে। তবুও স্বীকার করিতে হইবে যে, কবিতাটিতে চাতকপাখীর বর্ণনা যত না আছে তত আছে শেলীর অবিমিশ্র আদর্শবাদের সঙ্কেত, তাঁহার কবিচিত্তের অশান্ত ও অতৃপ্ত উন্মাদনার ইঙ্গিত।

কীট্‌সের 'Ode to a Nightingale' বা 'বুলবুলিকে' এই কবিতাটিতে শেলীর মনোবৃত্তির সঙ্গে মিল ও পার্থক্য—উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। কীট্‌সও শেলীর মত কল্পনাচারী, কিন্তু কীট্‌সের কল্পনাচারণের মধ্যে মৃত্তিকার সহিত সম্পর্কছেদ ও আকাশবিহারের প্রবণতা নাই। কীট্‌স চাহেন এই মাটির পৃথিবীর পরিপক্ব, অম্লান সৌন্দর্যরসের বাধাবন্ধহীন, পরিপূর্ণ উপভোগ। যে অকালমৃত্যু, মোহভঙ্গ, অতৃপ্তি ও অবসাদ এই ভোগের পরিপন্থী, তাহাদেরই বিরুদ্ধে তাঁহার অভিমান ও অনুযোগ। শেলী বিপ্লবপন্থী, তিনি চাহেন সমাজব্যবস্থার মৌলিক নীতির সম্পূর্ণ উন্মূলন। এই হিংসাজর্জর, অত্যাচারপূর্ণ মানব-সমাজকে তিনি নূতন করিয়া গড়িবার প্রয়াসী। সমাজের প্রভুশ্রেণী কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধের পরিবর্তে অবাধ, অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাবৃত আত্মনিয়ন্ত্রণই শেলীর নবগঠিত সমাজের নিয়ামক শক্তি হইবে। আদর্শবাদের স্বপ্ন জীবনবৃন্তে ফুটিয়া উঠুক, আশা ও আনন্দ সূর্যালোকের মত উজ্জ্বল ও সর্বব্যাপী হউক, জীবনের গতিচ্ছন্দ অন্তর-বাসনার তালে নিয়মিত হউক, ইহাই ছিল শেলীর কাম্য। কীট্‌সের সৌন্দর্যোপাসনার মধ্যে কিন্তু এরূপ কোন বৈপ্লবিকতার বিদ্যুৎ-শিখা বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী নাই। নাইটিঙ্গেল বা 'বুলবুলিকে' কবিতায় কীট্‌স মামুলী চিন্তাধারার পরিবর্তে সৌন্দর্যলোকের বঙ্কিম, বিসর্পিত রেখার অনুসরণ করিয়াছেন। অবসাদ ও আনন্দের বিপরীতমুখী দোলায় তাঁহার চিত্ত তরঙ্গায়িত হইয়াছে, ইহাদেরই উত্থান-পতন ধারয়া তাঁহার চিন্তা অগ্রসর হইয়াছে। নাইটিঙ্গেলের গানের সূত্র ধরিয়া তিনি নানা বিচিত্র সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফ্রান্স-ইটালীর সূর্যকরোজ্জ্বল দ্রাক্ষাক্ষেত্র, বিগলিত সূর্যালোকধারার ন্যায় স্বচ্ছ, রক্তিম, বুদ্‌বুদ্‌বহুল সুরা ও সুরভিত অন্ধকারে রহস্যময়, আঁকাবাঁকা অরণ্যবীথিকা, এই সমস্তই যেন বুলবুলের গানে আসিয়া মিশিয়াছে। পাখীর স্বতঃ-উৎসারিত গীতিকে তিনি এই সৌন্দর্যপ্রতিবেশে বেষ্টিত করিয়া, এক চির-অম্লান, পরিবর্তনাতীত কল্পলোকের অন্তরবাণীরূপে অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ইহার বিপরীত চিন্তাধারার অনুবর্তনে তিনি ক্ষয়শীল, ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনের অতৃপ্ত সৌন্দর্যপিপাসা, অর্ধপথে বাধাপ্রাপ্ত, অকালবার্ধক্য-বিড়ম্বিত তারুণ্যের বুভুক্ষু হাহাকারকে তীব্র অভিব্যক্তি দিয়াছেন। তিনি সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে পাখীকে অমর বলিয়া অভিনন্দন জানাইয়াছেন। যে মানুষের জীবননীতি যোগ্যতমের ঊর্ধ্বগতি

ও অযোগ্যের উৎসাদনের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে অনেকের ক্ষুধার উপর একের অন্ন নির্ভরশীল, পাখী যেন তাহা হইতে স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী। পাখী মরণশীল এ কথা ঠিক, কিন্তু মানুষের ন্যায় তাহার সমস্ত জীবনযাত্রা মৃত্যুজীবাণুদুষ্ট নহে। কবির নিকট এই অমরত্বের প্রমাণ এই যে, পাখীর গানের সুর যুগযুগান্তর ধরিয়া একই ভাবে মানবচিত্তকে প্রভাবিত করিয়া আসিতেছে। ইহা যেমন একদিকে স্বজন-বিরহ-ব্যথার সান্ত্বনাপ্রলেপ, অপর দিকে তেমনি অন্তরের নিভৃততম রহস্য-লোকের চেতনা-উদ্বোধক মন্ত্র। কবি এই পাখীর জগতে লীন হইয়া মনুষ্যসমাজের দুঃখকষ্ট ভুলিয়া থাকিতে চাহেন। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে কবির চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়, আবার তিনি সৌন্দর্যের আদর্শলোক হইতে বাস্তব জগতে নামিয়া আসেন। এই কবিতাটিতেও বুলবুলের বর্ণনা আমরা ততটা পাই না, যতটা পাই স্বপ্নলোকের অধিবাসী কবি কীট্‌সের মানসলোকের পরিচয়।

৪

এই যুগের নিসর্গ-বর্ণনাত্মক কবিতার সর্বত্রই সূক্ষ্ম বাস্তব পর্যবেক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পৃথিবীর পর্বত-উপত্যকা-হ্রদ-নদীতে মূর্ত, চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় রূপ, শেলী উহার মুহূর্ত-স্থায়ী মেঘ-কুয়াশা-ইন্দ্রধনুর দ্রুত বিলীয়মান আকৃতি-রেখা ও কীট্‌স ইহার বৃক্ষলতা-পুষ্পসমন্বিত কোমল শ্যামলিমার অপূর্ব ছবি আঁকিয়াছেন। তা ছাড়া, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিশেষ ভাব-ব্যঞ্জনা এবং মানব-মনের প্রতি ইহাদের নিগূঢ় আবেদন, আদর্শ সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত অনুভূত ও অভিব্যক্ত হইয়াছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পার্বত্য প্রকৃতির নিঃসঙ্গ গাম্ভীর্য, গিরিবেষ্টিত হ্রদের নিঃশব্দ বিজনতা, হেমন্ত-প্রভাতের প্রৌঢ়মনের প্রতি আবেদনশীল বিষাদচ্ছায়া, ঘুমন্ত মহানগরীর প্রভাত-সূর্যের কিরণোজ্জ্বল সুগভীর শান্তি, আকাশে-বাতাসে ব্যাপ্ত, গৃহহারা, উদাস আনন্দের সুর চমৎকারভাবে ফুটাইয়াছেন। শেলীর পার্বত্য প্রকৃতির চিত্র ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত—ইহা ইটালীর স্মৃতি ও বর্ণরঞ্জিত। আল্পসের অপরিমেয় বিশালতা, ইহার স্তরবিন্যস্ত আকাশভেদী শৃঙ্গশ্রেণী, ইহার পার্শ্বদেশে ঘন দুর্ভেদ্য অরণ্যানীর অজস্র, বিশৃঙ্খল প্রাচুর্য, ইহার উপত্যকায় নানাবিধ ফুলের বিচিত্র বর্ণপ্লাবন, সকলের উপর তুষারস্তূপ-বিচ্ছুরিত, কঠিন শুভ্র দীপ্তির অস্থির ঝলক—শেলীর কবিতায় এই সমস্তের মধ্য দিয়া পর্বতের দুরধিগম্য রহস্য সত্য সত্যই আমাদের সম্মুখে মূর্ত হইয়াছে। শেলীর Alastor বা আলাস্টার (১৮১৬) ও Prometheus Unbound বা 'প্রমিথিউসের মুক্তি' (১৮২০) প্রভৃতি

কাব্যে প্রকৃতি মানব-মনের পরিবর্তনশীল ভাবরাজির দর্পণরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে ; প্রকৃতি যেন মানব-মনের সহিত প্রতি সূক্ষ্ম অণু-পরমাণুতে, প্রতি গ্রহ-উপগ্রহে নিগূঢ় আত্মীয়তাবন্ধন অনুভব করিয়া এক অপূর্ব দ্বৈত গীত রচনা করিয়াছে।

কীট্সের নিসর্গ-কবিতায় মানব-মনের প্রতিচ্ছবি তেমন যেন লক্ষিত হয় না। তাঁহার বিশেষত্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম ও সুকুমার ইন্দ্রিয়ানুভূতি। তাঁহার দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা সহজ, সরল, আদিম মানবের বিস্ময়মুগ্ধ ভাব আছে, যাহাতে অতি-পরিচিত দৃশ্যের মধ্যেও তিনি প্রথম পরিচয়ের সরসতা ও আনন্দ-শিহরণ অনুভব করিতে পারেন। সৌন্দর্যের পাপড়ির সমস্ত স্তরগুলি ভেদ করিয়া তাঁহার দৃষ্টি ইহার নিগূঢ়তম মধ্যবিন্দুটির উপর নিবদ্ধ হয়। তথাপি মাঝে-মধ্যে মানব-মনের সহিত সহানুভূতিশীল প্রকৃতি-চিত্রও তিনি আঁকিয়াছেন। তাঁহার চন্দ্র কখনও বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য-হিল্লোল ও প্রাণ-স্পন্দনের মূল উৎস Endymion (এণ্ডিমিয়ন, ১৮১৮); কখনও বা ম্লান, বিস্মৃতি-কুহেলিকাচ্ছন্ন অন্যমনস্কতায় মানবের ব্যগ্র আবেগের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন—Hyperion (হাইপেরিয়ন) (১৮১৮-১৯, অসমাপ্ত)। হেমন্ত-সায়াহ্নের বৃষ্টিধারার মধ্যে সলিস্‌বেরির নির্জন প্রান্তরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাষাণ-দেবতামূর্তিগুলির ভগ্নাবশেষ তাঁহার মনে সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির নিবিড় নিঃসঙ্গতার বেদনা ঘনাইয়া আনে। আবার নিশীথ রাত্রে নক্ষত্রপুঞ্জের ঝিকিমিকি আলোকে অভিষিক্ত, নিবাত-নিষ্কম্প, স্বপ্ন-বিভোর বৃহৎ বনস্পতিগুলি তাঁহার মনে এক অবর্ণনীয় রহস্যবোধের ইন্দ্রজাল রচনা করে।

ঋতু-বর্ণনাতেও প্রত্যেক কবি আপন আপন বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কোনও ঋতুর বিস্তৃত চিত্র দেন নাই ; কিন্তু প্রত্যেক ঋতুরই মূল সুরের আভাস দিয়াছেন। শীতের জড়তামুক্ত বসন্তের নবীন প্রাণোন্মেষ ও আনন্দ-চাঞ্চল্য তাঁহার একাধিক কবিতায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। গ্রীষ্ম ও শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতও তাঁহার মনে প্রশান্ত আনন্দের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার চিন্তাশীল প্রকৃতি সর্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট হইয়াছে হেমন্ত-প্রভাতের ম্লান গাম্ভীর্যের প্রতি।

শেলীর Ode to the West Wind বা 'পশ্চিমা ঝড়ের আহ্বান' বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে ঋতু-বর্ণনার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা। ঋতুশেষের এই ঝটিকা-প্রবাহকে শেলী সৃজন ও ধ্বংসরূপী বিশ্বশক্তির সহিত একীভূত করিয়াছেন, ইহাকে বহিঃপ্রকৃতির তাণ্ডব হইতে নিখিল-বিধানের ছন্দের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। পশ্চিমা বাতাস একদিকে যেমন জীর্ণ, শীর্ণ ও পুরাতনের ধ্বংসকারী, অন্যদিকে সে

তেমনি সবুজ, তরুণ ও নূতনের অগ্রদূত। এই ঝড়, জল, স্থল, আকাশ ও কবির মনে অপ্রতিহত প্রভাবে আবর্তিত হইয়াছে এবং সর্বত্র একই প্রক্রিয়ার পুনরভিনয় করিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির সর্বত্র ইহার রুদ্রলীলা, ইহার অমোঘ শক্তি অনুভূত হইয়াছে। ঝঞ্ঝার বিপুল গতিবেগ, ইহার মত্ত মঞ্জীর-নিক্কণ কবির মনে ও ছন্দের ভঙ্গীতে তুল্যভাবে সংক্রামিত হইয়াছে। ঝড়ের প্রকৃতি ও ক্রিয়া বিশদ করিবার জন্য কবির উত্তেজিত কল্পনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে আপাতদৃষ্টিতে বহু বিসদৃশ, উদ্ভট উপমা ও বস্তুচিত্র পুঞ্জীভূত করিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ যাহা কষ্ট-কল্পনা বলিয়া গণ্য হইত, তাহাও বর্তমান ক্ষেত্রে কল্পনানুভূতির জারকরসে সমস্ত অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য হারাইয়া এক অখণ্ড ঐক্যে সংহত হইয়াছে। মহাদেবের জটার মধ্যে উত্তাল ভাগীরথী-ধারার ন্যায় ঝড়ের সমস্ত মত্ত বিক্ষোভ এই কবিতার দৃঢ় বেষ্টনীরেখা ও কল্পনাপরিধির মধ্যে স্থির-সংহতরূপে ধৃত হইয়াছে। বহির্জগৎ হইতে কবির অন্তর-জগতে ইহার সংক্রমণও আশ্চর্য কলাকুশলতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণের ন্যায় কবি যেন এই বিরাট শক্তিকে গ্রাস করিয়া নিজ অন্তরলোকের অঙ্গীভূত করিয়াছেন। কবির জীর্ণ শীর্ণ চিন্তা, তাঁহার ম্লান অবসাদ ও অক্ষমতার খেদ, পুরাতনের সমস্ত পুঞ্জীভূত ক্লেদ এই ঝড় উড়াইয়া লইয়া গিয়া তাহাদের পরিবর্তে কবির অন্তরে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছে। তাঁহার সংশয়ক্লিষ্ট ধূম্রান্ধ মনে ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা ঋষির অন্তর্দৃষ্টির শিখা আবার প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই নবদীপ্ত আলোকে তিনি অনাগত কালের অন্ধকারময় অধ্যায়গুলির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া মানুষকে চিরন্তন আশার বাণী শোনাইয়াছেন—শীত বসন্তেরই অগ্রদূত—শীত আসিলে বসন্তের আগমন কি বিলম্বিত হইতে পারে! জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে আসন পাইবার উপযুক্ত এই কবিতাটিতে মানবমনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির নিবিড়তম একাত্মতা দার্শনিক-মতবাদনিরপেক্ষ প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা গৃহীত ও পূর্ণতম কল্পনা-সমৃদ্ধির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতাটি শেলীর 'ওয়েষ্ট উইণ্ড' দ্বারা অনুপ্রাণিত এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

কীট্‌সের Ode to Autumn বা 'শরতের আহ্বান' কবিতাটি ঋতু-বর্ণনার মধ্য দিয়া মানবের মানস-চেতনার সহিত প্রকৃতির গভীর শান্তি ও সরস ফল-পুষ্প-সম্ভারের নিবিড় একাত্মতা-স্থাপনের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। এখানে ঝটিকার তাণ্ডব নৃত্য ও সৃষ্টি-বিপর্যয়ের পরিবর্তে আছে ধরিত্রীর উৎপাদিকাশক্তির বিচিত্র সুষমাময় প্রকাশ ও নিগূঢ় প্রাণরসধারার গোপন অলক্ষ্য সঞ্চার। কবিতার মধ্যে

এই রসনির্ঝর একটি স্নিগ্ধ, শান্ত প্রাচুর্যপ্রবাহে বহিয়া গিয়াছে। কবির বর্ণনার মধ্যে ফুলের মধুভরা মধুচক্র ও ফলের সুপুষ্ট, পরিপক্ব রসঘনতার সিক্ত কোমল স্পর্শ পাওয়া যায়। শরতের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যের মধ্যে যে একটি নিবিড় আত্মসমাহিত শান্তি, একটি সুগভীর তৃপ্তি ও সন্তোষ আছে, যাহা অতীতের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে না, যাহা ভবিষ্যতের অনাগত রিক্ততার চিন্তায় বিব্রত হয় না, তাহাই কবিতায় সাধারণ শব্দ ও দৃশ্য-বর্ণনার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই বাস্তব সৌন্দর্যের জাদুমন্ত্রে আমাদের সমস্ত অশান্ত চিন্তা, সমস্ত ক্ষুব্ধ অসন্তোষ, অপ্রাপনীয়ের জন্য সমস্ত লোলুপতা ঘুমাইয়া পড়ে। প্রকৃতিদেবী ফুলফলের মধ্যে যে অমৃত-নির্ঝর বহাইয়া দিয়াছেন, আমাদের মনও তাহাতে স্নাত ও অভিষিক্ত হইয়া সার্থকতার সহজ প্রসন্নতায় ভরিয়া ওঠে। কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকটিতে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একরূপ নূতন মিলনের ঈঙ্গিত আছে। যে চারিটি মানব মূর্তির কৃষিকার্য-প্রসূত দানে ধরণী ভরিয়া উঠিতেছে তাহা যেন শরতেরই দান। তাহারা অর্ধমানব ও অর্ধপ্রকৃতির সংমিশ্রণে গঠিত। তাহাদের চক্ষে অনাসক্ত, ধ্যানমগ্ন ভাব, মুখের চারিদিকে দিগন্তপ্রসারিত শ্যামরেখার স্নিগ্ধ আবেষ্টন, বহিঃপ্রকৃতির সহিত তাহাদের আত্মীয়তার সম্পর্কটি পরিস্ফুট করিয়াছে। শরৎ ঋতুতে মানুষ-প্রকৃতিতে অন্তরঙ্গ, মাখামাখি ভাব, মানুষের কর্মশীলতার মধ্যে প্রকৃতির উদার, অচঞ্চল, লোলুপতাহীন শান্ত ছন্দের অনুপ্রবেশ, ধরিত্রীর ধন-আহরণে ধরিত্রীর মতই ধীর, ত্বরাহীন পদক্ষেপ—এই অপূর্ব সম্বন্ধ-রহস্যটি পূর্বের মূর্তিগুলির দ্বারা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। শেলীর Ode to the West Wind বা 'পশ্চিমা ঝড়ের আহ্বান'-এর মত কীট্‌সের 'শরতের আহ্বান' কীট্‌সের মানস-বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতম অভিব্যক্তি। বলা হয় প্রাচীন গ্রীক জীবনের শান্ত, সমাহিত সৌন্দর্যবোধ এই কবিতাটির মধ্যে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

৫

প্রকৃতির মধ্য দিয়া রহস্যলোকের অনুভূতি ও ধ্যান-তন্ময়তার আবির্ভাবের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের The Prelude বা 'পূর্বাভাস' নামক আত্ম-জীবনচরিতমূলক মহাকাব্যে এইরূপ ধ্যানলোক-বিহারের, অতীন্দ্রিয় জগতের গভীর অনুভূতির অনেকগুলি দৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাটির রচনা শুরু হয় ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এবং শেষ হয় ১৮০৫-এ। অবশ্য ১৮৫০-এ কবির মৃত্যুর পূর্বে ইহা প্রকাশিত হয় নাই। এই কবিতায় কবি দেখাইয়াছেন—প্রকৃতি কেমন করিয়া ক্রীড়াসক্ত

বালককে ডাক দেয়, কেমন করিয়া অতর্কিতভাবে তাহার হৃদয়-দ্বারে আঘাত করিয়া তাহার মনে ভয়, কৌতূহল, বিস্ময়, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিদ্যুৎচমকের ন্যায় রহস্যবোধের উন্মেষ প্রভৃতি বিচিত্র ভাব-তরঙ্গের উদ্রেক করে। এই সমস্ত তরঙ্গিত ভাবলহরী ক্রমশঃ কবির চিত্তে নিগূঢ় আনন্দে ঘনীভূত হয় ও শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির মধ্যে ঐশী শক্তির লীলা সম্বন্ধে এক অসংশয় স্থির বিশ্বাসের সৃষ্টি করে। সহজ আনন্দের সুর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রথম জীবনের প্রায় প্রত্যেক খণ্ডকবিতাতেই ধ্বনিত হইয়াছে। আনন্দের উৎস যখন শুকাইয়া আসিয়াছে তখনও তিনি আশাবাদকে কর্তব্য হিসাবে দৃঢ় মুষ্টিতে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন, নিরাশার হাতে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তাঁহার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি প্রায়ই ক্ষণিক ঝলকে, নিমেষের আত্মবিস্মৃতিতে বাস্তব প্রতিবেশকে অস্বীকার করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মাঠে এক বালিকা একাকী কাজ করিতে করিতে গান করিতেছে ; আর এক বালিকা সূর্যাস্তকালে এক হ্রদের ধারে তাঁহার গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছে, এক বৃদ্ধ নির্জন প্রান্তরে পার্বত্য প্রদেশে বর্ষণের ফলে যে ক্ষুদ্র পল্লবের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার মধ্যে জীবিকার্জনের উপায়স্বরূপ জোঁকের অনুসন্ধান করিতে করিতে নিজ জীবনকাহিনী বিবৃত করিতেছে—এই সমস্ত অতি সাধারণ ও তুচ্ছ অভিজ্ঞতা তাঁহার মনে সুপ্ত রহস্যবোধ জাগরিত করিয়া তাঁহাকে অতীন্দ্রিয় জগতের ইঙ্গিত দিয়াছে—তাঁহার কল্পনা অতি সামান্য ইঙ্গিতের অনুসরণ করিয়া বাস্তব জগৎ তুলিয়া কল্পলোকে উধাও হইয়াছে। Tintern Abbey (টিনটার্ন অ্যাবি) ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের একটি বিখ্যাত কবিতা। এই কবিতায় কবি প্রকৃতির প্রভাবে তাঁহার রহস্যবোধের উদ্বোধনের চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন। সুন্দর দৃশ্য দেখার মধ্যে যে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি আছে, তাহাই স্মৃতির কটাহে পাক খাইয়া দেহ-মন-আত্মা সর্বত্র সঞ্চরণশীল নিগূঢ় আনন্দ-রসে রূপান্তরিত হয়, ও পরিশেষে যে ধ্যানদৃষ্টিতে আমরা সৃষ্টি-রহস্যের মর্মভেদ করিতে পারি তাহাই উন্মীলিত করে। সুতরাং চোখের নেশা হইতে দিব্যদৃষ্টিলাভ সমস্তই একসূত্রে গাঁথা। ইহাই টিনটার্ন অ্যাবির বাণী। Yew Trees নামক একটি কবিতায় কবি এক বিশাল বটবৃক্ষতলে আধ-আলো, আধ-ছায়ায় মানস-ভাবের রূপক কতকগুলি ছায়ামূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভয় ও কম্পিত-দেহ আশা, স্তব্ধতা ও দূরদৃষ্টি, কঙ্কালশেষ মৃত্যু ও ছায়াবয়ব মহাকাল যেন মন্দিরতলে সমবেত উপাসনার জন্য একত্রিত হইয়াছেন বা নীরবে শায়িত হইয়া দূর পর্বতগুহায় প্রতিধ্বনিত নির্ঝর-মর্মর শ্রবণ করিতেছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অপার্থিব জ্যোতি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শেষে

একেবারে সাধারণ দিবালোকে বিলীন হইয়াছে। কবি Ode on Intimations of Immortality ও অন্যান্য কবিতায় এই পরিবর্তনের জন্য খেদ প্রকাশ করিয়াছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের শেষ জীবনের কবিতায় তাঁহার কাব্যের অপরূপত্ব অনেকটা ম্লান।

যে অধ্যাত্মবোধ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যে শান্ত নিঃসংশয় উপলব্ধিতে স্থির দীপশিখার ন্যায় প্রোজ্জ্বল, তাহাই শেলীর কবিতায় নানা ভাব-বৈচিত্র্যের ও আবেগপ্রবণ বর্ণনার মধ্য দিয়া বিচিত্র বর্ণে বিচ্ছুরিত। এই আলোক-রেখা কোথাও সন্দেহে ম্লান, কোথাও অশান্ত আবেগে কম্পিত, কোথাও আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে দোদুল, কোথাও ভাবার্দ্রতার অশ্রু-বাষ্প-সংস্পর্শে সপ্তবর্ণ-রঞ্জিত, কোথাও বা প্রত্যয়ের অসাধারণ বেগবান উচ্ছ্বাসে উদ্ভাসিত। আলাস্টর-এ কবির নায়ক ব্যাকুল, উন্মনা ভাবে এই চঞ্চল, অপসরণশীল জ্যোতির অনুসরণ করিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে। Hymn to Intellectual Beauty বা 'মানসসুন্দরী' -তে স্থূল বস্তুপুঞ্জের মধ্যে বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় ঈষৎ প্রকাশমানা এই সঞ্চারিণী শিখা কবির নিকট মাঝে মাঝে ধরা দিয়া ইহার রহস্যময় আকর্ষণকে গাঢ়তর করিয়াছে। 'প্রমিথিউসের মুক্তি' নাট্য-কবিতাতে এই অধ্যাত্মবোধ বিশ্বব্যাপী নবসৃষ্টির বীজ-শক্তি—প্রেমের বিরাট রূপকে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই নাটকে Hymn to Asia বা 'এসিয়ার গান' নামক গানে আধ্যাত্মিক, দেহাতীত, অথচ দেহাশ্রয়ী প্রেমের নিগূঢ় অপরূপতা সাঙ্কেতিক ভাস্বরতায় ফুটিয়াছে। Epipsychidion (এপিপসাইকিডিয়ন্)-এ যে ব্যাকুল, অতৃপ্ত প্রেমের আবেগ নিজ জ্বলন্ত প্রাণশক্তিতে ধূপের ধোঁয়ার মত আদর্শলোকের উচ্চাকাশে উঠিয়া হাহাকারে মিলাইয়া যায় তাহা বিভিন্ন নারীকে আশ্রয় করিয়া সার্থকতা-লাভের বৃথা চেষ্টায় এই ধরা-ছোঁয়া-অতীত, বিভ্রান্তকারী অধ্যাত্মবোধের সহিত সমধর্মী। কীট্‌সের মৃত্যু উপলক্ষ্যে রচিত Adonais (আডোনিস) কবিতায় মৃত্যুর বিরাট রহস্যের সম্মুখীন হইয়া কবি এই নিখিলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিচরণশীল ঐশী শক্তির নিকট সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন ও দার্শনিকোচিত সূক্ষ্ম বিচারের সহিত ইহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। শেলীর সমস্ত কাব্যজগৎ ওতপ্রোতভাবে এই অধ্যাত্মবোধের বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে ভাস্বর। তাঁহার অসমাপ্ত শেষ কাব্য The Triumph of Life বা 'জীবনের জয়'-এ যে অর্ধোচ্চারিত প্রশ্ন (জীবন কি ?) তাঁহার কাব্য-জীবনের অন্তিম বাণী তাহাই তাঁহার অধ্যাত্ম ব্যাকুলতার অমর নিদর্শন !—এই বিরাট জিজ্ঞাসা-চিহ্ন তাঁহার কাব্যজগতের সৌধচূড়ায় জ্বলন্ত অক্ষরে ক্ষোদিত থাকিবে।

৬

এই যুগের নিসর্গ-কবিতার অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে আর একটি আত্ম-প্রকাশ লক্ষণীয়। ইহার নেতৃস্থানীয় কবিরা প্রকৃতির প্রতি আদিম মানুষের বিস্ময়জড়িত দৃষ্টিভঙ্গীর পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। শিশু মানবের যে ক্রীড়াশীল কল্পনা প্রকৃতির সৌন্দর্যে নানা দেবদেবী ও রূপক মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, জীবনের মানস জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে ও জগতের নিয়ম-রহস্য ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত হওয়ার ফলে সেই দৃষ্টিভঙ্গী বিলুপ্ত হইয়াছে। আজ প্রকৃতি আমাদের নিকট অমোঘ-নিয়ম-চালিত, যন্ত্রবদ্ধ জড়স্তূপ মাত্র, তাহার মধ্যে কোন স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বা লীলাচঞ্চল, আনন্দোদ্বেল মানবমূর্তির প্রতিচ্ছায়া আমরা অনুভব করি না। আধুনিক বিজ্ঞান জড়প্রকৃতির মধ্যে যে প্রাণস্পন্দন আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাও একটা রূপ-নিরপেক্ষ শক্তির মতই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে স্পর্শ করে, আমাদের কল্পনা ও সৌন্দর্য-বোধকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রকৃতির সঙ্গে কবির যে নব পরিচয় হইল, তাহাতে এই দীর্ঘকাল-লুপ্ত কল্পনা-বৈশিষ্ট্য পুনর্জীবন লাভ করিল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতিকে মানবের সুখদুঃখে সহানুভূতিশীল, তাহার চিন্তার উদ্দীপক ও অবসরের সুহৃদরূপে কল্পনা করিয়া এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রপাত করিলেন। কিন্তু তাঁহার অধ্যাত্মচেতনা ও নীতিজ্ঞান এত প্রবল ছিল যে, তাঁহার কবিতায় দায়িত্বহীন, লঘু সৌন্দর্যবোধ প্রবল হইতে পারে নাই। তাই তাঁহার ফুলগুলি জীবন্ত হইলেও আদিম যুগের বর্ণোজ্জ্বল বিস্ময় নয়, কোন নৃত্যশীলা পরী নয়; তাহাদের সৌন্দর্য ও সুগন্ধ উপভোগ্য হইলেও মোটামুটিভাবে তাহারা আধুনিক যুগের উপযোগী চিন্তা ও নীতিরই বাহন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতিতে যে জীবন আরোপ করিয়াছেন তাহা উচ্চতর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক উদ্দেশ্য সাধনের সোপান বলিয়া মনে হয়। তাঁহার শৈশবকালে প্রকৃতি তাঁহাকে যে খেলার জন্য ডাক দিয়াছে, তাহা ঠিক ছেলেখেলা নয়; ক্রীড়ার সহজ আনন্দ শীঘ্রই তাঁহার নিকট নিগূঢ়তর উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। অতি বিরল ক্ষেত্রে, নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সুদূর অতীতের এই বিস্ময়-বিমুগ্ধ সৌন্দর্যানুভবশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার এক বিখ্যাত সনেটে ইংলণ্ডের হীন বণিক্‌-বৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-স্বরূপ তিনি প্রাচীন গ্রীক চিন্তাধারার প্রশংসা করিয়াছেন। সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া যে গ্রীক কবি জলরাশির মধ্যে বরুণ দেবতার শঙ্খধ্বনি শুনিতেন বা সদা-চঞ্চল উর্মিভঙ্গের মধ্যে অপর কোন জলচর দেবের মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তন-রূপ

প্রত্যক্ষ করিতেন, উনবিংশ শতাব্দীর কবি তাহার সহিত নিকট-আত্মীয়তার জন্য ব্যাকুল।

শেলী ও কীট্স ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের আবিষ্কার গ্রহণ করিয়া তাহাকে নূতন ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের কল্পনা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের ন্যায় গাম্ভীর্যের বর্মপরিহিত ছিল না। তাঁহারা অনেক সময় সুদূর অতীতের নিশ্চিন্ত, ক্রীড়াশীল কল্পনা-লীলা আধুনিক মানুষের জটিল, সমস্যা-পীড়িত জীবনে আনিতে সক্ষম হইয়াছেন। শেলীর চোখে নব-পরিচয়ের বিস্ময়-ঘোর লাগিয়াই ছিল। তিনি পৃথিবীর বহু শতাব্দীব্যাপী ঐতিহাসিক বিবর্তনকে মিথ্যা মায়াবাদ বলিয়া এক মুহূর্তেই উড়াইয়া দিতে পারিতেন। আধুনিক যুগের যাবতীয় জটিল ব্যবস্থার আবরণের ভিতর দিয়া সৃষ্টির মৌলিক ও অবিকৃত আদর্শ সর্বদাই তাঁহার মানস-চক্ষের নিকট প্রত্যক্ষ ছিল। বিশেষতঃ ফরাসী বিপ্লবের ভূমিকম্পে সমাজের মূলদেশ পর্যন্ত যে আলোড়ন অনুভূত হইতেছিল, তাহা তাঁহার কল্পনাকে প্রভাবিত করিয়া তাঁহাকে নবযুগের অরুণোদয়ের স্বপ্নে বিভোর করিয়াছিল। প্রভাত-পাখীর বৈতালিক সঙ্গীতের ন্যায় তিনি শত শত উচ্ছ্বসিত গীতি-কবিতায় পৃথিবীতে এই স্বর্গরাজ্যের আবির্ভাবের আবাহনীগান রচনা করিয়াছেন। তিনি সত্য সত্যই নিজেকে এই নবসৃষ্ট জগতের আদিম মানুষরূপে অনুভব করিয়াছেন। স্বর্গোদ্যানের প্রথম দম্পতির নিষ্পাপ, উলঙ্গ স্বাধীনতাবোধ তাঁহার কাব্যের সহস্র নির্গম-পথে উদ্দামবেগে প্রবাহিত হয়।

এই স্বচ্ছ, সরল এবং সর্বান্বয়ী অনুভূতির বলে শেলী অতি সহজেই গ্রীক কবিদের ন্যায় প্রকৃতি-সৌন্দর্যের মধ্যে মনুষ্যমূর্তির আভাস প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। ইহার সহিত দার্শনিক অধ্যাত্মদৃষ্টি সংযুক্ত হইয়া তাঁহার পরিকল্পনাকে অসামান্য সৌকুমার্যে ও অনুভবতীক্ষ্ণতায় মণ্ডিত করিয়াছে। তিনি যেমন স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্মকে দেখিয়াছেন এবং জড়ের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন, সেইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে মানুষের শুধু রূপ নহে, তাহার সুখদুঃখঅনুভবশীল, হর্ষ-বিষাদে দোলায়মান, বিচিত্র ক্রীড়াশীলতায় রঙ্গকৌতুকময়, অন্তর-চেতনাও লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের এই আরোপে আদিম কল্পনা, বৈজ্ঞানিকের সত্যসন্ধানী দৃষ্টি ও দার্শনিকের রহস্যোদ্ভেদী দিব্যানুভূতি সবগুলিই মিলিয়া গিয়াছিল। এই বিভিন্ন-স্তরের দৃষ্টিভঙ্গীর সমাবেশ শেলীর সৃষ্ট মূর্তিগুলিকে জীবনের নিগূঢ় রহস্যের সন্ধানী করিয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য তাঁহার কবিতায় এই অতি পুরাতন, যন্ত্রবদ্ধ, বিশ্বজগৎ ও মানবজীবনের জীর্ণ, জরা-সঙ্কুচিত ধমনী দিয়া রূপ ও সৌন্দর্যের ঢেউ বহিয়া গিয়াছে। এই সৌন্দর্যপ্লাবনের প্রত্যেকটি তরঙ্গকে

তিনি জীবন্ত, অধ্যাত্মরাজ্যের সূক্ষ্মদেহ অধিবাসিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। আশা-বেদনা, ভালবাসা, বিষাদ, আনন্দ, অধ্যাত্মদৃষ্টি প্রভৃতি মানব-হৃদয়ের অশরীরী ভাবরাজি; পুষ্পের সুবাস, তৃণের উপরিস্থ রৌদ্রোজ্জ্বল শিশির-বিন্দু, দূর-শ্রুত পার্বত্য-নির্ঝরের মৃদু কুলুধ্বনি প্রভৃতি বহিঃপ্রকৃতির সূক্ষ্ম, সুকুমার সৌন্দর্যনিচয়; সৌর-জগতের বিশাল, অপরিমেয় গতিচ্ছন্দ, গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রাদির পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল কক্ষাবর্তন,—এই সমস্তই তাঁহার নিকট প্রাণময়রূপে উদ্ভাসিত হইয়া এক বিরাট আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়াছে; এমন কি শুষ্ক বৈজ্ঞানিক সত্যও তাঁহার কল্পনার নবীনতায় হর্ষোদ্বেল কাব্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাঁহার The Cloud বা 'মেঘ' কবিতায় মেঘের গঠন-বিলয়-সম্বন্ধে প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক তথ্য এইরূপে বালকের মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনশীল খেয়াল, নূতন নূতন ক্রীড়া-কৌতুকপ্রিয়তার রূপ ধারণ করিয়াছে; শিশিরবিন্দুর জলীয় ও বাষ্পরূপগ্রহণ পরীদের লুকোচুরি খেলাতে পরিণত হইয়াছে।

এই রূপ-কল্পনা-প্রবণতা কীট্সের কবিতাতে আরও বেশী। কীট্সের সৌন্দর্যানুরাগ আদিম মানবের বিস্ময়মণ্ডিত। কীট্সই বর্তমান কালে প্রকৃতির রূপ হইতে দেব-দেবী-সৃষ্টির পরিকল্পনার মধ্যে নূতন জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার এণ্ডিমিয়ন কাব্যে এই নবসৃজনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গ্রীক দেশের দেবমূর্তিগুলি যেন আবার সজীব হইয়া তাঁহার কাব্যে পদচারণা করিয়াছে। যে মানস প্রতিবেশ ও প্রবণতা হইতে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানবধর্মবিশিষ্ট করিয়া দেখা সম্ভব, কীট্সের স্বভাব-তরুণ মনে তাহা অক্ষুণ্ণভাবেই বিদ্যমান ছিল। তাই তিনি মরা গাছে ফুল ফুটাইয়াছেন, মরা গাঙ্গে বান বহাইয়াছেন। অবশ্য স্থানে স্থানে তাঁহার এই মূর্তি-পরিকল্পনার মধ্যে বিসদৃশ কষ্টকল্পনা লক্ষিত হয়; কোথাও কোথাও পাপড়ি-সন্নিবেশের আতিশয্যে যেন কেন্দ্রস্থ কোরক ও তাহার অন্তর্নিহিত সৌরভটি কতকটা চাপা পড়িয়াছে। এই সমস্ত দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও কিন্তু কীট্স এ বিষয়ে অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার এণ্ডিমিয়ন কবিতায় তিনি প্যান ও ব্যাকাস নামক দুই প্রসিদ্ধ গ্রীক দেবতার স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায় যে কিরূপ সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত এই দেবমূর্তি-সৃজনের মৌলিক প্রেরণাটুকু তিনি ধরিয়াছেন। পূজা-প্রণালীর উপচার-বহুল বর্ণনার সহিত পূজকের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়ও তাঁহার কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ মদ্যধারাসিক্ত, দ্রাক্ষালতার পত্রফলভূষিত, মকর-বাহন সুরাদেবের (Bacchus) শোভাযাত্রা-সমারোহের পিছনে প্রাচীন গ্রীসের যে দুর্বার দিগ্বিজয়স্পৃহার উন্মত্ত কল্পনা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা কীট্সের

কবিতায় চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। হাইপেরিয়ন কবিতায় তিনি গ্রীক দেব-দেবীর পরাজয়-ম্লান গাম্ভীর্য-গৌরব ও বিজেতা তরুণ সূর্যদেবের (Apollo) নবলব্ধ অভিজ্ঞতায় মহিমান্বিত, অজ্ঞাতপূর্ব সৌন্দর্যবোধের উন্মেষ-বেদনায় স্নিগ্ধ ও করুণ, দীপ্তোজ্জ্বল শ্রীর যে চিত্র দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। আর এই সমস্ত অমরবৃন্দের মুখে তিনি যে ভাষা দিয়াছেন তাহা দেবতারই উপযুক্ত। তাঁহার Ode to Psyche বা 'সাইকির আহ্বান' কবিতায় তিনি পুষ্পসৌরভপূর্ণ, শ্যামল বনস্থলীর মধ্যে কামপ্রিয়া রতিদেবীর আবেশ-শিথিল, বিলাস-বিভ্রমে এলায়িত, মোহময় সৌন্দর্যের এক অনবদ্য ছবি আঁকিয়াছেন। Ode on a Grecian Urn বা 'একটি গ্রীক ভস্মাধারের প্রতি' নামক কবিতায় তিনি গ্রীক ভাস্কর্যশিল্পের ব্যঞ্জনাপূর্ণ সৌন্দর্যের বিচিত্র স্বাদ নিজে গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে অনুভব করাইয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রতিবেশে লালিত ও বর্ধিত তরুণ ইংরেজ কবির পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

৭

প্রাচীন গ্রীক সৌন্দর্যপ্রিয়তার পুনরুজ্জীবন অতীতে প্রত্যাবর্তনের একটা দিক। কিন্তু অতীতের যে যুগ এই কবি-গোষ্ঠীর কল্পনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহা মধ্যযুগ। মধ্যযুগের সঙ্গে রোমান্টিক যুগের একটা নাড়ীর সম্পর্ক ছিল। উভয়েই যুক্তিবাদ অস্বীকার করিয়া কবি-কল্পনা ও অধ্যাত্ম মনোভাবকে প্রাধান্য দিয়াছে। মধ্যযুগের জীবন-যাত্রার ছন্দ দ্রুততর ছিল; যুদ্ধ-বিগ্রহ, অবাস্তব আদর্শবাদের অনুপ্রেরণা সর্বদাই তাহার হৃৎস্পন্দনে গতিবেগ সঞ্চার করিত। আধ্যাত্মিক সাধনা ও ধর্মবিশ্বাস তাহার চিত্তবৃত্তিকে বহির্জগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া অন্তর্মুখীন করিয়াছিল। মধ্যযুগের এই সমস্ত বিশেষত্বই রোমান্টিক যুগের কবিদের কাছে তীব্র আকর্ষণের হেতু ছিল। স্কট্ তাঁহার কাব্য ও উপন্যাসে ইহার জীবনধারার ব্যাপক চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহার সামন্ত-তন্ত্র যে কেবল বাহিরের শাসনব্যবস্থা মাত্র ছিল না, ইহা যে জাতির অস্থিমজ্জা পর্যন্ত সংক্রামিত হইয়াছিল তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। ইউরোপের সমস্ত দেশে, বিশেষতঃ স্কটল্যাণ্ডে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দলপতির প্রতি আনুগত্য ধর্মের অলঙ্ঘনীয় অনুশাসনের মতই বিবেচিত হইত। যখন পর্বতশিখরে প্রজ্বলিত সঙ্কেত-শিখা যুদ্ধঘোষণার অগ্নিময় পতাকার ন্যায় দিকে দিকে আন্দোলিত হইত, তখন গোষ্ঠীভুক্ত প্রত্যেক লোক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সে রুদ্র আহ্বানে নিমেষের মধ্যে সাড়া দিত। এক মুহূর্তে

শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা এক বিরাট যুদ্ধোদ্যমে পরিণত হইত। এই বীরত্বপূর্ণ প্রতিবেশে মানুষের জীবন-বীণা সর্বদা উঁচুসুরে বাঁধা থাকিত। একদিকে প্রেমে অবিচলিত একনিষ্ঠতা ও দুঃসাহসিক কৃচ্ছ্রসাধন, আদর্শ অনুসরণে অনমনীয় দৃঢ়তা; অপরদিকে ক্ষমাহীন, পুরুষানুক্রমিক প্রতিহিংসা ও নির্বিচার আজ্ঞানুবর্তিতা যুগ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। সুতরাং যে কবিরা সমসাময়িক বাস্তবতা পরিহার করিতে সর্বদাই ব্যগ্র ছিলেন, তাঁহারা মধ্যযুগের জীবনে যে তাঁহাদের আদর্শবাদপুষ্ট কল্পনার যোগ্য বিহারভূমির সন্ধান পাইবেন তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

আবার মধ্যযুগের অতিপ্রাকৃতে সহজ-সংস্কারগত বিশ্বাস কোলরিজ ও কীট্‌স তাঁহাদের কাব্যে মনস্তত্ত্বাভিজ্ঞতার অভ্রান্ত নৈপুণ্যে, এবং বিশেষ সহানুভূতির সহিত, ভয়াবহ আভাস-ইঙ্গিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কোলরিজের Rime of The Ancient Mariner বা 'একটি প্রাচীন নাবিকের কাহিনী', Christabel ('ক্রিস্টাবেল') ও Kubla Khan ('কুবলা খাঁ') অতিপ্রাকৃতবিষয়ক কবিতার শীর্ষস্থানীয়। কোলরিজ ভৌতিক অনুভূতি-বর্ণনায় এক সম্পূর্ণ অভিনব প্রণালী প্রবর্তন করেন। আধুনিক বিজ্ঞান অলৌকিক রহস্যে আস্থাস্থাপন করিতে পারে না, কারণ ইহার কোনো সর্বজনগ্রাহ্য প্রমাণ নাই। মধ্যযুগে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস এত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল যে, ইহা অসমর্থিত অভিজ্ঞতাকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিত; দ্বিধাহীন ও সর্বব্যাপী বিশ্বাস নিজেরই অজ্ঞাতসারে আত্মপ্রতারণার সাহায্যে ভৌতিক আবির্ভাবকে স্বীকার করিয়া লইত। কোলরিজ এই উভয়ের মাঝামাঝি এক পন্থা আবিষ্কার করিলেন। অপ্রাকৃতের অস্তিত্ব নির্ভর করে ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির অনুভূতির উপর, কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর নহে। সুতরাং এই অনুভূতি যদি তীব্র হয়, তাহার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যদি ঐক্য ও সামঞ্জস্য থাকে, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া তাহা যদি ত্রুটিহীন ও নিশ্ছিদ্র হয়, তবে তাহা পাঠকেরও বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে। প্রেতলোকের উপস্থিতিতে—তাহা সত্যই হউক বা কাল্পনিকই হউক—যে অন্তর্বিপ্লব ঘটে, বক্ষোরক্তে যে তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হয়, যে দৃষ্টিবিভ্রম কল্পনাতে সত্যরূপ আরোপ করে, পরিচিত দৃশ্যের উপর যে অস্থির মায়ালোক কাঁপিতে থাকে, কবি তাহাই নিখুঁতভাবে ফুটাইয়া অতিপ্রাকৃতের তুহিন-শীতল স্পর্শ অতি নিগূঢ় উপায়ে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেন। এই জাদুমন্ত্রে পাঠকের মনের অবিশ্বাস ও সন্দেহ অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্য ঘুমাইয়া পড়ে। সহানুভূতির তীব্রতা ঘটনার তথ্যগত অসম্ভাব্যতার কথা ভুলাইয়া দেয়। অতিপ্রাকৃতের অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী দুঃস্বপ্নের মত সমস্ত চিত্তকে এমন

সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে যে, সেই সময়ের জন্য ইহাই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে হয় ও স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া ইহারই অধীনতা স্বীকার করে।

প্রতিবেশ-রচনার অসামান্য নৈপুণ্য এই ভৌতিক বিশ্বাস উৎপাদনের একটা প্রধান উপায়। পটভূমিকা-নির্বাচনও প্রেত-আবাহনের অপরিহার্য অঙ্গ। আকাশ-বাতাসটি এমনভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাতে অশরীরীর সূক্ষ্ম আভাস-ইঙ্গিত বায়ুস্তরের পরতে পরতে ছড়াইয়া পড়ে। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে সুদূর অপরিচয়ের রহস্য, আসন্ন আবির্ভাবের স্তব্ধ প্রতীক্ষা এমনভাবে ফুটাইতে হইবে যাহাতে অতিপ্রাকৃত সেখানে নিজ আসনটি প্রস্তুত দেখিতে পায়। প্রকৃতির মুখে এমন একটা উত্তেজিত বিস্ময় আরোপ করিতে হইবে, তাহার বর্ণের লীলা ও প্রাণের বিকাশের মধ্যে এমন একটা অস্বাভাবিকতার হিল্লোল বহাইতে হইবে, যাহাতে মনে হইবে যে সে তাহার স্বাভাবিক ঔদাসীন্য ও নিশ্চলতা ছাড়িয়া অতিপ্রাকৃতের প্রতি ব্যগ্র আলিঙ্গনে নিজ হস্ত প্রসারিত করিয়াছে। কোলরিজের 'প্রাচীন নাবিকের কাহিনী' ও 'ক্রিস্টাবেলে'র দৃশ্য-নির্বাচনে এই নীতি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত অনুসৃত হইয়াছে। প্রথম কবিতায় বৃদ্ধ নাবিকের তরণী সুদূর মেরুপ্রদেশে ও বায়ুলেশহীন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সন্নিহিত মহাসমুদ্রে এক অপরূপ ভৌতিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইয়াছে। সেই মনুষ্যের সংস্রবশূন্য নির্জন প্রদেশে প্রকৃতির রূপ আমাদের পরিচিত জগতের রূপ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিরাট তুষার-স্তূপের ফাটলের মধ্যে যে শব্দ শুনা যায় তাহা যেন দৈত্যের ক্ষুব্ধ গর্জন; সূর্যোদয় যেন স্বয়ং ভগবানের জ্যোতির্মণ্ডিত শিরোদেশ। ঝটিকা যেন হিংস্র পক্ষীর অশান্ত পক্ষবিক্ষেপ; আবার ঝড় জল বিদ্যুৎবিকাশের ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্রপুঞ্জের মুহুর্মুহুঃ প্রকাশবিলয় যেন এক অদ্ভুত প্রেতনৃত্য; অন্ধকার রাত্রে সমুদ্রজলে নানাবর্ণের আলোকরশ্মির কম্পন যেন কোন পৈশাচিক কটাহের ফুটন্ত তৈল; সূর্যাস্তের পর প্রদোষান্ধকার ও তারকারাজির দ্রুতপদবিক্ষেপে আগমন—এই সমস্তই যেন প্রকৃতির উত্তেজিত ও বেগবান প্রাণশক্তির পরিচয়। বাহিরের মত অন্তরেও তীব্র গতিবেগের প্রবাহ। আশা-নৈরাশ্য, আনন্দ-বিষাদ, অনুশোচনা-আত্মপ্রসাদ, নরকভীতি ও ঐশী করুণার আশা—সমস্তই বক্ষপঞ্জরে প্রবল বেগে আন্দোলিত হইয়াছে। ভয় নাবিকের বক্ষোরক্ত যেন চুমুক দিয়া পান করিতেছে। অন্যান্য নাবিকদের মৃতদেহ যেন প্রস্তর-কঠিন দৃষ্টি দিয়া অপরাধী নাবিককে মৌন ভর্ৎসনা জানাইতেছে। নাবিকের পুনর্জীবিত ভ্রাতুষ্পুত্র

তাহার সঙ্গে নীরবে একই রজ্জু আকর্ষণ করিয়াছে, অথচ তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর দুস্তর ব্যবধান ভাববিনিময়ের দ্বারা ঘুচিয়া যায় নাই। অনন্ত-প্রসারিত লবণসমুদ্রের মধ্যে অপ্রশমিত তৃষ্ণার যন্ত্রণা, নিদ্রার স্নিগ্ধ সান্ত্বনা, নিঃসঙ্গতা-ক্লিষ্ট মনের মধ্যে মানব ও জলজন্তুর সৌন্দর্যের অভিনব উপলব্ধি, প্রেতানুভূতির শিহরণ, মোহজাল ছিন্ন হইবার পর পরিচিত দৃশ্যের অপরূপ আকর্ষণ এই সমস্ত ভাবই অভূতপূর্ব দক্ষতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রাণশক্তিতে হিল্লোলিত আবেষ্টনে অতি-প্রাকৃত রহস্য উহার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া মানুষের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছে। এরূপ পরিমণ্ডলেই ন্যায়-বিচার ও করুণার দেবদূতেরা মানুষের ভাগ্য লইয়া পরস্পরের সহিত বাক্-বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতে পারে ; এইখানেই মৃত্যু ও মৃত্যু-গ্রস্তজীবন (Death and Life-in-death) দ্যূতক্রীড়ায় মানুষের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট নির্ণয় করিতে উদ্যত হয়। এইখানেই প্রেতলোকের সমস্ত অমীমাংসিত রহস্য, অদৃষ্টের সমস্ত ঝঞ্ঝাবাত, ইন্দ্রহস্তনিক্ষিপ্ত বজ্রের সমস্ত আঘাত-বেদনা মানুষের গভীরতম অনুভূতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অতি সহজ সরল নীতি-বোধে অঙ্কুরিত হইতে পারে। নিয়তির বজ্রনির্ঘোষ মানবাত্মার অন্তরদেশে দেবমন্দিরের শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনির সুপরিচিত অথচ নবপ্রেরণার ফলে নূতন ভাবে অনুভূত ভক্তি-মাধুর্যের মধ্যে বিলীন হইয়াই কবিতাটির পরিসমাপ্তি।

'ক্রিস্টাবেল' কবিতাটিতে প্রতিবেশ-রচনা অনায়াসেই সম্ভব হইয়াছে। মধ্যযুগের দুর্গ, তাহার পার্শ্বে ঘন অরণ্য ; সেই নির্জন বনপ্রদেশে নিশীথ রাত্রে প্রবাসগত প্রণয়ীর কল্যাণে প্রার্থনাপরায়ণা, ভক্তি-বিশ্বাসে উদ্বেলিতহৃদয়া এক তরুণীর চক্ষুর সম্মুখে অকস্মাৎ অলৌকিক জগতের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। দুর্গের আকাশ-বাতাসে মধ্যযুগসুলভ অপ্রাকৃত আবির্ভাবের ছায়া সূক্ষ্মভাবে বিচরণ করিতেছে। তরুণী ক্রিস্টাবেলের স্বর্গগতা জননীর অদৃশ্য আত্মা তাহাকে ঘিরিয়া আছে ; দুর্গের পশু-পাখী নিজ সহজাত সংস্কার-বলে সেই অশরীরী উপস্থিতি অনুভব করে। এই অতিপ্রাকৃতের অনুভূতি কবি আশ্চর্য সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায়, প্রায় অলক্ষিত আভাস-ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। মোরগের নিদ্রালস ডাকে, কুকুরের চাপা গর্জনে, প্রকৃতি-বর্ণনার রহস্যময় জিজ্ঞাসাভঙ্গীতে, মন্ত্রোচ্চারণের মত একপ্রকার গূঢ়ার্থ, তির্যক্ ভাষাপ্রয়োগে কবি বায়ুমণ্ডলকে প্রেতলোকের অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনিতে পূর্ণ করিয়াছেন, সন্ত্রস্ত পদ-ক্ষেপের ক্ষীণ প্রতিধ্বনিতে পাঠকের বুকে এক অজ্ঞাত শঙ্কার শিহরণ জাগাইয়াছেন। এইভাবে পাঠকের মন ঠিকমত প্রস্তুত হইলে কবি অসঙ্কোচে তাহার সম্মুখে এক সুন্দরী যুবতীর ছদ্মবেশে ডাকিনী গেরাল্ডিনকে উপস্থিত করাইয়াছেন। তাহাকে

লইয়া দুর্গপ্রত্যাবর্তনের সময় ও তাহার পরে চারিদিকে অজ্ঞাত বিপদের পূর্বসূচনা ব্যঞ্জিত হয়। দুর্গপ্রবেশের পূর্বে গেরাল্ডিনের আকস্মিক মূর্ছা ও ক্রিস্টাবেলের সাহায্যে দুর্গদ্বার অতিক্রম; নির্বাপিতপ্রায় অগ্নির হঠাৎ ঝলকে তাহার ক্রূর সর্পের ন্যায় কুটিল দৃষ্টির উপর আলোকপাত; অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত তাহার শক্তি-পরীক্ষা; প্রার্থনায় যোগদানে অনিচ্ছা; তাহার উদ্‌ভ্রান্ত, রহস্যময় ব্যবহার; সর্বোপরি ক্রিস্টাবেলের সহিত একশয্যায় শয়নকালে তাহার বক্ষোদেশে এক ভয়াবহ ক্ষতচিহ্নের ইঙ্গিত—নিপুণ হস্তে গ্রথিত এই সংশয়জাল অভ্যাগতার প্রকৃতি-রহস্যটি নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে। পরবর্তী দ্বিতীয় খণ্ডে কবির এই অদ্ভুত কুহকশক্তি, প্রেতলোকের মায়াবিস্তারের নৈপুণ্য অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। দিবালোকে রাত্রির সূক্ষ্ম মায়া ক্ষীণ হইয়াছে। দুর্গের কোলাহলময় সাধারণ জীবন-যাত্রার মধ্যে ভৌতিক অনুভূতির তীক্ষ্ণতা মন্দীভূত হইয়া স্বপ্ন ও রূপকের নিম্ন পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। অনেক সমালোচক ইহাকে কোলরিজের গুরুতর ত্রুটি মনে করেন—কিন্তু এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। যেমন প্রবল শোক কালক্রমে অশ্রুরেখার সজল আভাসের মত মনের প্রান্তে লগ্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ নিশীথ রাত্রের তীক্ষ্ণ অপ্রাকৃত অনুভবও পরদিন প্রভাতে দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মত অনেকটা সহনীয় হইয়া আসে। মানবজগতে যাহা ঘটে কবি তাঁহার বর্ণনা-প্রণালীর পরিবর্তন দ্বারা তাহাই সূচিত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই চমৎকার কবিতাটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে।

'কুবলা খাঁ' কোলরিজের আর একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। ইহা ঠিক অতিপ্রাকৃত বিষয়ের উপর রচিত নহে, যদিও ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে অপ্রাকৃতের ইঙ্গিত ও প্রতিধ্বনি মিলে। স্বপ্নলোকের মায়াময় ও নিগূঢ় সৌন্দর্য এই কবিতায় আশ্চর্য অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কোন বুদ্ধির সক্রিয়তা বা চিন্তার ধারাবাহিকতার নিদর্শন নাই। এই কবিতায় মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণ অবসর দিয়া কবি কেবল তাঁহার স্বপ্নলোক হইতে স্বতঃ-উদ্ভূত, কুণ্ডলীকৃত ধূম্ররাশির ন্যায় অবাধসঞ্চরণশীল, অসংবদ্ধ চিত্রসৌন্দর্যসমষ্টিকে বাণীময় রূপ দিয়াছেন। বিভিন্ন দৃশ্য-সমূহের মধ্যে কোন চিন্তাগত ঐক্য নাই; তথাপি মনে হয় যে, ইহাদের অন্তর্নিহিত ধ্বনিপ্রবাহ এক গূঢ় ভাব-ঐক্যের হেতু হইয়াছে। কবি এই কবিতাটির উৎপত্তি সম্বন্ধে পাঠককে জানাইয়াছেন যে, ইহার ভাব, ভাষা, ছন্দোরূপ ও দৃশ্যাবলীর পারম্পর্য সমস্তই স্বপ্নলব্ধ। নিদ্রাভঙ্গের পর এই অনবদ্য স্বপ্নসুষমাটি লিপিবদ্ধ করাই তাঁহার একমাত্র সক্রিয় দায়িত্ব। কবি আরও বলেন যে, এই স্বপ্ন-

বিকশিত সৌন্দর্য-শতদলের সব কয়টি পাপড়িই তাঁহার জাগ্রৎ স্মৃতির সম্মুখে বিস্তৃত ছিল—কিন্তু লিখিবার সময় এক ব্যবসায়ীর তাগিদে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এই রূপ-স্বপ্ন অকস্মাৎ মিলাইয়া গেল; তাহার পর আর শত চেষ্টাতেও তিনি ইহার বিস্মৃত খণ্ডাংশগুলির পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। কাজেই কবিতাটি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। স্বপ্ন-সাগরের তল হইতে উত্থিত এই সৌন্দর্যলক্ষ্মী কাব্যজগতে অর্ধাভিব্যক্তি লাভ করিয়া স্বপ্ন ও জাগ্রৎ সত্যের অনিশ্চিত সীমারেখায় চিরন্তন প্রহেলিকার মতই দণ্ডায়মান। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে অবচেতন মনের কবিতা লইয়া যে মাতামাতি হইয়াছিল ও কৃত্রিমভাবে ঐ জাতীয় কাব্য রচিত হইয়াছিল, কোলরিজের ক্রিস্টাবেল সেই জাতীয় কবিতার সার্থক ও অকৃত্রিম অগ্রদূত।

কীট্‌সের অতিপ্রাকৃত কবিতার মধ্যে একটিতে ছাড়া আর কোথাও এই ভয়াবহ অনুভূতি নাই। সাধারণতঃ কীট্‌স যে সমস্ত পরী, যক্ষ প্রভৃতি অতিমানব জীব আঁকিয়াছেন, তাহারা মানবেরই প্রতিবেশী ও মানবিক গুণসম্পন্ন। Lamia ('লামিয়া')-তে যে তরুণীর ছদ্মবেশধারিণী সর্পিণীরূপ বর্ণিত হইয়াছে সে মানুষের মতই প্রেম যাজ্ঞা করে; তাহার ইন্দ্রজালবিদ্যা কেবল তাহার তীব্র প্রেমাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার উপায়স্বরূপই ব্যবহৃত হয়। ইহার মধ্যে কোন ভীতি-শিহরণ নাই। বরং যখন পরুষস্বভাব দার্শনিকের রূঢ় স্পর্শে তাহার মায়াজাল ছিন্ন হইয়াছে, তাহার ইন্দ্রজালরচিত সৌধ বায়ুস্তরে বিলীন হইয়াছে, মোহভঙ্গের নিদারুণ আঘাতে প্রেমিকযুগলের জীবনান্ত ঘটিয়াছে, তখন কবির সহানুভূতি এই অবাস্তব, ক্ষণস্থায়ী প্রেম-মাধুর্যের উপরই বর্ষিত হইয়াছে; তিনি বিজ্ঞানের সৌন্দর্য-বিধ্বংসী প্রভাবের বিরুদ্ধে বেদনা-বিদ্ধ আক্ষেপ-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। Isabella ('ইসাবেলা')-তে গোপন ছুরিকাঘাতে নিহত লরেঞ্জোর প্রেতাত্মা তাহার প্রণয়িনীর নিকট স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হইয়া অতি করুণভাবে নিজ সঙ্গিহীন একাকিত্ব, প্রাণযাত্রা-প্রবাহের সহিত তাহার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ও সহানুভূতির স্পর্শলাভের জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার কাহিনী বিবৃত করিয়াছে। ইহাতে ভৌতিক ভয় নাই, আছে নির্মল কারুণ্যরস, যাহাতে গলিত, দুর্গন্ধময় শবদেহের সমস্ত বীভৎসতা ও বিকৃতি ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। কেবল La Belle Dame Sans Merci বা 'করুণাহীনারে' নামক গীতি-কবিতাটিতে কীট্‌স ভৌতিক জগতের শিহরণ ও ইহার ভয়াবহ সাঙ্কেতিকতার সুরটি ফুটাইতে পারিয়াছেন। মধ্যযুগের এক অশ্বারোহী সৈনিক শীতের রিক্ত, দীর্ণ বিজনতার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তভাবে বেড়াইতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে এক ছলনাময়ী পরী-সুন্দরীর সহিত তাহার সর্বনাশা প্রেমের কাহিনী

বিবৃত করিয়াছে। এই সুন্দরীর মোহিনী মায়া ও মদির চুম্বনের নিকট সে আত্ম-সমর্পণ করিয়া আবেগময় সুষুপ্তিতে ঢলিয়া পড়ে। নিদ্রার মধ্যে সুন্দরীর দ্বারা পূর্ব-প্রতারিত প্রেমিকগণ শুষ্ক, শীর্ণ ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া তাহাকে সাবধান করিতে চেষ্টা করে। নিদ্রাভঙ্গে সে দেখে সে এক বিজন পার্বত্যপ্রদেশে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কবিতাটির বিষয়বস্তু ইহাই; কিন্তু ইহার সাঙ্কেতিক মূল্য অসাধারণ। বর্ণনার অত্যধিক সংযম; চাপা কিস্‌ফিস্ শব্দের মত হ্রস্বায়তন ছন্দের গতিধ্বনি—যেন নামহীন ভয়ের তাড়নায় ভাবাভিব্যক্তির অর্ধস্ফুট কণ্ঠরোধ সূচিত করিয়াছে। অলৌকিকের গূঢ় ব্যঞ্জনা সরলতার মধ্যেই রূপ ধরিয়াছে।

৮

রোমান্টিক যুগের কবিতায় প্রকৃতিই মুখ্য; মানুষ গৌণ। সুতরাং ইহাতে মানুষের যে ছবি আঁকা হইয়াছে, তাহা যেন বহিঃপ্রকৃতিরই একটা মানব সংস্করণ। মানুষ প্রকৃতি-রাজ্যেরই যেন একটা সীমান্ত-প্রদেশ, প্রকৃতির প্রভাবে আচ্ছন্ন, প্রকৃতির গোপন আত্মারই সচেতন বিকাশ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যে সমস্ত কৃষক ও মেষপালকের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রকৃতির অবিমিশ্র সরলতা, উদার অনাসক্তি ও সংযত-গভীর ভাবাবেগ মূর্ত হইয়াছে। তাঁহার Michael ('মাইকেল') দারুণ আশাভঙ্গ ও পুত্রবিচ্ছেদের শোকে পর্বতশৃঙ্গের মত অচল, অটল ও মৌন—পার্বত্য প্রকৃতির রুক্ষ-কর্কশ, অথচ অন্তঃপ্রবাহিত স্নেহ-নির্ঝরে কোমল আত্মা যেন তাহার মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। তাঁহার Two Brothers বা 'দুই ভাই' নামক কবিতায় কৃষক-জীবনের ছবিতে আমরা দেখি যে, পার্বত্য প্রতিবেশের প্রভাবে পারিবারিক বন্ধন ও ভ্রাতৃস্নেহ কত গভীর ও দৃঢ়মূল। তাঁহার ফেরিওয়ালা, ভ্রমণ-কারী, গ্রাম্য শিক্ষক প্রভৃতি অতি সাধারণ শ্রেণীর চরিত্রগুলিও প্রকৃতির প্রসাদে কবি ও দার্শনিক হইয়া উঠিয়াছে—প্রকৃতিই তাহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, গভীর চিন্তাশীলতা ও পৃথিবীর দুঃখ-ক্লেশের প্রতি মহাপ্রাণ সমবেদনা সঞ্চারিত করিয়াছে। তাঁহার আদর্শ প্রেমিকা লুসীও প্রকৃতির স্তন্যপানে লালিতা ও বর্ধিতা—তাহার দেহের প্রতি অঙ্গে, প্রতিটি মানসিক উৎকর্ষে প্রকৃতির লীলা-চঞ্চল সৌন্দর্য-তরঙ্গ হিল্লোলিত হইয়াছে। লুসীর মানবী মূর্তি প্রকৃতির স্নিগ্ধ-শ্যামল আচ্ছাদনে অন্তরায়িত—বহিঃপ্রকৃতি হইতে তিল তিল রূপ ও গুণ আহরণ করিয়া এই নব-তিলোত্তমা মানব জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের গ্রাম্য জীবন-চিত্রে অনেক স্থলে অতি তুচ্ছ, সাধারণ ঘটনাও বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাদের

অকিঞ্চিৎকরতা কবিকল্পনার দ্বারা অতিক্রান্ত ও রূপান্তরিত হয় নাই। ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের গ্রাম্যজীবন প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ধন্য ; সুতরাং তাহার প্রত্যেকটি হৃৎস্পন্দন, মানস-বৈশিষ্ট্য, এমন কি অতি-আকস্মিক, উদ্দেশ্যহীন খেয়ালও গভীর উপলব্ধির উর্ধ্বে, এক অনির্বচনীয় মহিমার দ্যোতক। সাধারণ পাঠক এই মত সর্বাংশে গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া কবির সহিত তাহার সহানুভূতির ব্যবধান রহিয়া যায়—কবিও অবশ্য এই ব্যবধান পুরাইবার কোন চেষ্টা করেন নাই। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের নিকট যাহা স্বতঃসিদ্ধ, সাধারণ পাঠকের কাছে তাহা অবিশ্বাস্য। এই সমস্ত কারণে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কতকগুলি গ্রাম্য কবিতা অনেক সময়ে অসার্থক তথ্যপুঞ্জে ভারাক্রান্ত ; নূতন তত্ত্বের বাহক নহে। কাষ্ঠসংগ্রহ হইয়াছে প্রচুর, কিন্তু উহাতে কল্পনার শিখা জ্বলিয়া উঠে নাই। নব্বই বৎসরের বৃদ্ধ ও তাহার তিন বৎসরের শিশু পৌত্র গ্রামের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে ছোট-খাট চুরি করে—প্রতিবেশীরা জানিয়াও এই ছেলেমানুষী চৌর্যবৃত্তির প্রতি সস্নেহ উপেক্ষা প্রদর্শন করে। The Two Thieves বা 'দুই চোর' কবিতায় কবি মনস্তত্ত্বের এই একটা কৌতূহলোদ্দীপক উদাহরণ দেখাইয়াছেন, কিন্তু পাঠক কবির কৌতূহলের অংশভাক্ হয় না। ছেলের ভালো লাগা না-লাগা সম্পূর্ণ খেয়াল—তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই ; সুতরাং বয়স্ক লোক যদি ছেলের কাছে কারণ জানিতে চায়, তবে সে তাহাকে মিথ্যাভাষণে প্রণোদিত করে। ইহাতে মনস্তত্ত্বের উপাদান আছে, কিন্তু কাব্যরস নাই। The Idiot Boy বা 'পাগলা' নামক কবিতায় অর্ধপাগল একটি বালকের অহেতুক উল্লাস কবির মনে উচ্ছ্বসিত আনন্দের সঞ্চার করিয়াছে, কিন্তু পাঠকের মনে তাহা অনুরূপ কোন আনন্দ বা উত্তেজনার সৃষ্টি করে না। কেননা কবি এই ক্ষ্যাপার মনে, ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করিয়া, যে মহিমার প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছেন, পাঠকের সে দিব্যদৃষ্টি খোলে নাই ; কবি যেখানে সম্ভ্রমে নত, পাঠক সেখানে অবজ্ঞায় বিদ্রূপশীল। অন্য একটি কবিতায় গাড়ীর চাকায় লাগিয়া এক দরিদ্র বালিকার গাত্রাবরণ ছিঁড়িয়া গিয়াছে ; কবি তাহার ক্রন্দনে রাজার সিংহাসন-চ্যুতি, বা মাতার সন্তানবিয়োগের মত, গভীর মর্মবেদনার হাহাকার শুনিয়াছেন। পাঠক কিন্তু এই ক্ষতিকে সামান্য মনে করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত করুণরসের প্রতি উদাসীন থাকে। এবং কবিতাটি করুণরসের পরিবর্তে বিদ্রূপরসের উদ্রেক করে। এই সমস্ত কবিতায় কবি ও পাঠকের মন একস্তরে উঠিতে পারে না বলিয়া কবির উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে নাই।

তবুও মোটের উপর ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের পল্লীজীবনের চিত্রগুলি গভীর সহানুভূতি

ও করুণার উদ্রেক করিয়া থাকে এবং অসামান্য গৌরবের আবিষ্কারে মহনীয় হয়। প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রব বাদ দিলেও, পল্লীবাসীদের স্বভাবে এমন একটা অসাধারণ চরিত্রবল, দৃঢ়সঙ্কল্প ও সাধুতার উচ্চ আদর্শ দেখা যায়, যাহাতে তাহারা আমাদের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। The Old Cumberland Beggar বা 'কাম্বারল্যাণ্ডের বুড়ো ভিখারী' নামক কবিতায় এক অশীতিপর বৃদ্ধ ভিক্ষুক স্থবিরতায় প্রায় জড়পদার্থের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে ; কিন্তু মুক্ত, স্বাধীন জীবনযাপনের জন্য, প্রকৃতির সূর্যালোক ও বায়ুপ্রবাহে স্নাত হইয়া তাহার জরাজীর্ণ দেহে একটা দিব্যদীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তা'ছাড়া তাহার চরম অক্ষমতা, তাহার প্রতিবেশীদের মনে দয়া ও সহানুভূতির অফুরন্ত নিঝর্র সৃষ্টি করিয়া তাহাদের নৈতিক উন্নতিসাধন করিতেছে। সুতরাং সে সকলের পরম উপকারী বন্ধু ও শিক্ষক। The Ruined Cottage বা 'ভাঙা কুঁড়ে' কবিতায় এক গ্রাম্য রমণীর জীবনের করুণ কাহিনী আশ্চর্য সহানুভূতি ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য তাহার আপ্রাণ চেষ্টার ব্যর্থতা, তিলে তিলে তাহার দৃঢ়সঙ্কল্পের শিথিলতা, কর্মোদ্যমের হ্রাস, ধীরে ধীরে অবসাদ ও নিশ্চেষ্টতার নিকট আত্মসমর্পণ, স্বামি-পরিত্যক্তার নিদারুণ বেদনা—তাহার জীবনযাত্রার সমস্ত বিপর্যয়ের স্তরগুলি এমন চমৎকারভাবে দেখান হইয়াছে, এমন মর্মস্পর্শী অথচ সংযত কারুণ্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে যে, আমরা পড়িতে পড়িতে অশ্রু সংবরণ করিতে পারি না। 'মাইকেল' ও 'ভাঙা কুঁড়ে' ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের গ্রাম্য-জীবন-বর্ণনায় চরম উৎকর্ষের উদাহরণ।

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ছাড়া অন্যান্য রোমান্টিক কবির কাব্যে মানব-চিত্র সেরূপ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে না। কোলরিজের সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা অতিপ্রাকৃত বিষয় বা আত্মানুশোচনা লইয়া রচিত। তাঁহার স্বপ্নাতুর দৃষ্টির সম্মুখে কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবন স্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠে নাই। ফরাসী বিপ্লবের সহিত তাঁহার সহানুভূতি রাজনৈতিক ও দার্শনিক মতবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মত তাঁহার বিপ্লব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা তাহার নায়কদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্রব ছিল না। অতএব তিনি আন্দোলন সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি বা পরিবারের সুখ-দুঃখের কাহিনী গভীরভাবে অনুভব করেন নাই। শেলীর নায়ক-নায়িকারা হয় আদর্শলোকের অধিবাসী, না হয় তাঁহার নিজের অন্তরবেদনার প্রতিমূর্তি। তাঁহার Ione, Panthea, Prometheus, Asia—ইহারা সকলেই মানবের মুক্তিসংগ্রামের সেনানী, মানুষের মুক্তি-সাধনার ব্যাকুল

আগ্রহ বা সিদ্ধিলাভের স্বর্গীয় আনন্দের প্রতীক, রক্তমাংসের জীব নহে। তাঁহার Prince Athanese, The Sensitive Plant, Alastor প্রভৃতি কবিতায় যে সমস্ত নরনারীর পরিচয় মিলে তাহারা শেলীর নিজের নিঃসঙ্গ, অতি-সূক্ষ্ম-অনুভূতি-শীল আদর্শবাদের রূপক, কবির আত্ম-চিত্রণেরই বিভিন্ন রূপ। শেলীর নাটক The Cenci (সেন্সি)-তে মাত্র কতকগুলি স্বতন্ত্র চরিত্র দৃঢ়রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে, যাহারা কবির আত্মজীবনের প্রতিচ্ছায়া নহে। ইহার নায়িকা বিয়াত্রিচে শেলীর দার্শনিক মতবাদের প্রতিধ্বনি করিলেও, তাহার জীবন-সমস্যার মৌলিকতা ও সঙ্কল্পের অনমনীয় দৃঢ়তা তাহাকে বিশিষ্ট সত্তা দিয়াছে।

কীট্‌সের কবিতায় মানুষের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা প্রায় সম্পূর্ণ প্রেমাশ্রয়ী। তাঁহার নর-নারীরা প্রায় সকলেই প্রেমিক-প্রেমিকা। প্রেমের উচ্ছ্বসিত প্লাবন ছাড়া তাহাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বলিতে আর কিছু নাই। Isabella ('ইসাবেলা')-তে বণিক্ ভ্রাতৃদ্বয়ের যে চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবানুগামী; কিন্তু তাহারা প্রেমের রাজকীয় মর্যাদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বলিয়া তীক্ষ্ণ, অথচ অনিপুণহস্তে নিক্ষিপ্ত বিদ্রূপ-বাণে বিদ্ধ। তাহাদের মনস্তত্ত্ব-আলোচনার কোন চেষ্টা না করিয়া কবি তাহাদিগকে প্রেমের বিচারালয়ের সম্মুখে অপরাধীর মত দাঁড় করাইয়াছেন।

স্কটের কবিতায় বীরোচিত আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মধ্যযুগের প্রাত্যহিক বাস্তব জীবনের উপভোগ্য বর্ণনা আছে। সমসাময়িক জীবন-সমস্যা সম্বন্ধে স্কটের কাব্য ও উপন্যাস উভয়েই নীরব। স্কটের জীবনাদর্শ মধ্যযুগের প্রভাব-নিয়ন্ত্রিত। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও মধ্যযুগের দুর্গাধিপতির জীবন-যাত্রা পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে, সামন্তরাজের সহিত প্রজাবৃন্দের মধুর, অথচ কঠোর-নিয়ম-বদ্ধ সম্বন্ধটি অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। এইরূপ অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তাঁহার কবিতা কিশোরপাঠ্য গাথা হিসাবে উপভোগ্য হইলেও কাব্যরসোত্তীর্ণ হয় নাই। মধ্যযুগের এক অসম্ভব স্বপ্ন সফল করিতে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক বিরাট দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন—এবং এই প্রাসাদ-প্রতিষ্ঠার ব্যয়বাহুল্যই তাঁহার আর্থিক সর্বনাশ ও মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

রোমান্টিক যুগের যে কবি সমসাময়িক মনুষ্য-জীবন সম্বন্ধে সর্বাধিক কৌতূহলী ছিলেন তিনি বাইরন। বহিঃ-প্রকৃতির অধ্যাত্ম-সম্পদ বিষয়ে তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলীর মতবাদের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন নাই। তাঁহার Childe Harold

('চাইল্ড হ্যারল্ড') ও Manfred ('ম্যানফ্রেড')-এ দু'এক স্থানে মাত্র এই অধ্যাত্মগুণোপেত প্রকৃতির চমৎকার বর্ণনা আছে। কিন্তু এই প্রকৃতি-উপাসনার সুর বাইরনের কাব্যের গভীরতম সুর নহে। তাঁহার প্রকৃতিতে এমন একটা অস্থির উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও লঘু-চপল মনোবৃত্তির এত আধিক্য ছিল যে উঁচু সুরে বাঁধা কাব্য-মনোভাব তাঁহার কাছে কখনই স্থায়ী হইতে পারিত না। চাইল্ড হ্যারল্ডে এই জাতীয় কাব্যিক প্রচেষ্টা কৃত্রিমতার হেতু হইয়াছে—বিশেষ করিয়া সেই সব স্থানে যেখানে কবি একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য ও বিষাদের ভান করিয়াছেন, মানুষ-সমাজের প্রতি অনুযোগের সুর খুব উঁচু পর্দায় চড়াইয়াছেন। জীবনের সুখ, প্রতিষ্ঠা ও ভালবাসা প্রভৃতির প্রতি তিনি যে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে আন্তরিকতা অপেক্ষা নাটকীয় ভঙ্গী ও উচ্ছ্বাসই বেশী ফুটিয়াছে। সুতরাং কাব্যের ভাষা ও ভাবে আলঙ্কারিক আতিশয্য ও অতিভাষণ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার Don Juan ('ডন জুয়ান') নামক দীর্ঘ কবিতায় কিন্তু তাঁহার আসল প্রকৃতিটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ ও লীলায়িত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। 'ডন জুয়ান' একটি ব্যঙ্গাত্মক মহাকাব্য—সমাজ-নীতির অন্তর্নিহিত ভণ্ডামি ও শূন্যগর্ভতার, আদর্শবাদের ছদ্মাবরণের অন্তরালে ইহার স্বার্থলোলুপতার এমন সরল ও সর্বব্যাপী চিত্র ইংরাজী সাহিত্যে আর কোথাও নাই। কবি কোথাও নীতিবিদের ভর্ৎসনা, সংশোধকের উগ্র, ঝাঁঝালো বিচার-পদ্ধতি প্রয়োগ করেন নাই। তিনি লঘু-সরস ব্যঙ্গের সহিত, নিজেকে অপরাধীদের সহিত একাসনে বসাইয়া, সমাজের সমস্ত হাস্যকর অসঙ্গতি ও নৈতিক শিথিলতা, মানব-চরিত্রের অনিবার্য নিম্নগামিতা, প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে নূতন পাপের বীজ-বপন, আদর্শবাদ হইতে ক্ষুদ্র স্বার্থপরতায় অবতরণ প্রভৃতি বিষয়ের কৌতুকপূর্ণ চিত্র আঁকিয়াছেন। এই বিদ্রূপ হাসির ফাঁকে ফাঁকে তিনি করুণ রসের, আদর্শ প্রেমের সৌন্দর্য ও হৃদয়াবেগের আলোচনাও করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত গভীর ভাবের বন্ধন তিনি দীর্ঘকালের জন্য স্বীকার করেন নাই। মুহূর্তমধ্যে, কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই, এমন কি, পংক্তি শেষ হইবার পূর্বেই তিনি উন্নত গাম্ভীর্য হইতে চপল ব্যঙ্গ-কৌতুকের স্তরে নামিয়া আসিয়াছেন। এই অবিরত ভাব-পরিবর্তন তাঁহার কাব্যে অফুরন্ত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে ও পাঠকের মনকে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের সম্ভাবনায় উন্মুখ রাখে। তাঁহার কাব্যে বুদ্ধির চমকপ্রদ তীক্ষ্ণতা, ব্যঙ্গের বিদ্যুৎশিখার তীব্র, অতর্কিত আঘাত হানিবার আশ্চর্য ক্ষমতা, ফোয়ারার ন্যায় হাস্যরসের সহজ অজস্রতা, ভাষার ও ভাবের প্রচণ্ড গতিবেগ প্রভৃতি গুণ সমালোচনার মন্থর বিশ্লেষণে

ধরা যায় না। তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজের চটুল সমালোচনা ও ইহার বাহিরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈচিত্র্যের নিখুঁত ছবি হিসাবে ডন জুয়ানের স্থান ইংরেজী সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শ্লেষাত্মক ব্যঙ্গ কবিতা হিসাবে 'ডন জুয়ান' অবশ্য রোমান্টিক কবিতার সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না; বরঞ্চ ইহাকে পোপপন্থী কবিতাই বলা চলে। কিন্তু পোপের ছন্দের একঘেয়েমী এবং নিয়মমাফিক কেতাদুরস্ততা এখানে নাই। অপ্রত্যাশিত চমকদান বাইরনের কবিতার এক বৈশিষ্ট্য—তাহার পর ভালমানুষীর ছদ্মবেশে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ তো আছেই।

আর একজন মধ্যম শ্রেণীর কবি **ক্র্যাব** (George Crabbe : ১৭৫৪-১৮৩২), পল্লীজীবনের বাস্তব ছবি আঁকিয়াছেন। ক্র্যাবের প্রণালী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। তিনি পল্লীবাসীদের দারিদ্র্যের নিদারুণ লাঞ্ছনা, আনন্দহীন জীবন-যাত্রা ও অবসন্নকারী শ্রমের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত তাহাদের জীবনে কোন আদর্শবাদের মহিমা আরোপ করেন নাই। ক্র্যাব নির্মম বাস্তবপন্থী কবি; যে সমস্ত কবি শৌখিন ভাববিলাসে উদ্বুদ্ধ হইয়া পল্লীর সুখ-শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রার কল্পনা করেন তিনি তাঁহাদিগকে তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাত করিয়াছেন। পল্লী-চিত্র আঁকিতে তিনি নিজ বাস্তব অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির উপর কল্পনার মোহাঞ্জন মাখান নাই। কবিত্ব-পর্যায়ে তাঁহার স্থান উচ্চ নহে; কিন্তু সত্য-ভাষণ, আন্তরিক অনুভূতি, শ্রমজীবী-শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ জীবন-সমস্যার বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য তাঁহার কবিতাকে উপভোগ্য না করিলেও শ্রদ্ধেয় করিয়াছে। রোমান্টিক কবিতার ভোজে কল্পনা-মিষ্টান্নের অতিপ্রাচুর্যের মধ্যে ক্র্যাবের কবিতা যেন এক চামচ বিশুদ্ধ লবণের মতই স্বাদবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। যুগ-প্রভাব হইতে তাঁহার সম্পূর্ণ মুক্তিই তাঁহার কবিতাকে রুচিকর ও উল্লেখযোগ্য করিয়াছে।

৯

রোমান্টিক যুগে কবিতাই সাহিত্য-রচনার মুখ্যতম প্রচেষ্টা। গদ্য-রচনা ইহার তুলনায় গৌণ। এই যুগের সমালোচনা-সাহিত্য নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। **ল্যাম্ব** (Charles Lamb : ১৭৭৫-১৮৩৪), **কোলরিজ** (S. T. Coleridge) ও **হ্যাজলিট** (William Hazlitt : ১৭৭৮-১৮৩০) সাহিত্য-বিচারে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করেন। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল এই যে, সমালোচক ভক্তি-নম্রভাবে, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সহিত লেখকের মানস-বৈশিষ্ট্য

ধরিতে চেষ্টা করিবে; লেখকের উদ্দেশ্য বুঝিয়া সেই উদ্দেশ্য-সাধনের সাফল্যের মানদণ্ডে রচনার উৎকর্ষ নির্ণয় করিবে। কোন সনাতন, অপরিবর্তনীয় নীতি প্রয়োগ না করিয়া, পূর্ব-নির্ধারিত আইনে বিচার না করিয়া প্রত্যেক গ্রন্থের প্রকৃতি অনুযায়ী স্বতন্ত্র বিচারাদর্শ গঠন করিয়া লইবে। নিন্দা-প্রশংসা সমালোচনার প্রকৃত কাজ নহে; ইহার প্রধান কর্তব্য কল্পনার বিচিত্র রূপায়ণ হইতে ইহার মৌলিক প্রেরণাটির আবিষ্কার ও পাঠকের নিকট ইহার পরিচয়-দান। পাঠক ও লেখকের মনের পরিচয়-সংঘটনে মধ্যস্থতা করাই সমালোচকের প্রধান কাজ। পূর্ববর্তী শতাব্দীর ডঃ জনসন মিলটন ও গ্রের প্রতি যে অবিচার করিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ এই যে, তিনি সনাতন ক্লাসিক্যাল আদর্শে তাঁহাদের বিচার করিয়া তাঁহাদের মধ্যে সেই আদর্শ-অনুবর্তন বিষয়ে অনেক ত্রুটি পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একবারও মনে করেন নাই যে, মিলটন ও গ্রে এক নূতন রকমের রূপসৃষ্টিতে ব্রতী হইয়াছেন; এবং এই নূতন প্রচেষ্টা তাঁহাদের নিজ নিজ অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের আদর্শে অঙ্গ-বিন্যাস করিয়াছে কিনা ইহাই একমাত্র বিচার্য বিষয়। রোমান্টিক যুগে এই জাতীয় ভ্রান্তির মূলোচ্ছেদ হইয়া গেল। ল্যাম্ব, কোলরিজ ও হ্যাজলিট, ইহারা শেক্‌শপিয়ার, এলিজাবেথীয় যুগের অন্যান্য নাট্যকার ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থপ্রমুখ সমসাময়িক কবিদের রচনা-আলোচনায় যে সূক্ষ্মদর্শিতা, সহানুভূতি ও রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহা ভবিষ্যৎ সাহিত্য সমালোচনার প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গীতে বিপ্লবকারী পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। অবশ্য এই জাতীয় সমালোচনা অনেক সময়ে সমালোচকের impression অর্থাৎ ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। সেইজন্য ইহাকে impressionistic criticism বা রুচিনির্ভর সমালোচনা বলা হয় এবং সেইজন্যই সমালোচক নিজে বিশেষ বিদগ্ধ ও সতর্ক না হইলে এ জাতীয় সমালোচনার উন্মার্গগামী হইবার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। এইজন্য এই জাতীয় সমালোচনার বিশেষ কোনো দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

সে যাহা হউক, এই নূতন সাহিত্য-বিচারধারার মূল উৎস ও প্রথম প্রতিষ্ঠাতা কোল্‌রিজ। কোল্‌রিজের সমালোচনা মুখ্যতঃ খণ্ডিত প্রবন্ধ ও অসমাপ্ত আলোচনার সমষ্টি। কোন চিন্তাকে স্থায়ী ও সম্পূর্ণ রূপ দিবার মত ধৈর্য ও প্রেরণার নিরবচ্ছিন্নতা তাঁহার ছিল না। কিন্তু এই খণ্ড ও হঠাৎ-পরিত্যক্ত রচনাসমূহের মধ্যে যে মৌলিক চিন্তার দীপ্তি, যে সঙ্কেতবাহী অনুভবের দূরপ্রসারী তাৎপর্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা তুলনারহিত। সমালোচনা-ক্ষেত্রে কোলরিজের প্রধান কৃতিত্ব হইল সাহিত্যবিচারের একটি সার্বভৌমিক দার্শনিক ভিত্তি-আবিষ্কার। তিনি

সমালোচনাকে অতর্কিত উপলব্ধি ও ব্যক্তিগত অভিরুচির স্তর হইতে উন্নীত করিয়া ইহাকে এক শাশ্বত বিধান-রহস্য, এক কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার অমোঘ ক্রিয়াশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্য—কবিপ্রতিভা একটা আকস্মিক শক্তির প্রহেলিকাময় প্রকাশ নহে; ইহা এক সহজ অনুভূতির বলে এক সু-মিত, নিয়ম-শৃঙ্খলাবন্ধনে সু-বলয়িত সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি করে। কলা-সৌন্দর্য প্রতিভার স্বয়ংসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি। মানব-প্রতিভা বহিঃপ্রকৃতির নির্ভুল, অথচ চেষ্টাহীন আত্মবিকাশের মানবিক প্রতিরূপ। শেক্‌শপিয়ারের বিস্ময়কর প্রতিভার সত্যকার ব্যাখ্যা এই রহস্যময় প্রকৃতি-অনুবর্তনের মধ্যেই নিহিত। যেমন বিশ্লেষণের দ্বারা প্রাণরহস্য ভেদ করা যায় না, তেমনি শেক্‌শপিয়ার-প্রতিভার উপলব্ধি এই বিরাট সৃষ্টিশক্তির নিকট সশ্রদ্ধ আত্মসমর্পণের দ্বারাই সম্ভব, বিশ্লেষণ-সাহায্যে নহে। শেক্‌শপিয়ার-প্রতিভার এই দার্শনিক ভিত্তি রচনা করিয়া কোল্‌রিজ সমগ্র শেক্‌শপিয়ার-সমালোচনায় এক নূতন অধ্যায় উন্মোচন করিলেন। Imagination (উচ্চ কল্পনা) ও Fancy (লঘু কল্পনা) এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য তিনিই প্রথম অনুভব ও চালু করেন্ এবং ইহা দ্বারা কাব্য-বিচারের একটা সুষ্ঠু মানদণ্ড নির্ধারণ করেন।

শেক্‌শপিয়ার ছাড়াও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সম্বন্ধে কোল্‌রিজের যে মূল্যায়ন তাহাতেও তাঁহার রুচির অভ্রান্ততা ও সৌন্দর্য-বিশ্লেষণের অপূর্ব শক্তি উদাহৃত হইয়াছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার শক্তি ও দুর্বলতা, তাঁহার কাব্যস্বরূপ সম্বন্ধে যে উপপত্তি (Theory) ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্-এর দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহার ভ্রান্তি ও আতিশয্যপ্রবণতা কোলরিজ যে সূক্ষ্ম অনুভূতির সহিত বিচার করিয়াছেন তাহা সমালোচনা-সাহিত্যে এক অভিনব অন্তর্দৃষ্টি ও সত্যাদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মোটকথা কোল্‌রিজই সাহিত্য-সমালোচনার একটা মূলনীতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন ও সাহিত্যবিচার যে ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি বা যদৃচ্ছ, মনগড়া একটা পদ্ধতির প্রয়োগ মাত্র নহে, এক অপরিবর্তনীয় মূলনীতির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট তাহার চিরন্তন স্বীকৃতি দেন।

ল্যাম্বের সাহিত্য-সমালোচনা শুধু বিচারবুদ্ধির পরিচয় নহে; সমগ্র সত্তা দিয়া অনুভূত, অথবা ক্ষণিক মেজাজ বা খেয়ালের দ্বারা অনুরঞ্জিত রস-আস্বাদন। এখানে যুক্তিবাদ বা বিচারের মানদণ্ড-প্রয়োগ গৌণ, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি দিয়া রসসার-লেহনই প্রধান। অর্ধবিস্মৃত, সমসাময়িক কালের সহিত ভিন্নরুচি

কবি, নাট্যকার ও গল্পলেখকগণই তাঁহার সারানুভবকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করে—বাধা অতিক্রম করিতে গিয়াই তাঁহার অন্তঃপ্রবেশশক্তি আরও তীক্ষ্ণতা অর্জন করে। ল্যাম্বের শেক্‌শপিয়ার সমালোচনা বিখ্যাত হইলেও তাহা মাত্র কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শেক্‌শপিয়ারের নাটকের রস ল্যাম্ব এত গভীর ও তীক্ষ্ণভাবে উপভোগ করিতেন যে তিনি বলিয়াছেন যে, কোনো অভিনয়ই শেক্‌শপিয়ারের নাটকের ঠিক রূপটি ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। শেক্‌শপিয়ারের সমসাময়িক বহু নাট্যকারকে বিস্মৃতির গর্ভ হইতে রক্ষা করা ল্যাম্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁহার Specimens of English Dramatic Poets Contemporary with Shakespeare বা 'শেক্‌শপিয়ারের সমসাময়িক নাট্যকারদের রচিত নাট্যাংশ' পুস্তকে তিনি যে ছোট ছোট মন্তব্য করিয়াছেন তাহা তাঁহার সূক্ষ্ম অন্তদৃষ্টি ও মননশীল বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় বহন করে। ল্যাম্ব এই পুস্তকটি বাহির না করিলে ওয়েবস্টারের মত বহু নাট্যকার হয়তো অজানাই থাকিয়া যাইতেন। রেস্টোরেশন নাট্যকার-গোষ্ঠীকেও তিনি একটি নূতন অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য, ইহাদের জগৎ একটি নীতিহীন লঘু কল্পনা-ক্রীড়ার জগৎ। ইহাকে কড়া নীতিবিদের আদর্শে বিচার করিলে, ইহার নর-নারীর যৌন অসংযম ও ব্যভিচারপ্রবণতাকে কঠোর নিন্দার বিষয়রূপে গ্রহণ করিলে, ইহার রসটাই অনাস্বাদিত থাকিয়া যাইবে। এই মত আমরা সমর্থন করি বা না করি, ইহা যে রেস্টোরেশন যুগের নাটকের রসোপলব্ধির একটা প্রকৃষ্ট উপায়, উহার মনোলোকে প্রবেশের একটা সহজ পথ তাহা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু সমসাময়িক কবিদের বেলায় ল্যাম্ব এই কল্পনা-প্রশ্রয়ের নীতি অবলম্বন করেন নাই। যাহা অতিসন্নিহিত ও অবিসংবাদিত বাস্তব ভাব-সত্য তাহাকে কল্পনারঞ্জিত বুদবুদ-রূপে দেখেন নাই। সেখানে তাঁহার গভীর জীবনবোধ ও সত্যানুভূতিই বিচারের মানদণ্ড হইয়াছে। তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাব-গাম্ভীর্য ও অলঙ্করণহীন সম্ভ্রমকে প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু বাইরন ও শেলীর অসংযত উচ্ছ্বাস, কল্পনাতিশয্য ও অস্থির বিদ্রোহ-প্রবণতা তাঁহার মনে বিশেষ সাড়া জাগায় নাই। এখানে তাঁহার স্বপ্নাবেশ ও কল্পনাবিহার অপেক্ষা তাঁহার স্বপ্নকল্পনাচ্ছন্ন মনের তলায় যে যুক্তিবাদী বিচারবুদ্ধি প্রচ্ছন্ন ছিল তাহারই প্রাধান্য দেখা যায়।

হ্যাজলিটের সমালোচনা জীবনরসভূয়িষ্ঠ; যেরূপ দুর্বার ক্ষুধা ও প্রগাঢ় তৃপ্তির সহিত মানুষ সুস্বাদু খাদ্য আস্বাদন করে, তিনি সাহিত্যরস সেই ভাবেই উপভোগ

করিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা পড়িলে ইহা যে পুঁথি-পত্র-ঘাঁটা, আইন-কানুন-জানা, সতর্ক পণ্ডিতের লেখা তাহা মনে হয় না; ইহার পিছনে একটা বিপুল জীবনাবেগ পরিস্ফুট। তাঁহার অন্তরের নিঃসঙ্গতার বেদনা, তাঁহার সমাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, তাঁহার অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার অস্বস্তি—সবই যেন তিনি সাহিত্যরসপানের গভীরতায় নিমজ্জিত করিতে চাহিয়াছেন। এমন কি, কবিদের সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পর্কের বর্ণনাতেও যেন আত্মার মিলনাকূতি, জীবনের সহিত জীবনের নিবিড় আলিঙ্গন-স্পৃহা মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

মনে হয়, হ্যাজলিট যেন একটা সহজ সংস্কারবলে তাঁহার আস্বাদ্য বিষয়ের মর্মভেদ করিয়াছেন। কবি-আত্মার নিগূঢ় পরিচয়, হৃদয়ের গভীর স্পন্দনধ্বনি যেন এক অলৌকিক অনুভূতির মাধ্যমে হ্যাজলিটের নিকট ধরা দিয়াছে। শেক্‌শপিয়ার সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অন্তর্গূঢ় রহস্যভেদের পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার শেক্‌শপিয়ার সমালোচনা—Characters of Shakespear's Plays বা 'শেক্‌শপিয়ার নাটকের চরিত্রাবলী'—পড়িলে মনে হয় যে অধিকাংশ সময়েই তিনি নাটকটি পাঠ করা অপেক্ষা অভিনয় দেখিবার অভিজ্ঞতার উপরই জোর দিয়াছেন। কোনো কোনো সময়ে হ্যাজলিটের সমালোচনায় নাটকীয় চরিত্রের পরিবর্তে যে অভিনেতা বা অভিনেত্রী সেই চরিত্রের অভিনয় করিতেন তাঁহার নাম আসিয়া গিয়াছে! এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের সম্বন্ধে তাঁহার মতামত অনেক সময়ে ল্যাম্ব অপেক্ষা অধিক যুক্তিনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য। ল্যাম্ব যেখানে তাঁহার মেজাজের অলক্ষ্য আকর্ষণে তাঁহার বিষয়ের সহিত একাত্ম হইয়াছেন, হ্যাজলিট সেখানে সমরুচি না হইয়াও অধীত লেখকের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। ল্যাম্বে আত্মার অনায়াস মিলন; হ্যাজলিটে মনীষার ব্রহ্মান্ত্রপ্রবেশ। ল্যাম্বে লেখকের দ্বৈত-সত্তার আবির্ভাব; হ্যাজলিটে ভাবগ্রাহী অনুভবের মর্মভেদী বোধশক্তি। অবশ্য হ্যাজলিটের রসানুভবশক্তি বিচিত্রগামী হইলেও সর্বত্রগামী হয় নাই। কোথাও কোথাও মেজাজের বৈপরীত্য, সংস্কারের বদ্ধমূল প্রভাব বোধের অন্তরায় হইয়াছে। শেলী তাঁহাকে আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণই করিয়াছেন। তথাপি হ্যাজলিটের রুচির সর্বগ্রাহিতা প্রশংসনীয় ও বিস্ময়াবহ। এমন কি তাঁহার সমসাময়িক রোমান্টিক কবিগোষ্ঠী সম্বন্ধেও তাঁহার আলোচনায় সূক্ষ্মদর্শিতা ও স্থির, অপ্রমত্ত বিচারবুদ্ধি দীপ্যমান। হ্যাজলিটের সমালোচনা গ্রন্থের মধ্যে Lectures on the English Poets বা 'ইংরাজ কবিদের উপর বক্তৃতা', English Comic Writers বা 'ইংরাজী হাস্যরসের

লেখক' ও Dramatic Literature of the Age of Elizabeth বা 'এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যসাহিত্য'ই সমধিক প্রসিদ্ধ।

ডি কুইন্সি (Thomas De Quincey : ১৭৮৫—১৮৫৯)-র সমালোচনা-বিষয়ক রচনা পরিমাণে খুব বেশী নহে। তাঁহার মেজাজেও সমালোচকের স্থির বিচারবুদ্ধি মুহুর্মুহু আবেগের আতিশয্য ও অহিফেন-নেশা হইতে উৎপন্ন স্বপ্নালুতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধাদিতে যে অনুভূতির উচ্চগ্রাম ও বর্ণ বৈভব দেখা যায়, তাহা তাঁহার সমালোচনাতেও কিছুটা লক্ষণীয়। সহজ চিন্তা-ভাবনাও তাঁহার মনে অতিরঞ্জিত ও একপ্রকারের অস্পষ্ট, ধারাবাহিকতাহীন, চিত্রসৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া প্রতিফলিত হইত। On the Knocking of the Gate in Macbeth তাঁহার শেক্‌শপিয়ার-সমালোচনায় আশ্চর্য কল্পনা-সমৃদ্ধ, অনুভব-তীব্রতায় শিরা-স্নায়ুতে শিহরণ-জাগানো রচনার দৃষ্টান্ত। তাঁহার Reminiscence of the English Lake Poets-এ তিনি তাঁহার সমকালীন কবিগোষ্ঠীর যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহাতেও তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মিলে। যেখানে অন্য সমালোচক এই কবিবৃন্দকে দূর হইতে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াই সন্তুষ্ট, সেখানে ডি কুইন্সি তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সত্তা-রহস্য প্রকটিত করিয়াছেন। মনে হয় যেন যে আত্মবিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি নিজের জটিল ও অন্তবিরোধে দুর্বোধ্য প্রকৃতির স্বরূপ জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার বন্ধুস্থানীয় কবিদের সত্তা-উদ্‌ঘাটনে সহায়তা করিয়াছে। তাঁহার মনোভাবের মধ্যে সহানুভূতি, সত্যানুসন্ধিৎসা, হয়তো কিছু পরিমাণে ঈর্ষাও মিশ্রিত আছে।

হ্যাজলিট ও ডি কুইন্সির মধ্যে পার্থক্য এই যে, ডি কুইন্সির মধ্যে স্বতঃসক্রিয়, বুদ্ধিনিরপেক্ষ সূক্ষ্মানুভূতির প্রাধান্য, আর হ্যাজলিটের মধ্যে মনীষা-সঞ্জাত, যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত-স্থাপনের কুশলতা লক্ষণীয়। ডি কুইন্সির ভ্রান্তি-প্রমাদ, ভুল পথে চলার সম্ভাবনা আছে এবং অনেক সময়ে চলেনও, কিন্তু যেখানে তিনি ঠিক পথ অনুসরণ করিয়াছেন সেখানে তিনি লেখকের অন্তরাত্মা পর্যন্ত আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেন। হ্যাজলিটের ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা কম, কিন্তু তাঁহার যুক্তি-নির্ভর চিন্তা আমাদিগকে লেখকের সত্তার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহায্য করে না। ডি কুইন্সির জ্ঞানপ্রধান সাহিত্য (literature of knowledge) ও শক্তি-প্রধান সাহিত্যের (literature of power) মধ্যে বিভেদের উপলব্ধি সমালোচনা-সাহিত্যে একটা বহুস্বীকৃত সত্যের মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

১০

রোমান্টিক ভাব-কল্পনার সর্বাত্মক প্রভাব ইহার গদ্য সাহিত্যেও সুস্পষ্ট। এ সময়ে গদ্যের অন্তঃপ্রকৃতি ও রচনারীতি অভাবনীয়রূপে কাব্যগন্ধী। এ যুগের গদ্যকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়—প্রথম প্রবন্ধসাহিত্য এবং দ্বিতীয় সমালোচনাসাহিত্য। যে সমস্ত লেখক সমালোচনাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই প্রবন্ধ-সাহিত্যের নূতন রূপনির্মিতিতেও অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই নবজাত প্রবন্ধ-সাহিত্য শুধু তথ্য, তত্ত্ব বা যুক্তির সমাবেশ নহে। ইহার মধ্যে লেখকের ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনা, তাঁহার ব্যক্তিগত রুচি, আবেগ ও মেজাজ যুক্তিবাদকে অতিক্রম করিয়া এক ব্যক্তিসত্তাসুরভিত আবহ রচনা করিয়াছে। ইহা যেন গীতি-কবিতারই একটা সম্প্রসারিত গদ্য প্রতিরূপ। লেখকের বিশেষ মানস গঠন, তাঁহার আত্মরূপ-প্রকটনের একটি বিশেষ রীতি, তাঁহার জীবন-রস-আস্বাদনের একটি নিজস্ব ভঙ্গি এই প্রবন্ধসমূহকে মন্ময় সাহিত্যের রমণীয়তায় মণ্ডিত করিয়াছে। লেখক এখানে ইচ্ছামত সুর উঠাইয়াছেন নামাইয়াছেন, অনুভূতির মাত্রা তীব্র বা শিথিল করিয়াছেন, ভাবকে যুক্তি-প্রতিপাদনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ না রাখিয়া আবহ-সৃষ্টির উপযোগী স্বচ্ছন্দ বিচরণের স্বাধীনতা দিয়াছেন ও ইহার ফলশ্রুতিরূপে একপ্রকার জীবন-সম্ভব রস-নির্যাসের দ্বারাই পাঠকের উপভোগস্পৃহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। সংবেদনশীল হৃদয়ের যে সব বিচিত্র, বহুমুখী রসবোধ ও জীবনাবেগকে কবিতার দৃঢ়বদ্ধ আঙ্গিক ও অনুভব-সমুচ্চতার শীর্ষদেশে ধরিয়া রাখা যায় না, তাহারাই এই প্রবন্ধের মাধ্যমে পর্বতগাত্র-নিঃসৃতা ও সমতলাভিমুখে ধাবমানা নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গিনীরূপে প্রবাহিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রবন্ধকার রোমান্টিক যুগের সাধারণ প্রেরণার গতিবেগ, বিস্ময়বোধ ও অভিনব অভিজ্ঞতার স্বাদবৈচিত্র্যের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। রোমান্টিক ভাবের জোয়ার সমুদ্রগামী কাব্য-নদী-প্রবাহেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া ছোটখাট শাখানদী, সুঁড়ি খাল ও স্থলবেষ্টিত ক্ষুদ্র তড়াগেও সঞ্চারিত হইয়া উহার সর্বব্যাপিত্বের নিদর্শন দিয়াছে।

প্রবন্ধকারদের মধ্যে চার্লস্ ল্যাম্ব শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার দুইখণ্ড Essays of Elia বা 'এলিয়ার প্রবন্ধ' (১৮২৩, ১৮৩৩) নিজ মনোভঙ্গীর ঐক্যসূত্রের দ্বারা নানা উপাদানের গ্রন্থনে এক অপূর্ব সুরসঙ্গতি লাভ করিয়াছে। এলিয়া ল্যাম্বেরই ছদ্মনাম। পূর্বস্মৃতি-রোমন্থন, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার রসনিষ্কাশন, লঘু, উদ্ভট কল্পনার সহিত গভীরতম জীবনবোধের সংমিশ্রণ, হাসি, মস্করা, পাঠককে বোকা

বানান ও নিজেকেও ভাঁড়রূপে উপস্থাপিত করার মধ্যে অপূর্ব করুণরস ও মর্মান্তিক দুঃখের ইঙ্গিত, নানা গ্রামের দ্রুতসঞ্চারী সুরসংঘের এক অখণ্ড সুরসংহতিতে রূপান্তর-সাধন ল্যাম্বকে ইংরাজ লেখকদের মধ্যে অতুলনীয় করিয়া রাখিয়াছে। অট্টহাসির অন্তরালে অশ্রু, আবোল-তাবোল বকুনির মধ্যে গভীর প্রচ্ছন্ন প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য-প্রকাশের মধ্যে অন্তরের অকৃত্রিম সরলতা, অপরের ভাষা অনুকরণের মধ্যে নিজ মৌলিকতার ছন্দোদ্যোতনা—এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী উপাদান ল্যাম্বের মানস রসায়নে এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ে মিলিত হইয়াছে। মানুষের অন্তরে যে বহুরূপী প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা যেন ল্যাম্বের রচনায় বহুত্বের আবরণ-মুক্ত ঐক্যের পরিচয় দিয়াছে। এই ঐক্য এত প্রাণময়, এত রসোচ্ছল, এত বিচিত্র আবেদনে সর্বসঞ্চারী যে ইহা সাহিত্য-প্রকাশের এক অপরূপ নিদর্শনরূপে অমরত্বের অধিকারী হইয়াছে।

ল্যাম্বের humour বা মর্মোদ্ভিন্ন রসদৃষ্টির দ্বারাই এই অসাধ্য-সাধন সম্ভব হইয়াছে। তিনি জীবন-বাদ্যযন্ত্র হইতে লঘু অঙ্গুলি-চালনায় যে বিচিত্র সুর-লহরী তুলিয়াছেন তাহা হিউমারের অন্তরশায়ী, সর্বব্যাপী অনুরণনে এক অখণ্ডতাৎপর্যময় সঙ্গীত-মূর্ছনায় মিলিত হইয়াছে। তাঁহার হেলায় ছড়ান চিন্তা-ভাবনারাশি, তাঁহার খেয়ালী মেজাজের নানা বর্ণের আল্পনা, তাঁহার কঠিন বাস্তব দৃশ্য ও অভিজ্ঞতার মধ্যে স্বপ্নসঞ্চরণ—সমস্তই এই জীবন-রসিকতার মধ্যবর্তিতায় এক অপূর্ব জীবনভাষ্য-রূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। শিল্পোৎকর্ষ ও মনস্তাত্ত্বিক যথার্থতায় ইহা একমাত্র 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর সহিত তুলিত হইতে পারে। অবশ্য বঙ্কিম পাগল সাজিয়াছেন, ল্যাম্ব সত্য সত্যই কিছুটা পাগল ছিলেন। তাঁহার হাসিঠাট্টা সবই উন্মাদ-প্রতিষেধক প্রয়াসরূপে, জীবনসত্যের বিভীষিকা হইতে আত্মবিস্মৃতির উপায়রূপে এক অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক-ব্যঞ্জনা-মণ্ডিত হইয়াছে। ল্যাম্বের অধিকাংশ প্রবন্ধই তখনকার দিনের বিখ্যাত পত্রিকা London Magazine ('লণ্ডন ম্যাগাজিন')-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। ল্যাম্বের বহু প্রসিদ্ধ প্রবন্ধের মধ্যে The Superannuated Man, ('অবসরপ্রাপ্তের কাহিনী') তাঁহার নিজের জীবনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনী এবং অবসরপ্রাপ্তির পর শূন্যতা অনুভবের সার্থক চিত্র; আর Dream Children ('স্বপ্নসন্তান') প্রবন্ধে তাঁহার অকৃতদার জীবনের অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত করুণমধুররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রাবন্ধিক হ্যাজলিট ও সমালোচক হ্যাজলিট একই ধাতুতে গড়া ও উভয়ের রচনারীতি ও মানস-প্রেরণাও অভিন্ন। হ্যাজলিটের প্রবন্ধের মধ্যেও জীবন-

রসলোলুপতা, জীবনোপভোগের অত্যাগ্রহ পরিস্ফুট। তাঁহার তীব্র আনন্দ, নূতন অভিজ্ঞতা-আস্বাদনের ঔৎসুক্য, তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে একটা আত্ম-প্রকাশের ঝাঁঝালো উগ্রতা তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধকে এক উপভোগ্য জীবনরসে আপ্লুত করিয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধগুলি কোন বিষয়ের যুক্তিক্রম অনুসরণ করে নাই—তাঁহার সাময়িক খেয়াল, ক্ষণিক ক্রোধ ও বিরক্তি অথবা প্রীতিকর অনুভূতি নিতান্ত অতর্কিতভাবে, সূক্ষ্ম ভাবানুষঙ্গের সূত্রে, একটি আপাত-নিঃসম্পর্ক বিষয়ের ভূমিকা রচনা করিয়াছে। জীবিকার্জনের তাগিদে হ্যাজলিটকে অনেক সময়ে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হইতে হইত। কিন্তু তিনি যে ভাবে রচনাকৌশল আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার রচনার মধ্যে কৃত্রিমতার ছায়ামাত্র অনুভব করা যায় না। তাঁহার রচনায় বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, কল্পনাক্রীড়া ও চিন্তার মৌলিকতা সমভাবে বর্তমান। তিনি সমধর্মী দুইটি গুণের সূক্ষ্ম পার্থক্য যে কিরূপ আশ্চর্যভাবে পরিস্ফুট করিতে পারেন তাহা তাঁহার Cant and Hypocrisy বা On Vulgarity and Affectation নামক প্রবন্ধে উদাহৃত। ল্যাম্বের মত হ্যাজলিটের সমস্ত রচনাই আত্মজীবনীমূলক এবং সমস্তগুলিই প্রথমে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধই ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Table Talk ('টেবিলে কথাবার্তা') নামক পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছিল।

ডি কুইন্সির ক্ষেত্রে প্রবন্ধ-রচনা মুখ্য ও সাহিত্য-সমালোচনা গৌণ। তাঁহার অহিফেনাসক্তি তাঁহার কল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশরীতিকে গভীরভাবে অতিরঞ্জিত করিয়াছে। তিনি যাহা কিছু দেখিয়াছেন ও বর্ণনা করিয়াছেন সবই যেন এক কুহেলিকার আবরণ হইতে এক অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, অথবা রঙীন আলোকে দীপ্ত হইয়াছে। লণ্ডন শহরের রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর, জনতা সবই যেন স্বপ্নলোকের অবাস্তবতা-মণ্ডিত হইয়া, বর্ণাঢ্য চিত্রের মত তাঁহার কল্পনার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। তিনি জীবন ও বহিঃপ্রকৃতি উভয়কেই এক স্বপ্নাবেশময় দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় জীবনের গোধুলি-রহস্য, উহার আলো-আঁধারি অনির্দেশ্যতা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্টের কাহিনীও যেন স্বপ্নলোকের ঘটনা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

তাঁহার রচনারীতি অতিরিক্ত অলঙ্কারবহুল ও তাঁহার অনুভূতির মধ্যে এমন একটি পল্লবিত বিস্তার ও সম্প্রসারণশীলতা আছে যে অতি সাধারণ ঘটনাও তাঁহার মনে অসংখ্য প্রতিচ্ছবির সমাবেশে জটিল ও বর্ণাঢ্য হইয়া উঠে। তিনি কাব্যময়

গদ্যের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ; যেখানে আবেগের আন্তরিকতা সরল প্রকাশরীতির মুখাপেক্ষী সেখানেও তিনি কারুকার্যময় ও অতিপল্লবিত বাগ্‌বিন্যাসের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন না। ইহার ফলে তাঁহার বর্ণনা অনেকস্থলে কৃত্রিমতাদুষ্ট হইয়া বিষয়বস্তুর যথার্থ উপস্থাপনার অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং অলঙ্কারের চাপে ও ভাববিলাসের আতিশয্যে বর্ণিত বস্তুকে অতিক্রম করিয়া কৃত্রিম হইয়া পড়ে।

ডি কুইন্সির Confessions of Opium-eater বা 'আফিংখোরের স্বীকারোক্তি' (১৮৫৬) ইংরাজী সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি। এই পুস্তকে তিনি তাঁহার অহিফেনাচ্ছন্ন মানস-প্রকৃতির মনস্তাত্ত্বিক-সত্যানুগ বর্ণনা করিয়াছেন। নেশার প্রকৃতি ও আবেশ সম্বন্ধে নেশাখোরের নিজের যে এমন স্বচ্ছ দৃষ্টি থাকিতে পারে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। একদিকে এই নেশা তাঁহার মনে কি অপূর্ব রঙের লীলা, কি অদ্ভুত ভাবোন্মাদনা জাগাইত তাহাও যেমন তিনি সত্যনিষ্ঠার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন, তেমনি অপরদিকে ইহার অশুভ প্রভাব, ইহার মানস-বিকার-উৎপাদনশীলতা সম্বন্ধেও তাঁহার কোন ভুল ধারণা নাই। এই কু-অভ্যাসের বশবর্তিতার জন্য তাঁহার মনে অনুশোচনা ও আত্মপ্রসাদের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে ; তবুও এই নেশার ঘোরে তাঁহার সত্যদৃষ্টি নষ্ট হয় নাই, ইহার স্বরূপ-বিশ্লেষণে তাঁহার কোন দৃষ্টি-বিভ্রম নাই। এইরূপ বিপরীত প্রবণতার সমাবেশ সাহিত্যক্ষেত্রে সত্যই বিরল।

ডি কুইন্সির Revolt of the Tartars বা 'তাতার বিদ্রোহ'-এ তাহার ইতিহাস-বিবৃতির বিশিষ্ট রীতি পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি তথ্যসংবলিত ধারাবাহিক বর্ণনার পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু ইতিহাস-কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নাটকীয় আখ্যানের গতিবেগ ও চিত্র-সৌন্দর্য আশ্চর্য ব্যঞ্জনাশক্তির সহিত ফুটাইতে পারিতেন। এখানে তাতার বাহিনীর রুশ হইতে চীনদেশে পলায়নের নাটকীয়তা ও দুর্বার তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ন্যায় দ্রুত সঞ্চরণবেগ তিনি কল্পনার দ্বারা অনুভব ও যথাযথ ভাষা-প্রয়োগে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ডি কুইন্সি অপূর্বশক্তিসম্পন্ন হইলেও ল্যাম্ব বা হ্যাজলিটের মত প্রথম শ্রেণীর লেখক নহেন। তাঁহার ভাবের অত্যুচ্ছ্বাস ও শব্দসৌন্দর্যের প্রতি অতি-মনোযোগ শ্রেষ্ঠ কলাকৌশলতার অভাব সূচিত করে। তাঁহার অজস্র রচনার মধ্যে প্রবন্ধের বিচ্ছিন্ন উপাদান প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু প্রবন্ধের রূপকল্পের সচেতন শিল্পী হিসাবে তাঁহাকে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া যায় না।

লে হান্ট (J. H. Leigh Hunt : ১৭৮৪-১৮৫৯) এই যুগের আর একজন

মধ্যমশ্রেণীর প্রবন্ধলেখক। তিনি Examiner ('এগজামিনার' বা 'পরীক্ষক') নামে একটি সাহিত্যপত্রের সম্পাদনা করিতেন এবং বাইরন, শেলী, কীট্‌স্‌, ল্যাম্ব সকলেরই বন্ধুস্থানীয় ও উপকারী ছিলেন। স্ফূর্তি, সহজ অন্তরঙ্গতা এবং এক-প্রকারের উদ্ভট মনোজ্ঞতার দিক দিয়া লে হাণ্ট ল্যাম্বের সমপ্রকৃতিসম্পন্ন। কিন্তু ল্যাম্বের গভীর অনুভূতি ও কল্পনা-সমুন্নতি লে হাণ্টে নাই। মানুষ হিসাবে তাঁহার চরিত্রে মানবিক সহানুভূতি ও উদার আদর্শবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। লে হাণ্ট কিছু কিছু অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতাও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্যে কিন্তু তাঁহার উচ্ছ্বাসপ্রবণতা কখনই সীমা অতিক্রম করে নাই। অনেক সময়ে তিনি প্রবন্ধসাহিত্যকে সাংবাদিকতার পর্যায়ে নামাইয়া আনিয়াছেন। তাঁহার এই জাতীয় রচনা প্রায়শঃ অতিপল্লবিত। হয়তো তাঁহার নিজ পত্রিকার তাগিদেই ইহা করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। লে হাণ্টের Autobiography বা 'আত্মজীবনী'ই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। শ্রেষ্ঠতর প্রবন্ধকারেরা নিজের জীবন হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া উহাকে বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সার্বভৌম কলাসৌন্দর্য ও মানবিক আবেদনে ঊর্ধ্বায়িত করিয়াছেন। লে হাণ্ট তাহা পারেন নাই, নিজের জীবনের ঘটনাগুলিকে স্থূল বিষয়রূপেই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সমসাময়িক সকল সাহিত্যিকেরই সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আত্মজীবনীর একটা সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

ল্যাণ্ডর (W. S. Landor : ১৭৭৫-১৮৬৪) রোমাণ্টিক লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে এক অনন্য স্বাতন্ত্র্যে অধিষ্ঠিত। তিনি স্বদেশীয় সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দক্ষিণ ওয়েল্‌স ও শেষ পর্যন্ত ইটালীতে বসবাস করেন। তাঁহার উগ্র মতবাদ ও বিস্ফোরণশীল মেজাজ তাঁহাকে মানব সমাজের সাধারণ প্রীতি-সহৃদয়তা হইতে দূরে রাখিয়াছিল। তাঁহার গদ্য ও পদ্য রচনাও এই উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত—তিনি সমকালীন লেখকবৃন্দের সাধারণ মানস-প্রবণতার দ্বারা একেবারেই প্রভাবিত হন নাই।

ল্যাণ্ডরের মন ছিল প্রাচীন রোমীয় চরিত্র-গৌরব ও আত্মদমনের ছাঁচে ঢালা। ভাবোচ্ছ্বাস ও আত্ম-উদ্‌ঘাটন-প্রবৃত্তিকে তিনি সবল হস্তে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আপনাকে নাট্যকারোচিত নৈর্ব্যক্তিকতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন। তাঁহার রচনারীতি এত ঘনবদ্ধ, তীক্ষ্ণ ও সংক্ষিপ্ত যে মনে হয় ইহা যেন পাষাণফলকের উপর সূক্ষ্মাগ্র ধাতব অস্ত্রে উৎকীর্ণ। তাঁহার সাহিত্য ভাববিগলিত তরলতা ও উচ্ছ্বাসের

আতিশয্য হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত—ইহা জমাট বরফ বা মর্মরপ্রস্তরের মত শীতল, উত্তাপহীন এবং সংযত। তাঁহার রচনা সম্পূর্ণরূপে ভাস্কর্যধর্মী। তাঁহার কবিতা সূচ্যগ্র সংক্ষেপোক্তি ; তাঁহার গদ্য ফলকে উৎকীর্ণ শিলালিপি।

ল্যাণ্ডরের Imaginary Conversations বা 'কাল্পনিক কথোপকথন' (১৮২৪-১৮২৯) এক সম্পূর্ণ অভিনব সাহিত্য-প্রকরণ। ইহা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস-বিশ্রুত ও শ্রেষ্ঠ পুরুষদের জীবনচরিত হইতে সঙ্কলিত ও নাটকীয়রূপে বিন্যস্ত। সংলাপগুলি অবশ্য কাল্পনিক। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনের এক-একটি নাটকীয় মুহূর্ত সংলাপের মাধ্যমে এই গ্রন্থে উহার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত লইয়া অভিব্যক্ত। এখানে নানা বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ; সংলাপের সুর ও সংঘর্ষের প্রকৃতিও প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিন্ন, অথচ প্রত্যেকটিই বিষয় ও চরিত্রোপযোগী। সংলাপগুলি মূলতঃ বীররসাত্মক, ঘটনার উপর বিজয়ী মানবাত্মার মহিমায় প্রোজ্জ্বল। এই মহিমার প্রকাশের মধ্যে কোথাও বা করুণ রস, চোখে দু'এক ফোঁটা যত্ননিরুদ্ধ অশ্রুর ঈষৎ আভাস, কোথাও বা প্রশান্ত আত্মসংযম ও অক্ষুণ্ণ নীতিবলের প্রতিষ্ঠা। মাঝে মধ্যে ভাবগাম্ভীর্যময় দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্যে লঘু, মনোজ্ঞ কল্পনা ও পরিবার-জীবনের মৃদু আবেগ-কম্পন ও সুর-বৈচিত্র্য-প্রবর্তন একঘেয়েমির ক্লান্তিকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু মোটের উপর উন্নত আদর্শনিষ্ঠা, দুঃখকষ্টের স্বেচ্ছাবরণ, উদাত্ত চরিত্র-গৌরব, প্রাচীন রোমীয়দের Stoic (স্টোয়িক) মনোভাবের দৃঢ় অনুবর্তন গ্রন্থখানির মূল সুর।

Hannibal and Marcellus ('হ্যানিবল ও মার্সেলাস্') সংলাপটি হইতে ল্যাণ্ডরের রচনার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইবে। কার্থেজের দিগ্বিজয়ী বীর হ্যানিবল ইটালি আক্রমণ করিয়া রোম সেনাপতি মার্সেলাস্‌কে পরাজিত ও আহত করিয়াছেন। হ্যানিবলের একান্ত আগ্রহ মার্সেলাস্‌কে সন্ধির দূতরূপে রোমে প্রেরণ ; সেই উদ্দেশ্যে মার্সেলাসের প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহার ব্যগ্রতা। মার্সেলাসের একমাত্র পুত্র বাঁচিয়া আছে কিনা তাহা জানিবার জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা তিনি প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়া প্রতিরোধ করিয়াছেন। শেষ মুহূর্তে পিতৃহৃদয়ের অনিবার্য ব্যাকুলতা ক্ষণিকের জন্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সে বাঁচিয়া আছে জানিয়া মার্সেলাস্ পরম শান্তিতে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। সন্ধির প্রস্তাব তিনি ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। রোমীয় বীরের অদ্ভুত মনোবল ও কর্তব্যবোধ, নিম্নতর জীবনচর্চার প্রতিনিধি, হ্যানিবলের রোমের প্রতি শ্রদ্ধাকুণ্ঠিত মনোভাব, রোমীয়ের বিলাস-দ্রব্যের প্রতি অবজ্ঞা ও গলদেশীয় বর্বর সেনাপতির

সোনার চাক্‌চিক্যে মোহ—এই সমস্ত জাতীয় চরিত্রের বিভিন্নতা অপূর্ব নাটকীয় রসে অভিষিক্ত হইয়া এই সংলাপটির মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

ল্যাণ্ডরের গদ্যরীতিতে মাঝে মধ্যে পাণ্ডিত্য-পরুষ আড়ষ্টতা ও শব্দাড়ম্বর-জনিত নীরসতা দেখা গেলেও উহাতে কবি-কল্পনার দীপ্তি ও বর্ণাঢ্যতারই প্রাধান্য। তাঁহার ক্লাসিক্যাল মনোভঙ্গী তাঁহার ভাষাকে সংযম ও মর্যাদা দান করিয়াছে। তাঁহার ভাষায় ল্যাম্বের করুণ উৎকেন্দ্রিকতা, হ্যাজলিটের তীক্ষ্ণ অনুপ্রবেশশীলতা বা ডি কুইন্সির সূক্ষ্ম রহস্যানুভব ছিল না ইহা সত্য, কিন্তু তাঁহার গদ্য যে সংযত ও গম্ভীরনাদী সৌন্দর্যের পরিচয় দেয় ও ভাবগ্রামের যে বহুচারী সুর-বৈচিত্র্য ধ্বনিত করে তাহা ইংরাজী গদ্যে তুলনারহিত। ল্যাণ্ডর রোমান্টিক যুগে প্রকৃত ক্লাসিক্যাল মনোভাব ও মহিমার উচ্চতম নিদর্শন।

১০

এই যুগে উপন্যাসের পরিমাণ বা প্রভাব খুব বেশী নহে। কিন্তু উহাতে অগ্রগতির নূতন আভাস পাওয়া যায়। সার ওয়ালটার স্কট ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনা করেন। এই যুগে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটে। মহিলা ঔপন্যাসিক রোমান্টিক যুগের লোক হইলেও তাঁহার মনোভঙ্গী ও রচনারীতিতে অষ্টাদশ শতকের ক্লাসিক্যাল ভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সহানুভূতির অভাব না থাকিলেও, ব্যঙ্গই যেন তাঁহার উপন্যাসের মূল সুর।

মিস্ বার্নে (Miss Burney, পরে Madame D' Arblay : ১৭৫৩—১৮৪০) উপন্যাসক্ষেত্রে নারীর প্রথম সশঙ্ক পদক্ষেপের উদাহরণ। উপন্যাসের আবিষ্কর্তা রিচার্ডসনের মনোভাব ও রচনাপদ্ধতিতে একটা নারীসুলভ স্পর্শ, মেয়েদের মত ছোটখাট বিষয়ে উত্তেজনাপূর্ণ কৌতূহল, সখির নিকট গোপন কথা ব্যক্ত করার অন্তরঙ্গ প্রবণতা ও তীক্ষ্ণ সাংসারিক জ্ঞানের পরিচয় মিলে। যিনি নারীর হৃদয়-রহস্য প্রকটিত করিয়াছেন তাঁহার মধ্যে নারী-প্রকৃতির কিছুটা উপাদান ছিল ইহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু রিচার্ডসনের অব্যবহিত পরে ফিলডিং ও স্মলেট তাঁহাদের পুরুষোচিত উচ্চ হাসি, উচ্ছল জীবনাবেগ, বহির্মুখী ঘটনা-বৈচিত্র্য ও কিছুটা স্থূল, অমার্জিত রুচি লইয়া উপন্যাসের খোলা দরজা দিয়া উতলা বায়ুর মত ঢুকিয়া পড়ায়, নারীর অভ্যাগম কিঞ্চিৎ বিলম্বিত হইল। পুরুষের পরুষ প্রকৃতির এই ঝড়ো বেগ খানিকটা প্রশমিত হইবার পর নারী যেন ধীরে ধীরে তাহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সংকীর্ণ অভিজ্ঞতা, ঘরোয়া রুচি ও তির্যক-কটাক্ষময় জীবনদর্শনের ছোট পসরাটি

সাজাইয়া উপন্যাস-বিপণিতে একটি পিছন-দিককার আসন অধিকার করিয়া বসিল। ফ্যানি বার্নে এই অনভ্যস্ত ক্ষেত্রে প্রথম আগন্তুক।

ফ্যানি বার্নের আত্মজীবনী হইতে আমরা জানিতে পারি যে উপন্যাসক্ষেত্রে নারীর প্রবেশ গোপন অভিসারের মতই সশঙ্ক এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বে দোলায়িত। তখনকার দিনে সামাজিক বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করিয়া নারীর পক্ষে সাহিত্যের খোলা বাজারে প্রবেশ করা সহজ ছিল না। তাঁহার প্রথম উপন্যাস, Evelina ('এভেলিনা') (১৭৭৮) বেনামীতে প্রকাশিত হয়। কত আত্মগোপনশীলতা, কত চক্রান্তকুশলতা, কত স্বীকৃতি-অস্বীকৃতি, কত লজ্জা-সরমের পিছন-টানা প্রভাব ইহার পিছনে সক্রিয় ছিল তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তাহার পর অপ্রত্যাশিত খ্যাতির দক্ষিণা বাতাস ছদ্মবেশের অবগুণ্ঠনখানি সরাইয়া লইয়া গেল ও তরুণী লেখিকা স্ব-নামে আত্মপ্রকাশের সাহস সঞ্চয় করিলেন। নারী আপন ভাগ্য জয় করিবার অধিকার বিধাতার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইল।

'এভেলিনা' এক শ্রেণীর মহিলা-লেখকের উপন্যাসের অগ্রদূত ও প্রতিনিধিরূপে আবির্ভূত হইল। অষ্টাদশ শতকের অভিজাত-সমাজ এক তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও মৃদুব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের অধিকারিণীর বঙ্কিম-কটাক্ষকুশল দৃষ্টিতে কি রূপে প্রতিভাত হয়, উহার মধ্যে কত হাস্যোদ্দীপক অসঙ্গতির উপাদান আছে, 'এভেলিনা' উপন্যাসে তাহা উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই আমোদ গা-ভাসান, তুচ্ছ বিষয়ে আসক্ত। চতুর সমাজের প্রাণস্পন্দনটি এই উপন্যাসে ধরা পড়িয়াছে। ফিল্‌ডিং ও স্মলেট-এ এই অভিজাত বা মধ্যবিত্ত সমাজের স্থূল রুচি ও ইন্দ্রিয়-ভোগাসক্তির যে চিত্র পাই তাহা খোলাখুলি, মোটা তুলিতে ও গাঢ়বর্ণে আঁকা এবং পুরুষের প্রশ্রয়-দাক্ষিণ্য-অভিনন্দিত না হইলেও অর্ধঅনুমোদিত। কিন্তু স্ত্রীলোকের আড়াল হইতে দেখায় সেই একই সমাজ কিরূপ উপহাস্য অসঙ্গতিপূর্ণ ও ছেলেমানুষী খেয়ালে ভরপুর মনে হয় ফ্যানি বার্নের লেখায় তাহাই আমরা বুঝিতে পারি। অবশ্য মিস্ বার্নের যে এই সমাজের সঙ্গে মিল বা সহানুভূতি ছিল না, তিনি যে উগ্র সংস্কারকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা নহে। তিনি এই সমাজেরই একজন, ইহার নৈতিক আদর্শের তিনি অংশীদার; তবে তিনি ইহার অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীভুক্ত নহেন। এই নাটকের তিনি একজন পার্শ্বচরিত্র। তিনি একেবারে বহিরাগত হইলে ও ভিন্ন আদর্শের অনুসারিণী হইলে ইহার এত যথার্থ চিত্র আঁকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। মনে রাখা যাইতে পারে যে, 'এভেলিনা' প্রকাশে ফ্যানি বার্নের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ার পর তিনি রানীর পার্শ্বচরীরূপে নিযুক্ত হন এবং সেই সুবাদে তিনি তখনকার

দিনের অভিজাত সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রথম জীবনেও তিনি ডঃ জনসন, গ্যারিক প্রভৃতির সান্নিধ্য লাভ করেন।

এই সমাজের চিত্রাঙ্কনে, ইহার সংলাপ-বর্ণনায় মিস্ বার্নে যে সূক্ষ্ম দৃষ্টির ও স্বাধীন বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা অনন্য। সামাজিক মেলামেশা ও প্রমোদ-বিহারের উপলক্ষ্যে এই সমাজ-ভুক্ত নারীপুরুষের মধ্যে যে তীব্র প্রত্যাশা ও উত্তেজনার সঞ্চার হইত, নিন্দাকুৎসা-রটনায় তাহাদের রসনা যেরূপ মুখর হইয়া উঠিত, কিশোরীর আনুষ্ঠানিক ভাবে সমাজ-বৈঠকে প্রথম আবির্ভাবের পর, তাহার অনুরাগ-সঞ্চার হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহান্তিক পরিণতি পর্যন্ত তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে কৌতূহল, ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মর্যাদাবোধ প্রভৃতির নানামুখী আন্দোলনের আবর্ত ঘূর্ণিত হইত, সমস্তই এই উপন্যাসে অত্যন্ত চতুরতা ও জীবনরসোচ্ছলতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এই সমাজ-চিত্রণে নারীমনের প্রথম পরিচয়, তাহার জীবন-দৃষ্টিভঙ্গিমার বৈশিষ্ট্য সাহিত্যিক অভিব্যক্তি পাইয়াছে। ইহার কিছু পরে জেন অস্টেন এই পথ ধরিয়াই অগ্রসর হন ও সাহিত্যের নানাকক্ষসমন্বিত প্রাসাদে নারীর একটি নিজস্ব আবাসস্থান চিরতরে নির্ধারিত করেন।

জেন অস্টেন (Jane Austen : ১৭৭৫—১৮১৭) : মিস্ বার্নের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসপ্রবণতা আরও পরিশোধিতরূপে, আরও পরিণত বিকাশে, জেন অস্টেনে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু মিস্ বার্নের সঙ্গে জেন অস্টেনের কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্যও আছে। মিস্ বার্নে কেতা-দুরস্ত ধনী ও প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ; এবং এই সম্প্রদায়ের রুচি ও জীবনাদর্শই তাঁহার জীবনদর্শনে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার রচনাকে খানিকটা সঙ্কীর্ণ ও অনুদার করিয়াছে। জেন অস্টেন কিন্তু একেবারে খাঁটি গ্রাম্য মধ্যবিত্ত সমাজের অধিবাসিনী ; ইহার জীবননীতি সুস্থ ও স্বাভাবিক, কোন কৃত্রিম আদর্শে দুষ্ট বা আড়ম্বরপ্রিয় আচাররীতির প্রভাবে স্বধর্মচ্যুত নহে। পল্লীবাসী মানুষ—ভদ্র গৃহস্থ, ধর্মযাজক, ছোটখাট জমিদার বা ব্যবসায়ী—যেরূপ সুস্থ, এবং অপেক্ষাকৃত কৃত্রিমতামুক্ত জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, যেরূপ ক্ষুদ্র আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য-নিশ্চিন্ততাকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে, বুদ্ধিমান ও নির্বোধ লোকের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা-প্রসূত বিচারের মানদণ্ড প্রয়োগ করে, যে হিসাবী মনোভাবকে প্রশংসা ও বে-হিসাবী মতিগতিকে নিন্দা করে, তাহাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে যে চারিত্রিক দোষত্রুটি লক্ষ্য করা যায়, জেন অস্টেনের উপন্যাসে সেই সমাজ-মানসেরই নিখুঁত চিত্র পাই। তাঁহার উপন্যাসে কয়েকটি পরিবার দীর্ঘকাল একত্রবাসের ফলে উৎসবে, বনভোজনে, বল-নাচে, আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণে ও প্রত্যেকের বাড়ীতে যথেচ্ছ

গতিবিধির জন্য পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-সূত্রে আবদ্ধ হয়। ইহারা সৌজন্য-শিষ্টাচার, সামাজিক রীতি ও আচরণের একটা বিশেষ আদর্শে বিশ্বাসী ও এই আদর্শের মানদণ্ডেই পরস্পরকে বিচার করিয়া থাকে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাঙলার পল্লীজীবনের অনুরূপ চিত্রই আমরা এখানে পাই। এবং সেই জন্যই জেন অস্টেনের উপন্যাসের রস আমাদের এখানের কোনো কোনো মহিলা ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের রসের মত। জেন অস্টেনের উপন্যাসে কোন নূতন অতিথি বা স্বল্পকালস্থায়ী বাসিন্দার আগমনে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এই নবাগতদের সম্বন্ধে নানা কল্পনা-জল্পনা, নানারূপ কৌতূহল উদগ্র হইয়া উঠে; বিশেষ করিয়া বিবাহযোগ্যা কন্যার জননীগণ ইহাদের জামাতৃরূপে লাভের সম্ভাবনায় বিশেষ ঔৎসুক্য পোষণ করেন। এই সঙ্কীর্ণ, বৈচিত্র্যহীন, অতিপরিচিত পল্লীজীবনে চরিত্রের ছোট-খাট দোষ-ত্রুটি বিকশিত হইবার সুযোগ পায়। কাহারও বা চরিত্রে আত্মাভিমান বেশী, কেহ বা কাহারও সম্বন্ধে অহেতুক বিরাগ পোষণ করে, কেহ বা খুব মিশুক, কেহ বা আত্মকেন্দ্রিক। এই সমস্ত বিচিত্র চরিত্রের পারস্পরিক মিলনসংঘাতে ক্ষুদ্র পল্লীজগতে যে জীবননাট্য জমিয়া উঠে, যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ-প্রীতি-বিদ্বেষের লীলা অভিনীত হয়, তাহার সমস্ত রসটুকু জেন অস্টেনের জীবন-দর্শনের দণ্ডে মন্থিত হইয়া তাঁহার উপন্যাসের ক্ষুদ্র পাত্রটিকে কানায় কানায় পূর্ণ করে ও আমাদিগকে তুচ্ছ উপাদানের রন্ধন-নৈপুণ্য-জাত স্বাদুতা-উপভোগের প্রচুর অবসর দেয়।

জেন অস্টেনের উপন্যাসগুলি সংখ্যায় অল্প ও আয়তনে ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহাদের শিল্পরূপ একেবারে নিখুঁত। 'সেন্স এ্যাণ্ড সেন্‌সিবিলিটি' (Sense and Sensibility : ১৮১১), 'প্রাইড এ্যাণ্ড প্রেজুডিস' (Pride and Prejudice : ১৮১৩), 'ম্যান্‌সফিল্ড পার্ক' (Mansfield Park : ১৮১৪), 'এম্‌মা' (Emma : ১৮১৬), 'নর্থাঙ্গার এ্যাবি' (Northanger Abbey : ১৮১৮) ও 'পারসুয়সেন' (Persuasion : ১৮১৮)—ইহাই তাঁহার রচনার সম্পূর্ণ তালিকা।

মিস্ বার্নের সহিত তুলনায় জেন অস্টেনের আর একদিক দিয়াও শ্রেষ্ঠত্ব আছে। বার্নের নীতি অনেকটা রিচার্ডসনের মত সুবিধাবাদী—বিবাহের দ্বারা বৈষয়িক উন্নতি করাই উহার প্রধান লক্ষ্য। জেন অস্টেনে এই সুবিধাবাদ ততটা প্রকট নহে। তাঁহার নায়ক-নায়িকাদের ধন বা বংশ-মর্যাদার দিকে যতটা আকর্ষণ আছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আকর্ষণ আছে মনের ও রুচির মিলের দিকে। অবশ্য রোমান্টিক যুগের লেখকদের মত আত্মোৎসর্গকারী প্রেম বা উন্নত-আদর্শগত,

আবেগময় অভীপ্সা জেন অস্টেনে নাই। তথাপি তাঁহার রুচি ও বিবেকবুদ্ধি যে বিশুদ্ধতর, তাঁহার প্রেম যে বাস্তব-মিলনাকৃতি-প্রসূত, কোন হীন-উদ্দেশ্যজাত নহে, তাহা স্বীকার করিতেই হবে। বার্নের ভাবাতিশয্য হইতেও জেন অস্টেন মুক্ত; বিবাহটা যে ঠিক মিষ্টান্নের মত লোভনীয় নহে, উহার সম্ভাবনায় যে একেবারে ভাবে বিগলিত ও আত্মহারা হওয়া মর্যাদাহীন—নারীর এই মোহমুক্তিবোধ প্রথমে জেন অস্টেনের উপন্যাসেই দেখা যায়।

জেন অস্টেন তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রদিগকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে, যেন একটা প্রয়াসহীন সহজ সংস্কারের বশেই, উপলব্ধি করিয়াছেন। অবশ্য পরবর্তী যুগের মত সত্তা-রহস্যের অতল গভীরে অবতরণ করার চেষ্টা তিনি করেন নাই; কিন্তু বাহির হইতে তাহাদের আচরণ ও বিভিন্ন উপলক্ষে তাহাদের মানস প্রতিক্রিয়া অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাদিগকে একটা সুসঙ্গত সামগ্রিকতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আত্মরতির সূক্ষ্ম জটিলতা, দেমাক ও স্বার্থপরতার প্রচ্ছন্ন প্রকাশ তাঁহার চোখে অভ্রান্তরূপে ধরা পড়িয়াছে ও তাঁহার মৃদু অথচ প্রায়-প্রশ্রয়শীল তিরস্কারের পাত্র হইয়াছে। এই সমস্ত দোষত্রুটি মানবপ্রকৃতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ ও ইহাদিগকে স্বীকৃতি দিয়াই সংসার-যাত্রা চালাইতে হইবে এইরূপ মনোভাবই যেন তাঁহার রচনার স্থায়ী মেজাজ। তবে তাঁহার রচনা যে ক্ষমাধর্মী তাহাও নহে। চরিত্র ও ব্যবহারের অসঙ্গতির দিকে তাঁহার দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং এই সমস্ত অসঙ্গতিকে তিনি সর্বদাই অকুণ্ঠিত, যদিও মৃদুভাবে, ব্যঙ্গ করিয়াছেন। এই দিক হইতে জেন অস্টেন রোমান্টিক যুগের লেখিকা হইলেও, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে অগাষ্টানদের সমগোত্রীয়।

তাঁহার চরিত্রাবলীর মধ্যে নারী-চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি শ্রেণীপ্রতিনিধিত্বমূলক হইলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। তিনি একদিকে যেমন একনজরে অন্তর-রহস্যের সবটুকু অনুভব করেন, তেমনি অপরদিকে ছোট ছোট ইঙ্গিতের নিপুণ সন্নিবেশে, রং ও রেখার যথাযথ প্রয়োগে, দক্ষ চিত্রশিল্পীর মত অন্তরের বহিঃপ্রকাশসমূহকে ছবির ন্যায় ফুটাইয়া তোলেন। প্রতিভার স্বভাবজ অন্তর্দৃষ্টি ও শিল্পীর আয়াসসাধ্য চিত্রাঙ্কন—তাঁহার উপন্যাসে এই উভয় গুণের চমৎকার সমন্বয় হইয়াছে। বাহিরের ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের যোগ, জীবনের স্বচ্ছন্দ বহিঃপ্রবাহের সহিত অন্তর্মুখীনতার মৃদু আবর্তের যুগপৎ প্রকটন, গল্পের সহজ আকর্ষণের সহিত মনস্তত্ত্বের জটিলতর ওঠাপড়ার সামঞ্জস্য-সাধন, ও সমস্ত আখ্যায়িকার এক সুসঙ্গত, আতিশয্যমুক্ত, শিল্পসৌষ্ঠবময়

রূপায়ণ—ইহাই জেন অস্টেনের কৃতিত্বের নিদর্শন। জীবনের হাস্যরস-প্রধান দিকটি, চরিত্রের কৌতুকাবহ অসঙ্গতি তিনি অপূর্ব সংযম, প্রসন্ন স্বীকৃতি ও মৃদু ব্যঙ্গের সাহায্যে চমৎকারভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক স্কট বলিয়াছিলেন যে, জেন অস্টেন দুই ইঞ্চি হাতীর দাঁতের ফলকে অনবদ্য কারুকার্য ক্ষোদিত করিয়াছেন, যদিও তিনি নিজের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সমাজ-সমালোচনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকার, হৃদয়াবেগের বিধিদত্ত স্বাধীনতা প্রভৃতি নিজ অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত বিষয় লইয়া কখনই শক্তির অপব্যয় করেন নাই। রোমান্টিক ভাব-কৌলীন্যের সহিত জেন অস্টেনের বিশেষ মিল ছিল না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত তিনি সাধারণ জীবনে দিব্য মহিমা আবিষ্কার করিতে না পারিলেও মানবিক রসের উপভোগ্য উৎস উন্মোচন করিয়াছিলেন। তাঁহার 'নর্থাঙ্গার এ্যাবি'-তে তিনি গথিক উপন্যাস লেখকদিগের রহস্যলোক সৃষ্টি করার ও অতিপ্রাকৃত ভীতি সংস্কারকে সুড়সুড়ি দিয়া পাঠক ভোলানোর অপচেষ্টার ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

সার ওয়াল্টার স্কট (Sir Walter Scott : ১৭৭১-১৮৩২) : রোমান্টিক যুগের শ্রেষ্ঠ ও প্রতিনিধিস্থানীয় ঔপন্যাসিক হইলেন স্কট। স্কট অবশ্য মধ্যযুগীয় জীবন লইয়া গাথাকাব্য রচয়িতা হিসাবে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন কিন্তু বাইরনের গাথাকবিতা অধিকতর জনপ্রিয় হওয়ায় তিনি কবিতা ছাড়িয়া উপন্যাস লেখার দিকে মন দেন। স্কট ঐতিহাসিক উপন্যাসের জনক। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যে একটি প্রাণসূত্রের যোগ আছে, অতীত যে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, সূক্ষ্মভাবে বর্তমানের মধ্যেই জীবিত—এই চেতনা স্কটের মধ্যে প্রবল ছিল এবং ইহাই তাঁহার অতীতের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত উপন্যাসগুলির মুখ্য প্রেরণা। তিনি মধ্যযুগকে দেখিয়াছেন উচ্চ আদর্শনিষ্ঠ, জীবনরসভূয়িষ্ঠ, নানা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নর-নারীর দ্বারা অধ্যুষিত ও কৌতূহলী জনসাধারণের বিহার-ভূমিরূপে।

স্কটের মধ্যযুগের জীবনবৃত্তান্ত শুধুমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা-ভিত্তিক নহে, ইহা তাঁহার মধ্যযুগের সহিত আত্মিক সহমর্মিতার ফসল। মধ্যযুগের হৃৎস্পন্দন তাঁহার নিকট সমকালীন জীবনের মতই সুপরিচিত ছিল, সুতরাং তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার অন্তর-লোক হইতে স্বতঃ-উৎসারিত। মধ্যযুগ তাঁহার নিকট প্রাণযাত্রাসমারোহে উজ্জ্বল, জীবন্ত চিত্রসমষ্টি ছিল বলিয়াই তিনি উহাকে আমাদের নিকট এত জীবন্তভাবে উপস্থাপিত করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার নিকট অতীত ও বর্তমানের মধ্যে বাহিরের কিছু রীতি-নীতি ও আচার-আচরণের পার্থক্য ছাড়া কোনো মূলগত পার্থক্য ছিল না।

কিন্তু এরূপ ধারণা সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। অন্ততঃ এক বিষয়ে মধ্যযুগের অতীতের সহিত আধুনিক যুগের একটা গুরুতর পার্থক্য আছে। মধ্যযুগের জীবন-যাত্রা অনেকটা গোষ্ঠীমনোভাবশাসিত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্ফুরণ সেখানে অনেক কম। একটা সর্বস্বীকৃত জীবনাদর্শ, সমাজের একটা ধর্মকেন্দ্রিক বিন্যাস, আচার-আচরণের একটা সুপ্রতিষ্ঠিত রীতি মধ্যযুগের জীবনযাত্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এই দৃঢ় কাঠামোর মধ্যেই জীবনপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত ছিল। ব্যক্তিত্বকে ছাপাইয়া তখন প্রতিবেশেরই প্রাধান্য ছিল। সেইজন্য সাধারণভাবে স্কটের মানবচরিত্র-বিশ্লেষণ প্রধানত প্রতিবেশনির্ভর, যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন নহে। ব্যক্তি-রাজা মুকুট-মহিমা, ক্ষাত্রবীর্য, লৌহবর্ম ও বীরোচিত আদর্শের ও জনসাধারণ বদ্ধমূল প্রথার অন্তরালে আত্মগোপন করিত। প্রেম ছিল বীরাচারের অনুষঙ্গী ও মোটামুটি একটা মামুলী ব্যাপার। কাজেই স্কটের মানবচিত্রগুলি প্রায়ই শ্রেণীদ্যোতক গুণাবলীরই সমষ্টি। ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশ, ব্যক্তিরহস্যের অকুণ্ঠিত অভিব্যক্তি উহাদের মধ্যে বিরল। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে এরূপ ঘটিয়াছে তাহা নহে। রানী এলিজাবেথ, রাজা প্রথম জেমস্, একাদশ লুই ও বার্গাণ্ডির ডিউক, সাহসী চার্লস্—স্কটের হাতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবের অনন্যতা লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছেন। আবার, তাঁহার কৃষক, মজুর, যাযাবর, চোরাই মালের ব্যবসায়ী, সৈনিক, ভদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থ প্রভৃতি তাহাদের জীবনরসপ্রাচুর্য, সংলাপের গ্রাম্য সরসতা, আচরণের স্বাধীনতা, আবেগের অকৃত্রিম প্রকাশ,—এক কথায় স্বভাবের অকুণ্ঠিত অনুবর্তনের জন্য পাঠকের মনে চিরস্থায়ী আসন অধিকার করে।

কিন্তু মধ্যস্তরের ব্যক্তিদের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। সম্ভ্রান্তবংশীয় নায়ক-নায়িকা, বীর ও বীরাঙ্গনা, ধর্মযাজক ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেকটা প্রাণহীন। তাঁহাদের প্রেমচিত্র বর্ণহীন, মামুলি ও কৃত্রিম রীতির আদর্শে আড়ষ্ট। তাঁহার সম্ভ্রান্তবংশীয় নায়ক-নায়িকা প্রেমনিবেদন-ব্যাপারে একেবারে সাহিত্যিক ছক অনুসরণ করেন। তাঁহার আইভ্যানহো ও রাওয়েনার সমস্ত আচরণ ও সংলাপ শ্রেণীপ্রতিনিধিত্বমূলক; তাঁহাদের নিজেদের ব্যক্তিগত কথা বড় একটা শোনা যায় না। কিন্তু সেই উপন্যাসেই রেবেকা ঘৃণিত ইহুদী জাতির মেয়ে হওয়ায় তাহার অবস্থা-বৈগুণ্যের জন্য অনেকটা প্রাণবন্ত হইয়াছে। Richard Coer de Lion বা 'সিংহবিক্রম রাজা রিচার্ড' তাঁহার লৌহ শিরস্ত্রাণের অন্তরালে তাঁহার মুখাবয়ব ও অন্তঃপ্রকৃতি উভয়কেই আচ্ছাদিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, স্যাক্সন জাতির প্রতিনিধি কেড্রিক ও লক্‌উড কৃত্রিম

সৌজন্যরীতির দ্বারা আবদ্ধ না হওয়ায় সজীব ব্যক্তিরূপে প্রতিভাত হন। যেখানে উচ্চবংশীয় ব্যক্তির চরিত্রে কোন দুর্বলতা বা আচরণের কোন অসাধারণত্ব আছে সেখানে স্কটের সৃজনী-শক্তি আত্মবিকাশের সুযোগ পাইয়াছে। 'কেনিলওয়ার্থ' (Kenilworth)-এ তাঁহার লিস্টার ও সাসেক্স এই দুই অভিজাত সন্তান পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তেজনায়, রানী এলিজাবেথের অনুগ্রহভাজন হইবার জন্য কূটনীতি প্রয়োগে, জীবন-মরণ দ্বন্দ্বে, আদর্শনীতির দ্বিধাগ্রস্ত উল্লঙ্ঘনে বিশেষ প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার 'ব্রাইড অব ল্যামারমুর' (Bride of Lammermoor) উপন্যাসের র‍্যাভন্‌স্‌উড-অধীশ্বর খানিকটা অতি-নাটকীয় হইলেও, তাঁহার নিয়তিবিড়ম্বিত অবস্থা, নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও মর্যাদা-রক্ষার ব্যর্থ প্রয়াস ও প্রেমের ব্যাপারে ভাগ্যবিপর্যয়ে এক অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইয়াছেন। এই ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মধ্যশ্রেণীর চরিত্র-চিত্রণে স্কট কোথাও বা সফল হইয়াছেন, কোথাও বা অসাফল্য বরণ করিয়াছেন। যেখানে শ্রেণীগত আদর্শের আড়ালে সম্পূর্ণ মানুষটি চাপা পড়ে নাই, সেখানেই স্কটের প্রতিভা নিজস্ব দীপ্তিতে উজ্জ্বল।

স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রাচীন তথ্য এবং আধুনিক কল্পনা ও মানবতা-বোধের সুষ্ঠু সংমিশ্রণে গঠিত এক নূতন সৃষ্টিপ্রকরণ। আধুনিক যুগে আমাদের সত্যনিষ্ঠার দাবী অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিয়াছে এবং স্কট যে কল্পনাপ্রয়োগের দ্বারা জ্ঞানের স্বল্পতাকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ন্যায্যতা সম্বন্ধে আমরা সন্দেহ পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার আদর্শে বর্ধিত হইয়া আমরা এই জাতীয় কল্পনাপ্রধান অতীত-পুনরুজ্জীবনকে ভেল্কিবাজির পর্যায়ে ফেলি ও ইহার ইন্দ্রজালের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে দ্বিধা বোধ করি। বর্তমানে অবশ্য আবার ঐতিহাসিক উপন্যাসের পুনরভ্যুত্থান হইয়াছে; কিন্তু এই উপন্যাস পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্যবহুল এবং অনেক সময়েই সাধারণ পাঠকের অধিগম্য নহে। মনে রাখিতে হইবে যে, উপন্যাস পাঠকের কাছে অতীত সম্বন্ধে প্রধান কথা হইল তথ্য-যাথার্থ্য নহে, ইহার প্রাণবেগ-সমর্থিত বিশ্বাসযোগ্যতা। ঔপন্যাসিকের কাছে আমরা সুপরীক্ষিত তথ্যপঞ্জী চাই না, চাই জীবনায়নের কল্পনাপুষ্ট অথচ সুনিশ্চিত প্রত্যয়। এই মানদণ্ডে বিচার করিলে স্কটের উপন্যাসের অসাধারণ সাফল্য অস্বীকার করা যায় না। স্কটের ইতিহাস-পরিধি সুবিস্তীর্ণ-কাল-প্রসারিত, দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইহার সময়-সীমা। ইহার সকল যুগের মধ্যেই আমরা লেখকের ইতিহাস-জ্ঞান ও জীবনানুভূতির সমান পরিচয় পাই। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ

শতকের স্কটল্যাণ্ড-সম্পর্কিত ইতিহাসে স্কটের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও তথ্যনিষ্ঠা খুবই উচ্চাঙ্গের। 'দি হার্ট অব মিডলোথিয়ান' (The Heart of Midlothian) ও 'ওল্ড মর্ট্যালিটি' (Old Mortality) এই উপন্যাসদ্বয়ে সমাজের বস্তুনিষ্ঠ জীবন, ব্যক্তি-চরিত্রের সুগভীর অনন্যতা ও বৃহত্তর ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও গতিবেগ অপূর্বভাবে সমন্বিত হইয়াছে। স্কটল্যাণ্ডের কৃষকদের জীবনযাত্রা তাহাদের গভীর ধর্মবোধ, এবং প্রথমটিতে তাহাদের আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে জীবনাবেগের আশ্চর্য প্রকাশ এবং দ্বিতীয়টিতে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের তীব্র দ্বন্দ্ব ও ধর্মোন্মাদের বিকার আমাদিগকে ইতিহাসের এক প্রাণোচ্ছল এবং সংঘাতমুখর জীবননিষ্ঠ রূপের সহিত পরিচিত করে।

দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত ও বিভিন্ন দেশ-সম্বন্ধীয় ইতিহাস-কাহিনী অবশ্য স্কটের এতটা গভীর ও অন্তরঙ্গ যুগচিত্ত-পরিচয়ের নিদর্শন বহন করে না। এই সময়ের ইতিহাস সম্বন্ধে স্কটের একটা মোটামুটি জ্ঞান ছিল। এবং এই জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া ও কয়েকটি বিশিষ্ট সংঘটনকে অবলম্বন করিয়াই তিনি অনেকটা শেক্‌স্‌পিয়ারের টেম্পেস্ট-নাটকবর্ণিত প্রস্‌পারোর মত, তাঁহার জাদুদণ্ড-সঞ্চালনে মায়াসৌধ-পরম্পরা নির্মাণ করিয়াছেন। আমাদের বাস্তববোধ ইহাদের সম্পূর্ণভাবে স্বীকার না করিলেও ইহাদের মোহের নিকট আমরা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করি। ইহাদের চরিত্রের অজস্র বৈচিত্র্য, ঘটনাপ্রবাহের দ্রুত গতিবেগ, রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির উদ্ভাবনা, ও এই সমস্তের মধ্য দিয়া লেখকের সহজসংস্কারলব্ধ জীবনবোধ ও উদার, সমবেদনাস্নিগ্ধ জীবনদর্শনের প্রকাশ আমাদের এমনভাবে মুগ্ধ করে যে, আমরা বিচারবুদ্ধি-প্রয়োগের অবকাশই পাই না। ইহাদের মধ্যে ঘটনার আকস্মিকতা, যোগসূত্রের ক্ষীণতা, অতিপ্রাকৃতের প্রভাব, কার্যকারণ শৃঙ্খলার স্বাভাবিক গতির ছন্দপাত ঘটায়; কিন্তু তবুও সংস্কারমুক্ত মন লইয়া বিচার করিলে ইহাদিগকে অনিবার্য যুগজীবনসম্ভব পরিণতি বলিয়াই মনে হইবে।

ইতিহাস-মহাবৃক্ষের তলায় যাহাদের বাস, যৌথ জীবনের সর্বসাধারণ ধর্মশালা যাহাদের আশ্রয়, ব্যক্তিত্বের সুদৃঢ় দুর্গে যাহারা বহিঃপ্রভাব হইতে সুরক্ষিত নহে, তাহাদের জীবন দুর্বিপাক-ঝটিকা দ্বারা বিধ্বস্ত হইবেই। আধুনিক কালে যেমন রাজনৈতিক ও ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মামলা-মোকদ্দমার মাধ্যমে অধিকার-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা জীবন-প্রেরণার অনিবার্য প্রকাশ, মধ্যযুগে ঠিক তেমনি যুদ্ধবিগ্রহ ও দৈবনির্ভরতা জীবনকে আকস্মিকতার পথে পরিচালিত করিত; ঘটনার দুর্নিবার আকর্ষণ ও সমাজের সর্বসম্মত প্রভাবের বিরুদ্ধে ব্যক্তিবিশেষের প্রতিরোধ সেরূপ

কার্যকরী ছিল না। কাজেই মধ্যযুগের জীবনযাত্রার সহজ ছন্দ স্কটের উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক যথার্থতার সহিতই অনুসৃত হইয়াছে।

এই মনস্তত্ত্ব আধুনিক যুগের মনস্তত্ত্ব নহে, কিন্তু স্কটবর্ণিত যুগে জীবনের পথ ও জীবনরথের গতিছন্দ ছিল বিভিন্ন। স্কটের পরে জীবনের মোড় ঘুরিয়াছে, জীবন ব্যক্তিসত্তার প্রায়-অসপত্ন নিয়ন্ত্রণে বাহিরের পরিধি সঙ্কুচিত করিয়া অন্তর-রহস্যের গভীরে আত্মনিমজ্জন করিয়াছে। এবং আমরা এখন এই নিগূঢ়পথচারী জীবনকে বুঝিবার নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি। সেইজন্য স্কট এখন বালক-বালিকাদের ঔপন্যাসিক বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য মহাদেশের কৈশোর ও যৌবনলীলা আমরা স্কটের উপন্যাসে যেরূপ প্রতিবিম্বিত দেখি, এই অন্তর্মুখী অকালপ্রৌঢ়ত্বের যুগে তাহা আর কোন দিনই দেখিব না। স্কট রোমান্সকে কবিকল্পনা হইতে উদ্ধার করিয়া অতীতের বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও রোমান্টিকতা যে জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরবর্তী যুগে যদিও ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা পরিত্যক্ত হয় নাই, তথাপি স্কটের পদ্ধতির অনুসরণ বড় একটা দেখা যায় না। কাজেই স্কটের প্রভূত শক্তি ও সমকালীন জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও উপন্যাস-সাহিত্যের বিবর্তনে তিনি যে অনেকটা ব্যতিক্রমধর্মী ছিলেন তাহা অনস্বীকার্য।

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অনেকটা স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। তবে বঙ্কিমের ইতিহাসজ্ঞান স্কটের তুলনায় অপ্রচুর ছিল। বাঙলা ও ভারতের ইতিহাসের তথ্যগত অপূর্ণতার জন্যই উভয়ের মধ্যে এই তারতম্য অনিবার্য। বঙ্কিমের উপন্যাসে ইতিহাস আরও বেশী কল্পনানুরঞ্জিত ও আদর্শধর্মী। কিন্তু স্কটের সহিত তুলনায় বঙ্কিমের চরিত্রসৃষ্টি ও হৃদয়াবেগ প্রকাশ অনেক বেশী সত্যনিষ্ঠ ও গভীরতর স্তর হইতে উদ্ভূত। বঙ্কিমের উপন্যাসে ইতি-হাসের রোমান্স গৌণ ; ধর্মসাধনাসম্পৃক্ত ও ভাবাদর্শপ্রসূত রোমান্সই মুখ্য। বঙ্কিম হয়ত Talisman বা Quentin Durward লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি 'কপালকুণ্ডলা', 'চন্দ্রশেখর' ও 'আনন্দমঠ'-প্রমুখ যে গীতিমূর্ছনাময় ও ধর্মাদর্শমূলক রোমান্স লিখিয়াছেন তাহা স্কটের পক্ষে কখনই সম্ভব হইত না।

রোমান্টিক যুগে সাময়িক **সাময়িক সাহিত্য পত্রিকার অভ্যুদয়** সম্বন্ধেও দু'চার কথা বলা প্রয়োজন। আডিসন ও স্টীলের 'ট্যাটলার' ও স্পেক্‌টেটার'-এ সাময়িক পত্রিকার যে সূচনা, ডঃ জনসন ও গোল্ডস্মিথের মাধ্যমে তাহার ধারা

অব্যাহত থাকে। লে হাণ্টের The Examiner বা 'পরীক্ষক' এই ধারারই বাহক। 'দি এগ্‌জামিনার' রাজনীতি ও সাহিত্যাশ্রয়ী পত্রিকা ছিল। তদানীন্তন রাজশক্তির নিকট নতিস্বীকার না করায় এবং নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার জন্য লে হাণ্টকে রাজ-নির্যাতন সহ্য করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার পত্রিকার মাধ্যমে সে যুগের বহু প্রথম শ্রেণীর লেখককে তিনি দর্শকদের সম্মুখে হাজির করান। কীট্‌স্‌, ল্যাম্ব, হ্যাজলিট ইহারা সকলেই কোনো-না-কোনো সময়ে লে হাণ্টের সহিত সংযুক্ত ছিলেন।

কিন্তু রোমাণ্টিক যুগের বিশেষ অবদান ম্যাগাজিন (Magazine) ও রিভিউ (Review)। রিভিউতে শুধুমাত্র সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক সমালোচনা থাকিত। ম্যাগাজিনগুলিতে সমালোচনা তো থাকিতই, তাহার উপর থাকিত কবিতা হইতে শুরু করিয়া সকল প্রকারের সৃজনশীল সাহিত্য—সাময়িক পত্রিকায় উপন্যাস প্রকাশের রীতি অবশ্য সে যুগে চালু হয় নাই।

রিভিউর মধ্যে বিখ্যাত হইতেছে The Edinburgh Review ('এডিনবরা রিভিউ', ১৮০২) এবং The Quarterly Review ('ত্রৈমাসিক রিভিউ', ১৮০৯)। প্রথমখানি প্রথমের দিকে রক্ষণশীলদের হাতে থাকিলেও পরে প্রগতিপন্থীদের হাতে চলিয়া যায় ; দ্বিতীয়টি পুরাপুরি রক্ষণশীলদের কাগজ। রাজনীতির কথা ছাড়িয়া দিলে, সাহিত্য সম্বন্ধে ইহাদের মত অত্যন্ত স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ ছিল। সকল কালের সকল সাহিত্যই ইহাদের উপজীব্য হইলেও, সমসাময়িক সাহিত্য বিচারের জন্যই ইহাদের খ্যাতি বা অখ্যাতি বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। 'এডিনবরা রিভিউ' হ্রদ অঞ্চলের কবিদের বিরোধিতা করিয়া খ্যাতি অর্জন করে। দীর্ঘকাল ধরিয়া ইংলণ্ডের বহু মনীষী এই পত্রিকায় লিখিয়াছেন। পরবর্তী যুগে কার্লাইল, মেকলে, ম্যাথিউ আর্নলড, এমন কি প্রধানমন্ত্রী গোল্ডস্মিথ পর্যন্ত ইহার লেখকগোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা বাহির হয় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। 'ত্রৈমাসিক'-এর লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন স্যার ওয়াল্টার স্কট, সাদে এবং পরবর্তী যুগে লর্ড ক্যানিং, গ্ল্যাডস্টোন প্রভৃতি। এই পত্রিকাখানিতেই স্কটের সমালোচনা জেন অস্টেনকে সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে ; আবার এই পত্রিকায় কীট্‌সকে যে তীব্র সমালোচনা করা হয়, অনেকের মতে, তাহাই কীট্‌সের অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী।

ম্যাগাজিনের মধ্যে বিখ্যাত দুইটির নাম—Blackwood's Edinburgh Magazine ('ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিন', ১৮১৭) ও The London Magazine ('লণ্ডন ম্যাগাজিন', ১৮২০)। প্রথমটি ছিল রক্ষণশীলপন্থী এবং ল্যাম্ব, হ্যাজলিট, লে হাণ্ট প্রভৃতির ঘোরতর শত্রু। দ্বিতীয় পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল মাত্র নয় বৎসর

হইলেও, ইংরাজী সাহিত্যে ইহার অবদান কম নহে। ল্যাম্ব, হ্যাজলিট, ডি কুইন্সি, কবি টমাস হুড প্রভৃতি সাহিত্যিকের সৃষ্টির কৃতিত্ব বহুলাংশে এই লণ্ডন ম্যাগাজিনেরই প্রাপ্তব্য।

রোমান্টিক যুগের প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে, এই যুগের রচনায় বিস্ময়কর প্রাচুর্য ও সরসতা সত্ত্বেও ইহা পরবর্তী যুগের প্রতিকূল সমালোচনা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। ম্যাথিউ আর্নল্ড ইহার বিরুদ্ধে মননশক্তির অপ্রাচুর্যের অভিযোগ আনেন। তাঁহার মতে, ইহার জীবন-আলোচনার মধ্যে চিন্তাশীলতা নাই, আছে কল্পনাবিলাস। আধুনিক অতিবাস্তবতার যুগে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরও প্রবল হইয়াছে—ইহার অবাস্তবতা, পলায়নী মনোবৃত্তি, সমস্যা-বিমুখতা অভিযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আসল কথা এই যে, মানব-মন আদর্শবাদ ও বাস্তবপ্রিয়তা এই উভয় বিপরীতমুখী বিন্দুর মধ্যে আন্দোলিত হইয়াছে। আদর্শবাদ-প্রণোদিত কল্পনার পরিণতি যদি হয় শেলীতে, অবিমিশ্র বাস্তবতার পরিণতি Eliot (এলিয়ট)-এর The Waste Land বা 'মরুপ্রান্তর'-এ। এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান বুদ্ধি দ্বারা সম্ভব; কিন্তু সাহিত্যের বিচারে ইহা দুই বিপরীতধর্মী মনোভঙ্গীর প্রকাশ। বর্তমান যুগে দ্বিতীয় মনোভঙ্গীর প্রভাব প্রবল হওয়ায়, রোমান্টিক যুগের আবেদন অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য একথা পশ্চিমী দেশগুলি সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের রোমান্টিক কবিরা আজও বিশেষ জনপ্রিয়।

রোমান্টিক যুগের বিরুদ্ধে আধুনিক সমালোচকের সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করিয়াও ইহার মহনীয়তা ও রূপবৈচিত্র্যে নিঃসংশয় শ্লাঘা অনুভব করা যায়।

সপ্তম অধ্যায়

ভিক্টোরীয় যুগ

(১৮৩২—১৯০০)

১

ইংরাজী সাহিত্যে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দকেই ভিক্টোরীয় যুগের সূচনা বলিয়া ধরা হয়। অবশ্য ভিক্টোরিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সেই হিসাবে আপাতদৃষ্টিতে এই নামকরণকে অসমীচীন মনে হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেমন এক রাজার মৃত্যু এবং নূতন রাজার অভিষেক নূতন যুগের সূচনা করে, সাহিত্যে তেমন নহে। নানা কারণে আমরা সাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন যুগের উল্লেখ করি বটে, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে সর্বদাই—কখনও বা সবার অলক্ষ্যে, ধীরে ধীরে, কখনও বা প্রবল গতিতে—পরিবর্তনের স্রোত বহিয়াই চলিয়াছে এবং এক যুগের শেষ কয় বৎসরের সহিত পরবর্তী যুগের প্রথম কয় বৎসরের প্রভেদ অনুভব করা অনেক সময়েই কঠিন হইয়া পড়ে। সাহিত্যের রথী মহারথীগণও সিংহাসনের অধিকারী পরিবর্তনের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন না। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রাণী এলিজাবেথ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন, কিন্তু শেক্‌স্‌পিয়ারের ম্যাকবেথ, ওথেলো, হ্যামলেট প্রভৃতি সমস্ত নাটকই তাহার পরে রচিত হয় এবং তাহারা আজও সাধারণ্যে এলিজাবেথীয় নাটক বলিয়া পরিচিত।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে শাসনসংস্কার আইন পাস হয়। এই আইন একদিকে যেমন যুগচেতনা উন্মেষের ফল, অপর দিকে তেমনি ইহা পাস হইবার পরে যুগচেতনা একটি নূতন মোড় নেয় এবং এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ১৮৩২-কে সাহিত্যে ভিক্টোরীয় যুগের সূচনাকাল বলা হয়।

এলিজাবেথীয় যুগের সহিত সপ্তদশ শতাব্দীর যেরূপ সম্বন্ধ, রোমান্টিক যুগের সহিত ভিক্টোরীয় যুগের সম্বন্ধ অনেকটা সেই রকমই। উভয় ক্ষেত্রেই পূর্বগামী যুগে যে অভূতপূর্ব কল্পনার ঐশ্বর্য কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, পরবর্তী যুগে তাহাই নানা শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ ও মন্দীভূত হয় এবং নূতন উপকরণ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সংসর্গে আসিয়া ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। উভয়ত্রই অব্যবহিত অতীতের সহিত সম্বন্ধ অস্বীকার করা হয় নাই—বরং উহারই সঞ্চিত মূলধন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া নানা নূতন বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহৃত হইয়াছে। শেক্‌স্‌পিয়ারের কল্পনাসম্পদের উত্তরাধিকার যেমন ডান ও দার্শনিক কবি-গোষ্ঠীর

(metaphysical poets) মধ্যে খণ্ডিত ও কতকটা বিকৃতরূপে ক্রিয়াশীল, তেমনি রোমান্টিক যুগের মৌলিক প্রেরণা টেনিসন্, ব্রাউনিং ও ম্যাথিউ আর্নল্ডের মধ্যে ক্ষীণ ও বিচ্ছিন্নভাবে সংক্রামিত হইয়াছে।

রোমান্টিক যুগের কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য, এই যুগে কবি-মনের উপর তার একাধিপত্য হারাইয়াছে ; রোমান্টিক যুগের সৌন্দর্য-সৃষ্টি ও বর্ণনাপদ্ধতি, এ যুগে আর তেমনভাবে কবির জীবন-দর্শনের সহিত সম্পর্কান্বিত বা তাহার অখণ্ড মানস প্রকৃতির অভিব্যক্তি নহে। ভিক্টোরীয় কবিদের রচনায় ইহা অনেকাংশেই বহিরঙ্গ সৌষ্ঠব, শিল্প-প্রসাধনে পর্যবসিত হইয়াছে। ম্যাথিউ আর্নল্ড মোটামুটি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রকৃতি সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদ অনুসরণ করিয়াছেন—কিন্তু ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের স্থির, আত্মসমাহিত বিশ্বাস ম্যাথিউ আর্নল্ডের ক্ষেত্রে করুণ নৈরাশ্যবাদ ও সান্ত্বনাহীন, অবসাদক্লিষ্ট চিত্তের ব্যথিত দীর্ঘনিঃশ্বাসে রূপান্তরিত। টেনিসনের প্রকৃতি-বর্ণনায় সূক্ষ্ম কারুকার্য ও শিল্প-সৌন্দর্য আছে কিন্তু ইহাতে শেলীর জীবন্ত, নিবিড় অনুভূতির উষ্ণ রক্তপ্রবাহ বা কীট্সের সত্যাশ্রয়ী সৌন্দর্যের অবিনশ্বরতা নাই। শেলীর কল্পনার ঊর্ধ্বাভিযান ও সর্বব্যাপী বিশ্বনিয়ন্ত্রক প্রেম ব্রাউনিং-এর কাব্যে বিশ্লিষ্ট ভাববিলাস ও সাময়িক উচ্ছ্বাসে পরিণত হইয়া নূতন লক্ষ্যাভিমুখী হইয়াছে। ব্রাউনিং শেলীর আদর্শলোক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া বাস্তব জগতের নরনারীর অফুরন্ত বৈচিত্র্যের, প্রেমের ভাবোচ্ছ্বাসের পরিবর্তে ইহার অদ্ভুত মানস প্রতিক্রিয়ার প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন। মনে হয়, যেন শেলীর কল্পনা নূতন প্রতিবেশে, নূতন বাস্তববোধ ও কৌতূহলী মনোভাবের প্রেরণায়, নিজ গতি ও প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়াছে—যে শক্তি আকাশ-বিহারের পক্ষবেগ যোগাইত, তাহাই যেন নিম্নাভিমুখী হইয়া মানবমনের অন্ধকারময় গুহার রহস্যোদ্ভেদের চেষ্টায় প্রযুক্ত হইয়াছে। কীট্সের সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত রূপমোহ ও চিত্র-সৌন্দর্য-কুশলতা Pre-Raphaelite (প্রি-র্যাফেলাইট) কবি-গোষ্ঠীতে একটা বিশেষ-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, সচেতন ভাবমণ্ডল-রচনা ও আঙ্গিক-সৃষ্টির প্রয়াসে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার সহজ এবং অনায়াসলব্ধ শক্তিতে কীট্স কাব্যমন্দিরে যে সৌন্দর্য-প্রদীপ জ্বালিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্তীরা কৃত্রিম প্রচেষ্টায় তাহাকে এক গূঢ় উপাসনা-পদ্ধতির অঙ্গীভূত আরতি-বর্তিকায় রূপান্তরিত করিয়া বায়ুমণ্ডলকে ধূপধূনার সুরভিত ধূমে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করিয়াছেন—এই বদ্ধ বায়ুতে আমরা যে সৌন্দর্য-মায়া অনুভব করি তাহা যেন জীবনের স্পন্দনরহিত, মৃত্যুর শীতল-স্পর্শজড়িত। সুইনবার্ন শেলীর গীতি-প্রতিভার অধিকারী ; কিন্তু শেলীর গীতি-কবিতায় যে গভীর

হৃদয়াবেগ ও আন্তরিকতার স্পর্শ পাই, তাহার পরিবর্তে সুইনবার্নে পাই অপরিমিত ও অনেক সময়ে অর্থহীন উচ্ছ্বাস।

ভিক্টোরীয় যুগে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রোমান্টিক যুগের সৌন্দর্যপ্রবণ মনোভাবের সঙ্গে কয়েকটি নূতন উপাদান ও বিশেষ একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী যুক্ত হইয়াছে। এই যুগে গণতন্ত্র ও বিজ্ঞান সাহিত্যের উপর নূতন প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে এবং উদ্দেশ্যমূলক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশঃ নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রেরণাকে প্রভাবিত করিতে আরম্ভ করে।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে পার্লামেন্ট-সংস্কারের আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গণতন্ত্রের প্রকৃত অভ্যুদয়ের সূচনা করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেও রাজনৈতিক দলাদলির প্রভাব সাহিত্যে উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—কিন্তু উহার মূল প্রেরণা ছিল দলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্কীর্ণ স্বার্থ। ভিক্টোরীয় যুগে রাজনৈতিক চেতনা দলের পক্ষসমর্থনের স্তর অতিক্রম করিয়া উদার সাম্যবাদ ও নিষ্পেষিত দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতির ধারায় সাহিত্যে আবির্ভূত হয়। সামাজিক বিবেক-বুদ্ধি ও ন্যায়নিষ্ঠতা জাগ্রত হইয়া সাহিত্যের মধ্যবর্তিতায় দরিদ্রের অধিকার-রক্ষার, তাহাদের জীবনের অসহনীয় গুরুভার লাঘব করার মহান প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করে। সাহিত্যে, বিশেষতঃ উপন্যাসে, এই সময়েই শ্রমিক ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনের সমবেদনাপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হইতে আরম্ভ করে। সামাজিক অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য হইয়া ওঠে। ডিকেন্সের উপন্যাসসমূহ নানাবিধ সামাজিক দুর্নীতি ও শাসন-ব্যবস্থার অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে একদিকে তীব্র শ্লেষ, অন্যদিকে ভাবার্দ্র করুণরস উদ্দীপন করে। থ্যাকারে অভিজাত-সম্প্রদায়ের ভণ্ডামি ও নৈতিক দুর্বলতার প্রতি নির্মমভাবে কশাঘাত করিয়া আভিজাত্যমোহের মূলোচ্ছেদ করেন। জর্জ ইলিয়ট সাধারণ অবস্থার নরনারীর জীবনে অসাধারণ ভাব-গভীরতা ও প্রবৃত্তি-সংঘর্ষ উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহাদের সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

রাস্কিন, মরিস প্রভৃতির রচনা সমাজতন্ত্রবাদের নূতন প্রেরণা, সমাজ-ব্যবস্থায় নূতন সৌন্দর্য ও নীতিবোধ প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পাঠককে সচেতন করিয়াছে। এমন কি, যে কার্লাইল গণতন্ত্রের বহির্ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, ভোটের দ্বারা যোগ্যতা-নির্ণয়ের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে যাঁহার কোনো আস্থাই ছিল না, যিনি একমাত্র বিধিনিয়োজিত ঐশ্বরিকগুণসম্পন্ন বীরের প্রতি নির্বিচার নেতৃত্ব অর্পণের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনিও তাঁহার সমর্থিত স্বেচ্ছাচারকে অমোঘ নীতি-

নিষ্ঠা ও কারুণ্যস্নিগ্ধ সহানুভূতির সিংহাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। বিশিষ্ট গদ্য-লেখকদের মধ্যে ম্যাথু আর্নল্ড ও নিউম্যান এই দুইজনের রচনায় গণতন্ত্রের প্রভাব অবশ্য সেরূপ লক্ষণীয় নহে। আর্নল্ড সংস্কৃতি ও শিষ্টাচারের উপর অতিরিক্ত জোর দিয়া জীবন হইতে সমস্ত অশোভন উগ্রতা, সাফল্যের জন্য উৎকট আগ্রহ এবং গণতন্ত্রের ইতর রুচিবিকার ও সুষমাবোধের অভাবকে নির্বাসিত করিতে চাহিয়াছেন। নিউম্যান ধর্মযাজক ও শিক্ষাব্রতীর শান্ত, নিস্তরঙ্গ বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, গণতন্ত্রের মূলসূত্র যে স্বাধীন চিন্তার অধিকার তাহা পর্যন্ত অস্বীকার করিয়াছেন, ও সমস্ত ভুলভ্রান্তির অতীত নির্বিচার গুরুবাদের নিরাপদ দুর্গে শেষ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মধ্যযুগসুলভ মনোবৃত্তিকে এই আধুনিক যুগে আহ্বান করিয়াছেন।

গণতন্ত্রের পর বিজ্ঞানের প্রভাব ভিক্টোরীয় সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। সপ্তদশ শতাব্দীতে রয়্যাল সোসাইটি-র স্থাপন ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুক্তিবাদ-মূলক মনোভাবের প্রতিষ্ঠা এই বৈজ্ঞানিক প্রভাবের ক্রমপ্রসারের নিদর্শন। তবে অষ্টাদশ শতকে কবিতা বিজ্ঞানের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয় নাই; কাব্যের মধ্যে শুষ্ক যুক্তিবাদের প্রাদুর্ভাব অভাবাত্মক লক্ষণ, স্বভাবাত্মক নহে। গভীর ভাবাবেগের অভাবই এই যুগের কাব্য-রচনাকে আলোচনাধর্মী করিয়াছে, বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির প্রত্যক্ষ প্রভাব নহে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার—ডারউইনের বিবর্তনবাদ—সমস্ত সাহিত্যিক চিন্তাধারার প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। অর্থাৎ এই সময়ে বিজ্ঞানের প্রভাব কাব্যের ও কবিমনোভাবের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে—বিশ্বজগৎ ও নৈতিক জীবনের ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে কবির ধারণাকে সম্পূর্ণ নূতন পথে লইয়া গিয়াছে।

এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ভিক্টোরীয় যুগের টেনিসন, ব্রাউনিং ও ম্যাথিউ আর্নল্ডের মত প্রধান কবিদের মধ্যে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। টেনিসন তাঁহার বন্ধু আর্থার হালামের মৃত্যু সম্বন্ধে রচিত In Memoriam বা 'স্মরণে' কাব্যে বিশ্ববিধানের নীতি ও জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহা বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সংশয়জড়িত। ভগবানের আশ্বাসবাণী ও বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য উভয়ে মিলিয়া তাঁহার মনে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা উনিশ শতকের শেষার্ধের পূর্বে সম্ভবই হইত না। এই অনিশ্চয়াত্মক মানস পরিস্থিতি অবশ্য সব সময়ে গীতি-কবিতার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল প্রতিবেশ রচনা

করে নাই—পরিপূর্ণ নির্ভর ও একনিষ্ঠ আদর্শের অভাবে এই সময়ের কাব্যকে অনেক সময়েই ক্ষুণ্ণ ও প্রতিহত হইয়াছে। কল্পনা, বিশ্বাস ও জিজ্ঞাসু মন সমস্ত তালগোল পাকাইয়া যেন একটা জগাখিচুড়ি হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য এই কাব্যের দার্শনিক মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না এবং ইহা আধুনিক মনের সন্দেহনিরসন ও পথনির্দেশের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ব্রাউনিংএর উল্লসিত, সংশয়লেশহীন আশাবাদ, জীবনের অবিচ্ছিন্ন প্রগতিতে তাঁহার অবিচল আস্থাও ধর্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ব্রাউনিংএর মননশীলতার আতিশয্য—যুক্তিতর্কের উপর অসাধারণ অধিকার ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য—নিঃসংশয় ভক্তিবাদের বা বিশ্বনিয়ন্তার উপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতার সহিত খাপ খায় না। মনে হয় যে, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ, জীবনের মধ্যে আনন্দ ও অগ্রগতির সম্ভাবনা আবিষ্কার করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত হইতে নূতন প্রেরণা ও গতিবেগ আহরণ করিবার চেষ্টা করিলেও সফল হইতে পারিতেছে না। 'ভগবান স্বর্গ হইতে পৃথিবীকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতেছেন' এই উৎসাহ-দীপ্ত আশার বাণীর মূলে কোন গভীর অধ্যাত্ম অনুভূতি নাই, আছে এক সহজলভ্য, আনন্দময় মনোভাব।

যে বিজ্ঞান টেনিসন ও ব্রাউনিংএর কাব্যাভিব্যক্তিকে কখনও বা দ্বিধা-কুণ্ঠিত, কখনও বা প্রাণশক্তি-সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহা ম্যাথিউ আর্নল্ডের ক্ষেত্রে গভীর অবসাদ ও নৈরাশ্যবাদের ছায়া-বিস্তারের হেতু হইয়াছে। তিনি বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসের সহিত বিজ্ঞান-প্রভাবের ভাটার টানে মানবজীবনের কূল হইতে আস্তিক্যবাদ-সমুদ্রের দূরাপসরণ লক্ষ্য করিয়াছেন। বিশ্বাসের স্রোতোবেগ সরিয়া যাওয়াতে জীবনের উপকূলে খানিকটা কর্দমাক্ত, উপলবিকীর্ণ বালুকাবিস্তার উদ্‌ঘাটিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য-সুষমার হানি করিয়াছে। তাই তিনি জীবনে আঁকড়াইয়া ধরিবার কোন নিশ্চিন্ত আশ্রয় পান না—তাঁহার জীবনে উদ্দেশ্য ও আদর্শবাদের মূলও যেন শিথিল। অতীতের আদর্শ নষ্ট হইয়াছে, বর্তমান এখনও সূতিকাগারের ভ্রূণাবস্থা হইতে পরিণতি লাভ করে নাই; এই অরাজকতার যুগে তাঁহার মন উদ্‌ভ্রান্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাই তিনি অতীতের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন; বর্তমানের বিশৃঙ্খল ও নিয়ত পরিবর্তনশীল কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে কোন স্বস্তি পান না। আধুনিক মনের এই মূঢ় বিক্ষেপ, এই উদ্‌ভ্রান্ত লক্ষ্যহীন গতি, গভীর আবেগ ও বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠার সহিত এই দ্বন্দ্ব, ম্যাথিউ আর্নল্ডের কবিতায় কাব্যলোকের অমরতা লাভ করিয়াছে।

ইহা ছাড়া এই যুগে বিজ্ঞান আরও নিগূঢ় ও ব্যাপক ভাবে সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কবির উপমা-নির্বাচন ও প্রকৃতি-বর্ণনাও বহুলভাবে বিজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। কাব্যের ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যেও অধিকতর বস্তুনিষ্ঠা লক্ষিত হয়। ব্রাউনিং আদিম সভ্যতা, মধ্যযুগ ও রেনেসাঁস যুগের মনোভাবের বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে, বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস-আলোচনার সাহায্যে, তাঁহার কবিতায় প্রতিফলিত করিয়াছেন। নৃতত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে অর্ধবর্বর মানুষের মনে অতিপ্রাকৃত শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রথম সচেতনতা, ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রথম বিকৃত ধারণার স্ফুরণ তিনি অতি সুন্দর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। ঔপন্যাসিকদের মানব-চরিত্র-বিশ্লেষণ, ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকের তথ্যালোচনা সমস্তই এই সর্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সাক্ষ্য দেয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আশা করিয়াছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে 'বিজ্ঞানের ভাবোত্তেজিত মুখশ্রী' কবিতার কর্তৃত্বাধীনে আসিবে। এ আশা এখনও সফল হয় নাই; কিন্তু উহার বিপরীত সম্ভাবনা—কাব্যের মুখশ্রী ও অন্তঃপ্রেরণার উপর বিজ্ঞানের সন্ধানী আলোর নিক্ষেপ—ভিক্টোরীয় যুগে বহুলাংশে সার্থকতা লাভ করিয়াছে ইহা বলা যাইতে পারে।

ভিক্টোরীয় যুগে ইংরাজের সাম্রাজ্য-বিস্তার ও শিল্প-বাণিজ্য-প্রসার চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইহারই ফলে ইংরাজের মনে সাম্রাজ্যবাদের গর্ব ও সাফল্যের যে আত্মপ্রসাদ অনুভূত হয় সাহিত্যে সেই মনোভাবেরও ছাপ পড়িয়াছে। রেনেসাঁসের যুগে উচ্চাভিলাষ কল্পনার লঘুপক্ষে ভর করিয়া সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখার উর্ধ্বে উঠিয়াছে, ও তরুণ মনের স্বপ্নলীলামণ্ডিত হইয়া সাহিত্যে অপরূপ সুষমার সৃষ্টি করিয়াছে; রোমান্টিক যুগে যাহা আদর্শবাদের সৌন্দর্যে অভিষিক্ত ও সীমাহীন অগ্রগতির আশায় উৎফুল্ল হইয়া অপার্থিব-জ্যোতিঃমণ্ডল-বেষ্টিত হইয়াছে, ভিক্টোরীয় যুগে সেই একই প্রবৃত্তি বাস্তব সার্থকতার সঙ্কীর্ণ কারাগারে বন্দী হইয়া, রাজ্যবিস্তার ও ধনার্জনের সুলভ আত্মতৃপ্তিতে পর্যবসিত হইয়া, নিজ উদার সম্ভাবনা ও অসীমের প্রতি আকূতি হারাইয়াছে। ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ কাব্যবীণার ঝঙ্কারে একটা স্থূল বস্তুতন্ত্রতার সুর লাগিয়াছে; ভাষা ও ভাবের স্বচ্ছতা, উহাদের অধ্যাত্ম সাঙ্কেতিকতা ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য যেন একটা স্থূল মালিন্যে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। কাব্যের দিগন্তরেখা সাচ্ছল্যের তৃপ্তিতে সীমিত হইয়া দৃষ্টির বাধাহীন প্রসারকে অবরুদ্ধ করিয়াছে; সঙ্গীতের সূক্ষ্মতম অনুরণনগুলি জীবনযুদ্ধে বিজয়-ঘোষণার রূঢ় আত্মপ্রত্যয়ে বিলীন হইয়াছে। উনবিংশ শতকের একেবারে শেষের

দিকে কিপলিং-এর সাম্রাজ্যবাদের দম্ভস্ফীত কবিতা এই মনোভাবের চরম অভিব্যক্তি ; কিন্তু টেনিসন, ব্রাউনিং, ম্যাথিউ আর্নল্ডের কবিতাতেও ইহারই তীক্ষ্ণ উত্তর বায়ু তাহাদের কাব্য-শতদলকে অনেকটা শীর্ণ ও প্রাণহীন করিয়াছে। যে প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিগোষ্ঠী এই সমসাময়িক রূঢ়তার হাত এড়াইবার জন্য বর্তমানকে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া অতীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পলায়নী মনোবৃত্তির আতিশয্য, সৌন্দর্যের বিস্মৃতিময় জাদুমন্ত্রে আত্মসমর্পণের অতিব্যগ্রতা ও পরোক্ষভাবে এই যুগপ্রভাবেরই সাক্ষ্য দেয়। সুইনবার্ন ইতালীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের যে প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন তাহাতে সংগ্রামের তীক্ষ্ণতা একেবারেই নাই ; তাঁহার প্রেম-কবিতার সৌন্দর্যমত্ততা ও শিথিল, এলায়িত বিলাস-বিভ্রম রাজনৈতিক কবিতাতেও বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। ইয়েট্‌সের গোধূলিম্লান কেল্‌টিক সৌন্দর্যলোকে আশ্রয়-গ্রহণও যুগপ্রভাবের প্রতিক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভিক্টোরীয় যুগের স্থূল কর্মসাফল্যের মধ্যে একটা প্রতিকূল প্রভাব ছিল যাহা শাশ্বত বিশ্বজনীন কবিতা সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নহে।

২

কাব্য

টেনিসনকে (Alfred Tennyson : ১৮০৯—১৮৯২) ভিক্টোরীয় যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি বলা হয়। ভিক্টোরীয় মনোবৃত্তির নূতন প্রবণতা,—উহার গণতন্ত্র, বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ও সঙ্কীর্ণ আত্মপ্রসাদ, উহার আদর্শবাদহীন সৌন্দর্যপ্রিয়তা সমস্তই তাঁহার কবিতায় প্রতিফলিত হইয়াছে। টেনিসন খণ্ড গীতি-কবিতার কবি ; বড় কাব্য রচনার চেষ্টা করিলেও সেই রচনায় তাঁহার কল্পনা নির্ভরযোগ্য দৃঢ়তা দেখাইতে পারে নাই। তাঁহার প্রথম বয়সের রচনার মধ্যে তাঁহার সৌন্দর্য-সৃষ্টির নবীনতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। The Princess বা 'রাজকুমারী' কবিতায় তিনি নারীজাতির অধিকার সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া কল্পনার মাত্রা ও মনোভাবের ঐক্য সব সময়ে ঠিক রাখিতে পারেন নাই—মধ্যযুগ ও আধুনিক কাল, কৌতুক ও গাম্ভীর্যের মধ্যে দোলায়িত হইয়াছেন। ভাবের গাম্ভীর্য না থাকিলেও কবিতাটির ছন্দমাধুর্য উপভোগ্য। In Memoriam বা 'স্মরণে' নামক কাব্যে তাঁহার দার্শনিক বিচারপদ্ধতির অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। দৃশ্যতঃ একটি কবিতা হইলেও, ইহা দীর্ঘদিন ধরিয়া (১৮৩৩-৫০) রচিত বহু ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি। তবে সমস্তটিই একছন্দে লিখিত এবং সমস্ত

কবিতাগুলিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁহার মৃত বন্ধু আর্থার হালামের সহিত সংশ্লিষ্ট। Idylls of the King ('ইডিল্‌স্ অব দি কিং')-এ তিনি প্রাচীনযুগের আদর্শ রাজা আর্থারের বিষয়ে মহাকাব্যের মত একটা দ্বাদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থেই তাঁহার কবিত্বশক্তির দৈন্য ও বৃহৎ পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার অক্ষমতা শোচনীয়ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। প্রথমতঃ রাজা আর্থার মধ্যযুগের আদর্শচ্যুত হইয়া ভিক্টোরীয় যুগের সঙ্কীর্ণ নৈতিক আদর্শের অঙ্গীভূত হইয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ তাঁহাকে দৃঢ়ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, রক্তমাংসের মানুষ অপেক্ষা কতকগুলি অস্পষ্ট, অশরীরী ভাবসমষ্টির আধার বলিয়া মনে হয়। তৃতীয়তঃ কাব্যটির মধ্যে একটা অর্ধ-প্রচ্ছন্ন রূপক-ব্যঞ্জনা ইহার মানবিকতার হানি করিয়াছে, এবং ইহার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আদর্শ-সংঘাতের বাস্তব তীব্রতা ছায়ালোকে বিলীন হইয়াছে। মহাকাব্যের অখণ্ড ঐক্য ও ঋজু মেরুদণ্ড ইহার একেবারেই নাই—বিভিন্ন খণ্ডাংশগুলির আপন আপন স্বতন্ত্র সত্তা ও রস-আবেদন কোন বৃহত্তর সংহতির মধ্যে পরিণতি লাভ করে নাই।

কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-কবিতা রচনায় ইংরাজী সাহিত্যে টেনিসনের দোসর মেলা ভার। তাঁহার অনেকগুলি গীতিকবিতাই অনবদ্য শিল্পসৌন্দর্যে চমৎকার পালিশ-করা রত্নের ন্যায় ভাস্বর; অনেকগুলিতে মানব-চিত্তের কোন বিশেষ ভাবরূপ—উৎসাহ, অবসাদ, স্বপ্নময় আবেশ, অতীত-পর্যালোচনার সুখদুঃখ-সমাকুল, মিশ্র মনোভাব, ধর্মবিশ্বাস-দীপ্ত মৃত্যু-বরণ—নিখুঁত অভিব্যক্তি লাভ করিয়া পাঠকের মনে স্মরণীয়ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

গীতিকবিতা ছাড়াও টেনিসন অমিত্রাক্ষর ছন্দে বেশ কয়েকটি কাহিনীকাব্য লেখেন। ইহাদের মধ্যে Enoch Arden ('এনক্ আর্ডেন') ও Dora ('ডোরা') সমধিক প্রসিদ্ধ। টেনিসন রাজকবি (Poet Laureate) ছিলেন বলিয়া সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লইয়াও তাঁহাকে কবিতা লিখিতে হইত। এই জাতীয় কবিতার মধ্যে The Charge of the Light Brigade ('লাইট ব্রিগেডের আক্রমণ') ও The Revenge ('রিভেঞ্জ' নামক জাহাজের নিমজ্জন উপলক্ষে রচিত গাথা)—এই দুইটি কবিতা সাময়িক ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও কাব্যরসোত্তীর্ণ। ছন্দ ও ধ্বনি-প্রবাহের উপর টেনিসনের অসাধারণ অধিকার তিনি যে কত বড় কাব্যশিল্পী ছিলেন তাহার প্রমাণ—ইহাদের সহিত ভাবগভীরতা ও কল্পনার ঐশ্বর্যের সমন্বয় হইলে তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন। তাঁহার কবিতার মধ্যে ভাবের গভীরতা বা

মননশীলতার অভাবের জন্য বর্তমানে অবশ্য অনেক সাহিত্যসমালোচক টেনিসনকে প্রথম শ্রেণীর কবি পর্যন্ত বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, যদিও তাঁহার কাব্যের ছন্দোমাধুর্য সর্বজনস্বীকৃত।

যুগধর্ম এক হইলেও রচনা-রীতি ও শিল্পকৌশলে ব্রাউনিং (Robert Browning : ১৮১২-১৮৮৯) টেনিসন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। টেনিসনের মসৃণ ধ্বনিমাধুর্য ও প্রথাবদ্ধ আলঙ্কারিকতা ব্রাউনিংএ একেবারেই নাই। ব্রাউনিং কবিতার বহিঃসুষমা ও গীতিঝঙ্কার বিষয়ে একেবারেই নিস্পৃহ ও উদাসীন—কথ্য রীতির কর্কশতা, আকস্মিকতা ও প্রকাশ-ভঙ্গীর দুর্বোধ্য সংক্ষিপ্ততাই তাঁহার কবিতার বিশেষত্ব। তিনি ইচ্ছাপূর্বক পাঠকের সৌন্দর্যরুচিকে বিপর্যস্ত করিয়া কবিতার বাহিরের সৌষ্ঠবের দিক হইতে তাহার মনকে কবিতার অর্থগভীরতার দিকে আকৃষ্ট করিতে চাহেন। তাঁহার প্রেম সম্বন্ধীয় কবিতাতে তিনি প্রেমের চিরন্তন ভাবালুতা ও সৌন্দর্যাসক্তির আলোচনা করেন নাই—প্রেমের তীব্র অভিজ্ঞতা যে মানস বিপর্যয় ঘটায়, যে চিত্তবিকারের সৃষ্টি করে তাহারই কৌতূহলোদ্দীপক মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ তাঁহার আলোচ্য বিষয়। এক এক কবিতায় মনঃসমীক্ষণের এক এক নূতন অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কোথাও বা প্রেমের অসম্পূর্ণতার মধ্যে এক নূতন জীবন-দর্শনের উপলব্ধি প্রেম-কবিতায় দার্শনিকতার গৌরব আরোপ করিয়াছে (Two in the Campagna, 'প্রান্তরে দুজন')। কোনো কবিতায় এক বিকৃত-মস্তিষ্ক প্রেমিক তাহার চলচ্চিত্ত প্রেমিকার শ্বাসরোধে মৃত্যু ঘটাইয়া তাহাদের প্রেমকে চিরন্তন করিয়া এক অদ্ভুত আত্মপ্রবঞ্চনা-মিশ্র আত্মপ্রসাদে পূর্ণ (Porphyria's lover, 'পরফিরিয়ার প্রেমিক')। অন্য এক কবিতায় এক প্রত্যাখ্যাতা প্রণয়িনী তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে বিষপ্রয়োগে হত্যার জন্য এক রাসায়নিক পরীক্ষাগারে উপনীত হইয়াছে—বিষ প্রস্তুত হইবার অবসরে তাহার কথাবার্তার ভিতর দিয়া তীব্র ঈর্ষার যে বিষাক্ত ঝলক উদ্গীরিত হইয়াছে আমরা যেন তাহার ঝাঁজ নিজ নাসারন্ধ্রে অনুভব করি (The Laboratory, 'রাসায়নিকের কাছে')। বিলুপ্ত সভ্যতার প্রতীক এক ধ্বংসবিলীন মহানগরীর পটভূমিতে দুই প্রকারের প্রেমলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। একটিতে নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তির ধূসর বিস্মৃতির মধ্যে নবীন প্রেমের তীব্র আগ্রহ দীপ্ত শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে; ধ্বংসের মধ্যে নূতন সৃষ্টির বীজ-বপন হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে পরিত্যক্ত বিশাল প্রান্তরের মধ্যে উদ্ভিদ্-জীবনের অপরিমিত বিস্তার প্রেমের বন্য, দুর্বার শক্তির উদ্বোধন করিয়াছে; কিন্তু জীবনী-শক্তির এই উদ্দাম প্রাচুর্যের মধ্যে অপ্রতিবিধেয় ব্যর্থতার করুণ সুর গুঞ্জরিত

হইয়াছে। মানবের ক্ষুদ্র হৃদয় ও প্রেমের অসীম বিস্তার—এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের অসম্ভাব্যতা চিত্তকে পীড়িত করিয়াছে (Love among the Ruins, 'ধ্বংসের মাঝে প্রেম')। আর একটি কবিতায় হতাশ প্রেমিক তাহার প্রণয়িনীর সঙ্গে শেষবার ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার নৈরাশ্যবোধকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া এক নূতন আশাবাদে উদ্দীপ্ত হইয়াছে—পরলোকের অসীম সম্ভাবনার মধ্যে জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষতি-ক্ষোভ নূতন অর্থগৌরবে ভরিয়া উঠিয়াছে (The Last Ride Together, 'শেষ বিহার')। এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে ব্রাউনিংএর প্রেম-কবিতার বৈচিত্র্য ও বহুমুখীনতার কিছু ধারণা জন্মিবে।

ইহা ছাড়া, ব্রাউনিং এক অভিনব art-form (বা কলা-প্রকরণ) Dramatic Monologue বা 'আত্মবিশ্লেষণমূলক' নাটকীয় স্বগতোক্তির-র উদ্ভাবন করিয়াছেন। এগুলি ঠিক নাটক নয়, কেননা ইহাদের মধ্যে ঘটনার কোন ঘাত-প্রতিঘাত নাই ; যা কিছু আলোড়ন তাহা সমস্তই চিন্তারাজ্যের। দ্বিতীয়তঃ এগুলিতে কোন কথোপকথন নাই ; ইহারা একজন বক্তারই উক্তি, যদিও দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি এবং তাহার আপত্তি ও মানস প্রতিক্রিয়ার অদৃশ্য প্রভাব এই আত্ম-পরিচয়ের প্রত্যেকটি স্তর নিয়ন্ত্রিত করে। এই জাতীয় কবিতাগুলি মনের গহন স্তরে পরস্পর-বিরোধী ভাবের সমাবেশ, নানা জটিল প্রবৃত্তি-সূত্রের সমন্বয়ের চিত্র হিসাবে, লেখকের নাটকীয় শক্তি ও অসাধারণ মনস্তত্ত্ব-কুশলতার পরিচয় দেয়। অনেকগুলি কবিতায় ইটালীতে মধ্যযুগ ও রেনেসাঁসের প্রথম যুগের মানুষের মানস পরিস্থিতির চমৎকার ছবি ফুটিয়াছে। এই সমস্ত যুগের সংস্কৃতির মধ্যে সৌন্দর্যোপাসনা ও শিক্ষানুরাগের সঙ্গে হিংস্র, বর্বর মনোবৃত্তি ও নৈতিক শিথিলতার কি অদ্ভুতপ্রকারের সংমিশ্রণ ছিল তাহা অনেকগুলি কবিতায় স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। একটি কবিতাতে (My Last Duchess বা 'মৃত্যোমৃতা স্ত্রী') এক সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী ভিন্নদেশীয় দূতের সঙ্গে বিবাহের কথাবার্তা চালাইতে চালাইতে নিজ সৌন্দর্যরুচির আত্মশ্লাঘাপূর্ণ পরিচয়দানের মধ্যে, সামান্য একটু হাসিখুশি ও মেলামেশার আতিশয্যের জন্য তাঁহার পূর্ববর্তী প্রণয়িনী কেমন করিয়া নিঃশব্দে জীবন-যবনিকার অন্তরালে সরিয়া গিয়াছে, তাহার ক্রূর, ভয়াবহ ইঙ্গিত দিয়াছেন। এক মৃত্যু-শয্যাশায়ী ধর্মযাজক (The Bishop Orders his Tomb, 'কবর কেমন হবে') তাঁহার অবৈধ-প্রণয়োদ্ভূত পুত্রদের নিকট আপনার অন্তিম ইচ্ছা ব্যক্ত করার প্রসঙ্গে এক অদ্ভুত রকমের মিশ্র মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে। তাহার মৃতদেহ মন্দির-প্রাঙ্গণের কোন্ ছায়াস্নিগ্ধ, শান্ত কোণে সমাহিত হইবে, তাহার উপর কেমন

রত্নখচিত স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিতে হইতে, স্তম্ভের উপর কিরূপ খাঁটি লাটিনে লেখা স্মারকলিপি উৎকীর্ণ হইবে, এবং এই সমস্ত ব্যবস্থাই যেন তাহার এক মৃত প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত তুলনায় উন্নততর রুচির পরিচয় দেয়—ইত্যাদি বিষয়ে এই মরণপথের যাত্রীটি অতি ব্যাকুল অস্বস্তির সহিত ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত খুঁটিনাটি নির্দেশ দিয়াছে। এই সমস্ত নির্দেশ ও অভিলাষ-প্রকাশের মধ্য দিয়া মধ্যযুগসুলভ ধর্মজীবনের এক কৌতুকাবহ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে—মর্ত্যের প্রতিযোগিতা স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। যীশুখ্রীষ্টের পুনর্জীবনলাভের অলৌকিক কাহিনী বৈজ্ঞানিক-মনোভাব-সম্পন্ন এক আরব চিকিৎসকের মনে কি প্রবল বিচার-বিমূঢ়তার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আর একটি কবিতার (Karshish, 'কার্শিশ') আলোচ্য বিষয়। সে বিজ্ঞান-সম্মত মানদণ্ডে ইহার বিচার করিতে চেষ্টা করিয়া সমস্যার কোনো মীমাংসাই করিতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত তাহার সমস্ত অবিশ্বাস ও বৈজ্ঞানিক সন্দেহের আবরণ ভেদ করিয়া ভক্তিবাদ ও ঐশী মহিমার রোমাঞ্চিত উপলব্ধি স্ফুরিত হইয়াছে। আধুনিক যুগের সন্দেহবাদী ধর্মযাজক কেমন করিয়া সন্দেহের সহিত নির্বিচার ধর্ম-বিশ্বাসের সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে, তাহা অতি কূট যুক্তিতর্কের সাহায্যে আর একটি কবিতায় (Bishop Blougram's Apology, 'বিশপ ব্লুগ্রাম্‌স্ এ্যাপলজি') আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান কালে কেহই পূর্ণ বিশ্বাসী বা পূর্ণ অবিশ্বাসী হইতে পারে না—সকলেরই মনে আস্থা-অনাস্থা-জড়িত এক পরিস্থিতি, সাদা-কালোয় চিত্র-বিচিত্র সতরঞ্চ-ছক। তাহাই যদি অপরিহার্য হয়, তবে নাস্তিকতা ঘোষণা করিয়া জীবনের সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা নিঃসংশয় বিশ্বাসের দাবী করিয়া লৌকিক প্রতিষ্ঠা-অর্জন বুদ্ধিমানের কাজ। এই সমস্ত যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়া বক্তার মানস-সংস্থানের জটিলতা, তাহার পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারা, তাহার আত্ম-পরিচয়ের বিদ্যুৎঝলক-উদ্ভাসিত ইঙ্গিতগুলি চমৎকার ফুটিয়াছে। ব্রাউনিং কবিতার মধ্যে গদ্যরীতিছন্দ, কথোপকথনের লঘু সরসতা ও অর্ধাবগুণ্ঠিত প্রকাশভঙ্গী ব্যবহার করিয়া এবং ইহাকে চরিত্র-সৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ মননশক্তির বাহন করিয়া কাব্যের পরিধি বাড়াইয়াছেন। এইদিক হইতে দেখিলে ব্রাউনিংকে ডানের উত্তরসাধক বলা যাইতে পারে।

অতি-আধুনিক যুগের কোন কোন কবি ব্রাউনিংকে অনুসরণ করিয়া কাব্যকে প্রথারুদ্ধ আলঙ্কারিতার প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক কবিদের উপর টেনিসন অপেক্ষা ব্রাউনিংএর প্রভাব অনেক বেশী। বর্তমান যুগের সমালোচকদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাউনিংএর মননশীলতার প্রতি সন্দিহান।

তাঁহাদের মতে ব্রাউনিংএর কাব্যালুতা তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীকে অস্বচ্ছ ও তাঁহার দর্শনকে অগভীর করিয়াছে ; অপরপক্ষে তাঁহার দার্শনিকতা তাঁহার কাব্যের স্বতঃস্ফূর্ততাকে ব্যাহত করিয়াছে। ব্রাউনিংএর কবিতার দুর্বোধ্যতা সর্বজনস্বীকৃত, কিন্তু তাঁহার কবিখ্যাতিও অস্বীকৃত নহে।

ম্যাথিউ আর্নল্ড (Matthew Arnold : ১৮২২-১৮৮৮) এই যুগের তৃতীয় বিশিষ্ট কবি। ছন্দকুশলতায় টেনিসন ও দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণে ব্রাউনিং-এর সমকক্ষ না হইলেও নিছক কাব্যকৃতিত্বে আর্নল্ডের স্থান এই দুই কবিরও উপরে। প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতায় আর্নল্ড ওয়ার্ডসওয়ার্থের উত্তরসূরী, কিন্তু প্রেমের কবিতায় ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার নিজের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। রোমান্টিক কবিদের উচ্ছ্বাস, বিক্ষোভ বা বেপরোয়া ভাব ম্যাথিউ আর্নল্ডে নাই, তাহার পরিবর্তে আছে অবশ্যম্ভাবী বিরহের একটি বিষাদকরুণ মধুর স্বীকারোক্তি। ইংরাজী সাহিত্যে আর্নল্ডকে নিঃসঙ্গতাবোধ বা বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রথম কবি বলা যাইতে পারে। বিদেশীনী প্রণয়িনী মার্গারেটের উদ্দেশ্যে রচিত সব কয়টি কবিতাই এই নিঃসঙ্গতা-বোধচিহ্নিত। বিশ্বাসপ্রবণতার ক্ষয় এবং যুক্তিবাদের প্রসারে মানুষের মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হইয়াছে এবং সে নিজেকে জানিবার চেষ্টা না করিয়া উন্মাদের মত অনিশ্চয়তার পিছনে ছুটিয়া মরিতেছে—ইহাও তাঁহার বেশ কয়েকটি কবিতার বক্তব্য। এ জাতীয় কবিতার মধ্যে The Scholar Gipsy ('ভবঘুরে পণ্ডিত') সর্বাপেক্ষা বেশী প্রসিদ্ধ। তাঁহার Thyrsis ('থার্সিস') ও Rugby Chapel ('রাগবি চ্যাপেল') নামক দুইটি শোক কবিতাতে (elegy) তাঁহার মানস-বৈশিষ্ট্য, ও ধূসর দুঃখবাদপ্রবণতা অতি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাহিনীমূলক Shorub and Rustum ('সোরাব-রুস্তম')-ও ইংরাজী সাহিত্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি। পরস্পরের অজান্তে বীর পিতাপুত্রের সংগ্রাম, পিতা-কর্তৃক পুত্রের নিধন এবং তাহার পর সত্য উদ্ঘাটন সমস্তই অতি সূক্ষ্ম, সংযত অথচ দৃঢ় এবং মর্মস্পর্শীভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই কবিতাটিকে একটি ক্ষুদ্র মহাকাব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তাহার পর আছে Pre-Raphaelite (প্রি-রাফেলাইট) কবিগোষ্ঠী। এই কবিগোষ্ঠীতে ছিলেন **রসেটি** (D. G. Rossetti : ১৮২৮-১৮৮২), **মরিস** (William Morris : ১৮৩৪-১৮৯৬), **সুইনবার্ন** (A. C. Swinburne : ১৮৩৭-১৯০৯) এবং রসেটির ভগিনী **কুমারী ক্রিষ্টিনা রসেটি** (C. G. Rossetti : ১৮৩০-১৮৯৪)। ইহাদের মধ্যে অনেকেই একাধারে কবি ও চিত্রকর

ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর বিখ্যাত চিত্রশিল্পী র‍্যাফেলের আবির্ভাবের পূর্বে ইউরোপীয় চিত্রকলায় যে সহজ, সরল রীতি ও বর্ণবৈচিত্র্য অনুসৃত হইত ইঁহারা ইঁহাদের চিত্র এবং কবিতায় সেই রীতি অনুসরণ করিতে মনস্থ করিয়া নিজেদিগকে প্রি-র‍্যাফেলাইট বা র‍্যাফেলপূর্বী বলিতেন। ইঁহাদের বর্ণনাভঙ্গী ও শিল্পরীতির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইঁহারা কবিতার মধ্যে চিত্রকরসুলভ বর্ণোজ্জ্বল্য ও ছবির ন্যায় সুস্পষ্ট রেখা-বেষ্টনী (outline) আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহাদের লেখনী যেন বর্ণ-তুলিকার কাজ করিত; ইঁহারা যেন কবি ও চিত্রকরের শিল্প-প্রণালীর পার্থক্য দূর করিয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইঁহাদের এক একটি বর্ণনা যেন রঙে ঝলমল, দৃঢ় রেখাবন্ধনীতে সুস্পষ্ট, সাঙ্কেতিকতায় রহস্যময় ছবির মত আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অবশ্য এই চিত্র-সৌন্দর্যের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণের জন্য অনেক সময়ে কবিতার অন্যান্য গুণ—ইহার ভাবগভীরতা, গতিবেগ, প্রকাশাতীত আভাসব্যঞ্জনা, ধ্বনি-মাধুর্য প্রভৃতির দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। এই গোষ্ঠীভুক্ত সমস্ত কবি অবশ্য চিত্রসৌন্দর্যের আদর্শ সমান নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করেন নাই—তাঁহাদের আদর্শসাম্য অল্পদিনের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের টানে খণ্ডিত হওয়ায় প্রত্যেকে আপন আপন স্বতন্ত্র পথের পথিক হইয়াছেন। মরিস একদিকে প্রাচীন যুগের মহাকাব্যধর্মী আখ্যায়িকাগুলিকে নিজ কবিতার বিষয়বস্তু করিয়াছেন—ইহাদের সরল মনোভাব ও প্রচণ্ড গতিবেগের মধ্যে চিত্রসৌন্দর্যসৃষ্টির মন্থর আবেশ, বর্ণবিন্যাসের খুঁটিনাটি শিল্পরীতি স্রোতের টানে ভাসিয়া গিয়াছে। আর একদিকে তিনি সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাবে কাব্য, চিত্রকলা প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের চর্চা ছাড়িয়া গৃহসজ্জার সংস্কার-কার্যে, আমাদের সাধারণ গৃহস্থালীর ব্যবস্থায় অবিকৃত সৌন্দর্য-বোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছেন। সুইনবার্নের কবিতায় অপরিমিত উচ্ছ্বাস ও ধ্বনিমাধুর্যের দিকে অতিরিক্ত মনোযোগের জন্য চিত্রসৌন্দর্যের আদর্শ অনেকটা গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। রসেটি ও মিস্ রসেটি—এই দুই ভ্রাতা ভগিনী—শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের গোষ্ঠীর আদর্শে স্থির ছিলেন। ভ্রাতার কবিতায় বর্ণপ্লাবন ও ভগিনীর কবিতায় গোধূলির বর্ণরিক্ততা—উভয়ের মধ্যেই চিত্রকরের তুলির টান, অঙ্কন-প্রতিভার স্পর্শ বেশ লক্ষণীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রসেটির The Blessed Damozel বা 'পরপারের প্রেমিকা' তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা ও তাঁহার বৈশিষ্ট্যের চমৎকার নিদর্শন। মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে উন্নীত প্রণয়িনী অধীর আগ্রহের সহিত তাহার অধোলোকস্থিত প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের প্রতীক্ষা

করিতেছে—স্বর্গের সমস্ত অপার্থিব সৌন্দর্য তাহার চক্ষু হইতে পৃথিবীর প্রণয়ের মোহাবেশ মুছিয়া লইতে পারে নাই। তাহার কল্পনা এই মিলনের স্বপ্নে বিভোর —ত্রিদিবসৌন্দর্যের প্রথম বিস্মিত উপলব্ধির মুহূর্তে সেই তাহার প্রেমিকের পথ-প্রদর্শিকা হইবে এই সুখচিন্তায় তাহার বক্ষ গৌরব-স্ফীত। অবশেষে যখন তাহার দীর্ঘ প্রতীক্ষা নিষ্ফল হইয়াছে তখন সে আর অশ্রুজল রোধ করিতে পারে নাই—স্বর্গের পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে তাহার অন্তরের শূন্যতা আশাভঙ্গের রন্ধ্রপথে অশ্রু-প্রবাহে বিগলিত হইয়াছে। স্বর্গ, এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী মহাশূন্যের বর্ণনায় আমরা কবির ছবি আঁকিবার, অরূপ অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে চিত্রের সুস্পষ্ট রূপ দিবার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাই।

সুইনবার্ন (১৮৩৭—১৯০৯)—প্রথমে প্রি-র‍্যাফেলাইট গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব এত প্রখর ও শক্তিশালী, তাঁহার অনুভূতি এত তীব্র ও সর্বগ্রাসী, তাঁহার কল্পনার উত্তেজনা এত অনিয়ন্ত্রিত যে তাঁহার পক্ষে দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন গোষ্ঠীনীতির আনুগত্য সম্ভব ছিল না। তাঁহার ইন্দ্রিয়াকুলতা চিত্রধর্মী ছিল না, সঙ্গীতধর্মী ছিল। চিত্রের স্থির রেখায় ও সূক্ষ্ম বর্ণবিন্যাসে তাঁহার আবেগমত্ত ছন্দঝঙ্কার ও শব্দধ্বনিতে আবিষ্ট কবি-কল্পনাকে আবদ্ধ রাখা সম্ভব ছিল না। এই ছন্দ-মাতাল কবি শব্দের সঙ্গীতময়তার উপর এত মাত্রাতিরিক্ত জোর দিয়াছেন যে, তাঁহার গীতিকবিতার মধ্যে ভাবের সঙ্গতি ও সংযম বা শিল্পবোধের সার্থক নিয়ন্ত্রণ আবিষ্কার করা দুরূহ। তাঁহার কবিতার মূল উৎস শব্দ-মোহ ও উহার আনুষঙ্গিক বর্ণ ও ধ্বনির আতিশয্য। কবিতার বিষয়বস্তু-নির্বিশেষে উহার রূপায়ণ-পদ্ধতি প্রায় অভিন্ন। কোন সু-নিয়ন্ত্রিত ভাবপরিণতি বা সৌন্দর্যের ক্রম-পর্যায়-লব্ধ চরম বিকাশে তাঁহার কবিতা সার্থকতা লাভ করে না। পাঠ করিবার সময়ে তাঁহার কবিতার ধ্বনিমাধুর্য পাঠকের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। কিন্তু কবিতা শেষ করিবার পর চিন্তা করিয়া দেখিলে পাঠক দেখে যে সে বিশেষ কিছুই পায় নাই। সুতরাং তাঁহার সৌন্দর্যসৃষ্টির মধ্যে একটা আতিশয্যজনিত বিকার আছে বলিলে মোটেই অত্যুক্তি হয় না।

অবশ্য তাঁহার কবিতার এই আপাত-অর্থহীনতার সমর্থনও কেহ কেহ করেন। বলা হয় যে, সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনার অতি-প্রাচুর্যে তাঁহার কবিতা পরবর্তী যুগের সাঙ্কেতিক (Symbolic) ও বিশুদ্ধ-অনুভূতিনিষ্ঠ (Impressionistic) কবিতার পথিকৃৎ। তাঁহার নিসর্গ-কবিতায় একটা নিগূঢ়তর বোধ, একটা দুর্লক্ষ্য অনুভূতি, জীবন-প্রহেলিকার বহুমুখী বিচিত্র ইঙ্গিতময়তা আমাদের মানস-তন্ত্রীতে যেন একটা

অনির্দেশ্য অনুরণন জাগায়। তাঁহার কবিপ্রকৃতিতে এই অতিসূক্ষ্ম সংবেদনশীলতার সঙ্গে একটা সরল পূর্ব-ঐতিহ্যানুগত ভাব-সংস্কারও মিশ্রিত ছিল। তিনি যে সমুদ্র-প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন, ঝটিকার যে দুর্দম বেগ ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে রুক্ষ, নিরানন্দ অবসাদভারে ক্লিষ্ট রূপটি চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে ইংলণ্ডের অতীত ইতিহাস ও যুগযুগান্তর হইতে আগত জাতীয় মানস-প্রবণতার প্রভাব সুস্পষ্ট। কখনও কখনও তাঁহার সুরমত্ততার মধ্যে গভীরতর ভাব-তাৎপর্য ও কলাসংযমেরও পরিচয় মিলে—এই বিরল ব্যতিক্রম-জাতীয় রচনাগুলির জন্য আমরা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ গীতিকবির আসন দিতে বাধ্য হই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার খুব কম কবিতাতেই এই প্রথম শ্রেণীর কাব্যাকৃতির ছাপ তিনি রাখিতে পারিয়াছেন। ইংরাজী কবিতার ছন্দোরীতির উপর অবশ্য তাঁহার বিস্ময়কর অধিকার। আমরা বাঙালী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে ছন্দ-জাদুকর আখ্যা দিয়া থাকি। এই আখ্যা সুইনবার্নের প্রতি আরও সার্থকভাবে প্রযোজ্য। সত্যেন দত্তের ছন্দসাবলীলতা প্রধানত সচেষ্ট ছন্দবিন্যাস ; উহার মধ্যে কোন দুর্বার আবেগের গতিবেগ লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু সুইন্‌বার্ন-এর ক্ষেত্রে তাঁহার জটিলতম ছন্দরীতিও তাঁহার মানস উত্তেজনার অনিবার্য ও অতিস্বাভাবিক কাব্যরূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়।

সুইনবার্ন প্রাচীন গ্রীসের নিয়তিবাদ-প্রভাবিত কাহিনী অবলম্বনে কয়েকটি গীতিপ্রধান নাটক লিখিয়াছেন—উহাদের মধ্যে Atlanta in Calydon ('কালিডনে আটলাণ্টা', ১৮৬৫) সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ইহাতে প্রাচীন গ্রীসের জীবন-যাত্রা ও প্রাণোন্মাদনা গীতিময় ও নাট্যসংঘাতপূর্ণ রূপ পাইয়াছে। কবির জীবনে ইতালীর স্বাধীনতা-আন্দোলন এক নূতন প্রেরণা আনে ; তাঁহার রূপমুগ্ধ ও সঙ্গীত-রস-বিভোর কবিপ্রকৃতি এই মুক্তিসংগ্রামের উন্মাদনায় এক নূতন শক্তি অর্জন করে। কিন্তু মোটের উপর এই নূতন প্রভাবে তাঁহার কাব্যরীতির কোন মৌলিক রূপান্তর সাধিত হয় নাই। তাঁহার A Song of Italy বা 'ইতালির গান' (১৮৬০) ও Songs Before Sunrise বা 'ভোরের গান' (১৮৭১) তাঁহার কাব্য-জগতে খানিকটা ভাব-কুহেলিকা অপসারণ করিলেও কোন নূতন সূর্যোদয়ের সূচনা করে নাই।

এই যুগে কুমারী ক্রিস্টিনা রসেটি ছাড়া আরও দুইজন মহিলা কবির নাম উল্লেখযোগ্য—শ্রীমতী ব্রাউনিং (Elizabeth Barret Browning : ১৮০৬-১৮৬১) ও এমিলি ব্রণ্টি (Emile Bronte : ১৮১৪-১৮৪৮)। ব্রাউনিং-জায়ার কবিতা তাঁহার স্বামীর কবিতার সম্পূর্ণ বিপরীত—ব্রাউনিংএর তাক্ষ

কৌতূহল ও অশ্রান্ত অনুসন্ধিৎসার পরিবর্তে তাঁহার স্ত্রীর কবিতায় রমণীসুলভ আত্মনিবেদন, প্রেমের মধুর আত্মবিলোপ ও ঐকান্তিক আরাধনার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। মনে হয় যেন বৈজ্ঞানিক যুগের সংশয়, গণতন্ত্রবাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও অধিকারসাম্যের দাবী বর্জন করিয়া মধ্যযুগের সাধ্বী পত্নীর একনিষ্ঠতার আদর্শ শ্রীমতী ব্রাউনিংএর কবিতায় সার্থকভাবে মূর্ত হইয়াছে। ব্রাউনিং-দম্পতির পূর্বরাগ ও প্রেমকাহিনী রোমান্সের আদর্শ সুষমার সুরে বাঁধা; এবং যেমন তঁহাদের ব্যক্তিজীবনে, তেমনি তাঁহাদের কাব্যেও এই প্রেম মোহভঙ্গের তিক্ততার দ্বারা অভিভূত না হইয়া তাহার নবীন মাধুর্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এমিলি ব্রন্টি জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় লইয়া তাঁহার কবিতায় কখনও বা নির্ভীক বিদ্রোহ-ঘোষণা করিয়াছেন, কখনও বা আত্মবিস্মৃত কল্পনার আবেশে ক্ষণিক শান্তি আস্বাদন করিয়াছেন।

৩

উপন্যাস

ভিক্টোরীয় যুগকে উপন্যাসের যুগ বলা যাইতে পারে। মনে হয় এই সময়ে যেন সাহিত্যিক মুখ্য প্রচেষ্টা নাটক-ও-কাব্য হইতে অপসারিত হইয়া উপন্যাসের খাতেই প্রবাহিত হইয়াছে। সাহিত্যে ও মনোভাবে বস্তুতন্ত্রতার প্রাধান্য স্বাভাবিক কারণেই কাব্য-ও-তথ্যানুবর্তনে গঠিতদেহ এই মিশ্র ঔপন্যাসিক রূপের দিকেই ঝুঁকিয়াছে। **ডিকেন্স** (Charles Dickens: ১৮১২-১৮৭০), **থ্যাকারে** (W. M. Thackeray: ১৮১১-৬৩), **জর্জ এলিয়ট** (George Eliot: ১৮১৯-৮০), **শার্লট ব্রন্টি** (Charlotte Bronte: ১৮১৬-৫৫), **এমিলি ব্রন্টি** (Emily Bronte: ১৮১৮-৪৮), **মেরিডিথ** (George Meredith: ১৮২৯-১৯০৯), **হার্ডি** (Thomas Hardy: ১৮৪০-১৯২৩) প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকেরা এই যুগের সমাজ-বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞান-প্রবণতা হইতে অনুকূল প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। উপন্যাস যে আধুনিক মনের বহুবিস্তৃত, বিশৃঙ্খল চিন্তা-পরিধির সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি এবং সমাজব্যবস্থার নানাবিধ অসঙ্গতি ও অবিচারের আলোচনা ও বিশ্লেষণের উপযুক্ত বাহন এই যুগেই যেন তাহা প্রথমে অনুভূত ও প্রমাণিত হইল। এই যুগে উপন্যাসের যে ধারা প্রবর্তিত হয়, পরবর্তী যুগে দুই-চারিজন ঔপন্যাসিকের পরীক্ষানিরীক্ষার কথা বাদ দিলে, উপন্যাসে মোটামুটি সেই ধারাই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে।

ভিক্টোরীয় যুগের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ডিকেন্সেরই সৃষ্টি-প্রাচুর্য সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। স্নিগ্ধ পরিহাস-রসিকতা, সহৃদয় সমাজচেতনা, কোমল ভাবপ্রবণতা, কখনও কখনও মাত্রাতিরিক্ত সমবেদনা, খেয়াল-প্রবণ, উৎকেন্দ্রিক চরিত্রসৃষ্টিতে অদ্ভুত নৈপুণ্য ও তীক্ষ্ণ সমাজ-সংস্কার-প্রবৃত্তি—এই সমস্ত উপাদান তাঁহার উপন্যাসে চমৎকার সমন্বয়ে মিলিত হইয়াছে। ডিকেন্সের রচনায় স্থানে স্থানে উদ্ভট কল্পনাও প্রচুর হাসির খোরাক জোগায়। Pickwick Papers ('পিকউইক পেপার্স')-এ (১৮৩৬—১৮৩৭) তাঁহার রচনারীতির বৈশিষ্ট্য প্রথম উদাহৃত হয়। পিকউইক একজন সরল, উদার, আত্মভোলা, জীবনের অভিজ্ঞতাহীন, সদানন্দ বৃদ্ধ। তাঁহার ভুল করার ও প্রতারিত হওয়ার প্রবণতা অসাধারণ, সেইজন্য তিনি পাঠকের উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। অবশ্য এই উপহাসের মধ্যে ঘৃণার ভাব নাই; তাঁহার চরিত্রের উপহাস্যতার সহিত চরিত্রের মাধুর্য ও গৌরব মিলিত হইয়া তাঁহাকে পাঠকের সস্নেহ কৌতুকের পাত্র করিয়া তুলিয়াছে। অনেকে বলেন যে পিকউইক বাস্তব জগতের মানুষই নহেন, তিনি লোকহিতব্রত দেবদূতের মানবিক সংস্করণ; এবং তাঁহার এই অপার্থিব দিকটা চাপা দিবার জন্যই তাঁহার মধ্যে উপহাস্যতার সংযোজনা করা হইয়াছে। অবশ্য ডিকেন্স যে ঐরূপ কোনো অতিসূক্ষ্ম উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিলেন তাহা মনে করিবার কোনো কারণ নাই। ডিকেন্সের অসাধারণ পরিহাস-রসিকতা পিক্উইকের ভৃত্য সাম ওয়েলার ও তাহার পিতা বুড়ো ওয়েলারের কৌতুকপ্রদ, সরস উক্তিসমূহের মধ্যেও অফুরন্ত প্রাচুর্যের সহিত বিকীর্ণ হইয়াছে। অনেক খেয়ালী ব্যক্তির প্রবর্তনে ও নানা হাস্যকর অবস্থার অবতারণায় উপন্যাসটি একটি হাস্যরসের সদাপ্রবাহিত নির্ঝরে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থার যে বিবরণ আছে, তাহা মোটের উপর তথ্যানুবর্তী হইলেও উদ্ভট কল্পনার আতিশয্যের জন্য কতকটা অপরিচিত পরীরাজ্যের কাহিনীর মত শোনায়। 'পিকউইক পেপার্স'কে উপন্যাস বলা উচিত, না এক বিশেষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি কৌতুকপূর্ণ সমাজচিত্রের সমষ্টি বলা উচিত তাহা লইয়া বিতর্কের অবকাশ আছে।

ডেভিড কপারফিল্ড (David Copperfield : ১৮৫০) ডিকেন্সের আর একটি উচ্চাঙ্গের উপন্যাস। ইহা অনেকটা আত্মজীবন-কাহিনীর পর্যায়ভুক্ত। ইহাতে ডিকেন্স অতিসূক্ষ্ম একটি অন্তরালের আশ্রয়ে নিজ বাল্য ও কৈশোর জীবনের দুঃখক্লেশপূর্ণ, কঠোর পরীক্ষার কাহিনী মর্মস্পর্শী করুণ রসে অভিষিক্ত করিয়া পাঠককে শুনাইয়াছেন। বয়স্ক লোকের দয়ামায়াহীন পীড়ন বালকের

কল্পনার ভিতর দিয়া কিরূপ অতিরঞ্জিত আকার গ্রহণ করে, অত্যাচারী নিঃস্নেহ অভিভাবক কিরূপে এই অতিরঞ্জিত অনুভূতির বলে প্রায় রূপকথার রাক্ষসের পর্যায়ভুক্ত হইয়া দাঁড়ায়, উপন্যাসটিতে ত্রুটিহীন মাত্রাজ্ঞানের সহিত তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সমস্ত উপন্যাসটি বালসুলভ কল্পনার অতিরঞ্জন-প্রবণতা, ইহার স্বপ্নে বাস্তবে মেশানো, স্থানে স্থানে প্রখরভাবে উজ্জ্বল, স্থানে স্থানে অপরিচয়ের ছায়াপাতে অস্পষ্ট, খণ্ডিত তথ্যানুভূতি, ইহার অস্বাভাবিকরূপে তীব্র আনন্দ ও বেদনাবোধ, কৈশোর প্রেমের উদ্‌ভ্রান্ত, মদির আবেশ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মানস অবস্থার জীবন্ত সংগ্রহ। এখানে যদিও বেটসি ট্রটউড, মিকবার প্রভৃতির ন্যায় খেয়ালী চিত্রের অভাব নাই, তথাপি মোটের উপর ইহা লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী বলিয়া ভাবগভীরতা ও বাস্তবগুণ, উভয় দিক দিয়াই সমৃদ্ধ। বেহিসাবী, সর্বদাই দুর্দশাগ্রস্ত অথচ সর্বদাই ভবিষ্যৎ সুদিনের আশায় আশান্বিত মিকবার-চরিত্র প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছে। ডিকেন্সের 'অলিভার টুইস্ট'ও অনেকটা এই জাতীয় উপন্যাস। তাঁহার A Tale of Two Cities ('দুই নগরীর কাহিনী') ফরাসী বিপ্লবের ফ্রান্স ও লণ্ডনের পটভূমিকায় রচিত। সিডনি কার্টন উপন্যাসের নায়িকা লুসিকে ভালবাসে, অথচ লুসি চার্লস্ ডার্নের বিবাহিতা স্ত্রী। বিপ্লবের জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ডার্নেকে কারাগার হইতে পলায়নে সাহায্য করিয়া এবং নিজে তাহার স্থানে প্রাণোৎসর্গ করিয়া সিডনি কার্টন প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। কিছুটা ভাবালুতাদুষ্ট হইলেও উপন্যাসখানির মহত্ত্ব ও জীবনধর্মিতা অনস্বীকার্য। 'এ টেল অব টু সিটিজ', 'ডেভিড কপারফিল্ড' ও 'পিকউইক পেপার্স' এই তিনখানি ছাড়া আর কোনো পুস্তক না লিখিলেও ডিকেন্স ইংরাজী সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিতেন।

ডিকেন্সের জীবনচিত্রনের সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক সমালোচক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বলা হয়—তাঁহার পরিহাস-রসিকতা ও করুণ রসেও বিশুদ্ধির অভাব আছে, তাঁহার রসিকতা জীবনের সত্যরূপ নহে, ইহার বিকৃতি ও অতিরঞ্জনের উৎস হইতে উদ্ভূত। এ বক্তব্য খানিকটা ঠিকও। রসপ্রধান চরিত্রগুলি সব প্রায় একই রকমের অঙ্গভঙ্গী, আচরণ ও সংকীর্ণ মানসপ্রতিক্রিয়ার দ্বারা চিহ্নিত। জীবনের বিস্তার অথবা বিচিত্র পরিবর্তনশীলতা তাহাদের নাই। উহাদের অনেকেই তাঁহার করুণরসসুলভ অশ্রুপ্রবণতার দ্বারা চিহ্নিত আতিশয্যে আর্দ্র— সংযম-ও-পরিমিতিহীন। অতি-নাটকীয় অতিরঞ্জন-প্রবণতা ডিকেন্সের গভীর রচনার আর্টকে অনেক সময় ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

অন্যদিকে সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত উপন্যাসগুলিতে তাঁহার আক্রমণের অন্ধ তীব্রতা ও অসংযম তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অন্তরায় হইয়াছে ও তাঁহার নিরপেক্ষ মনোভাবের অভাব সূচিত করিয়াছে। দরিদ্র শিশুদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ও বিদ্যালয়-পরিচালকদের লোভ ও ও হৃদয়হীনতা, দোকানদারদের শঠতা ও নীচতা, আদালতগুলির ও উকীলদের বিবেকশূন্য, পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ, চোরছ্যাঁচড়দের জীবনযাত্রাপ্রণালী—সমস্তই ডিকেন্সের সমালোচনার বিষয়বস্তু। তিনি বিস্ময়াবহ সৃষ্টি-প্রতিভার অধিকারী—তাঁহার সৃষ্ট অসংখ্য নর-নারী, তুলির দুই-একটি অযত্ন-বিন্যস্ত আঁচড়ে, দুই-এক ফোঁটা রংএর যদৃচ্ছ প্রক্ষেপে, পাঠকের মনে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে ও গুণবাচক নূতন সংজ্ঞা-প্রবর্তনের হেতু হইয়াছে।

মনে হয় ডিকেন্সের যাবতীয় সৃষ্টির মূলে আছে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা। অগভীর বিশ্লেষণ ও চিন্তাশক্তির অপ্রাচুর্য সত্ত্বেও তিনি জীবনস্পন্দনের নিগূঢ় রহস্য ও সমাজব্যবস্থার আসল রূপটি সেইজন্যই ধরিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। লণ্ডনের রাজপথ, অলি-গলি, দরিদ্র-অধ্যুষিত পল্লীসমূহ, মুটে-মজুর-ভবঘুরে-জাতীয় নিম্নস্তরের ব্যক্তি ও প্রতিবেশ তাঁহার উপন্যাসে জীবনের বৈদ্যুতীস্পর্শে প্রাণবান্। এই অনায়াসলব্ধ সৃষ্টিশক্তি-প্রাচুর্যে তিনি শেক্স্পিয়ারের সমকক্ষ না হইলেও সমগোত্রীয়। আর একটি বিষয়েও শেক্স্পিয়ারের সহিত ডিকেন্সের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ডিকেন্সের উপন্যাসে নীচ ও শঠ চরিত্রের প্রাচুর্য থাকিলেও ডিকেন্স কখনও তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর নন এবং কাহাকেও তীব্র কশাঘাত করেন নাই। অবস্থাবৈগুণ্যেই যে তাহাদিগকে এরূপ আচরণ করিতে হয়—ইহাই যেন গ্রন্থকারের প্রতিপাদ্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ডিকেন্সের উপন্যাস প্রচারধর্মী নহে।

অনেক বিষয়ে থ্যাকারে ডিকেন্সের বিপরীত-ধর্মী। থ্যাকারে প্রধানতঃ অভিজাত ও ধনী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনসমস্যা লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন—দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোক সম্বন্ধে তিনি অনেকটা নিঃস্পৃহ। ডিকেন্সের হাস্য ও করুণরসের স্থূলতা ও আতিশয্যের পরিবর্তে তিনি মার্জিত শ্লেষ ও সংযত, পরিমিত ভাবাবেগের অধিকারী। সৃষ্টিশক্তির প্রাচুর্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তিতেই তাঁহার প্রাধান্য। ডিকেন্স অপেক্ষা তাঁহার জনপ্রিয়তা কম, কিন্তু তিনি অনেক বেশী শিল্পসচেতন শিল্পী। তাঁহার একটি দোষ এই যে, তাঁহার কাহিনীর গতি অতি মন্থর। তিনি তাঁহার আখ্যায়িকাকে মন্তব্যবাহুল্য ও সুদীর্ঘ নীতি-প্রচারের দ্বারা ভারাক্রান্ত করেন—পাঠকের ধারণাকে স্বপ্রণোদিতভাবে স্ফূর্ত

হইতে দেন না। লেখকের এইরূপ বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ, এইরূপ প্রচার-প্রবণতা ঔপন্যাসিক রসস্ফূর্তিকে অনেক সময় ব্যাহত করিয়াছে। অবশ্য ঔপন্যাসিককে যে নাট্যকারের মত সম্পূর্ণ আত্মাবলুপ্ত করিতে হইবে তাহা নহে, তথাপি তাঁহার নিজস্ব উপস্থিতি যেন অশোভনরূপে উগ্র না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

থ্যাকারেকে সাধারণতঃ cynic বা মানবচরিত্রের মহত্ত্বে অনাস্থাশীল আখ্যায় অভিহিত করা হয়। তাঁহার প্রথম উপন্যাস Vanity Fair ('ভ্যানিটি ফেয়ার') (১৮৪৮)-এ তিনি যেরূপ চরিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে এইরূপ প্রতীতি জন্মান খুবই স্বাভাবিক। এই উপন্যাসে তিনি অভিজাত ও আভিজাত্য-মোহগ্রস্ত সমাজের অতি তীক্ষ্ণ-শ্লেষপূর্ণ ছবি আঁকিয়াছেন—উহার ভণ্ডামি, অন্তঃসারশূন্যতা, কৃত্রিম শিষ্টাচারের ছদ্মবেশের অন্তরালে ইতর রুচি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতি স্থূল লোলুপতা প্রভৃতি দোষ নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। এই উপন্যাসের কোন চরিত্রই আমাদের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি অর্জন করিতে পারে না। তীক্ষ্ণবুদ্ধির সহিত চরিত্রহীনতা ও সচ্চরিত্রের সহিত বুদ্ধির জড়তা থ্যাকারের উপন্যাসে যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আধুনিক সমাজ বীরপ্রসূ নয়, ভালমন্দে মেশানো সাধারণ নরনারীর সমষ্টি মাত্র, যেখানে মন্দের ভাগ ভাল অপেক্ষা অনেক বেশি—তাঁহার জীবন-চিত্রণের বৈশিষ্ট্য হইতে মোটামুটি যেন এই ধারণাই জন্মায়। কিন্তু তাঁহার সমগ্র রচনা মনোযোগ দিয়া পড়িলে এই ধারণার পরিবর্তন হয়। থ্যাকারের হৃদয়ে দয়া, সমবেদনা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিসমূহের অভাব ছিল না। তিনি ডিকেন্সের মত কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিতেন না সত্য, কিন্তু মানুষের অন্তরে প্রবাহিত স্নিগ্ধ অশ্রুনির্ঝর সম্বন্ধে তিনি যে সচেতন ছিলেন, তাহা তাঁহার কর্নেল নিউকমের মৃত্যু-বর্ণনার দৃশ্যে প্রমাণিত হইয়াছে। বয়সবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সহিত, থ্যাকারে জীবনের উপরিভাগের ঈষৎ কষায় স্বাদের স্তর অতিক্রম করিয়া ইহার গভীর তলদেশের বিশুদ্ধ মাধুর্যময় স্তরের সহিত পরিচিত হইয়াছেন ; এবং তাঁহার ব্যঙ্গপ্রধান মনোবৃত্তি অনেকাংশেই শ্রদ্ধাপূর্ণ বিস্ময়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস Henry Esmond ('হেনরী এসমণ্ড') (১৮৫২)-এর নায়কের উদার, ক্ষমাস্নিগ্ধ চরিত্র কোন সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি, সন্দিগ্ধচেতা, মানব-মহিমায় অবিশ্বাসী লেখকের সৃষ্টি হইতে পারে না। এই উপন্যাসখানি ঐতিহাসিক কল্পনার সার্থক প্রয়োগের চমৎকার উদাহরণ। স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির সহিত তুলনা করিলেই 'এসমণ্ড'-এর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যাইবে। স্কট ঐতিহাসিক পটভূমিটি মোটামুটি ঠিক রাখিতেন এবং বাকিটুকু কল্পনার সাহায্যে পূরণ করিয়া উপন্যাস রচনা করিতেন। থ্যাকারে আরও অনেক

বেশী ইতিহাসাশ্রয়ী এবং তথ্যানুগ, অথচ নিষ্প্রাণ নন। 'হেনরী এসমণ্ড' উপন্যাসখানিতে অষ্টাদশ শতকের রীতি-নীতি, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের বৈশিষ্ট্য, এমন কি সেই শতাব্দীর আকাশ-বাতাস ও প্রচলিত সাহিত্যিক ভাষা পর্যন্ত নিখুঁতভাবে অনুসৃত হইয়াছে।

জর্জ এলিয়ট হইল স্ত্রী-ঔপন্যাসিক মেরি অ্যান্ ইভান্সের ছদ্মনাম। ইংরাজী সাহিত্যে জেন অস্টেনের পরে তিনিই উল্লেখযোগ্য মহিলা ঔপন্যাসিক। তাঁহার প্রগাঢ় মনস্তত্ত্বজ্ঞান, দার্শনিক পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ নীতিবোধ ছিল। তিনি মধ্যশ্রেণীর অতি সাধারণ নরনারীর জীবনের তীব্র ভাবাবেগ ও মানস সংঘর্ষ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। The Mill on the Floss ('ফ্লসের মিল'), Silas Marner ('সাইলাস মার্নার') প্রভৃতি গ্রন্থে কোমল হৃদয়ের ছাপ পড়িয়াছে—স্ত্রী-চরিত্র অঙ্কনে তিনি পুরুষের অনধিগম্য সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসে এইরূপ রমণীসুলভ কোমল স্পর্শ কোন কোন সূক্ষ্ম-অনুভূতিপূর্ণ পাঠককে তাঁহার সত্য পরিচয়ের সূত্র ধরাইয়া দিয়াছিল। তাঁহার গ্রাম্য-সমাজ ও কৃষক-পরিবারের ছবিগুলি অকৃত্রিম সহানুভূতি, স্নিগ্ধ রসিকতা ও গ্রাম্য লোকের মূঢ় ও সঙ্কীর্ণ গেঁয়োমির সরস উপলব্ধির সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। যতদিন তাঁহার উপন্যাসের বিষয় তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, ততদিন তাঁহার রচনার সরসতা ও প্রসাদ-গুণ অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু পরে যখন তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন, তখন তাঁহার উপন্যাসগুলি রীতিমত সমস্যা-বিড়ম্বিত ও পাণ্ডিত্য-কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সুতরাং তাঁহার শেষের দিকের উপন্যাসগুলির মধ্যে স্বাভাবিকতা ও জীবনীশক্তি উভয়েরই অভাব অনুভূত হয়।

জর্জ এলিয়টের মধ্যে নীতিবিদের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাঁহার উপন্যাসে নীতিবিধানের এরূপ অমোঘ কার্যকারিতা যে, অপরাধ করিয়া কাহারও নিস্তার নাই। সামান্যমাত্র দুর্বলতা, বিন্দুমাত্র কর্তব্যচ্যুতি ধীরে ধীরে বিষের মত সমস্ত চরিত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া ইহাকে পঙ্গু ও বিকৃত করিয়া ফেলে। চরিত্রের এই ক্রমিক অবনতি এবং প্রলোভনের সম্মুখে মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটাইয়া তুলিতে জর্জ এলিয়ট বিশেষভাবে সিদ্ধহস্ত। 'অ্যাডাম বীড'-এ আর্থার ডনিথর্ন হেটি সরেলের মত চপলমতি বালিকাকে প্রলোভনে ফেলিয়া তাহাকে রসাতলে ঠেলিয়া দিয়াছে। জর্জ এলিয়ট 'অ্যাডাম বীড' উপন্যাসটির সারাংশ পাইয়াছিলেন তাঁহার এক পিতৃষ্বসার নিকট হইতে। এই উপন্যাসের নায়িকা ডিনা মরিসও এই পিতৃষ্বসার

ছায়ানুসারিণী। 'সাইলাস মার্নার'-এ গড্‌ফ্রে তাহার গোপন বিবাহ অস্বীকার করিয়া নিঃসন্তান, নিরানন্দ জীবন-যাপনে বাধ্য হইয়াছে—তাহার পরিত্যক্তা স্ত্রীর সন্তান এপি তাহার পিতৃত্ব অস্বীকার করিয়া তাহার প্রথম যৌবনের কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্তের হেতু হইয়াছে। সাইলাসের জীবনে প্রচণ্ড আঘাতের ফলে তাহার সমস্ত সুস্থ মানবিকতার নিষ্পেষণ ও নিরোধ এবং পরে শিশুকে ভালবাসিয়া ইহার পুনরুদ্ধারের চিত্র, গভীর মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দেয়। Romola ('রমোলা')-তে টিটো কর্তব্যচ্যুতির পিচ্ছিল পথে ক্রমাবরোহণের ফলে অবনতির নিম্নতম বিন্দু স্পর্শ করিয়াছে। এইরূপে মানবজীবনের নৈতিক দায়িত্বের গুরুত্ব জর্জ এলিয়টের প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই প্রতিফলিত। জর্জ এলিয়টের মূল বক্তব্য—মানুষের জীবন তাহার বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় না ; হয় প্রবৃত্তি, অনুভূতি প্রভৃতি দ্বারা। অতএব এই প্রবৃত্তি ও অনুভূতিকে বশে আনিয়া ঠিক পথে পরিচালিত না করিতে পারিলে অনর্থ ঘটিবেই।

তাঁহার সমসাময়িকেরা জর্জ এলিয়টের পাণ্ডিত্যে ও বিশ্লেষণ-গভীরতায় অভিভূত হইয়া তাঁহাকে সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার সে প্রতিষ্ঠা আর নাই। এখন অনেকে মনে করেন যে, জীবনকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি ইহার হৃৎস্পন্দনের ঠিক রহস্যটিই ধরিতে পারেন নাই। তিনি জীবনের পরিবর্তে ইহার একটা অতি-সুনিয়ন্ত্রিত, সঙ্কীর্ণ নিয়মের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ, কৃত্রিম পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন। নীতিবোধ ও বিশ্লেষণের আতিশয্য যে সব সময়ে সৃষ্টি-প্রতিভার অনুকূল নহে, জর্জ এলিয়টের উপন্যাসাবলী তাহার উদাহরণ।

ব্রন্টি-ভগিনীদের (The Bronte Sisters) উপন্যাসে বিক্ষুব্ধ, নিপীড়িত আত্মার বিদ্রোহ-ঘোষণা, স্ত্রীজাতির পূর্ণতর জীবনের অধিকার প্রভৃতি অসঙ্কোচ তীব্রতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। **শার্লট** (১৮১৬-১৮৫৫), **এমিলি** (১৮১৮-১৮৪৮) ও **এ্যান** (১৮২০-১৮৪৯) এই তিন ভগিনী দারিদ্র্যের অশ্রান্ত সংগ্রাম ও পুঞ্জীভূত গ্লানিতে বিকৃত এক নিরানন্দ প্রতিবেশের মধ্যে তাঁহাদের সারাজীবন কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনে প্রেমের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং সমাজের বিরুদ্ধে বদ্ধমূল ক্ষোভ ও অভিমান নিরুদ্ধ ছিল ; এবং তাঁহাদের উপন্যাসে এইগুলিই আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রোতের ন্যায় জ্বালাময়ী ভাষায় ফাটিয়া পড়িয়াছে। শার্লটের উপন্যাসের মধ্যে 'জেন আয়ার' (Jane Eyre)-ই বিখ্যাত, যদিও 'শার্লি' (Shirley) পুস্তকখানিকেও কেহ কেহ আদর করিয়া পড়েন। এমিলি ব্রন্টি তাঁহার একমাত্র উপন্যাস 'উদরিং-এর

টিলা' (Wuthering Heights)-এর জন্য ইংরাজী সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবেন। এ্যানের দুইখানি উপন্যাসের মধ্যে 'এ্যাগ্নিস গ্রে' (Agnes Grey)-ই উল্লেখ্য। শার্লট ও এ্যানের উপন্যাসের নায়িকারা তাহাদের লেখিকারই মত দরিদ্র, রূপহীনা শিক্ষয়িত্রীশ্রেণীর নারী ; জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, অবদমিত ইচ্ছার উত্তাপে তাহাদের অন্তরের মাধুর্য ঝলসাইয়া গিয়াছে। তাহাদের জীবনে যখন প্রেম আসে, তখন ইহা সর্বনাশা, দুর্বার বন্যাস্রোতের মত তাহাদের সমস্ত সংযম ও শিষ্টাচারের বন্ধন ভাসাইয়া লইয়া যায়। প্রেম-বিষয়ে স্ত্রীজাতির নিষ্ক্রিয়ত্বের ও আত্ম-নিরোধের যে সনাতন আদর্শ সমাজে প্রচলিত ও সাহিত্যে স্বীকৃত, ব্রণ্টি ভগিনীরা স্পর্ধাভরে তাহাকে অস্বীকার করিয়াছেন। জর্জ এলিয়টের উপন্যাসে নারীত্বের যে স্পর্শ বাৎসল্যরসের বিগলিত স্নেহ ও সাংসারিক জীবনের সূক্ষ্ম, সহানুভূতিপূর্ণ চিত্রণে পরোক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ব্রণ্টি ভগিনীদের উপন্যাসে তাহা অবরুদ্ধ কামনার অনবগুণ্ঠিত প্রকাশে, অধিকার-সাম্যের দৃপ্ত সমর্থনে ও সমাজ-বৈষম্যের প্রতি অভিমান-ক্ষুব্ধ অনুযোগে আপনাকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

ইহাদের উপন্যাসে শক্তিমত্তার পরিচয় আছে স্বীকার করিতেই হইবে, কিন্তু সে শক্তি সব সময়ে—বিশেষ করিয়া এমিলি ব্রণ্টির ক্ষেত্রে—সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের শক্তি নহে, অনেকটা বিকারগ্রস্ত রোগীর দানবিক শক্তির মত। ইহারা, বিশেষ করিয়া এমিলি ব্রণ্টি, যতক্ষণ তাঁহাদের নিজ নিজ সীমিত ক্ষেত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতার কথা উপন্যাসে রূপান্তরিত করিয়াছেন, ততক্ষণই তাঁহারা উপন্যাসের কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য রাখিতে পারিয়াছেন। যেখানেই কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন বা লইতে বাধ্য হইয়াছেন, সেইখানেই তাঁহাদের কাহিনী অবিশ্বাস্য ও আজগুবি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জ্যেষ্ঠা ভগিনী শার্লটের বিখ্যাত উপন্যাস 'জেন আয়ার'-এর নাম ঐ উপন্যাসের নায়িকারই নাম। জেন আয়ার এক অনাথা বালিকা ; পালিকা কর্তৃক নানাভাবে নিগৃহীত হইবার পর সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং দাতব্য শিক্ষালয়ে প্রেরিত হয়। তাহার পর সে এক দুশ্চরিত্র ধনীর (রচেষ্টার) জারজ কন্যার শিক্ষিকারূপে নিযুক্ত হয় এবং রচেষ্টার ও জেন আয়ার পরস্পরের প্রেমে পড়ে। বিবাহের ঠিক পূর্বে জানা যায় যে রচেষ্টারের এক উন্মাদ পূর্বপরিণীতা পত্নী আছে। বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়। নানা প্রতিকূল ও অনুকূল অবস্থার মধ্য দিয়া জেন আয়ার যখন তাহার দ্বিতীয় রক্ষক রিভার্সকে বিবাহ করিতে যাইতেছে, তখন সে এক অনির্দিষ্ট দুর্বার আকর্ষণে রচেষ্টারের কাছে ফিরিয়া আসে। রচেষ্টার এখন পঙ্গু ও অন্ধ। বাড়ীতে আগুন

লাগিয়াছিল—সেই আগুন হইতে উন্মাদ স্ত্রীকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে গিয়াই তাহার এই দশা। এখন আর বিবাহের কোনো অন্তরায় নাই। রচেষ্টার ও জেন আয়ারের মিলনেই উপন্যাসের শেষ।

এমিলি ব্রন্টির উপন্যাস 'উদরিং-এর টিলা'-র উপন্যাস ভাগ আরও অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য। উপন্যাসের নায়ক, কুড়াইয়া-পাওয়া জিপসী শিশু, হীথক্লিফ তাহার পালকপিতা আর্ন্‌শ কর্তৃক নিজপুত্র হাইণ্ডলি ও কন্যা ক্যাথেরিনের সহিত লালিত-পালিত হয়। হীথক্লিক ও ক্যাথেরিনের মধ্যে এক দুর্বার আকর্ষণ জন্মে। আর্ন্‌শ-এর মৃত্যুর পর হাইণ্ডলির দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া এবং ক্যাথেরিনের সহিত বিবাহ অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া হীথক্লিক গৃহত্যাগ করে। কয়েক বৎসর পরে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন হাইণ্ডলির চরম দুরবস্থা এবং ক্যাথেরিনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। হাইণ্ডলি ও তাহার পুত্র হেয়ারটনকে সে সহজেই আয়ত্তে আনে এবং ক্যাথেরিনের প্রতি তাহার পূর্ব আকর্ষণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। দুর্বল অবস্থায় উত্তেজিত করিয়া সে ক্যাথেরিনের মৃত্যু ঘটায় এবং ইহার পরে সে আরও মরীয়া হইয়া উঠে। হীথক্লীক ক্যাথেরিনের স্বামীর ভগিনীকে বিবাহ করে এবং ঐ বিবাহের ফলে এক বিকলাঙ্গ পুত্র জন্মায়। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য সে কৌশল ও নিষ্ঠুরতার সাহায্যে এই পুত্রের সহিত ক্যাথেরিনের কন্যা ক্যাথির বিবাহ দেয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিকলাঙ্গ পুত্র মরিয়া যায়। ক্যাথেরিনের কন্যা ক্যাথি ও হাইণ্ডলির পুত্র হেয়ারটনের বিবাহে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। তেজস্বী প্রকৃতির মানুষের আশাভঙ্গ হইলে তাহার মধ্যে যে দানবিক নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায় বা পাইতে পারে উপন্যাসটির প্রতি ছত্রে তাহারই সুস্পষ্ট পরিচয়।

মেরিডিথ (George Meredith : ১৮২৮-১৯০৯) ও **হার্ডি** (Thomas Hardy : ১৮৪০-১৯২৮), ভিক্টোরীয় যুগ অতিক্রম করিয়া আধুনিক যুগে পদক্ষেপ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানস-বৈশিষ্ট্য অনেক সময়েই পূর্বতন যুগের। মেরিডিথের বিশ্লেষণ সাধারণতঃ অতি-পল্লবিত। তাঁহার মন্তব্য অনেক সময়েই ঘটনাকে ছাড়াইয়া যায় ও সময়ে সময়ে উহাকে অস্পষ্ট করিয়া তোলে। তাঁহার মননশক্তির তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ-ছটায় চোখ ধাঁধিয়া যায় ও ঘটনার পারম্পর্যবোধ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তাঁহার ভাষাও অতি-সংক্ষেপের ফলে মধ্যে মধ্যে দুর্বোধ্য হইয়া ওঠে। বর্ণনা ও বিবরণের যে সাবলীলতা ঔপন্যাসিককে জনপ্রিয় করে মেরিডিথের তাহা নাই। তথাপি 'দি অর্ডিয়াল অব রিচার্ড ফেভারিল' (The Ordeal of Richard Feverel) ; 'দি ইগোইস্ট' (The Egoist) ও 'ডায়ানা অব দি ক্রস্-

ওয়েজ' (Diana of the Crossways), তাঁহার এই তিনখানি উপন্যাসে যথার্থ ঔপন্যাসিক প্রতিভার নিদর্শন মিলে। প্রথম উপন্যাসে ভাগ্য-বিড়ম্বিত কৈশোর প্রেম, দ্বিতীয়ে মানুষের মনে সূক্ষ্ম, অনতিক্রমণীয় আত্মাভিমানবোধ ও তৃতীয়টিতে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রজালের কুটিল প্রভাবে প্রেমের আদর্শচ্যুতি গভীর অন্তর্দৃষ্টির আলোকে বর্ণিত ও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

সমগ্র ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর মধ্যে হার্ডির ন্যায় আর কেহ এত অবিমিশ্র কাব্য-মনোভাব লইয়া উপন্যাস-রচনায় ব্রতী হন নাই। তিনি মানুষকে ক্রূর দৈবের অসহায় ক্রীড়নকরূপে এবং জীবনকে গভীর দুঃখবাদের ভিত্তিভূমিরূপে দেখিয়াছেন। নিয়তি মানুষের অদৃষ্টের প্রতি উদাসীন। তাহার ক্ষুদ্রতম ভুলভ্রান্তির সহিত চরম শাস্তির সংযোগ ঘটাইয়া নিয়তি যেন জীবনকে দুর্ভেদ্য রহস্যজালে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। হার্ডির উপন্যাসগুলির মধ্যে, গ্রীক ট্রাজেডির ন্যায়, নিয়তির এই দুর্জ্ঞেয় বিধান, মানবজীবনের এই অপ্রতিরোধ্য বিষাদময় পরিণতি অনবদ্য সৌন্দর্য ও তীব্রশ্লেষাত্মক বেদনাবোধের সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতির সহিত মানব-মনের নিগূঢ় ভাব-বিনিময়ের যে কবিত্বময় অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সর্বপ্রথম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় প্রচারিত হয়, হার্ডির উপন্যাসে সেই অনুভূতিই ব্যাপক ঘটনার বৃহত্তর পরিধির মধ্যে, দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি উদাহরণের সাহায্যে, নূতন প্রসার ও অর্থগৌরব লাভ করিয়াছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় যাহা মুহূর্তের উপলব্ধি, হার্ডির উপন্যাসে তাহা জীবনব্যাপী প্রভাবরূপে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রাবলীর গতি ও প্রকৃতি নির্ধারিত করিয়াছে।

মানসিক প্রবণতার দিক হইতে হার্ডি কবি হইলেও ঔপন্যাসিক হিসাবেই তিনি প্রথমে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার উপন্যাসের মানও বেশ উন্নত। হার্ডি বিংশ শতাব্দীর কবি বলিয়া পরিচিত এবং পরে তাঁহার কাব্যের আলোচনা করা হইবে। তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রধানগুলি হইল—Under the Greenwood Tree ('সবুজ তরুতলে'), Far From the Madding Crowd ('জনতার অন্তরালে'), The Return of the Native ('প্রবাস থেকে ফেরা'), Tess of the D' Urbervilles ('টেস'), Two On A Tower ('মিনারে দুজন') ইত্যাদি।

হার্ডি নিজের উপন্যাসগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতেন—(১) চরিত্র ও পারিপার্শ্বিক-প্রধান উপন্যাস, (২) রোমান্স বা কল্পনা-প্রধান উপন্যাস এবং (৩) কলাকৌশল-প্রধান উপন্যাস। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই লক্ষ্য করা

যাইবে যে, শ্রেণী-বিভাগ যে ভাবেই করা হউক, হার্ডির সমস্ত উপন্যাসেরই মূল সুর এক। উদাসীন নিয়তির অমোঘ বিধান তো আছেই, তাহার উপর আছে আদিম মানব মনের সৎ-অসৎ বিচারবোধ এবং আধুনিক সমাজের নিষ্ফল, মূঢ় এবং অনেক সময়ে ভ্রান্ত ও ভণ্ড নীতিবোধ। যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হার্ডির উপন্যাসে বিশেষ সোচ্চার না হইলেও সর্বত্র প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। শিল্প-বাণিজ্য-প্রধান উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেও সুদূর অতীতের যে সমস্ত লুপ্তাবশেষ চিহ্ন এখনও টিকিয়া আছে তাহাদিগকে উদ্ঘাটিত করিয়া হার্ডি আমাদের মনে এক বিষাদময় বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। আদিম কাল হইতে অপরিবর্তিত, প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতার প্রতীক অথচ সমসাময়িক এগ্ডন হীদ বা জলার বিশাল, অকর্ষিত প্রান্তর যেন মানবমনের অন্ধ সংস্কার, দুর্বার প্রবৃত্তি ও উচ্ছেদাতীত রহস্যানুভূতির শেষ আশ্রয়। বলা হইয়া থাকে যে The Return the Native-এ এগ্ডন হীদও একটি চরিত্র বিশেষ। এই অব্যক্ত ভয়াবহ রহস্যময়, মৌন জড়প্রকৃতির অন্তর হইতে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট মানব জীবনের উপর এক দুরতিক্রম্য কুটিল, অশুভ প্রভাব বিচ্ছুরিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমের ডরসেট অঞ্চলই হার্ডির অধিকাংশ উপন্যাসের পশ্চাদ্ভূমি। এই অঞ্চলকে ওয়েসেক্স বলা হয় বলিয়া হার্ডির বহু উপন্যাসও 'ওয়েসেক্স নভেল' বলিয়া বর্ণিত হয়। শেষ করিবার পূর্বে আর একবার বলা প্রয়োজন যে, হার্ডির পরিকল্পনা ও প্রণালী কাব্যধর্মী। তাঁহার এক-একটি উপন্যাস যেন মহাকাব্যের সুদূরপ্রসারী পটভূমিকার উপর গীতিকবিতার ঘননিবদ্ধ অর্থব্যঞ্জনার সার্থক প্রয়োগ।

এলিজাবেথীয় যুগকে যদি নাটকের যুগ বলা যায়, রোমান্টিক যুগকে যদি কাব্যের যুগ বলা হয়, ভিক্টোরীয় যুগকে তাহা হইলে উপন্যাসের যুগ বলিতেই হইবে। যে সমস্ত প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের কথা বলা হইল তাঁহারা ছাড়াও এই যুগে অনেক ক্ষমতাবান ঔপন্যাসিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অন্য কোনো যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহাদের অনেকেই প্রথম শ্রেণীর লেখক বলিয়া গণ্য হইতেন। ইহাদের মধ্যে **চার্লস্ কিংসলি** (Charles Kingsley : ১৮১৯-১৮৭৫), **চার্লস্ রীড** (Charles Reade : ১৮১৪-১৮৮৪), **অ্যান্টনী ট্রলোপ** (Anthony Trollope : ১৮১৫-১৮৮২), **উইল্কি কলিন্স্** (Wilkie Collins : ১৮২৪-১৮৮৯), **রবার্ট লুই স্টিভেনসন্** (Robert Louis Stevenson : ১৮৫০-১৮৯৪), **জর্জ বরো** (George Borrow : ১৮০৩-১৮৮১)

ও **জর্জ গিসিং** (George Gissing : ১৮৫৭-১৯০৩) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের উপন্যাসে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একদিকে বিষাদময় সমাজ-সচেতনতা, ভিক্টোরীয় যুগের আত্মপ্রসাদের ক্রমিক বিলুপ্তি, অপরদিকে মধ্যযুগের রোমাণ্টিক মনোভাবের সৌন্দর্যনিষ্ঠতা ও দুঃসাহসিক জীবনযাত্রার প্রতি আকর্ষণ প্রতিফলিত হইয়াছে।

কিংসলি তাঁহার উপন্যাসে সমাজতন্ত্রবাদের ভাবপ্রেরণা, নিপীড়িত জনসাধারণ ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সমবেদনার আবেগপূর্ণ চিত্র আঁকিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত উপন্যাসে স্থায়িত্বের বিশেষ লক্ষণ নাই—ইহাদের মধ্যে ভাবোচ্ছ্বাস যে পরিমাণে আছে, মননশীলতা ও সমস্যার গভীর উপলব্ধি ততটা নাই। তাঁহার এলিজাবেথীয় যুগের সমুদ্রাভিযান-বিষয়ক উপন্যাস 'ওয়েস্টওয়ার্ড হো' (Westward Ho, ১৮৫৫) তাঁহার স্মৃতিরক্ষার সহায়তা করিয়াছে। বর্ণিত যুগের ভাবোন্মাদনা ও কর্মোদ্যম, অপরিচিত দেশ আবিষ্কারের বিস্ময় ও বিপদসঙ্কুলতা এবং ইংরাজ নাবিকদের বেপরোয়া মনোবৃত্তি ইহাতে স্মরণীয় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। চার্লস্ রীড কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী লেখক। তিনি বাস্তববাদী এবং ইতিহাস-প্রণেতার মত দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটিয়া যথার্থ তথ্য উদ্ধারে যত্নবান ছিলেন। এদিক দিয়া স্কটের সহিত তাঁহার খানিকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। রীডের 'দি ক্লয়স্টার এ্যাণ্ড দি হার্থ' (The Cloister and the Hearth) উপন্যাসটি মধ্যযুগের ধর্মাদর্শ-সংঘাত ও যাজক-বৃত্তির বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক ও রোমাঞ্চকর কাহিনী। ইহার জনপ্রিয়তা এখনও কতকাংশে অক্ষুণ্ন আছে।

অ্যাণ্টনী ট্রলোপ আর একজন বস্তুতান্ত্রিক ঔপন্যাসিক। তিনি কয়েকটি উপন্যাসে একটি ক্ষুদ্র মফঃস্বল শহরে ধর্মযাজকমণ্ডলীর জীবনযাত্রা ও মানস আদর্শের তথ্যসমৃদ্ধ চিত্র আঁকিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার বস্তুতন্ত্রতা একেবারে সম্পূর্ণভাবে তথ্যসংগ্রহ ও নিরাবেগ পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তাঁহার কিছুটা কল্পনাশক্তি ও মানব-জীবন সম্বন্ধে সহজ সংস্কার ছিল, এবং তিনি নৈর্ব্যক্তিকতাকেও আদর্শরূপে অনুসরণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার বাস্তব চিত্রগুলি বস্তুসঞ্চয় হইতে খানিকটা উর্ধ্বায়িত জীবনসত্য। তাঁহার বর্ণিত সমাজে সাধারণ ব্যক্তিরই ভিড়। করুণ ও হাস্যরস যেটুকু আছে তাহাও এই সাধারণত্বের চিহ্নাঙ্কিত।

উইল্‌কি কলিন্স্ প্রধানতঃ অপরাধের সূত্র-অন্বেষণ ও সত্য-আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর কাহিনীর লেখক। তাঁহার উপন্যাসে একদিকে যেমন ঘটনা-গ্রন্থনের নিপুণতা ও সম্ভাব্যতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখা যায়, অন্যদিকে সেইরূপ রোমান্সসুলভ

আশ্চর্য ও কৌতুহলোদ্দীপক বিপর্যয়, রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা ও মাঝে মধ্যে অপ্রাকৃতর ভীতিসঞ্চারপ্রয়াসও লক্ষণীয়। তাঁহার The Woman in White বা 'শ্বেতবসনা সুন্দরী' উপন্যাসটি এই উভয়বিধ সংমিশ্রণের সার্থক উদাহরণ। দামোদর মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'শুক্লবসনা সুন্দরী' অনুবাদে এই গল্পটিকে বাঙালী জীবনযাত্রার কাঠামোতে বিন্যস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে কলিন্‌স্‌ই বর্তমানের জনপ্রিয় গোয়েন্দা উপন্যাসের জন্মদাতা। রোমান্টিক যুগের গথিক উপন্যাসের আধিভৌতিক আতিশয্যের পরিবর্তে এখানে আছে অপরাধীর মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ ও কার্যকারণসূত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়া অপরাধীকে ধরিবার সার্থক প্রয়াস।

স্টিভেন্‌সন্ তাঁহার উপন্যাসে প্রধানতঃ সমুদ্রযাত্রা, গুপ্তধন-আবিষ্কার, নৌ-কর্মচারীদের মধ্যে বিদ্রোহ ও মারামারি ও নানা বিপদ্‌সঙ্কুল ঘটনার সমাবেশ প্রভৃতি বিষয়কে উপজীব্য করিয়াছেন। উত্তেজনামূলক ও দুঃসাহসিক জীবনযাত্রার প্রতি কিশোর মনের যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে, তাঁহার উপন্যাসে তাহারই তৃপ্তি সাধনের আয়োজন দেখা যায়। তাঁহার বর্ণনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, তাঁহার সংলাপ নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের যথার্থ প্রতিলিপি। এক কথায় বলিতে গেলে, তাঁহার উপন্যাসগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষ খুব উন্নত স্তরের। কিন্তু যে গভীর জীবনসত্য থাকিলে উপন্যাস শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে, তাহার আপেক্ষিক অভাবের জন্যই তিনি গৌণ ঔপন্যাসিক রহিয়া গিয়াছেন। স্টিভেন্‌সনের রচিত The Treasure Island বা 'রত্নদ্বীপ' এবং Dr. Jekyll and Mr. Hyde বা 'ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইড' নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং আজও বহু দেশের কিশোরদের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পুস্তক।

জর্জ বরো ইংরাজী উপন্যাসে যাযাবর জীবনের সুর প্রবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার 'ল্যাভেংগ্রো' (L'avengro) ও 'রোমানি রাই' (The Romany Rye) এই দুইখানি উপন্যাসে তিনি পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ঘরছাড়া জীবনের বাধাবন্ধহীন আনন্দের চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন। ইংলণ্ডের পরিচিত জীবনযাত্রা হইতে বহুদূরে স্পেন ও পর্তুগালে যে সমস্ত বেদে, ভবঘুরে, নির্দিষ্ট-জীবিকাহীন নর-নারী সমাজের প্রান্তদেশে তাঁবু খাটাইয়া নিয়মিত সমাজ-জীবনের মধ্যে একটা অনিয়মের জুয়ারি নেশার রং ধরায়, বরোর সঙ্গে তাহাদের একটা সহজ অন্তরঙ্গতা ছিল। অবশ্য তিনি ইহাদিগকে নিছক কৌতুহলের বিষয়রূপে দেখিয়াছেন। ইহাদের সত্য মানবিক পরিচয় উদ্‌ঘাটনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ছন্নছাড়া জীবনে যে সহজ নাটকীয়তার ইঙ্গিত আছে, বিধিনিষেধের দ্বারা অরক্ষিত জীবন যে

অনিবার্য সংঘাতে দোলায়িত হয়, বরোর উপন্যাসে তাহারই চমৎকার রূপায়ণ দেখা যায়। বরোর এই নাটকীয় বৈচিত্র্য-অনুভবের শক্তি লণ্ডনের সুপরিচিত দৃশ্যের মধ্যেও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মন প্রাচ্য জগতের রঙীন আবেশে এত মশগুল ছিল যে, তাঁহার সব কিছু বর্ণনাই যেন আরব্য উপন্যাসের অবাস্তব কল্পনার রঙে রঞ্জিত হইয়াছে।

জর্জ গিসিং যদিও ডিকেন্সের সম্বন্ধে সমালোচনা-গ্রন্থ লিখিয়াছেন ও তাঁহার সহিত কিছুটা ভাব-সাম্যের অধিকারী, তথাপি জীবনচিত্রণে তিনি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। ডিকেন্স্ সমাজের গ্লানিকর তথ্য পুঞ্জীভূত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সহজ আশাবাদ ও আনন্দপ্রবণতা এই ঘন অন্ধকারকেও আলোক-প্লাবিত করিয়াছে—তাঁহার কল্পনা দুঃখের মধ্যে দুঃখপ্রতিষেধক শক্তিকে আহ্বান জানাইয়াছে। গিসিং-এর দুঃখবাদ কিন্তু নিবিড়, নীরন্ধ্র, আলোক-রেখার প্রবেশহীন। তাঁহার মতে, মানবসমাজে এত অন্যায়, এত বৈষম্য, এত নিষ্ঠুরতা ও উপেক্ষা বাসা বাঁধিয়াছে যে, কোন ব্যক্তির সুস্থ মানস বিকাশ ও আনন্দময় জীবনযাত্রা এই প্রতিবেশে অসম্ভব। গিসিং ধনীর বদান্যতা ও দরিদ্রের বিদ্রোহ—উভয় পন্থাতেই আস্থাহীন। লণ্ডনের বস্তিজীবন, উপবাসক্লিষ্ট, দারিদ্র্যজীর্ণ নূতন লেখকের বাঁচিবার করুণ প্রয়াস, সবেরই উপর এই ধূসর মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার উপন্যাসে জীবনের যে বিষণ্ণ, নিরানন্দ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে সমস্ত মন হতাশায় ভাঙিয়া পড়ে। তাঁহার নায়কেরা অনেকাংশেই তাঁহার নিজস্ব জীবন-অভিজ্ঞতার খণ্ডিত প্রতিবিম্ব। এই নিশ্ছিদ্র বাস্তববাদ যে পৃথিবীর সমস্ত মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত ও নস্যাৎ করিবে, এ বিষয়েও তিনি সচেতন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবনপ্রত্যয় এত দৃঢ় ও সুনিশ্চিত যে, তাঁহার মনে আশাবাদের যে ক্ষীণরশ্মি মাঝে মধ্যে দেখা দিয়াছে, তাহাকেও তিনি এই প্রত্যয়ের ফুৎকারে সম্পূর্ণ নিবাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। সাহিত্যিক আনন্দবাদ এই বদ্ধমূল জীবনবাদের চাপে সম্পূর্ণভাবে অবদমিত হইয়াছে। তথাপি মোটের উপর তিনি বিপ্লবপন্থী নহেন; সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধকেই তিনি স্বীকৃতি দিয়াছেন ও সমর্থন জানাইয়াছেন।

৪

গদ্য সাহিত্য

ঊনবিংশ শতকে গদ্য, বাক্যছন্দে সংক্ষিপ্ত ও সরস হইয়া, পদ্যের ধ্বনিপ্রবাহ, ব্যঞ্জনাশক্তি ও ভাবোচ্ছ্বাস ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে আত্মসাৎ করিয়াছে। অষ্টাদশ

শতকে গদ্য, পদ্যের বহিরবয়বের অতিবিস্তার বর্জন করিয়া, দৃঢ়বদ্ধ সংহতি অর্জন করিয়াছিল ; কিন্তু বার্ক প্রভৃতি দুই-একটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, কোন গদ্যলেখকই বিষয়ে ও ভাবাবেগে, পদ্যের সমকক্ষতাস্পর্ধী হইতে পারেন নাই। কিন্তু ভিক্টোরীয় যুগের সমস্ত কাব্য-প্রবণতা ছন্দোবদ্ধ কবিতার মধ্যে নিঃশেষিত হয় নাই। কবিতার কড়া আইন-কানুনের দ্বারা নির্দিষ্ট রূপ ও নিয়ত ঊর্ধ্বলোক-বিহারী ভাবগ্রামের মধ্যে এই প্রয়োজনধর্মী যুগ নিজ সার্থক ও অপরিহার্য প্রকাশরীতির সন্ধান পায় নাই। কাজেই ইহার বাড়তি ভাবাবেগের সঞ্চয় কবিতার গণ্ডী ছাপাইয়া গদ্যের অপেক্ষাকৃত অগভীর প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই যুগের প্রধান গদ্যলেখক—**কার্লাইল** (Thomas Carlyle : ১৭৯৫-১৮৮১) ও **রাস্‌কিন** (John Ruskin : ১৮১৯-১৯০০)। কাব্যধর্মী ভাবগভীরতায় প্রেরণায় চঞ্চল ও প্রকাশাতীতের ব্যঞ্জনায় রহস্যময় গদ্যভাষায় রচনা এই দুই লেখকের বিশেষ কৃতিত্ব। কার্লাইলের ভাষা প্রচলিত গদ্য-রীতির সমস্ত শৃঙ্খলাকে অস্বীকার ও বিপর্যস্ত করিয়াছে। তাঁহার হৃদয়াবেগ উষ্ণ গৈরিকস্রাবের ন্যায়, প্রচণ্ড ঘূর্ণীবায়ুর ন্যায়, অন্বয়ের সমস্ত পারম্পর্য বিধ্বস্ত করিয়া, ভাষাকে নিজ নিগূঢ় গতিবেগের ছন্দে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই ভাষাতে অভিব্যক্ত ক্রোধ বিদ্যুৎছটার ন্যায় স্পর্শমাত্র দগ্ধ করে ; ইহার করুণা হৃদয়কে বিগলিত করে ; ইহার বিষাদ মেঘভারাবনত আকাশের ন্যায় মনকে আচ্ছন্ন করে ; ইহার বিশ্ববিধান-রহস্যের উদ্ঘাটন মন্ত্রবাণীর ন্যায় অমোঘ শক্তিতে হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতির সমর্থন লাভ করে। তাঁহার 'ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস' ঠিক অর্থে ইতিহাসই নয়, অর্থাৎ তথ্যবিবৃতি বা কারণ-বিশ্লেষণ নহে ; ইহা যেন সুসজ্জিত চিত্রশালায় রক্ষিত বর্ণোজ্জ্বল, সাঙ্কেতিকতার প্রতিভাসে গূঢ়ার্থ চিত্রসমষ্টি। এক-একটি ঘটনা যেন মানুষের অগ্নিপরীক্ষার জন্য ভগবানের স্বহস্ত-প্রজ্বলিত চিতানলের এক-একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ইতিহাসের প্রত্যেকটি সংঘটন, ভাবের উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া, কল্পনার ইন্দ্রধনুবর্ণে রঞ্জিত হইয়া, তাহার স্থূল বস্তুতন্ত্রতা হারাইয়াছে এবং তাহাদের অর্ধস্বচ্ছ আবরণের ভিতর দিয়া দিব্যদৃষ্টির রঞ্জন-রশ্মিপ্রয়োগে, বিশ্ববিধানের মর্মরহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। গণতন্ত্র, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও বাণিজ্যবিস্তার—এই ত্রিবিধমোহগ্রস্ত ভিক্টোরীয় যুগকে কার্লাইল যে ন্যায়নীতি ও আত্মবোধের বাণী শুনাইয়াছিলেন তাহা আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হইয়াছে মনে হয়। কিন্তু এই শাশ্বত নীতি উপেক্ষা করার যে কি সাংঘাতিক পরিণাম, তাহা অতি স্বল্প ব্যবধানে সংঘটিত দুই বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তিতে প্রমাণিত হইয়াছে। কার্লাইল নিজেকে একজন সমাজ-সংস্কারক ও ভবিষ্যদ্বক্তা মনে করিতেন।

তাঁহার রচনাভঙ্গীও এই দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ Sartor Resartus ('সার্টর রিসার্টাস') জার্মানদর্শনপ্রভাবিত। Hero and Hero Worship বা 'বীর ও বীরপূজা' এবং Past and Present বা 'অতীত ও বর্তমান'—এই দুইটিও কার্লাইলের বিশেষ স্মরণীয় গ্রন্থ। প্রথমখানিতে তিনি পরোক্ষভাবে গণতন্ত্র বা 'সমস্ত লোকের মূল্য সমান' এই বিশ্বাসে আঘাত করিয়াছেন, আর দ্বিতীয়টিতে আঘাত করিয়াছেন যান্ত্রিক সভ্যতা ও বাণিজ্যিক মূল্যবোধকে।

রাস্কিন চিত্রকলার সমালোচকরূপে প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য যুগে যুগে চিত্রশিল্পীর সৃষ্টিতে কি বিভিন্ন রীতিতে অঙ্কিত হয়, রাস্কিন সুললিত, ধ্বনিমাধুর্যপূর্ণ গদ্যে সেই রহস্যের অনুপম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সমস্ত শিল্পসৃষ্টির পিছনে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন দায়িত্বহীন সৌন্দর্যবিলাস নহে, এক প্রচ্ছন্ন-গভীর নীতিবোধ ও জীবনদর্শনের প্রতিচ্ছায়া। তাঁহার মতে, যুগে যুগে চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি চারুশিল্পের রীতিবৈচিত্র্য স্বচ্ছ মুকুরের ন্যায় জাতির নৈতিক জীবনের উন্নতি ও অবনতির ভিন্ন ভিন্ন স্তর প্রতিবিম্বিত করে। তিনি মনে করেন যে, কোনো জাতির যদি বহির্ঘটনামূলক ইতিহাস নাও থাকিত, তথাপি ইহার চারুশিল্প হইতে ইহার অন্তর্জীবনের কাহিনী, ইহার আদর্শবাদের বৈশিষ্ট্যটি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইত। আর্টের সঙ্গে নীতিবোধের এই অচ্ছেদ্য নিবিড় সম্বন্ধ—ইহাই রাস্কিনের বক্তব্যের মূলমর্ম। তাঁহার মতে, মধ্যযুগের মন্দিরের আকাশচুম্বী চূড়া ইহার আধ্যাত্মিক অভীপ্সার দ্যোতক; রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগের স্থাপত্য-শিল্পের প্রসাধন-বাহুল্য ইহার জড়বাদ-প্রধান ভোগলিপ্সার পরিচয়। তিনি বলেন যে, এইরূপে ছবিতে ও মন্দিরে, প্রস্তরমূর্তি ও গৃহনির্মাণ-রীতিতে প্রত্যেক যুগ ইহার মানস-প্রবণতার অবিনশ্বর সত্য স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়াছে।

রাস্কিনের রচনা শুধু শিল্পবিচারে সীমাবদ্ধ নহে, আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনায়ও রাস্কিন সমান আগ্রহী। উভয়ের মধ্যে হয়ত একটি খুব সূক্ষ্ম যোগসূত্রও আছে। আধুনিক শিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রীতে সৌন্দর্যের অভাব, প্রয়োজনের খাতিরে সুষমাকে বলি দিবার প্রবণতা, জাতীয় চরিত্রে সুকুমার সৌন্দর্যবোধের বিলোপ—এ সমস্ত রাস্কিনের পক্ষে পীড়াদায়ক ছিল। তিনি বলিয়াছেন, কলকারখানার যান্ত্রিক উৎপাদনে না আছে শিল্পজ্ঞান, না আছে শিল্পীর আত্মমর্যাদাবোধ ও আনন্দ—আছে কেবল প্রয়োজনের তাগিদ ও সস্তার সুবিধাবাদের নিকট শিল্পসৃষ্টির সম্পূর্ণ অধীনতা-স্বীকার। সুতরাং যে অর্থনৈতিক

ব্যবস্থায় প্রয়োজনের নিকট কলাকুশলতার এই বশ্যতাস্বীকার আবশ্যক হইয়াছে, যে অর্থনীতি মুনাফার প্রতি অতিরিক্ত লোভকে এবং নীতি ও সৌন্দর্যবোধের প্রতি অবহেলাকে উৎসাহিত করে তাহাই লেখকের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। শিল্পোৎপাদন-ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রধান অন্তরায় এই ধনতন্ত্রমূলক সমাজ-ব্যবস্থা। সুতরাং রাস্কিন এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নীতিবিদ্ ও সৌন্দর্য-পিয়াসীর যুগ্ম প্রতিবাদ ঘোষণা করিয়াছেন এবং কঠোর ন্যায়নিষ্ঠা ও গভীর ভাবাবেগের সহিত এই মরণধর্মী শোষণক্রিয়ার মূলোচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছেন। অবাধ প্রতিযোগিতার বাহ্যতঃ উদার ও ন্যায়নিষ্ঠ নীতির পিছনে যে বর্বর পশুবল, অসহায়ের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণের তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে, রাস্কিন তাহার ছদ্ম আবরণ ভেদ করিয়া নগ্ন বীভৎসতা উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

ভাবের দিক দিয়া রাস্কিন আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের একজন অগ্রদূত। তাঁহার গদ্য-রচনা আবেগপ্রধান মনোভাবের জন্য কাব্যধর্মী—ইংরাজী ভাষায় যাঁহারা কবিত্বগুণপ্রধান গদ্য ব্যবহার করিয়াছেন রাস্কিন তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। কার্লাইলের ভাষার মত তাঁহার ভাষার দাহকারী শক্তি, মর্মভেদী তীব্রতা বা অন্বয়-বিধ্বংসী প্রচণ্ড গতিবেগ নাই। তাঁহার অক্ষুণ্ণ শিল্প-সৌন্দর্যবোধ গভীর ভাবাবেগের উত্তেজনা সত্ত্বেও রচনারীতির মসৃণ সুষমার ছন্দ হইতে বিচলিত হয় নাই। এই গদ্য একাধারে তাঁহার শক্তিমত্তা ও দুর্বলতার নিদর্শন। ভাষার সৌন্দর্য অনেক সময়ে তাঁহার ভাবের তীব্রতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে—তাঁহার রোষবহ্নি মসৃণ আধারে সুরক্ষিত হওয়ার জন্য কার্লাইলের মত আকাশস্পর্শী শিখায় লেলিহান হইয়া উঠিতে পারে নাই। কার্লাইলের মত ভবিষ্যদ্-দ্রষ্টার অসন্দিগ্ধ আত্মপ্রত্যয়, অনাগত-প্রত্যক্ষকারী দিব্যদৃষ্টির অকম্পিত স্থিরতাও তাঁহার ছিল না—তথাপি তাঁহার রচনায় মনীষী, কবি ও কলাবিদের সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে। তাঁহার চিত্রবিদ্যা ও স্থাপত্যসম্বন্ধীয় বইগুলির মধ্যে Modern Painters বা 'আধুনিক চিত্রকর' ও Stones of Venice বা 'ভেনিসের শিলা' বিখ্যাত। সমাজ ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তকের মধ্যে আছে The Crown of the Wild Olive; Unto this Last; The Sesame and the Lilies প্রভৃতি।

ম্যাথিউ আর্নল্ড একাধারে কবি ও গদ্যলেখক এবং উভয়বিধ রচনাতেই সমান পারদর্শী। তাঁহার কবিতার সমালোচনা আগেই করা হইয়াছে। সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে তিনি অনেক স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্যিক সম্বন্ধে নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই আলোচনাগুলিতে গভীর অন্তর্দৃষ্টি,

সূক্ষ্ম রসবোধ ও শোভন, পরিমিত প্রকাশভঙ্গীর নিদর্শন পাওয়া যায়। Poetry is the criticsm of life বা 'কবিতা জীবন-সমালোচনা'—তাঁহার এই স্মরণীয় উক্তি প্রবাদ-বাক্যে হইয়াছে ; 'পরিণত কাব্য জীবনের সহিত সম্পর্কহীন নিছক সৌন্দর্যলীলার পক্ষপাতী' এই মতবাদের বিরুদ্ধে আর্নল্ডের উক্তিই চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। কীট্স ও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতার তুলনামূলক সমালোচনা উপলক্ষে তিনি Nature-magic বা 'প্রকৃতির ইন্দ্রজাল' ও Moral Profundity বা 'নৈতিক আবেদনের গভীরতা'—বিভিন্ন প্রকৃতির কাব্যের এই দুইটি মূলসূত্রের চমৎকার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তথাপি সময়ে সময়ে মনে হয় যে, তাঁহার সমালোচনা কাব্যরহস্যের গভীরতম উৎস পর্যন্ত পৌছায় নাই ; তিনি মূল কাব্য অপেক্ষা ইহার প্রতিবেশের উপরই যেন বেশী জোর দেন। সময় সময়—যেমন শেলীর কাব্যবিচারে—তাঁহার ব্যক্তিগত রুচি ও মতবাদের আদর্শে কবিকে বিচার করিতে গিয়া তিনি ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কীট্সের উপর লিখিত প্রবন্ধে কবিতার রসবিচার অপেক্ষা কবির জীবন-সমস্যা অধিকতর প্রাধান্য পায়। ক্লাসিক্যাল যুগের মানস আদর্শের প্রতি পক্ষপাতবশতঃ তিনি রোমান্টিক কাব্যের প্রতি সব সময়ে হয়ত যথোচিত সুবিচারও করিতে পারেন নাই।

তাঁহার সমাজ-সমালোচনার নিবন্ধসমূহের মধ্যে Culture and Anarchy বা 'কৃষ্টি ও নৈরাজ্য' সুপরিচিত। এই গ্রন্থে তিনি ইংরেজ সমাজের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যবহারিক সাফল্যের প্রাণহীন অনুসরণ, উদার চিন্তা ও সংস্কৃতির অভাব এবং সৌন্দর্যবোধ ও সুরুচির প্রতি উদাসীনতার উপর মার্জিত শ্লেষ প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি কর্মোদ্যম ও সঙ্কীর্ণ নীতিবাদ অপেক্ষা উদার, নিরাসক্ত জ্ঞান ও মানবিক বিকাশের সর্বাঙ্গীণতাকে কাম্যতর আদর্শ বলিয়া মনে করেন। Culture and Anarchy বইখানি বিশেষ বিখ্যাত ও আদৃত হইলেও, ইহার যে খুব বেশী সাহিত্যিক মূল্য আছে তাহা বলা যায় না। একই রকম যুক্তি ও শ্লেষভঙ্গীর পৌনঃপুনিক প্রয়োগে ভাবের অপ্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্য ও উদ্ভাবনী-শক্তির রিক্ততা ধরা পড়ে। তিনি সমাজের মধ্যে মাধুর্য ও আলোক-বিকিরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বারবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার নিজের রচনায় উক্ত দুইটি গুণের যে বিশেষ প্রাচুর্য আছে তাহা মনে হয় না। সেখানে আমরা পাই মাধুর্যের পরিবর্তে ঈষৎ অম্লরসাত্মক ব্যঙ্গ ও আত্মপ্রসাদপূর্ণ বিচারক-মনোভাব, আর আলোক যেটুকু পাই তাহা একদেশদর্শিতার ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথ হইতে বিচ্ছুরিত। মনে হয় যে ম্যাথিউ আর্নল্ড

গদ্যলেখক অপেক্ষা কবি হিসাবেই ভবিষ্যৎযুগের নিকট অধিক পরিচিত হইবেন। অবশ্য সাহিত্যসমালোচনামূলক যে সমস্ত প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছেন, তাহার মূল্য বরাবরই থাকিবে।

স্টিভেন্‌সন্‌ শুধু ঔপন্যাসিকই ছিলেন না, নিবন্ধরচয়িতা হিসাবেও তিনি বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি ল্যাম্বের অনুকরণে রচিত 'ভার্জিনিবাস পিউরেস্কি'তে (Virginibus Puerisque) খেয়ালী মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি-বৈচিত্র্যকে চারু ও মনোরম প্রকাশভঙ্গীর সাহায্যে পরিস্ফুট করিয়াছেন। ল্যাম্বের মত তাঁহার গভীর জীবনবোধ ছিল না; তিনি ট্রাজেডির অতল গভীরে ডুব দিয়া সেই রসাতলবাহী ভাবধারা লইয়া ছদ্ম কৌতুকের শীকরবর্ষণ করিতে পারেন নাই, বরঞ্চ জীবনের মূল সমস্যাকে এড়াইয়া গিয়া উহার শাখাপথের ছোট ছোট অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার কারবার করিয়াছেন। কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত গৌণ জীবনসত্য প্রকাশে তিনি যে যথাযথ বিচারবোধ ও ভাষার অপরূপ-রমণীয় কারুকার্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে গদ্যের ঐন্দ্রজালিক রূপে তাঁহার প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত থাকিবে। হয়ত এই কারিকুরিতে কোথাও কোথাও একটু মাত্রার আতিশয্য ঘটিয়াছে; হয়ত অতি-সূক্ষ্ম মাকড়সার জালের মত এই লঘু বাক্যবন্ধনে কোন গভীর জীবনসত্যের ভারবহন-শক্তির অসদ্ভাব আছে। এবং হয়ত সেই জন্যই স্টিভেন্‌সনের রচনা সাহিত্য হইলেও উচ্চ পর্যায়ের সাহিত্য নহে। তথাপি জীবনরসিক না হইলেও কলাশিল্পী হিসাবে স্টিভেন্‌সন্‌ অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরবের অধিকারী।

ওয়াল্টার পেটার (Walter Pater: ১৮৩৯-১৮৯৪) সাহিত্য সমালোচনায় এক নূতন ধারার প্রবর্তন করেন। তিনি সমালোচনায় কলাকৈবল্য-বাদের (art for art's sake) একজন প্রধান সমর্থক—হোতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সৌন্দর্য-সৃষ্টিই সাহিত্যের মুখ্য, বা একমাত্র উদ্দেশ্য; উহার মানবিক চিত্তবিশুদ্ধিমূলক আবেদন গৌণ, অতএব অনুসরণীয় নহে, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। তিনি বলেন, সাহিত্য পাঠকের নিকট তীব্র, রসঘন মুহূর্তের সমষ্টি; এই নেশার মত রসকে সর্বাত্মক আসক্তি ও রুচিপ্রকর্ষের সহিত যত বেশী আস্বাদন করা যায় ততই ভাল। পেটার শুধু সাহিত্যের এই কেন্দ্রীয় রস উপভোগ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি উহার সঞ্চয়-রহস্য, লেখকের যে বিশেষ মেজাজ ও জীবনবোধের উপর উহা নির্ভরশীল, তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার প্রয়োগে নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সময়ে সময়ে মনে হয় যেন এই বিশ্লেষণ কবি ও সমালোচকের মধ্যে একটা নিগূঢ় একাত্মতা সৃষ্টি

করিয়া এক ধ্যানতন্ময় অনুভূতির রূপ গ্রহণ করিয়াছে, মধুপানরত মৌমাছি যেন মধুচক্রের উপচীয়মান রসসঞ্চয়ের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। পেটারের সমালোচনা-নীতি তাঁহার Appreciations ('এ্যাপ্রিসিয়েশন' বা 'রসবোধ') (১৮৮৯) নামক গ্রন্থে উদাহৃত হইয়াছে। সমালোচনা যে কত সূক্ষ্ম, অন্তর্মুখী ও কল্পনানুভূতি-সমৃদ্ধ হইতে পারে এই গ্রন্থে তাহার বিস্ময়জনক নিদর্শন মিলে। লেখকের অন্তর-রহস্যে প্রবেশ করিতে হইলে যে কত নিগূঢ় সমীক্ষা পারিপার্শ্বিকতা-বোধ ও মনোজগতের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সহিত গভীর পরিচয়ের প্রয়োজন, পেটার তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। পেটার অনেক সময় তাঁহার ব্যক্তিগত অভিরুচি ও অনুভবও তাঁহার আলোচ্য বিষয়ের উপর আরোপ করিয়াছেন এবং ইহাই তাঁহার সমালোচনায় একমাত্র ত্রুটি। শেক্‌সপিয়ারের 'ইংরেজ রাজন্যবর্গ' (The Kings of Shakespeare) প্রবন্ধে তিনি যে করুণ ব্যর্থতা ও নিষ্ফল আত্মরতির ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা শেক্‌সপিয়ারের বলিষ্ঠ জীবন-বোধের সহিত কতটা সঙ্গতিপূর্ণ তাহা সন্দেহের বিষয়। ইহা যেন পেটারের অতি সংবেদনশীল রূপমোহে উদ্‌ভ্রান্ত জীবন-দর্শনের প্রতিচ্ছবি। কোলরিজ ও রসেটির মত যে সমস্ত কবি অনেকটা আত্মলীন ও বহির্জগৎবিমুখ, আপনাদের মানস অনুভূতির জটিল জালে বন্দী, পেটার তাঁহাদের স্বরূপ-নির্ণয়ে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। অসুস্থ মনোবিকারের কেন্দ্রবিন্দুতে যেন তাঁহার অনায়াস প্রবেশাধিকার আছে। কিন্তু সুস্থ ও জীবননিষ্ঠ লেখকের পক্ষে তাঁহার এই রীতি সব সময় যথার্থ পরিচয়বাহী হয় না। পেটারের Style এবং Romanticism ও Classicism ('স্টাইল' এবং 'রোমান্টিসিজম্ ও ক্লাসিসিজম্')-এর উপর প্রবন্ধ দুইটি গভীর অন্তর্দৃষ্টির জন্য সমালোচনা-সাহিত্যে একটা সার্বভৌম প্রামাণিকতা অর্জন করিয়াছে। আধুনিক যুগে পেটারের সৌন্দর্য-সর্বস্ব সমালোচনা-রীতি বর্তমানে জীবনপ্রবাহের জটিলতা ও সমস্যাসঙ্কুলতার জন্য অনেকটা অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সাহিত্যসমালোচনার দিঙ্‌নির্ণয়ে পেটারের অবদান অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

অন্যান্য গদ্যলেখকের মধ্যে **মেকলে** (Macaulay, T B : ১৮০০—১৮৫৯), **নিউম্যান** (Newman, J. H. : ১৮০১—১৮৯০), **মিল** (Mill, J. S. : ১৮০৬—১৮৭৩) ও বৈজ্ঞানিক **হাক্সলি** (Huxley, T. H. : ১৮২৫—১৮৯৫) উল্লেখযোগ্য। মেকলের রচনা ভিক্টোরীয় যুগের আত্মপ্রসাদের মূর্ত বিকাশ, এবং ইংলণ্ডের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ও শিল্প-বাণিজ্য-প্রসূত ঐশ্বর্যের জয়গানে

মুখর। এই সাড়ম্বর পরিতৃপ্তিবোধের মধ্যে সংশয়ের ক্ষীণতম স্বরও শোনা যায় না। তাঁহার আত্মপ্রত্যয়বোধে দৃপ্ত, ধাতব ঝঙ্কারে প্রতিধ্বনিত, মসৃণোজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ বাক্য-পরম্পরা যেন ভিক্টোরীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিজয় অভিযানের রথচক্রনির্ঘোষ। তাঁহার রচনার মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক আত্মজিজ্ঞাসা, কোন দুরধিগম্য ভাবের জোয়ার-ভাঁটা বা সূক্ষ্মতর সঙ্গীতধ্বনিপ্রবাহ অনুভূত হয় না। মেকলের গদ্য আগাগোড়া বক্তৃতার সুরে বাঁধা। মেকলে একখানি ইংলণ্ডের ইতিহাস লেখেন। মিলটন, ডঃ জনসন প্রভৃতি পূর্বসূরীদের উপর তাঁহার প্রবন্ধগুলিও উল্লেখযোগ্য। উহাদের মধ্যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো পরিচয় না থাকিলেও ভাষার সরলতা ও ওজস্বিতার জন্য এগুলি আজও জনপ্রিয়। মেকলের The Lays of Ancient Rome ('প্রাচীন রোমের গাথা')-ও কিশোরপাঠ্য সাবলীল কাব্যগ্রন্থ।

নিউম্যানের গদ্য সূক্ষ্মভাবের অনুরণনে ও অধ্যাত্ম-অনুভূতিতে মেকলের গদ্যের ঠিক বিপরীতধর্মী। তাঁহার 'এ্যাপলজিয়া' (Apologia)-তে অর্থাৎ নিজ ধর্মমত-পরিবর্তনের বিবরণ-মূলক আত্মকাহিনীতে ও Ideal of a University বা 'বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ' নিবন্ধে তাঁহার প্রসাদগুণ, যুক্তিবাদ-শৃঙ্খলা, অধ্যাত্ম চিন্তা-ধারার যথাযথ অভিব্যক্তি ও সূক্ষ্ম ভারসাম্যবোধের প্রচুর নিদর্শন মিলে। কিন্তু তথাপি তাঁহার রচনা সমগ্রভাবে পাঠ করিলে একটা অতৃপ্তি রহিয়া যায়। তাঁহার ভাবাবেগ কোথাও ইহার ধীরগতি ও মন্দপ্রবাহের যতিভঙ্গ করিয়া প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই—তাঁহার অধ্যাত্ম অনুভূতি যুক্তিতর্কের সচেতনতা ছাড়াইয়া ধ্যান-তন্ময় আবেগে পৌছায় নাই। মনে হয় যেন তাঁহার জীবনীশক্তির অপ্রাচুর্যই এই আবেগ-বিমুখতার কারণ। যুক্তি এবং আবেগ এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব নিউম্যানের রচনায় সাহিত্যধর্মকে খণ্ডিত করিয়াছে।

মিল ও হাক্সলির রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সাহিত্যিক গুণের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। মিলের On Liberty (বা 'স্বাধীনতা'), On Representative Government ('লোকতান্ত্রিক সরকার') ও Subjection of Women ('স্ত্রীলোকের পরবশ্যতা') প্রভৃতি গ্রন্থে নিছক যুক্তিবাদ যে সাহিত্যিক পর্যায়ে আরূঢ় হইতে পারে, চিন্তার জড়িমাহীন সুস্পষ্টতা যে ভাষার স্বচ্ছতা ও প্রসাদগুণে মণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে তাহা প্রমাণ হইয়াছে। হাক্সলিও বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনায় অনুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও তাঁহার ভাষার কল্যাণে সহজবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রচনার মধ্যে Man's Place in Nature ('প্রকৃতিতে মানবের স্থান') সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভিক্টোরীয় যুগের গদ্যলেখকেরা গদ্যের বৈচিত্র্য, প্রসার, নানাভাব-প্রকাশ ও নানা বিষয়-আলোচনার পক্ষে ইহার উপযোগিতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই যুগে উপন্যাস যেমন কাব্যের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, ঠিক সেইরূপেই গদ্যও কবিতা অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছে। এই যুগে এবং ইহার পরবর্তী যুগে কবিতা নিজ কল্পনাপ্রধানতা ও ভাবাবেগসমৃদ্ধি হারাইয়া ক্রমশঃ গদ্যের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, এই যুগ হইতেই কাব্য গদ্যধর্মী হইয়াছে।

৫
নাটক

রোমান্টিক যুগে যেমন কবিতারই প্রাধান্য, নাটক রচিত হয় নাই বলিলেই হয়, তেমনি ভিক্টোরীয় যুগে উপন্যাসেরই প্রাধান্য, নাটকের স্থান অতি গৌণ। টেনিসন টমাস বেকেটের জীবনী অবলম্বনে যে নাটক রচনা করেন তাহা ইতিহাস-অনুসারী নহে, তাহার সাহিত্যিক মূল্যও যৎকিঞ্চিৎ এবং অভিনয়োপযোগিতাও নাই। ব্রাউনিং অবশ্য বেশ কয়েকখানি নাটক রচনা করেন এবং তাহাদের মধ্যে কোনো কোনোটি মঞ্চস্থও হয়; কিন্তু তাহারা নাটক হিসাবে রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। তাঁহার নাটকের মধ্যে আছে Colombe's Birthday (কুলমের জন্মদিন), Blot in the Scutcheon ('কলঙ্করেখা'), A Soul's Tragedy ('একটি আত্মার মৃত্যু') প্রভৃতি। তাঁহার নাটকগুলির সাহিত্যিক মূল্য যাহাই হউক না কেন, মঞ্চসাফল্য তাহাদের বরাতে জুটে নাই। এই নাটকগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণপদ্ধতি ছিল এলিজাবেথীয় নাটকের পদাঙ্কানুসারী এবং সেইজন্যই এগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগচিত্তের নিকট গ্রহণীয় হয় নাই। ম্যাথিউ আর্নল্ডের Merope ('মেরোপি'), মিলটনের 'স্যামসন আগোনিস্টিস্'-এর মত গ্রীক পদ্ধতিতে রচিত নাটক, অভিনয়ের জন্য লিখিত নহে। সুইনবার্ন যে নাটক লিখিয়াছিলেন তাহা তো লোকে ভুলিয়াই গিয়াছে।

ভিক্টোরীয় নাটকের এই দৈন্যদশা কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে কাটিয়া যায়। এই সময়ে বেশ কয়েকখানি যুগোপযোগী মঞ্চসফল নাটক লেখা হয়। এই প্রসঙ্গে পিনেরো ও জোন্সের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের নাটকগুলি মঞ্চসাফল্য অর্জন করিলেও তাহাদের সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু নাই। একমাত্র ব্যতিক্রম **অস্কার ওয়াইল্ড** (Oscar Wilde: ১৮৫৪-১৯০৯)।

বার্নার্ড শ-ও (George Bernard Shaw : ১৮৫৬-১৯৫০) এই সময়ে নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ নাটকই রচিত হয় বিংশ শতাব্দীতে এবং তিনি বিংশ শতাব্দীর নাট্যকার রূপেই পরিচিত।

অস্কার ওয়াইল্ড্ যে শুধু নাট্যকার ছিলেন তাহা নহে; সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে তিনি ওয়াল্টার পেটারের সার্থক উত্তরসূরী এবং তাঁহার 'অভিপ্রায়' (Intentions) নামক ক্ষুদ্র সমালোচনা গ্রন্থটির গুরুত্ব আজও ঠিকমত স্বীকৃত না হইলেও, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই পুস্তকটিই বর্তমান যুগের সাহিত্য-সমালোচনার মূলস্বরূপ। সাহিত্যসমালোচনায় সমালোচকের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্ব যে কতখানি তাহা ওয়াইল্ডই প্রথমে সবিস্তারে আলোচনা করেন। কোনো শিল্পকৃতি যে স্বমহিমায় একক হিসাবে স্বপ্রতিষ্ঠিত—এই মতও আমরা তাঁহার মুখে প্রথম শুনি। ওয়াইল্ডের আত্মদর্শনমূলক দীর্ঘ প্রবন্ধ De Profundis ('ডি প্রোফাণ্ডিস') ইংরাজী ভাষার এক অতুলনীয় সম্পদ। কিশোর পাঠ্য যে সমস্ত গল্প অস্কার ওয়াইল্ড্ লিখিয়াছিলেন তাহার সাহিত্যিক মূল্যও কম নহে।

তবে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে অস্কার ওয়াইল্ডের নাম মুখ্যতঃ নাট্যকার হিসাবেই থাকিবে। তাঁহার নাটকের মধ্যে বিখ্যাত—Lady Windermere's Fan ('হাতপাখা'), A Woman of No Importance ('গৌরবহীনা') ও On the Importance of Being Earnest ('নামমাহাত্ম্য')। সব কয়খানিই কমেডি। তির্যক্ দৃষ্টিভঙ্গী, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও সরস ব্যঙ্গের দ্বারা চিহ্নিত এই কমেডিগুলি ওয়াইল্ডের বুদ্ধিমত্তার চরম নিদর্শন। গম্ভীর আভিজাত্যবোধ, গুরুত্বপূর্ণ বহু সামাজিক বিধিনিষেধ ও তথাকথিত সামাজিক নীতিপরায়ণতা যে কতদূর মিথ্যা, ঠুনকো ও অপল্কা হইতে পারে—ওয়াইল্ডের নাটকে পদে পদে তাহাই দেখানো হইয়াছে। সচরাচর ওয়াইল্ডের নাটকের কাহিনী অতি ক্ষীণ; কিন্তু ঘটনাস্রোতের আকস্মিক দিক্-পরিবর্তন, ঘটনা-সংস্থানের অকল্পনীয় হাস্যকরতা ও চরিত্রগুলির অসাধারণ বাঙ্‌নৈপুণ্য দর্শক বা পাঠককে এরূপ মুগ্ধ করিয়া রাখে যে, সে অন্যদিকে মন দিবার অবকাশ পায় না। কনগ্রীভ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে না লিখিয়া যদি ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে লিখিতেন, মনে হয় তিনি অস্কার ওয়াইল্ডের নাটকের মত নাটকই লিখিতেন। ভাষার কারুকার্য এবং বাচনভঙ্গীর দিক হইতে ওয়াইল্ডকে কনগ্রীভ ও বার্নাড শ'র মধ্যে যোগসূত্র মনে করা যাইতে পারে—অবশ্য শ'র মধ্যে সমাজসংস্কারের যে বাসনা ছিল ওয়াইল্ডে তাহা একেবারেই ছিল না। বিদগ্ধ ইতরজনের জন্য বিশুদ্ধ কৌতুক পরিবেশন করাই ছিল ওয়াইল্ডের মুখ্য

উদ্দেশ্য। ওয়াইল্ড্ Salome ('সালোমি') নামে একখানি উচ্চাঙ্গের ট্রাজেডিও রচনা করেন—কিন্তু ইহা প্রথমে ফরাসী ভাষায় রচিত হয় এবং পরে তাঁহার এক বন্ধু ইহার ইংরাজী অনুবাদ করেন।

সমস্ত মিলাইয়া দেখিতে গেলে ভিক্টোরীয় যুগ ইংরাজী সাহিত্যের বিশেষ গৌরবের যুগ না হইলেও বন্ধ্যা যুগ নহে। উপন্যাস এই যুগেই সাহিত্য ক্ষেত্রে তাহার স্থানটি বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়া লয় এবং তাহার মধ্যে যে বহুমুখিতা আছে তাহার প্রমাণ দিতে শুরু করে; গদ্য জ্ঞান বিস্তার, সমাজচেতনা সঞ্চার, বিজ্ঞানের প্রচার প্রভৃতি নানা দিকে সার্থকভাবে আত্মনিয়োগ করে; এই যুগের শেষদিকে নাটকের পুনরুজ্জীবনও লক্ষ্য করিবার মত বিষয়। এই সমস্ত দিক হইতে দেখিলে ভিক্টোরীয় যুগকে রোমান্টিক যুগের শুধুমাত্র লেজুড় বলিয়া মনে হইবে না—মনে হইবে রোমান্টিক যুগের ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের মধ্যে ভিক্টোরীয় যুগ এক বিশেষ অর্থবহ হাইফেনের কাজ করিতেছে।

১

রানী ভিক্টোরিয়ার দেহাবসানের (১৯০১) সঙ্গে সঙ্গে শতাব্দীর ও একটি সাহিত্যিক যুগেরও অবসান হইল। ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যে যে আত্মপ্রসাদ ও আদর্শের দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত একাগ্রতা বিরাজ করিতেছিল, নূতন শতাব্দীতে তাহা ধীরে ধীরে শিথিল ও লুপ্ত হইয়া আসিল। রাজ্যবিস্তার, বাণিজ্যসমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা যে সর্বসুখের আকর নহে, তাহাদের মধ্যেও যে নূতন নূতন জটিল সমস্যা উদ্ভূত হইতে পারে, এই সত্য ধীরে ধীরে জাতির চেতনায় প্রতিফলিত হইতে লাগিল। পূর্বের স্থির, নিঃসংশয় আত্মপ্রত্যয়ের স্থলে আবার সন্দেহবাদ ও জিজ্ঞাসামূলক মনোবৃত্তির প্রাধান্য স্থাপিত হইল। ধনিকের সহিত শ্রমিকের স্বার্থসংঘাত, ধনবণ্টনের বৈষম্য, বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতা, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিমূঢ়তা, অন্তরে বাহিরে শান্তি ও সন্তোষের অভাব—এই সমস্তই সমাজ-সংস্থিতির ভারসাম্যকে বিচলিত করিয়া এক আমূল বিপর্যয়ের সম্ভাবনা উদ্‌ঘাটিত করিল। সাহিত্যিকের মন প্রশ্নসঙ্কুলতায় আচ্ছন্ন হইয়া উহার সহজ, সরল দৃষ্টিভঙ্গী হারাইল। পূর্বতন যুগের অবিসংবাদিত, স্বতঃস্বীকৃত সত্যসমূহও সংশয়াকুলতার বাষ্পে আবৃত্ত হইয়া অস্বচ্ছ ও অনিশ্চিত হইয়া উঠিল। সুনির্দিষ্ট, অন্তর-সমর্থিত বিশ্বাসের যে প্রণালী বাহিয়া কাব্য প্রচুর ধারায় প্রবাহিত হয় তাহা অবরুদ্ধ হইয়া গেল। সংক্ষেপে, এই যুগে সন্দেহবাদ এত প্রবল হইয়া ওঠে যে, একজন সমালোচক '১৯০০-১৯২০' এই কালবিভাগকে জিজ্ঞাসাচিহ্নের যুগ (Age of Interrogation) আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। এই অনিশ্চয়াত্মক অবস্থার মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) বজ্রপাতের মত আসিয়া সমাজ ও সাহিত্যের নৈতিক ও সৌন্দর্যবোধমূলক ভিত্তিভূমিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিল।

ভিক্টোরীয় যুগে ডারউইনের বিবর্তনবাদ যেমন মানুষের মনকে খ্রীষ্টানধর্মের সত্যতার প্রতি সন্দিগ্ধ ও সৃষ্টিরহস্যের অর্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু করিয়া তুলে, বিংশ শতকের প্রথমেও তেমনি দুই চিন্তানায়কের লেখা মানুষের মনকে আলোড়িত ও মথিত করিয়া তোলে। ইহারা হইলেন কার্ল মার্কস ও সিগমুণ্ড ফ্রয়েড। অর্থনীতির নিয়ম, সমাজসংস্থানের কারণ, রাষ্ট্রব্যবস্থার যৌক্তিকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে যাবতীয়

প্রচলিত ধ্যান ধারণাই মার্কস্ তাঁহার পুঁজিবাদ (The Capital) নামক গ্রন্থে বিপর্যস্ত করিয়া দেন। ওদিকে, ফ্রয়েডও তাঁহার লেখায় এবং নির্জ্জান মনের তত্ত্ব উদ্ভাবনে নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক, মানুষের কাজের প্রেরণা, সমাজসংস্থানের কারণ প্রভৃতি সম্পর্কে মানুষকে নূতন করিয়া ভাবাইয়া তোলেন। এই দুই চিন্তানায়কের প্রভাব বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অধিকাংশ ইউরোপীয় লেখকের লেখাতেই কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও পরোক্ষভাবে পড়িয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরকে অবশ্য এই শতাব্দীর বাকী অংশটুকুরও প্রতিনিধিস্থানীয় চিত্র বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। এই শতকের প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যে যে বিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়কে অন্তত তিনটি যুগে ভাগ করিতে হয়। প্রথম, জিজ্ঞাসার যুগ—১৯০১ হইতে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান বা ১৯১৯-২০ পর্যন্ত; দ্বিতীয়, অবসাদ বা অসন্তোষের যুগ—প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ (১৯১৯-২০) হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ (১৯৪৫-৪৬) পর্যন্ত; এবং তৃতীয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ (১৯৪৫-৪৬) হইতে অদ্যাবধি, বিদ্রোহ বা নৈরাজ্যের যুগ।

প্রথম পর্বের মানসিকতার কথা আগেই আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্বের অবসাদ বা অসন্তোষের কারণগুলিও খুব সুপরিস্ফুট। বহু ঢক্কানিনাদে বিঘোষিত "গণতন্ত্র রক্ষার জন্য" প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের লোক আশা করিয়াছিল যে, বিশ্বে সুখ ও শান্তি ফিরিয়া আসিবে, সম্পদের প্রাচুর্যে সকলেরই অধিকার থাকিবে, দুঃখ-দারিদ্র্য-অসাম্যের অবসান ঘটিবে; এককথায়, ছোট-বড় সকলেই মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার ফিরিয়া পাইবে। যুদ্ধান্তে তাহা ঘটিল না। যুদ্ধদীর্ণ ইউরোপে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর নিদারুণ অভাব এবং তাহার জন্য জীবনযাত্রার মানের অবনমন, যুদ্ধে বিরাট সংখ্যক তরুণের আত্মাহুতিতে সমাজের বিরাট গহ্বর, যাহারা যুদ্ধসম্ভার সরবরাহের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল তাহাদের বিপুল ঐশ্বর্য, এই সমস্তই মানুষের মনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিল। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়—যুদ্ধোত্তর ইউরোপে নৈতিক মানেরও বিশেষ অধোগতি হয়। স্বাভাবিকভাবেই সেই যুগের চিন্তাশীল লেখকদের লেখায় এই মোহভঙ্গ ও অবসন্নতার রূপটি করুণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এদিকে এই যুদ্ধের মধ্যেই রুশদেশে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই রাষ্ট্রে লৌহপ্রাচীরের পিছনে কি ঘটিতেছে তাহা ঠিক না জানা গেলেও, প্রচারের মাধ্যমে যে ছিটে-ফোঁটা খবর আসিত, তাহাতে অনেকে ভাবিত যে সেখানে স্বর্গরাজ্য

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং কমিউনিজমই হয়ত বর্তমান সমাজের সকল ব্যাধির নিরসন করিতে পারিবে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া এই শতকের ত্রিশ দশকের অধিকাংশ লেখকই এবং প্রায় সব তরুণ কবিই কমিউনিস্ট হইয়া যান। পরে অবশ্য রুশ-সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রকৃত রূপটি জানিতে পারিয়া ইহারা সকলেই কমিউনিজমের পথ বর্জন করেন এবং কমিউনিজমের যে ছায়া কয়েক বছরের জন্য ইংরাজী সাহিত্যে পতিত হয় তাহা অপসারিত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইবার কুড়ি বৎসরের মধ্যেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসিয়া পড়িল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে সাহিত্যের স্রোত যে একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহা নহে; কিন্তু কাগজের অভাব, পাঠকের উৎসাহের অভাব প্রভৃতি কারণে এই স্রোত অত্যন্ত ক্ষীণকায় হইয়া গিয়াছিল। যুদ্ধান্তে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ইংলণ্ডের অবস্থা প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ইংলণ্ডের অবস্থার অনুরূপ—হয়ত আরও করুণ। এই মহাযুদ্ধে জার্মান বোমারু বিমান খাস ইংলণ্ডের উপর বোমাবর্ষণ করিয়া তাহার সম্পত্তির যে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত করে শুধু তাহা নহে, বলিতে গেলে, এই যুদ্ধে ইংলণ্ড একরূপ সর্বস্বান্তই হইয়া পড়ে। যুদ্ধ শেষ হইবার অব্যবহিত পর হইতেই তাহার বিশাল সাম্রাজ্যের একটি একটি করিয়া অংশ খসিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। ফলে হৃতগৌরব ইংলণ্ডের অধিবাসীদের দুঃখদুর্দশার সীমা ছিল না, দৈনন্দিন জীবনে তাহাদের পক্ষে নৈতিক মান বজায় রাখা পর্যন্ত অসম্ভব হইয়া পাড়য়াছিল। প্রকৃত আত্মসম্মান হারাইয়া ইংরাজ এক মেকী আত্মাভিমানের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজিতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টার ফলশ্রুতি ইংলণ্ডে এক বিশেষ শ্রেণীর তরুণ লেখকের আবির্ভাব। ইহারা সেই সময় ক্রুদ্ধ তরুণ (Angry Young Men) বলিয়া অভিহিত হইত। ইহাদের রচনায় যে শুধু একটা বেপরোয়া বিদ্রোহের ভাব দেখা যাইত তাহা নহে, ইহারা প্রকাশভঙ্গিতেও প্রচলিত প্রথার বিশেষ বিরোধী ছিল। যথাস্থানে এই সমস্ত বিষয় আলোচিত হইবে।

২

বিশ শতকের প্রথমে আমরা যে সকল কবির দেখা পাই তাহার মধ্যে হার্ডি (Thomas Hardy : ১৮৪০-১৯২৮), ব্রিজেস (Robert Bridges : ১৮৪৪-১৯৩০), হাউসম্যান (A. E. Houseman : ১৮৫৯-১৯৩৬), কিপলিং (Rudyard Kipling : ১৮৬৫-১৯৩৬), ডেভিস (W. H. Davies : ১৮৭০-১৯৪০),

ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার (Walter De la Mare : ১৮৭৩-১৯৫৬) ও মেসফিল্ড (John Masefield : ১৮৭৮-১৯৬৭)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা সকলেই বহু সুন্দর গীতিকবিতার রচয়িতা এবং সাহিত্যের ইতিহাসে ইয়েট্‌স্ ও হার্ডি ছাড়া আর কাহারও নাম যদি নাও থাকে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের যে-কোনো কবিতাসঙ্কলনে ইহাদের কবিতা স্থান পাইবেই।

এ যুগের কবিরা মুখ্যতঃ ভিক্টোরীয় যুগের কবিতার ধারারই অনুসরণ করিতেন, তবে তাঁহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যও ছিল। হার্ডি ঔপন্যাসিক হিসাবে বিখ্যাত হইলেও তাঁহার মানসপ্রবণতা ছিল কবির এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করার পর তিনি প্রধানতঃ কবিতাই লিখিতেন। সহজ, সরল ভাষায় এবং অতি সাধারণ ছন্দে মনের গভীর অনুভূতি ও অনির্দেশ্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিবার ক্ষমতায় হার্ডির প্রতিভা অতুলনীয়। তিন খণ্ডে রচিত তাঁহার মহাকাব্যিক নাটক 'ডাইন্যাস্টস্' (The Dynasts) ইংরাজী সাহিত্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই একশত সাঁইত্রিশ গর্ভাঙ্কে বিভক্ত নাটক পড়া কঠিন হইলেও, ইহাতে রচয়িতার যে মহাকবিসুলভ দৃষ্টিবিস্তার ও মানসিক ঐশ্বর্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ব্রিজেসের কবিতাতেও সর্বপ্রকার রোমান্টিক আতিশয্য ও কল্পনাবিলাস বর্জিত হইয়াছে। ক্ল্যাসিকাল রীতির অনুমোদিত প্রশান্তি ও বিশুদ্ধি, সহজ আড়ম্বরহীন বাক্যে উচ্ছ্বাসহীন পরিমিত আবেগের সৌন্দর্যপূর্ণ অভিব্যক্তি তাঁহার কাব্যের বিশেষত্ব। তাঁহার কল্পনা পূর্ববর্তী মহাকবিদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে মার্জিত ও সংস্কৃত। তাঁহার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে অনুশীলনের দ্বারা পরিশোধিত একটি মনের সূক্ষ্ম সৌকুমার্যবোধ ও মৃদু ভাবব্যঞ্জনা। তাঁহার প্রেম-কবিতায় উন্মাদনা নাই, আছে স্নিগ্ধ আবেশ—সুরার পরিবর্তে স্বচ্ছ শীতল ভাবধারার নির্ঝর ভাবপ্রবাহ। হয়ত তাঁহার এই পরিমিতিবোধ এবং অতি সংযমই তাঁহার কবিতার পক্ষে উচ্চগ্রামের সাহিত্য হইবার পথে বাধার কারণ হইয়াছে।

রবার্ট ব্রিজেসের কবিতার পরিমিতিবোধ ও সংযম হাউসম্যানের কবিতায় আরও প্রকট। হাউসম্যান গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাটিনের অধ্যাপক ছিলেন। A Shropshire Lad ('শ্রপশায়ারের ছেলে') ও Last Poets ('শেষ কবিতা')—এই দুইখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থে তিনি ক্ল্যাসিকাল রীতির সহিত আধুনিক মানসিকতার অপূর্ব সমন্বয় দেখাইয়া গিয়াছেন।

কিপলিং সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের কবি। সাম্রাজ্যবাদের দম্ভ এবং এশীয় জাতিগুলির প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা তাঁহার কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। তবে ছন্দের উপর—বিশেষ করিয়া দ্রুততালের ছন্দের উপর—তাঁহার দখল ছিল অভূতপূর্ব। সহজে জনপ্রিয় হইবার যত গুণ সবই কিপলিং-এর ছিল। সেইজন্য তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতি পাইয়াছিলেন। তবে সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান হইবে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়।

ডি লা মেয়ার শিশুমনের রহস্য, স্বপ্নের তন্দ্রাজড়িত ইঙ্গিত, বস্তুর মধ্য দিয়া অবাস্তবতার আভাস অনুভব করার আশ্চর্য প্রবণতা দেখাইয়াছেন। দুই-একটি কথার ব্যঞ্জনায়, ছন্দের মন্থর ধ্বনিপ্রবাহের দ্বারা তিনি একটি অদ্ভুত কুহকের সৃষ্টি করিয়া পাঠকের মনে তাহা সঞ্চারিত করেন। অতিপ্রাকৃত জগৎকে এবং অশরীরী আত্মাকে পাঠকের চোখের সম্মুখে হাজির করার ক্ষমতায় ডি লা মেয়ারের দক্ষতা বোধহয় কোলরিজ অপেক্ষাও বেশী।

মেসফিল্ড মুখ্যত সমুদ্রের—লোনা জল ও লোনা বাতাসের—কবি। রবার্ট ব্রিজেসের মৃত্যুর পর তিনি ইংলণ্ডের রাজকবি পদে বৃত হন।

তাহার পর আছেন ইয়েট্‌স্। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইবার বৎসর পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ইয়েট্‌সের কাব্যপ্রতিভা নানা বিষয়ের উপর নানা ভঙ্গিতে আলোকসম্পাত করে। ইয়েট্‌সের প্রথম জীবনের কবিতায় অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও স্বপ্নাবিষ্টতার সর্বব্যাপী প্রসার বাস্তববোধকে বেশ খানিকটা অস্বীকার করে। তরুণ ইয়েট্‌স্ বাস্তব জগতকে উপেক্ষা করিয়া যেন এক রহস্যময় পরিমণ্ডলে বাস করিতেন। স্বপ্নের আভাস-ইঙ্গিত, রূপক-ব্যঞ্জনা, সুদূর অতীতের নানা অপ্রাকৃত বিশ্বাস—তাঁহার প্রথম জীবনের কবিতা ইহা দ্বারা চিহ্নিত। অলৌকিকের মোহ ইয়েট্‌স্ উত্তর জীবনেও সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার মধ্যজীবনের অনেক কবিতাই অতিপ্রাকৃত চিন্তাকল্পনায় বেষ্টিত এবং যুক্তিতর্কের অতীত, ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনধিগম্য আধ্যাত্মিক বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু ইয়েট্‌স্‌কে জীবনবিমুখ পলায়নীমনোবৃত্তিসম্পন্ন কবি মনে করিলে ভুল হইবে। তরুণ বয়স হইতেই তিনি আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতাসংগ্রামের সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ও আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা শহীদ হইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘস্বরূপে রচিত কবিতাগুলি তাঁহার স্বদেশপ্রেমের জলন্ত নিদর্শন। আয়ারল্যাণ্ডের সুপ্রাচীন যুগের গাথাকাহিনী ও শৈশবকল্পনার সৃষ্টিসমূহ লইয়া তিনি তাঁহার অনেক রচনায়

যে মায়াঘন, গোধূলিছায়াচ্ছন্ন প্রতিবেশ রচনা করিয়াছেন তাহাও তাঁহার স্বদেশ-প্রীতির বিশেষ পরিচয় বহন করে। মনে হয় যে, প্রতিকূল ও নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিকের চাপে পড়িয়া ইয়েট্স্ যেন অনেকটা সচেষ্টভাবে নিজের চারিদিকে কল্পলোকের উপাদান সমাবিষ্ট করিয়া, তাঁহার আবেষ্টনের বস্তুপুঞ্জ ও অন্তরের অনুভূতিসমূহের মধ্যে সাংকেতিক অর্থগূঢ়তা আরোপ করিয়া, অপ্রাকৃত সংস্কার ও কল্পনার অবিরত রোমন্থনের সাহায্যে এক অর্ধস্বচ্ছ অবাস্তব মানসলোক রচনা করিয়া সেখানেই বাস করিতে চাহিতেন। স্বপ্নজগৎ ও বাস্তবজীবন—উভয়ের মধ্যে প্রকৃত সমন্বয়মূলক যোগসূত্র-রচনার শক্তি ইয়েট্সের ছিল না। তাঁহার শেষ বয়সের কবিতা কিন্তু বাস্তবের, রক্তমাংসের ইন্দ্রিয়সচেতন মানুষের অনেক কাছাকাছি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইয়েট্সের মানসিক বিবর্তন হইয়াছে এবং তিনি প্রচুর লিখিলেও তাঁহার কবিতায় একঘেয়েমি নাই। উত্তরকালের ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে ইয়েট্সই বোধহয় বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকৃত হইবেন।

এইখানে আর একজন কবি হপকিন্স (G. M. Hopkins : ১৮৪৪-১৮৮৯)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। হপকিন্স প্রকৃতপক্ষে ভিক্টোরীয় যুগের কবি। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তরুণ বয়সেই সংসার ছাড়িয়া নিজের রচিত কাব্যগুলি অগ্নিতে আহুতি দিয়া ধর্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন। পরে ভগবদ্‌বিষয়ক সে সকল কবিতা লেখেন তাহাও তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর বহু পরে তাঁহার বন্ধু, কবি রবার্ট ব্রিজেস, এই কবিতাগুলি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। সন্দেহবাদ ও অবিশ্বাসের যুগে হপকিন্সের ভগবদ্‌ভক্তির নিবিড় একাগ্রতা এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। তাঁহার এই সংশয়লেশহীন ভক্তিবাদ তাঁহাকে সপ্তদশ শতকের ভক্তকবিদের সমগোত্রীয় করিয়াছে। তিনি বহু-আলোচিত নিসর্গ-সৌন্দর্যকে এক নূতন চোখে দেখিয়াছেন—তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য পূর্বকবিদের প্রভাবের নিকট সম্পূর্ণ অঋণী এবং ইহা এক সম্পূর্ণ নূতন ধরনের প্রকৃতি বর্ণনায় প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার আধুনিকতার দাবী অবশ্য তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য নহে; এই দাবী তাঁহার ভাষার মৌলিকতা ও ছন্দোবিন্যাসের অভিনবত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ছন্দের ব্যাপারে হপকিন্স আধুনিক ইংরাজীর রীতি পরিহার করিয়া প্রাক্-চসারীয় যুগের ইংরাজী কবিতার ছন্দ অনুসরণ করেন আর ভাষার ব্যাপারে তিনি প্রাচীন ইংরাজী, জার্মান, লাটিন, গ্রীক এই সমস্ত ভাষার বাগ্‌বিধি মিশাইয়া নিজস্ব এক প্রকাশভঙ্গি উদ্ভাবন করেন। স্বভাবতঃই হপকিন্সের কবিতা অতি দুরূহ।

এই যুগে বেশ কয়েকজন কবি প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করেন এবং যুদ্ধ সম্বন্ধে

কবিতা লেখেন। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুইজনের নাম সাহিত্যের ইতিহাসে সন্নিবিষ্ট হইবার যোগ্য। প্রথম, রুপার্ট ব্রুক (Rupert Brooke: ১৮৮৭-১৯১৫) এবং দ্বিতীয়, উইলফ্রিড ওয়েন (Wilfred Owen: ১৮৯৩-১৯১৮)। ইহারা দুইজনেই যুদ্ধের কবি হইলেও, ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। যুদ্ধের প্রথম দিকেই ব্রুকের মৃত্যু হয় বলিয়া তিনি পরবর্তী স্তরের মোহভঙ্গ ও নিদারুন প্রতিক্রিয়া অনুভব করার সময় পান নাই। যুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল দিকটাই তাঁহার কবিতায় প্রতিফলিত হইয়াছে। অশুভের বিনাশসাধনই যে যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং কল্যাণ ও সভ্যতার ধারক ও বাহক ইংরাজ জাতির প্রতিনিধি হিসাবেই তিনি এই বিনাশ সাধনের কাজে এক মহান ভূমিকা লইয়াছেন, এই বোধই রুপার্টের কবিতার মূল সুর। অপরপক্ষে, যুদ্ধের করুণ, গ্লানিকর ও বীভৎস দিকটার চিত্রই ওয়েনের কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। সৈনিকেরা পরিখার কর্দমসিক্ত ভূমিতে সরীসৃপের ন্যায় আত্মগোপন করিয়া, বীভৎস, বিকলাঙ্গ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া, মূঢ় যান্ত্রিকতার অনুশাসনে সমস্ত স্বাধীন ইচ্ছা বিসর্জন দিয়া, নির্মম প্রয়োজনের নিকট সমস্ত শালীনতা ও শিষ্টাচারকে বলি দিতে বাধ্য হইয়া যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাহাই ওয়েনের কবিতার উপজীব্য। এই ক্লেদপঙ্কিল যুদ্ধের মধ্যে ওয়েন গৌরবময় উন্মাদনার পরিবর্তে মানবাত্মার চরম অবমাননা ও চরম অমর্যাদা উপলব্ধি করিয়াছেন। কুটিল, স্বার্থপর রাজনীতিকেরা তরুণদের সম্মুখে এক মিথ্যা আদর্শের উজ্জ্বল ছবি ধরিয়া, তাহাদের উদার আত্মবিসর্জন প্রবৃত্তির অপব্যবহার করিয়া তাহাদের এই বৃথা রক্তপাতে প্রণোদিত করিতেছে—ইহাই ওয়েনের বক্তব্য। এই যুদ্ধের পরিণামে জগতের কোন মঙ্গল হইতে পারে না, কোন উন্নততর আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না—ব্যঙ্গ, শ্লেষ ও হতাশাপূর্ণ ক্ষোভমিশ্রিত ওজস্বিনী ভাষায় ওয়েন এই সতর্কবাণীই আমাদের বার বার শুনাইয়াছেন। বিশেষ উপলক্ষে রচিত হইলেও, ওয়েনের কবিতা মানবসভ্যতার এক চিরন্তন করুণ অশুভের দ্বারা চিহ্নিত হইয়া কালজয়ী কাব্যে পরিণত হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর যুগের দারুণ অবসাদ, আদর্শবাদমূলক সমস্ত আশা-ভরসার সাহিত্যিক মূলোচ্ছেদ করেন ইংলণ্ডপ্রবাসী এক মার্কিন কবি টি. এস. এলিয়ট (T. S. Eliot: ১৮৮৮-১৯৬৫)। যুদ্ধের সময়েই প্রকাশিত এবং মধ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী কবিদের দ্বারা প্রভাবিত তাঁহার খণ্ডকবিতা 'প্রুফ্রক' (The Love Song of J. Alfred Prufrock)-এ যে পুঞ্জীভূত গ্লানি ও তির্যক দৃষ্টিভঙ্গির

প্রকাশ, যুদ্ধান্তে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত The Waste Land ('মরুপ্রান্তর') নামক কাব্যে তাহাই এক চরম এবং ব্যাপক অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। পাঁচটি খণ্ডে সমাপ্ত মাত্র ৪৩৩ লাইনের এই কবিতাটিকে নানা অর্থে একটি যুগান্তকারী কবিতা বলা যায়। যাহাকে এখনও পর্যন্ত ইংরাজী আধুনিক কবিতা বলা হয় 'ওয়েস্টল্যাণ্ড'-এই তাহার সূচনা। এই কাব্যের প্রকাশভঙ্গি, গঠন ও বক্তব্য বিষয় ইংরাজী কবিতার চিরাচরিত রীতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহার ছন্দের স্খলিত শিথিলতা, ধ্বনিপ্রবাহের মুহুর্মুহু বিরতি যেন এই যুগেরই গুরুভার শ্রান্তি, ইহার যান্ত্রিক প্রাণহীন পদক্ষেপ ও অতলস্পর্শ শূন্যতার গহ্বরমুখে পৌছিয়া অকস্মাৎ থমকাইয়া দাঁড়ানোকে সূচিত করে। ইহার বর্ণনায় ধারাবাহিকতার অভাব, অস্পষ্ট ছায়াময় সাঙ্কেতিকতার ভিতর দিয়া অর্থের অর্ধস্ফুট ইঙ্গিত ইহার ভাষাতে অধীত সাহিত্যের দূরাগত ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ও আধুনিকতম জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাব—এই সমস্তের মধ্যে যুদ্ধোত্তর যুগের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, পথসন্ধানে বিভ্রান্তি, অতীত সংস্কৃতির পাষাণভারে কল্পনার মৌলিক স্ফুরণের আঘাত সার্থক ব্যঞ্জনায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এই সর্বব্যাপী নৈরাশ্যবাদের মধ্যে কাব্যের শেষে আশার ইঙ্গিত খুঁজিয়া পাওয়া যায় প্রাচ্যের উদাত্ত আহ্বানে। উপনিষদের মন্ত্রেই এই মৃতদেহে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হইবে, উদ্‌ভ্রান্ত ও কেন্দ্রিকতাভ্রষ্ট পাশ্চাত্য জগৎ শান্তিবারি-প্রক্ষেপে শীতল হইয়া জ্বরবিকার হইতে আরোগ্যলাভ করিবে—এই আশ্বাসবাণীর মধ্যে এই কাব্যের পরিসমাপ্তি।

'ওয়েস্টল্যাণ্ড'-এর তরুণ কবি এলিয়টই কিন্তু এলিয়টের সবটুকু নয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করার পর কবির জীবনে প্রশান্তি না নামুক, আশ্বাস ও আস্থা ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাঁহার এই সময়কার ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি ইংরাজী সাহিত্যে ধর্মসম্বন্ধীয় কবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এলিয়ট তাঁহার শেষ কাব্যগ্রন্থ The Four Quartet ('চতুরঙ্গ') প্রকাশিত করেন। এই কাব্যটিতে কালপ্রবাহের স্বরূপ, ভাষার অনির্বচনীয়তা, জন্মমৃত্যুর অর্থ ইত্যাদি নানা দুরূহ বিষয়ের অবতারণা ও দার্শনিক আলোচনা করা হইয়াছে; অথচ তৎসত্ত্বেও ইহার কাব্যগুণ কোথাও খণ্ডিত হয় নাই।

কবি হিসাবে এলিয়টের যে খ্যাতি ও প্রভাব তাহার তুলনায় তাঁহার কাব্যকৃতির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কমই বলিতে হইবে। তবুও অনেকে ইয়েট্‌স্‌কে নহে, এলিয়টকেই বিংশ শতকের প্রথমার্ধের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মনে করেন। শ্রেষ্ঠ যেই হউন, পরবর্তী যুগের—বিশেষ করিয়া বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যাঁহারা আত্ম-

প্রকাশ করেন সেই—কবিরা সকলেই যে এলিয়টের রচনাভঙ্গির বিশিষ্টতার দ্বারা নিবিড়ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এই কবিদের মধ্যে লিউইস (C. D. Lewis : ১৯০৪-), অডেন (W. H. Auden : ১৯০৭-১৯৭৩), ম্যাকনীস (Louis Mac Neice : ১৯০৭-১৯৬৩) এবং স্পেণ্ডার (Stephen Spender : ১৯০৭-) অন্ততঃ এই চারিজন প্রকৃত প্রতিভাসম্পন্ন কবি। তাঁহারা সকলেই উচ্চবিত্ত ঘরের সন্তান এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তরুণ বয়সে ইহারা সকলেই কমিউনিস্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বেশ কিছু কবিতা তাঁহাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবান্বিত। কোন কোন কবি স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের কাঁধে কাঁধ দিয়া লড়াই পর্যন্ত করিয়াছিলেন। তবুও তাঁহাদের কবিতাকে নিছক প্রচারধর্মী রচনা বলা চলে না। বিরাটসংখ্যক মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য ও অসহায়তায় বিচলিত হইয়া এবং কমিউনিজমই মানুষকে শোষণমুক্ত করিবার একমাত্র উপায় এই বিশ্বাসে তাঁহারা কমিউনিজমে দীক্ষিত হন। পরে ইহাদের সকলেরই মোহমুক্তি ঘটে এবং তাঁহারা কমিউনিজম পরিত্যাগ করেন। কমিউনিজমের আকর্ষণেই ইহারা এলিয়টের ধর্মান্তরগ্রহণ এবং তাহার ফলে তাঁহার বিদ্রোহীভাবের প্রশমন হওয়ায় এলিয়টের নিকট হইতে সরিয়া যান। পরে অবশ্য সকলেই এলিয়টের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁহার নিকট উহাদের নিজেদের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

এই কবি চতুষ্টয়ের মধ্যে লিউসির রচনা অত্যন্ত অসমান। তাঁহার একদিকে যেমন সহজ, সরল অথচ গভীর ভাবপ্রতিবিম্বিত কবিতা আছে, তেমনি অতি সাধারণ পদ্যেরও অভাব নাই। অডেনের কবিতাও সবগুলি সমশ্রেণীর নহে, তবে তাঁহার কবিতার বহুব্যাপ্তি, ভাবগভীরতা, ছন্দোবৈচিত্র্য ইত্যাদি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অতি সাধারণ ঘটনাকে, আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত-তুচ্ছ অভিজ্ঞতাকে, যে সমস্ত দৃশ্য আমরা অহরহ চোখে দেখিতেছি সেই সব দৃশ্যকে অডেন তাঁহার কবিতায় অপূর্ব সুষমামণ্ডিত করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন। অডেনের হিউমার-বোধ এবং করুণামিশ্রিত ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীও তাঁহার বহু কবিতাকে রসোত্তীর্ণ করিয়াছে। এলিয়টের প্রতিভার পাশে অডেনকে আজ তুলনামূলকভাবে ম্লান দেখাইলেও তাঁহার দীপ্তি ইংরাজী সাহিত্যে অবিনশ্বর থাকিবে। অডেনের তুলনায় স্পেণ্ডারের কবিকৃতির পরিমাণ কম, কিন্তু তাহা অনেক বেশী মার্জিত। অডেনের তীক্ষ্ণতা হয়তো স্পেণ্ডারের নাই, তবে তাঁহার হৃদয়বত্তা অডেনের অপেক্ষা বেশী বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য এই দুইজনকেই বুদ্ধিপ্রধান কবি বলিতে হইবে।

অপরপক্ষে ম্যাকনীস মূলতঃ রোমান্টিক। বিংশ শতাব্দীর ধূসর রুক্ষ হৃদয়হীনতার মধ্যে রোমান্টিসিজম্ যে কি রূপ ধারণ করিতে পারে ম্যাকনীসের কবিতা প্রধানতঃ তাহারই সাক্ষ্য বহন করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যে সকল কবির নাম হয় তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র ডিলান টমাসই (Dylan Thomas : ১৯১৪-১৯৫৩) উল্লেখযোগ্য। তাঁহার কবিতা অত্যন্ত দুরূহ। ডিলান টমাসের রচনায় শব্দগুলির আক্ষরিক অর্থ এবং পঙক্তিগুলির ব্যাকরণগত গঠন ধরিয়া কবিতার অর্থোদ্ধারের চেষ্টা করিলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইতে হইবে। অথচ ঠিকমত পাঠ বা আবৃত্তি করিতে পারিলে ঐ শব্দগুলির বা ধ্বনির মধ্য হইতেই ছোট ছোট চিত্র এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির সন্ধান মিলিবে। শোনা যায়, অনেক পাঠক তাঁহার কোন কোন কবিতা লইয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়াও কিছু বুঝিতে পারেন নাই, অথচ পরে কবির স্বকণ্ঠে সেই সমস্ত কবিতার আবৃত্তি শুনিয়া তাহাদের মর্ম অনুভব করিতে পারিয়াছেন। কবিতায় ধ্বনির প্রভাব কতটা বা ধ্বনিই যে কবিতার প্রাণ হইতে পারে ডিলান টমাসের কবিতাই তাহার প্রমাণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কবিদের রচনার মান বা মূল্য নির্ধারণের সময় এখনও আসে নাই। কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হইবার পর তাহারা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইবে।

সাহিত্য ক্ষেত্রে ভিক্টোরীয় যুগে উপন্যাস প্রাধান্যের যে আসনটি দখল করিয়া লয়, বিংশ শতাব্দীতেও তাহা অটুট আছে। উপন্যাস লঘুপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক হইবার জন্য শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার পাঠকসংখ্যাও দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে এবং উপন্যাসও শুধুমাত্র কাহিনী বা মনস্তত্ত্বমূলক না হইয়া জীবনের বহু ক্ষেত্রের বহু সমস্যাকে নিজের চৌহদ্দীর মধ্যে আনিয়া ফেলিতেছে।

বিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকদের প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম—প্রাচীনপন্থী, যাঁহারা উপন্যাসের চিরাচরিত ধারার অনুসরণ করিয়া নিজেদের উপন্যাসে আখ্যান ও মামুলী চরিত্র-চিত্রণের দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিয়াছেন। এই শ্রেণীর তিনজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক হইলেন—গলস্‌ওয়ার্দি (John Galsworthy : ১৮৬৭-১৯৩৩), বেনেট (Arnold Bennet : ১৮৬৭-১৯৩১) ও ওয়েল্‌স (H. G. Wells : ১৮৬৮-১৯৪৬)। দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদের মধ্যপন্থী বলা যায়। ইহারা উপন্যাসের কাহিনীকে উপেক্ষা করেন না; তবে উপন্যাসে উপস্থাপিত পাত্র-পাত্রীর মানসিক বিবর্তন, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধি, বিচার ও আবেগপ্রবণতার সংঘর্ষ, মানুষের উপর প্রকৃতি ও সমাজব্যবস্থার অদৃশ্য অথচ

শক্তিশালী প্রভাব, মানুষের বাল্যজীবনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহার সারা জীবনের গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ, মানুষের মনে যে সমস্ত উত্তরহীন প্রশ্ন ও সমাধান-হীন সমস্যার কথার উদয় হয়—সেই সমস্ত বিষয়ের উপস্থাপন এবং আলোচনাই ইহাদের মূল লক্ষ্য এবং এই দিকেই মনোযোগ বেশী। এই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদের আবার সময় অনুসারে দুই পর্যায়ে ভাগ করা যায়; প্রথম পর্যায়ে পড়েন—কনরাড (Joseph Conrad : ১৮৫৭-১৯২৪), ফরস্টার (E. M. Forster : ১৮৭৯-১৯৭০) এবং লরেন্স (D. H. Lawrence : ১৮৮৫-১৯৩০); দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রধান প্রধান ঔপন্যাসিক হইলেন—হাক্সলি (Aldous Huxley : ১৮৯৪-১৯৬৩), ওয় (Evelyn Waugh : ১৯০৩-১৯৬৬) এবং গ্রীন (Graham Greene : ১৯০৪-)। তৃতীয় শ্রেণীতে যে ঔপন্যাসিকেরা পড়েন প্রকরণের দিক হইতে তাঁহাদের বিপ্লবী বা বিদ্রোহী ঔপন্যাসিক বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল এই যে, উপন্যাস গতানুগতিকতার যে ধারা অনুসরণ করিতেছিল তাহা ছিল বহিরঙ্গপ্রধান। এই সমস্ত উপন্যাস হইতে আমরা পাত্র-পাত্রীর পরিবেশ, তাহাদের বেশভূষা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, বড় জোর তাহাদের মনের ভাসাভাসা ভাব-অনুভূতির ধারণা লাভ করিতে পারি, কিন্তু প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে দুর্জ্ঞেয় মন রহিয়াছে এবং যাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুরণন আমাদের কৌতূহলের বস্তু তাহার কোনো আভাসই এই সমস্ত মামুলী উপন্যাসে নাই। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা যে সমস্ত উপন্যাস লেখেন স্বভাবতঃই সেগুলিতে কাহিনী বা উপাখ্যানের প্রাধান্য বা পারম্পর্য নাই। মানুষের মনে নানান বেখাপ্পা ও অসংলগ্ন চিন্তার যাওয়া-আসার প্রতিচ্ছবি দেওয়াকেই তাঁহারা ঔপন্যাসিকের প্রধান এবং একমাত্র কর্তব্য মনে করিতেন। ইহাদের উপন্যাসকে সম্বিৎপ্রবাহী উপন্যাস (Stream of Consciousness novel) বলা হয়। এই শ্রেণীর মাত্র দুইজন ঔপন্যাসকের নাম উল্লেখযোগ্য—জয়েস (James Joyce : ১৮৮২-১৯৪১) এবং ভার্জিনিয়া উলফ (Virgina Woolf : ১৮৮২-১৯৪১)।

এইবারে এই সকল ঔপন্যাসিকের সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারি কথা করিয়া বলা হইবে।

গলস্ওয়ার্দির The Forsyte Saga বা 'ফরসাইট পরিবারের কাহিনী' উচ্চ মধ্যবিত্তশ্রেণীর ধনিকসম্প্রদায়ের মনোবৃত্তি ও জীবনদর্শনের এক বিস্তৃত জীবনালেখ্য। এই শ্রেণীর লোক পৃথিবীর ধনসম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া সমস্ত জীবনকেই নিজ উপভোগ্য দ্রব্যরূপে দেখিতে অভ্যস্ত এবং সংসারের

সমস্ত বিভাগেই স্বত্বাধিকারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উপন্যাসের নায়ক সোম্‌স্ এই শ্রেণীর প্রতিনিধি। সে তাহার দাম্পত্যজীবনেও অধিকারবাদের নীতি প্রয়োগ করিতে উৎসুক। তাহার স্ত্রী ইরিনকে সে নিজ সম্পত্তির অংশরূপে ভোগদখলের পাত্রী বলিয়া মনে করে—স্ত্রীর সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও সংকীর্ণ জীবন-যাত্রায় অতৃপ্তি সে আমলের মধ্যেই আনে না। শেষ পর্যন্ত ইরিনের অন্যাসক্তি ও গৃহত্যাগ তাহার বস্তুসঞ্চয়ের দ্বারা গাঁথা নিরেট জীবনাদর্শকে যেন ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আঘাতে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে! দাম্পত্যজীবনের এই ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে সোম্‌স্ জীবনকে নূতনভাবে দেখিতে এবং অপরকে নূতন সমবেদনা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির দ্বারা বিচার করিতে শিখিয়াছে। তাহার এই অভিজ্ঞতার ফলে সে তাহার একমাত্র কন্যা ফ্ল্যাওয়ারের উদ্‌ভ্রান্ত অস্থিরমতিত্ব, নীতিপরায়ণতার অভাব ও ক্ষণিকবাদকে পর্যন্ত পিতৃসুলভ স্নেহ ও ক্ষমার চক্ষে দেখিয়াছে। সোম্‌স্ সম্বন্ধে লেখকের মনোভাব যেন অবজ্ঞা হইতে সহানুভূতির স্তরে উন্নীত হইয়াছে। এই মহা-উপন্যাসে প্রায় সমস্ত চরিত্রই অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে—ফরসাইট গোষ্ঠীর ভ্রাতৃবৃন্দের চরিত্রে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও গোষ্ঠীগত ঐক্যের সমন্বয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু গ্রন্থটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ইহার প্রতিবেশচিত্রাঙ্কনে। একদিকে ভিক্টোরীয় যুগের আত্মতৃপ্ত, সংসারযুদ্ধে বিজয়ীর উৎফুল্ল, আত্মপ্রত্যয়শীল মনোভাব, অধিকারের গর্বে জীবনের দুরধিগম্য রহস্য ও অপ্রত্যাশিত বিকাশের প্রতি অন্ধতা, অপরদিকে যুদ্ধোত্তর জগতে সমস্ত নৈতিক আদর্শের উন্মূলনে জীবনের চরম উদ্দেশ্যহীনতা ও বিশৃঙ্খলার সংক্রমণ ও ইহার সনাতন কেন্দ্রবিন্দুর অপসারণ—এই বিপরীত অবস্থার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ আশ্চর্য তথ্যসমৃদ্ধি ও কলাগত সুসঙ্গতির সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বাংলা ভাষায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ট্রিলজির সহিত 'ফরসাইট সাগা'র বেশ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

স্টাফোর্ডশায়ারের মৃৎশিল্পাঞ্চলের পাঁচটি শহরই হইল বেনেটের উপন্যাসের পশ্চাদ্‌ভূমি। বেনেটের লেখায় গল্‌স্‌ওয়ার্দির প্রসারতা না থাকিলেও একটা সূক্ষ্ম বাস্তবতাবোধ ও অল্পায়াসে চরিত্রচিত্রণের নিপুণ দক্ষতা আছে, যাহা আমাদিগকে ফরাসী ঔপন্যাসিকদের, বিশেষ করিয়া জোলার, কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বেনেটের নরনারীরা সমাজের নিম্নমধ্যবিত্তস্তরের লোক—ন্যায়-অন্যায়, সামাজিক বোধ প্রভৃতি বড় বড় ব্যাপার লইয়া তাহাদের আদৌ মাথাব্যথা নাই, এই সকল ব্যাপারে তাহারা মাত্র ততটুকুই মাথা ঘামায় যতটুকু না ঘামাইলে সমাজে বাস করা অসম্ভব। এইজন্য বেনেটের পাত্র-পাত্রীরা আমাদের অনেক কাছের মানুষ। দৃষ্টিভঙ্গি স্থানে

স্থানে ব্যঙ্গাত্মক হইলেও, বেনেটের মূল সুর অনুকম্পার, সহানুভূতির, সমবেদনার সুর। এই বিষয়ে এবং সৃষ্ট চরিত্রের বিচিত্রতায় বেনেটের সহিত ডিকেন্সের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, তবে লেখক হিসাবে বেনেট ডিকেন্স অপেক্ষা অনেক বেশী শিল্পসচেতন ছিলেন। The Old Wives Tale ('ঠাকুরমাদের কথা')-কেই অনেকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া মনে করেন। পাৰ্শ্বে-শহরের এক অতি ক্ষুদ্র বস্ত্রব্যবসায়ীর দুই কন্যা কনস্ট্যান্স ও সোফিয়া বাল্যকাল হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যে বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় এই উপন্যাসের তাহাই উপজীব্য। সাদামাঠা কনস্ট্যান্স ঐ দোকানেরই নগণ্য প্রধান কর্মচারীকে বিবাহ করিয়া বৈচিত্র্যময় হইলেও উত্তেজনাহীন পরিবেশের মধ্যে সারা জীবন কাটাইয়া দেয়। অপর ভগিনী সোফিয়া হঠাৎ-বড়লোক, ভ্রাম্যমাণ এক ক্যানভাসারের প্রেমে পড়িয়া গৃহত্যাগ করে এবং নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হইবার পর শেষ পর্যন্ত তাহার প্রেমাস্পদকে বিবাহ করিতে সক্ষম হইলেও, ঐ দুর্বৃত্ত তাহাকে প্যারিসে নিতান্ত দুরবস্থা ও বিপদের মধ্যে ফেলিয়া পলায়ন করে। বহু লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহ্য করিবার পর সোফিয়া প্যারিসেই একটি হোটেল চালাইবার কাজ পায় এবং সেইভাবেই সারা জীবন অতিবাহিত করে। শেষজীবনে আবার দুই ভগিনীর মিলন। ভাল-মন্দ, উচ্চ-নীচ, সুখ-দুঃখ, এই সমস্ত কোন কিছুর দিকেই দৃকপাত না করিয়া কালস্রোত অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে এবং চলিবে—সকল বোধ ছাপাইয়া এই বোধটিই 'ঠাকুরমার কথা'-র পাঠকদের অভিভূত করিবে। নিষ্ঠুরতা নাই, করুণাও নাই—শিল্পীসুলভ নিস্পৃহতার সহিতই বেনেট এই কান্নাহাসির দোলা দোলাইয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসের নায়কনায়িকাদের নানা রঙের দিনগুলি তাঁহার তুলিতে ঠিক রঙেই ফুটিয়া উঠিয়াছে—অবশ্য যুগপ্রভাবে ইহাদের অধিকাংশের রঙই ধূসর।

গল্স্ওয়ার্দি ও বেনেটের সমসাময়িক হইলেও ওয়েল্‌স কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের ঔপন্যাসিক। তাঁহার গতি বাস্তবচিত্র হইতে কাল্পনিক সম্ভাবনার দিকে। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানবের সম্মুখে যে অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে, তাহাই ওয়েলসের কল্পনাকে উদ্দীপিত করে। বিজ্ঞানের প্রত্যাশিত উন্নতির ফলে ভবিষ্যৎ যুগের মানবের জীবনযাত্রায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হইতে পারে, তাহাই তাঁহার উপন্যাসাবলীর বর্ণিতব্য বিষয়। মানুষকে নানাবিধ অনভ্যস্ত, বিস্ময়কর অবস্থার মধ্যে ফেলিলে তাহার কিরূপ মানস প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, তাহা তিনি কৌতূহলের সহিত অনুমান ও সূক্ষ্মদর্শিতার

সহিত বিবৃত করিয়াছেন। আজ যদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপ কমিয়া যায়, সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে গমনাগমনের পথ উন্মুক্ত হয়, জরামৃত্যুর অভিভব প্রতিরুদ্ধ হয়, অথবা মানবের প্রতিবেশের ও অভ্যন্ত জীবনযাত্রার যে-কোনো একটার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়, তবে তাহার জীবনধারাও নিশ্চয়ই নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত হইবে এবং উহার গতিছন্দও নূতন তালে নিয়মিত হইবে। সেই নূতন জগতে মানুষের অভ্যাস, আদর্শ, মূল্যমান সবই হইবে স্বতন্ত্র। ওয়েল্‌স্ এই প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ পরিবর্তনকে কল্পনার সাহায্যে উপলব্ধি বা অনুমান করিয়া নানা ঘটনা সমাবেশের দ্বারা ইহার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার রচনায় কবিকল্পনা ও বিজ্ঞানসমর্থিত বাস্তবতার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ ও চমকপ্রদ সমন্বয় হইয়াছে। এই জাতীয় রচনার উৎকর্ষ নির্ভর করে বিশ্বাসযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত অনুমান ও অনাগত জীবন-ব্যবস্থার ছবির মধ্যে নিখুঁত সামঞ্জস্যজ্ঞান ও নিশ্ছিদ্র তথ্যবিন্যাসের উপর। এই উভয় দিক দিয়াই ওয়েল্‌সের উপন্যাসসমূহ সফলতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রথম বক্তব্য বা অনুমানটি মানিয়া লইলে তাঁহার উপন্যাসে ইহার সার্থক রূপায়ণ আমাদের বিচারবুদ্ধি ও কল্পনাবিলাস উভয়কেই তৃপ্ত করে। প্রতিভাশালী লেখকের কল্পনা যে অনেক স্থলে সত্যের পূর্বাভাস হইতে পারে, উত্তরকাল ওয়েল্‌সের উপন্যাস সম্বন্ধে তাহা প্রমাণ করিয়াছে—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ ব্যাপ্তি ও ধ্বংসলীলা ঐ যুদ্ধের অনেক পূর্বেই ওয়েলসের একখানি উপন্যাসে বিস্ময়কর ভবিষ্যৎদৃষ্টির সহিত বর্ণিত হইয়াছিল।

অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ওয়েল্‌সের উপন্যাস চিরাচরিত ধারার ব্যতিক্রম। ইহা বাস্তবজীবনের বিশ্লেষণমূলক প্রতিচ্ছবি নহে ; যে বাস্তব অপরিণত সম্ভাবনার মধ্যে এখনও আত্মগোপন করিয়া আছে, যাহার বীজ উপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অঙ্কুর এখনও ভূগর্ভস্থ অন্ধকার হইতে উদ্ভিন্ন হয় নাই, ওয়েল্‌সের উপন্যাস তাহাকেই একটা সুনির্দিষ্ট রূপ দিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। উপন্যাসের প্রচলিত সংজ্ঞা মানিয়া চলিলে, এই উদ্দেশ্য হয়ত উপন্যাসের সীমাবহির্ভূতই। মনে হয়, যে শক্তির প্রত্যক্ষের মর্মোদ্ঘাটনে নিয়োজিত হওয়া উচিত ছিল, তাহা যেন অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টায় অপব্যয়িত হইয়াছে। তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে যে, ওয়েল্‌সের উপন্যাস আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাসের পথিকৃৎ এবং এই জাতীয় রচনার আঙ্গিক ও পরিধিবিস্তারের চমৎকার নিদর্শন।

দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ অন্তর্মুখী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সময়ের দিক দিয়া দেখিলে কনরাডই প্রথম। কনরাডই বোধহয় একমাত্র বিদেশী লেখক যিনি ইংরাজী

সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। তিনি জাতিতে পোল অর্থাৎ পোল্যাণ্ডের নাগরিক ছিলেন। লেখাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিবার পূর্বে তিনি জাহাজে কাজ করিতেন। আঠার বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে আসিয়া কনরাড ইংরাজী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। স্থানে স্থানে ইংরাজী বাগ্‌বিধি ক্ষুণ্ণ হইলেও তাঁহার ভাষা সূক্ষ্ম ভাব-প্রকাশনৈপুণ্যে, ছন্দসুষমায় ও কল্পনাসমৃদ্ধিতে অতুলনীয়। অবশ্য কখনও কখনও অতিভাষণপ্রবণতা, কল্পনার আধিক্য, আলোছায়াবিন্যাসের নিবিড়তা, অনুভূতির সূক্ষ্মতম অনুরণন পর্যন্ত সঠিকভাবে প্রকাশ করিবার অত্যধিক আগ্রহ ও প্রয়াস—এই সমস্ত মিলিয়া তাঁহার ভাষাকে কিছুটা আড়ষ্ট ও কৃত্রিম করিয়াছে। তথাপি কনরাডের গদ্যরচনার কাব্যোৎকর্ষ ও মৌলিকতা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার উপন্যাসসমূহে নাবিকজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অসাধারণ অনুভূতি চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের জীবনযাত্রা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এবং পাশ্চাত্য জাতির চোখে প্রাচ্য মহাদেশের অন্তর ও বাহিরের যে একটা মোহময়, অনির্দেশ্য আকর্ষণ আছে, তাঁহার উপন্যাসে তাহার একটা উজ্জ্বল ও জীবন্ত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার 'টাইফুন' (Typhoon) উপন্যাসে সমুদ্রে ঘূর্ণিবায়ুর প্রলয় তাণ্ডবের বর্ণনা এবং এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে জাহাজের কর্মচারী-বৃন্দের বিভিন্ন চরিত্রের উদ্ঘাটন—তাঁহার বর্ণনাশক্তি ও মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ ক্ষমতা উভয়েরই চমৎকার পরিচয়। অসীম, দিক্‌চিহ্নহীন মহাসমুদ্রের নির্জনতা, প্রগাঢ় শান্তি, স্বপ্নময় অবাস্তবতা ও অতলস্পর্শ রহস্যবোধের ইন্দ্রজাল তিনি নিজে গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন ও ভাষার অপরূপ কুহকে পাঠককেও অনুভব করাইয়াছেন। 'লর্ড জিম' (Lord Jim) তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক, জাহাজের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বিপদের মুহূর্তে জাহাজ ছাড়িয়া পলায়ন করে। এই কর্তব্যচ্যুতি ও কাপুরুষতার গ্লানি তাহাকে এরূপ পীড়িত করে যে, সে সমস্ত সভ্য লোকালয় বর্জন করিয়া অরণ্যে আশ্রয় লয় এবং সেখানের আদিম অধিবাসীদের নানান সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আত্মোৎসর্গ করে। শেষ পর্যন্ত ঐখানেই দুই বিবদমান গোষ্ঠীর লড়াইয়ের মধ্যে পড়িয়া তাহাকে প্রাণ হারাইতে হয় এবং এভাবেই হয় তাহার তথাকথিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। সুদীর্ঘকালব্যাপী নির্জন বাস, প্রকৃতির অপরিমেয় রহস্যের সান্নিধ্য এবং যাহারা প্রকৃতির কাছাকাছি বাস করে তাহাদের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় মানুষের চরিত্রকে কত গভীরভাবে প্রভাবিত করিতে পারে এবং কি ভাবে তাহার মনে দার্শনিকোচিত নিস্পৃহতা ও উদারতার উন্মেষ করিতে

পারে 'লর্ড জিম'-এ কনরাড তাহা অনবদ্য শিল্পকুশলতার সহিত দেখাইয়াছেন। মোট কথা, কনরাডের উপন্যাসে আমরা এক অভিনব অনুভূতি, জীবনের এক নূতন, অপরিচিত রূপের সন্ধান পাই।

ইংরাজীতে এত কম লিখিয়া ফরস্টারের মত এত বেশি খ্যাতি এবং এরূপ অবিসংবাদিত স্বীকৃতি আর কোনো ঔপন্যাসিকই লাভ করেন নাই। ফরস্টার মাত্র পাঁচখানি উপন্যাস লেখেন (তাঁহার মৃত্যুর বেশ কিছু পরে আর একখানি উপন্যাসও প্রকাশিত হইয়াছে, তবে তাহাতে তাঁহার খ্যাতির কিছুই ইতর বিশেষ হয় নাই); তাহার মধ্যে আবার প্রথম তিনখানিতে উপন্যাসের প্রসার বা জটিলতা কিছুই নাই, উপন্যাস না বলিয়া তাহাদিগকে কাব্যগন্ধী বড় গল্পও বলা যাইতে পারে। তাঁহার চতুর্থ উপন্যাস Howards End ('হাওয়ার্ডস্ এণ্ড') প্রথম মহাযুদ্ধের চার বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয় এবং তাঁহাকে লেখকসমাজে প্রতিষ্ঠিত করে। পঞ্চম এবং শেষ উপন্যাস A Passage to India ('ভারতপথিক'?) প্রকাশিত হয় ইহার চৌদ্দ বৎসর পরে এবং ইহাই ফরস্টারকে খ্যাতির শীর্ষদেশে পৌঁছাইয়া দেয়। সমন্বয়সাধন বা মানুষে মানুষে যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাই ফরস্টারের উপন্যাসগুলির মূল কথা। সম্পদের পরিমাণ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, জাতি বর্ণ অথবা ধর্মের পার্থক্য—ফরস্টারের মতে এ সমস্তই বাহ্য এবং অকিঞ্চিৎকর অথচ এইগুলির জন্যই মানুষে মানুষে এত বিভেদ, এত বাগ্‌বিতণ্ডা, সমাজে এত অশান্তি। মানুষ যদি অপরকে বাহির হইতে উপর-উপর দেখিয়া বিচার না করে, তাহার অন্তরের মানুষটির পরিচয় পাইতে চেষ্টা করে এবং তাহার দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্বের দিকে তাকায়, তাহা হইলেই মানুষের সহিত মানুষের ভুল বোঝাবুঝির, সমস্ত মনোমালিন্যের অবসান হইবে এবং সামাজিক ও শেষ পর্যন্ত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—ফরস্টার তাঁহার উপন্যাসে নানাভাবে এই সত্যই প্রতিপাদিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অথচ ঔপন্যাসিক ফরস্টার উপদেশদাতা নন, তাঁহার উপন্যাসে কোথাও নীতিবাক্যের আধিক্য নাই—ঘটনাবিন্যাস, পাত্রপাত্রীর কথোপকথন ও চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমেই তিনি তাঁহার আদর্শ সার্থকভাবে পাঠক-পাঠিকার মনে সঞ্চালিত করিতে পারেন। পাশ্চাত্যসমাজে যাহারা আর্থিক সম্পদ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের মূল উদ্দেশ্য মনে করে তাহাদের; যাহাদের জীবিকার্জনের কোনো তাগিদ নাই, আর্থিক সাচ্ছল্য আছে এবং যাহারা সুকুমার শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় লইয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিতে চায় তাহাদের এবং যাহারা দরিদ্র, হতভাগ্য হইয়াও সংস্কৃতিসম্পন্ন হইবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া বিড়ম্বিত ও অপরের

উপহাসাস্পদ হয় তাহাদের—এই তিন শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় নরনারীর সংযোগ ও সংঘর্ষই The Howards End-এর বিষয়বস্তু। ফরস্টার দেখাইয়াছেন যে, ইহাদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও আচারব্যবহারের যৌক্তিকতা আছে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিলে কাহারও কোনো দোষ আছে মনে হয় না—অথচ যখনই তাহারা পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তখনই তাহারা, অনেক সময়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই, পরস্পরকে আঘাত করিয়াছে। ফরস্টারের বক্তব্য—মানুষে মানুষে সেতুবন্ধনই এই করুণ ব্যর্থতা রোধ করিবার একমাত্র উপায়। A Passage to India-তে এই দৃষ্টিভঙ্গি জাতির সীমারেখা অতিক্রম করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। যুদ্ধের কিছু পরে ফরস্টার চাকুরির সূত্রে ভারতবর্ষে আসেন এবং কয়েক বৎসর এখানে অতিবাহিত করেন। পুস্তকখানি তাহারই ফলশ্রুতি। ইহাতে ইংরাজদের প্রতি ভারতবাসীর বিরাগ ও বিদ্বেষ, ভারতীয়দের প্রতি ইংরাজদের অবজ্ঞা ও ঘৃণামিশ্রিত ভয়, মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরস্থ সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ববন্ধন, হিন্দুদের ঔপনিষদিক মনোভাব ও কৃষ্ণপ্রেম—সমস্ত কিছুই যথাযথ এবং সুনিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ফরস্টার দেখাইয়াছেন যে, জাতিগতভাবে ইংরাজ ও ভারতীয়ের মধ্যে বৈরীভাব থাকিলেও, ব্যক্তিগতভাবে একজন ইংরাজ ও একজন ভারতীয় পরস্পরের অন্তরঙ্গ হইতে পারে ; তেমনি, ধর্মগতভাবে একজন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদ থাকিলেও ব্যক্তিগতভাবে একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান একাত্ম হইতে পারে। অর্থাৎ ফরস্টারের উপন্যাসের বাণী হইল—সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। গীতায় বিশ্বরূপ দেখাইবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যাহা বলিয়াছিলেন এই উপন্যাসে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় —'সব কিছুই আছে, ইহা ঠিক ; কিন্তু কিছুই কিছু নয়।' এইভাবে দেখিলে বুঝা যায় যে, যাঁহারা A Passage to India-কে শুধুমাত্র ইঙ্গ-ভারতীয় সম্বন্ধের উপন্যাস বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত ; মানব সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যা ও তাহার সম্ভাব্য সমাধান এবং মানুষের চরম এবং শেষ জিজ্ঞাসাই এই উপন্যাসে রূপায়িত হইয়াছে।

বিংশ শতকের প্রথম দিককার মধ্যপন্থী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শেষজন ডি. এইচ. লরেন্সের উপন্যাসে কিছুটা অভিনবত্ব আছে। প্রথমতঃ, তাঁহার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার আত্মজিজ্ঞাসা আরও একটু গভীরতর এবং তাহাদের মনোবিকলনে গ্রন্থকার ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি দ্বারা বেশ কিছুটা প্রভাবান্বিত। ডিকেন্সের মত লরেন্সের রচনাবলীও তাঁহার ব্যক্তিজীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। লরেন্সের পিতা

ছিলেন এক দরিদ্র এবং উদ্দামপ্রকৃতির খনিমজুর এবং তাঁহার মাতা ছিলেন এক সংস্কৃতিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের উচ্চাভিলাষসম্পন্ন মহিলা। দারিদ্র্যনিপীড়িত ক্লেদাক্ত পরিবেশের মধ্যে পারিবারিক মন-কষাকষি ও কলহের ভিতর দিয়াই লরেন্সের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। লরেন্সের উপন্যাসে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈসাদৃশ্য ও মনের অমিলে আমরা লরেন্সের এই বাল্য অভিজ্ঞতার ছাপই পাই। মাতার আপ্রাণ চেষ্টা ও আত্মনিগ্রহের ফলেই লরেন্স কিছুটা শিক্ষালাভ করেন এবং শিক্ষকতা করিবার যোগ্যতা অর্জন করেন। লেখাকে পুরাপুরি বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিবার পূর্বে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণও করিয়াছিলেন। লরেন্সের প্রথম বিখ্যাত—এবং অনেকের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ—উপন্যাস Sons and Lovers ('ছেলেরা আর তাদের প্রেমিকারা')-এ শুধু তাঁহার নিজের ব্যক্তিজীবন নহে, গোটা পারিবারিক জীবনটারই ছায়া পড়িয়াছে। এই উপন্যাসের নায়ক পল মোরেলকে তাহার মাতা তাহার পিতার উদ্দামতা হইতে সযত্নে বাঁচাইয়া মানুষ করিয়া তোলেন। ছেলেকে ঘিরিয়াই মাতার জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা। পুত্র কিন্তু মাতৃস্নেহের এই গভীরতা উপলব্ধি করিয়া, প্রাণপণে তাহার মর্যাদা দিবার চেষ্টা করিয়া মাঝে মাঝে পুলকিত হইলেও এবং নিজেকে চরিতার্থ অনুভব করিলেও কোথায় যেন একটা শূন্যতা অনুভব করে। পরে মিরিয়ম নামক এক আদর্শবাদী, কল্পনা-বিলাসিনী রমণীর সংস্পর্শে আসিয়া সে যেন খানিকটা সার্থকতা লাভ করে এবং ইহাকে উপলক্ষ করিয়া তাহার সহিত তাহার মাতার মনোমালিন্য হয়। কিন্তু মিরিয়মও পলের চিত্তের শূন্যতা ভরাইতে পারে না এবং পল ক্লারা নামে এক বিবাহিতা তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত মিরিয়ম ও ক্লারা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবার পর পলের চৈতন্যোদয় হয়—সে যেন উপলব্ধি করিতে পারে যে, মানুষে মানুষে পূর্ণ মিলন কখনই সম্ভবপর নহে ; শরীরের পূর্ণ মিলনের পরও যাহা বাকী থাকে তাহা মানুষের অলভ্য। আত্মোপলব্ধিই শেষ কথা। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মধ্য দিয়া নিবৃত্তি ও মোক্ষলাভ—তন্ত্রের এই মতবাদ যেন লরেন্সের লেখার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। লরেন্সের একখানি উপন্যাস The Rainbow ('রামধনু') অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত হয় ; আর একখানি Women in Love ('প্রেমাতুরাদের কাহিনী') বাজেয়াপ্ত না হইলেও তীব্র বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয় এবং অপর একখানি Lady Chatterley's Lover ('লেডী চ্যাটার্লির প্রেমিক') তো ইংলণ্ডে মুদ্রিত হইবারই সুযোগ পায় না। এই উপন্যাসখানি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সে প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থকারের মৃত্যুর অনেক পরে, মাত্র ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে, আইনসঙ্গতভাবে ইংলণ্ডে

প্রবেশ করিবার অধিকার পায়। সেদিনের রুচিবোধের নিরিখে লরেন্সের উপন্যাসে যৌন আবেগ ও আকর্ষণের কিছুটা বাড়াবাড়ি আছে, একথা ঠিক; একথাও ঠিক যে ফ্রয়েডের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া তিনি যৌন আবেগের সর্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধেও খানিকটা বাতিকগ্রস্ত; কিন্তু তবুও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার লেখা বাস্তবধর্মী এবং অশ্লীলতা দোষদুষ্ট নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য সুগভীর এবং অকপট আত্মানুসন্ধান, রুচিবিকার পরিবেশন নহে। সূর্যচন্দ্র, গ্রহতারা, পৃথিবী, পৃথিবীর অরণ্য, পর্বত, নদী, পশুপক্ষী, মানুষ সমস্তের মধ্যেই একটা যোগসূত্র আছে—এই বোধ লরেন্সের প্রায় সব লেখাতেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; যৌনআকর্ষণ এই যোগ-সূত্রের একটিমাত্র তন্তু, যদিও এই অতি গুরুত্বপূর্ণ তন্তুটি বশে আনিতে না পারিলে সমস্ত বিশ্বতত্ত্বই আমাদের নিকট অজানা রহিয়া যাইবে—ইহাই যেন লরেন্সের উপন্যাসাবলীর অঘোষিত বাণী।

কাহিনীভিত্তিক এবং চরিত্র ও বিশ্লেষণপ্রধান যে উপন্যাস কনরাড, ফরস্টার ও লরেন্স এই তিনজন মধ্যাবলম্বী ঔপন্যাসিকগণ লিখিয়াছিলেন তাহাই ইংরাজী উপন্যাসের মূলধারা। এই ধারার যে তিনজন উত্তরসূরীর নাম করা হইয়াছে তাঁহারা সকলেই ইহাদের অপেক্ষা বেশী তির্যক্‌দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এবং তাঁহাদের লেখার প্রায় সর্বত্রই কম বেশী ব্যঙ্গের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকারের পরস্পরবিরোধী ধ্যানধারণার আবর্তে পড়িয়া আধুনিক মানুষ যে হাবুডুবু খাইতেছে তাহাই হাক্সলির উপন্যাসের উপজীব্য। তাঁহার উপন্যাসসমূহে যুদ্ধোত্তর যুগের মানস বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক বিপর্যয়ের চমৎকার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই যুগের সমাজে কোনো স্থির সর্বস্বীকৃত নৈতিক আদর্শের অভাবে নানারূপ উদ্ভট মতবাদ, অস্থির মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল কর্মপদ্ধতি, প্রগতিশীলতার সঙ্গে অন্ধসংস্কারের অদ্ভুত সংমিশ্রণ, উন্নত অধ্যাত্মবাদ ও বীভৎস ভোগবাদের, জনহিতৈষণা ও উৎকট স্বার্থপরতার যুগপৎ প্রাদুর্ভাব নীতিজগতে এক বিভ্রান্তকারী অরাজকতা ও কেন্দ্রিকতাভ্রষ্ট অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি করে। হাক্সলির রচনায় আমরা এই অন্তর্বিপ্লবেরই বিশ্লেষণ ও ইহার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ দেখিতে পাই। অনেকটা এলিয়টের মত হাক্সলিও ভারতীয় অধ্যাত্ম আদর্শের অনুসরণে, ত্যাগের দ্বারা ভোগলিপ্সার বিশুদ্ধীকরণে, ইউরোপের অর্জনশীল ঐহিক-সুখসর্বস্ব মনোবৃত্তির বিলোপেই এই সংকটময় অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের পন্থা দেখিতে পান। হাক্সলির বহু উপন্যাসের মধ্যে এই প্রসঙ্গে Point Counter Point ('পক্ষাপক্ষ') এবং Eyeless in Gaza ('গাজার অন্ধ') এর নাম উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে কিভাবে যন্ত্রে পরিণত

করিতেছে এবং কালক্রমে মানুষ সম্পূর্ণ যান্ত্রিক হইয়া উঠিতেছে, তাহারও কৌতুককর অথচ বেদনাদায়ক এবং ভয়াবহ চিত্র হাক্সলি কোনো কোনো উপন্যাসে আঁকিয়াছেন। এই জাতীয় উপন্যাসের মধ্যে The Brave New World ('বা রে নয়া দুনিয়া') The Brave New World Revisited ('আবার নয়া দুনিয়া') এবং After Many a Summer ('বহু বসন্তের পর') সমধিক বিখ্যাত। এই উপন্যাসগুলিতে হাক্সলি ওয়েল্‌সের সার্থক উত্তরসাধক।

ওয় এবং গ্রীন দুইজনেই রোমান ক্যাথলিক এবং তাঁহাদের উপন্যাসে সদসৎ, ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য, বিধির বিধান ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। তবে এটা স্বীকার করিতেই হইবে যে, লেখকের নীতিবোধ এবং ধর্মীয় বিশ্বাস কোথাও কাহিনীর সরলতা ও চরিত্রের সজীবতাকে খণ্ডিত করে নাই। দুইজনে প্রায় সমসাময়িক হইলেও গ্রীন এখনও জীবিত আছেন এবং ইঁহাদের রচনার ঐতিহাসিক মূল্য যাচাই করিবার সময় এখনও আসে নাই।

বিদ্রোহী বা বিপ্লবপন্থী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মাত্র দুইজন—জয়েস ও উল্‌ফ্‌-এর নামই উল্লেখযোগ্য। আগেই বলা হইয়াছে যে, প্রচলিত উপন্যাসে মানবমনের যে ছবি প্রতিফলিত হইত, ইঁহাদের মতে তাহা তাহার অগভীর মনের ছবি। ইহাতে আপাতসত্যের আভাস থাকিতে পারে, গভীর সত্যের সন্ধান নাই। এই বিশ্বাসে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া এই ঔপন্যাসিকগণ নিজদিগকে অবিমিশ্র সত্যানুসন্ধানে ব্রতী মনে করিয়া সনাতন ঔপন্যাসিকের পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথ ধরিলেন। বহুলাংশে ফ্রয়েডের এবং পরে ইয়ুং-য়ের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ইঁহারা সৃষ্টিপূর্ব জগতের আদিম রহস্যমণ্ডিত, অণু-পরমাণুর যদৃচ্ছ সংঘর্ষে তরঙ্গায়িত, রূপ ও আকারের শাসনে অসংযত এক খণ্ডিত মানবমনের চিত্রাঙ্কনে সকল শক্তি নিয়োজিত করেন। চেতন ছাড়িয়া অচেতন বা অবচেতন স্তরে বন্দী দুরধিগম্য সত্তাকে রূপ দেওয়াই তাঁহারা ঔপন্যাসিকের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। দুঃখের বিষয়, অন্ধকারময় সুড়ঙ্গপথে অবতরণ করিয়া লেখক যে সত্যকে বোধগম্যতার সূর্যালোকে আনিতে চেষ্টা করিবেন বলিয়া উঁহারা মনে করিতেন, সেই সত্য নিজেই অস্পষ্ট ও অপ্রতিপাদ্য। ফলে লেখকের গভীরতা-পরিমাপক যন্ত্রসমূহ সমুদ্রের তলদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়া যাহা আহরণ করিয়া আনে তাহা ভাস্বর রত্ন নহে, কর্দমাক্ত শৈবালগুচ্ছ ও জলমগ্ন মৃত প্রাণীর অস্থি-কঙ্কাল মাত্র। বহু ক্ষেত্রে তাহা লেখকের নিজের বিকারগ্রস্ত মনের অভিক্ষেপমাত্র।

জয়েসের Ulysses ('ইউলিসিস') এই সম্বিৎপ্রবাহী উপন্যাসের পথিকৃৎ এবং

ইহার সর্ববৃহৎ ও বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই জাতীয় প্রচেষ্টার অসমসাহসিক মৌলিকতা কতদূর যাইতে পারে এবং তাহার ফল কতটা নৈরাশ্যজনক হইতে পারে, এই উপন্যাসেই আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করি। হোমারের 'ওডিসি'র ছায়াবলম্বনে রূপকভঙ্গিতে লিখিত এই উপন্যাসে আমরা দুই নায়ক লিওপোল্ড ব্লুম ও স্টিফেন ডিডেলাসের একদিনের বহির্জীবন ও আন্তরজীবনের পরিচয় পাই। ব্লুম নিজে ওডিসির এবং ডিডেলাস ওডিসি-তনয় টেলিমেকাসের প্রতিচ্ছবি। এই একদিনের ঘটনার মধ্যে নাটকীয়তা বা আকর্ষণ যে খুব বেশী আছে তাহা নহে, তবে তাহাদের মনোবিশ্লেষণের মধ্যে ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজের বহুরূপিতা, ন্যায়নীতির স্বরূপ, কর্তব্যের নিরিখ, মানুষের মধ্যে আবেগ ও বিচার-বুদ্ধির সংঘর্ষ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই আসিয়া পড়িয়াছে। 'ইউলিসিস্'-এ গভীর বিদ্যাবত্তা ও লেখকের জ্ঞানের বিরাট প্রসারের পরিচয় আছে, কিন্তু উপন্যাস হিসাবে ইহার মূল্য যৎসামান্য। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ যে বৎসর এলিয়টের The Waste Land প্রকাশিত হয়, ইউলিসিস্-ও সেই বৎসর প্রকাশিত হয়। অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে 'ওয়েস্টল্যাণ্ড' যেমন কাব্যজগতে যুগান্তর আনিবে, 'ইউলিসিস্'-ও উপন্যাসজগতে আনিবে এক অভাবিত যুগান্তর। স্বাভাবিক কারণেই সে আশা ফলবতী হয় নাই। অবচেতন মনের প্রকাশ করা যায় কিনা এবং যাইলে তাহা কিভাবে করা যায়—ইহা লইয়া জয়েস সারাজীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়াছিলেন। তাঁহার শেষগ্রন্থ The Finnegans Wake ('ফিনেগানস্ ওয়েক্') এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল। 'ফিনেগানস্ ওয়েক্'-কে দুর্বোধ্য গ্রন্থ বলিলে কিছুই বলা হয় না। ইহাতে কিছু কিছু ইংরাজী শব্দ ও মধ্যে মধ্যে ইংরাজী বাক্য আছে বটে, কিন্তু বাকিটুকু ইংরাজী হরফে লেখা আওয়াজের সমষ্টিমাত্র। এই যদি সম্বিৎপ্রবাহী উপন্যাসের পরাকাষ্ঠা হয়, তবে সে উপন্যাস লইয়া সমালোচকেরা যতই না কেন সমালোচনা করুন এবং বিশেষ লেখকগোষ্ঠী যতই না মাতামাতি করুক, তাহা কথনই জনপ্রিয় হইবে না বা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন লাভ করিতে পারিবে না।

ভার্জিনিয়া উলফের অবলম্বিত প্রণালী ইহা অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক। নীতিগতভাবে উপন্যাসে কাহিনীর গুরুত্বকে অস্বীকার করিলেও, কার্যতঃ উপন্যাস লিখিবার সময়ে তিনি কাহিনীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার Mrs. Dalloway ('মিসেস ড্যালওয়ে') এবং To the Lighthouse ('আলোকস্তম্ভে') প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি একদিনের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দিকে সমস্ত পূর্বজীবনের স্মৃতি এবং ইহার সার্থক মুহূর্তগুলি ও গভীর অনুভূতিসমূহকে বৃত্তাকারে

বিন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, একদিনের অভিজ্ঞতার মধ্যেই সমস্ত জীবনের ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়—স্মৃতি-রোমন্থনের প্রণালী বাহিয়া সমস্ত পূর্বানুভূতি এক-একটি ক্ষুদ্র মুহূর্তকে অর্থগৌরবে এবং প্রতিনিধিত্বের মহিমায় মণ্ডিত করে। জীবনের সমস্তটাই পরস্পরের সহিত এমনভাবে জড়িত যে, কোনো তুচ্ছ ঘটনাই, কোনো ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাই একেবারে শেষ হইয়া যায় না। প্রতি মুহূর্তের চিন্তা ও কর্মোদ্যমের পিছনে সমস্ত জীবনের যে সঞ্চিত মননশক্তি অলক্ষ্যভাবে ক্রিয়াশীল, লেখিকা যেন তাহাকে সচেতনভাবে উপলব্ধি করিয়া দক্ষ ফটোগ্রাফারের মত পাঠকের চোখের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে এই স্মৃতিগুলি আবার যেন বর্তমানের চারিদিকে একটা সাঙ্কেতিকতার রশ্মিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া বিশেষ অর্থবহ হইয়া উঠে। আপাতদৃষ্টিতে লেখিকার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় বটে ; কিন্তু এই প্রশ্ন থাকিয়াই যায় যে, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সংযোগ-সূত্রটির নির্বাচন মনস্তত্ত্বের বিচারে ঠিক হইয়াছে কিনা। বর্তমানের যে ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া যে স্মৃতি কল্পনাগুলি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি কেবল আকস্মিক, না তাহারা কোনো গূঢ়তর যোগসূত্রে সন্নদ্ধ, না ইহা শুধুমাত্র লেখিকার কৃত্রিম প্রচেষ্টার ফল—এই প্রশ্নও পাঠকের মনকে সংশয়াকুল করিয়া তোলে। মনে হয়, অবচেতন মন যখন সেই মনের অধিকারীরই নিকট অজ্ঞাত, তখন লেখকের পক্ষে তাহার ধর-ছোঁওয়া পাওয়া কেমন করিয়া সম্ভব !

এইখানে বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে, এই সম্বিৎপ্রবাহী উপন্যাস প্রাথমিক দৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গের শিল্পকলা বলিয়া মনে হইলেও ইহার কোনো যুক্তিনিষ্ঠ ভিত্তিভূমি নাই। সেইজন্য প্রথম প্রথম বেশ খানিকটা আলোড়ন সৃষ্টি করিলেও ইহা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পায় নাই এবং ছিন্নমূল তরুর ন্যায় অচিরেই শুকাইয়া যায়। ভার্জিনিয়া উলফ ও তাঁহার ভগ্নী, ইহাদের স্বামী দুইজন এবং তাঁহাদের আর কয়েকজন বুদ্ধিজীবী বন্ধু, যুদ্ধের কিছু পরে লণ্ডনে 'ব্লুমস্‌বেরী গোষ্ঠী' নামে একটি গোষ্ঠী গড়িয়া তোলেন ; ইহাদের নিজস্ব ছাপাখানাও ছিল। তাঁহারা ক'জনেই এই সম্বিৎপ্রবাহী উপন্যাস লইয়া, সাময়িকভাবে হইলেও, খুব তীব্র এবং ব্যাপক হৈচৈ করেন। উল্লেখ্য যে, ফরস্টার ও টি. এস. এলিয়টও মাঝে মধ্যে 'ব্লুমস্‌বেরী গোষ্ঠী'র বৈঠকে যোগদান করিতেন, তবে তাঁহারা এই গোষ্ঠীর সাহিত্য সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিকে যে সমর্থন করিতেন; এমন ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যায় না।

বিংশ শতব্দীর কয়েকজন প্রধান প্রধান ঔপন্যাসিকের মাত্র নাম করা হইল। ইহারা ছাড়া আরও বহু লেখক আছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রথম

শ্রেণীর। বস্তুতঃ প্রকাশনার সংখ্যা ও পাঠকসংখ্যার দিক হইতে বিচার করিলে উপন্যাসই এ যুগের সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু। পরিসংখ্যানের দিক হইতে দেখিলে দেখা যায় যে, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মোট চার হাজার উপন্যাস প্রকাশিত হয় ; এই সংখ্যার অর্ধেকের উপর নূতন উপন্যাস। ১৯৩৯-এ চার হাজার দুশো বাইশ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৫১-তে তিন হাজার আটশ একাত্তর এবং ১৯৬০-এ চার হাজার দুশো নয়টি উপন্যাস ছাপা হয়। এই হিসাবের মধ্যে কিছু কিছু পুরাতন উপন্যাসের পুনর্মুদ্রণও আছে, কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামই নূতন। এই পরিসংখ্যান হইতে বর্তমান যুগে উপন্যাসের চাহিদা ও জনপ্রিয়তার খানিকটা প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

(৪)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গোল্ডস্মিথ ও শেরিডানের পর ইংরাজী নাট্য সাহিত্যের উপর কৃষ্ণযবনিকা নামিয়া আসে। রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় কবিগণ নাটক লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলি হয় অভিনয়যোগ্য ছিল না, নয় মঞ্চস্থ হইবার পর দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই। মঞ্চগৃহগুলিকে চালু রাখিবার জন্য অপর দুই-চারিজন লেখক কয়েকখানি নাটক লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত নিম্নমানের এবং সাহিত্যগৌরব পাইবার অনুপযুক্ত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে অস্কার ওয়াইল্ডের আবির্ভাবে নাট্য সাহিত্যের এই দুর্দিনের অবসান হয়। বার্নার্ড শ' (George Bernard Shaw: ১৮৫৬-১৯৫০)-ও এই সময়ে নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ নাটকই লিখিত হয় বিংশ শতাব্দীতে এবং এই শতাব্দীতেই তিনি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

নাটকরচনা সম্বন্ধে প্রচলিত মামুলী রীতিগুলি স্পর্ধাভরে এবং প্রকাশ্যভাবে উপেক্ষা করিয়া বার্নার্ড শ নাটককে এক অভিনব পথে চালাইয়াছিলেন। সাধারণ্যে এইরূপ একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে, নাটক নাট্যকারের বিশেষ মতবাদ প্রচারের বাহন হইবে না—নাট্যকার কোনো উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া তাঁহার নাটককে নিয়ন্ত্রিত করিবেন না। শেক্‌শপিয়ারের নাটক সম্বন্ধে এই কথা সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। তাঁহার নাটকাবলী হইতে জীবন ও নীতিবোধ সম্বন্ধে শেক্‌শপিয়ারের যে ঠিক কি ধারণা ছিল তাহার সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করা যায় না। শেক্‌শপিয়ারের পরবর্তী নাট্যকারগণ তাঁহাদের নাটকে এরূপ আত্মাবলুপ্তি না করিতে পারিলেও

নাটকের পাত্রপাত্রীর চরিত্রচিত্রণে সমাজে ঐ শ্রেণীর নরনারীর অনুকরণের চেষ্টা করিয়াছেন, নিজেদের ব্যক্তিগত মতামত লইয়া নাটকে মাতামাতি করেন নাই। কিন্তু বার্নার্ড শ এই পূর্বস্বীকৃতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহার নাটকাবলীর প্রধান উদ্দেশ্য সমাজ-সমালোচনা ও সমাজ-সংস্কার। তাঁহার প্রায় প্রতি চরিত্রের কার্য ও কথোপকথনই এই লক্ষ্যের অনুবর্তন করিয়াছে। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন যে কেবলমাত্র সুকুমার কলার স্বার্থে তিনি এক লাইনও লিখিতে চান না।

বার্নার্ড শ সমাজতন্ত্রবাদের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তিনি বৈষম্য ও অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সমাজের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের পক্ষপাতী। সেইজন্য প্রচলিত সমস্ত সমাজনীতি ও রাজনীতির বিরুদ্ধেই তাঁহার জেহাদ। আর এই জেহাদে তাঁহার একমাত্র অস্ত্র তাঁহার নাটক। বিবাহপ্রথা, অমার্জিত বা অসদুপায়ে অর্জিত ধন-উপভোগের অনৈতিকতা, চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের মনোবৃত্তি, গণিকাবৃত্তি, ধর্ম-যাজকদের অন্ধ ধর্মবিশ্বাস, যুদ্ধের গৌরব ঘোষণার মধ্যে ধনিকশ্রেণী ও যুদ্ধবাজদের প্রকাণ্ড ফাঁকি, সমাজের মান্যগণ্য নীতিবাগীশদের ব্যক্তিগত গুপ্ত জীবনে দুর্নীতির প্রাবল্য ইত্যাদির আলোচনায় তিনি সমাজপ্রচলিত ধারণা ও সংস্কারগুলির অন্তঃসারশূন্যতা তীক্ষ্ণ যুক্তিতর্ক ও মর্মভেদী ব্যঙ্গের সাহায্যে প্রকট করিয়াছেন। The Arms and the Man ('অস্ত্রধারী') নাটকে তিনি দেখাইয়াছেন যে, যুদ্ধজয়ের গৌরব বেতনভুক্ সামান্য সেনাদের, তথাকথিত বীর সেনাপতিদের এখানে কোনো ভূমিকাই নাই। প্রসঙ্গত এই নাটকে তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, বাস্তবে তথা-কথিত নিকষিত-হেম প্রেম হইল কল্পনাবিলাসের সোনার পাতে মোড়া সুবিধাবাদ মাত্র। Man and Superman ('মানুষ ও অতিমানব')-ই বোধহয় তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটক। এই নাটকে তিনি বিবর্তনবাদ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, যে যুগযুগান্তরব্যাপী বিবর্তনের ফলে অণুদেহী এককোষী জীব হইতে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা এখানে আসিয়া থামিয়া যায় নাই; আমরা জানি, এক অদৃশ্য জীবনীশক্তি (Life Force) আমাদের মধ্য দিয়া অহরহ কাজ করিয়া চলিতেছে এবং ইহারই ফলে ক্রমে ক্রমে মানুষের মধ্যে অতিমানবের আবির্ভাব হইবে। আমাদের শ্রীঅরবিন্দ আধ্যাত্মিক শক্তিবলে উপলব্ধ যে সত্য প্রচার করিয়াছেন, অনেকটা সেই রকম সত্যই বার্নার্ড শ তাঁহার এই নাটকের কাহিনী এবং পাত্রপাত্রীর কথোপকথনের মধ্য দিয়া উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া এই তত্ত্বটি প্রমাণ করিবার জন্য নাট্যকার তাঁহার শেষ অর্থাৎ চতুর্থ

অঙ্কের পূর্বে একটি গোটা অঙ্ক নরকে সংঘটিত করাইয়াছেন। এই নরকদৃশ্যটি অতিপ্রাকৃত এবং অবিশ্বাস্য ; ইহা একটি স্বপ্ন হিসাবে দেখানো হইয়াছে এবং মূল গল্পের সহিত ঘটনার সাদৃশ্য থাকিলেও, সচরাচর এই অঙ্কটি বাদ দিয়াই নাটকটি অভিনীত হয় বা হইতে পারে। অবশ্য স্বপ্ন বা নরক দৃশ্যটি প্রায়ই এককভাবেও প্রদর্শিত হয়। তাঁহার অন্যান্য নাটকের মধ্যে Pygmallion ('পিগম্যালিয়ন') ও Saint Joan ('সেণ্ট জোন') বিখ্যাত। প্রথমটিতে নাট্যকার দেখাইয়াছেন যে, উচ্চারণ ও আদবকায়দার বৈশিষ্ট্যের জন্যই অভিজাত সম্প্রদায়ের আভিজাত্য ; তাঁহাদের অন্য কোনো বিশেষত্ব নাই এবং একজন ফুলবিক্রয়ওয়ালীকেও তালিম দিয়া সম্ভ্রান্ত মহিলা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়। যোয়ান অব আর্কের উপর ঐশী শক্তির ভর এবং তাহার ফলে ধর্মযাজকদের দ্বারা তাঁহার বিচার ও জীবন্ত অগ্নিদহনের দ্বারা মৃত্যুদণ্ড—ইহাই দ্বিতীয় নাটকটির বিষয়বস্তু।

বার্নার্ড শ'র মতবাদ যেরূপ চমকপ্রদ, তাঁহার যুক্তি-তর্কের ও শ্লেষের উপর অধিকারও তেমনি বিস্ময়কর। তাঁহার রসিকতাপূর্ণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য যে কোনো অযৌক্তিক ও অসম্ভব সিদ্ধান্তের প্রতি আমাদের বিমুখতা ও বিরোধকে জয় করিয়া লইতে পারে। অনেক সময়ে মনে হয় যে, বুদ্ধির ছোরা-খেলা দেখাইবার জন্যই নাট্যকার যেন ইচ্ছা করিয়া কোনো কোনো চরিত্রের মুখ দিয়া অদ্ভুত কথা বলাইয়াছেন এবং তাহার পর বিভিন্ন চরিত্রের তীক্ষ্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে পাঠক বা দর্শককে এই উদ্ভট বক্তব্যের সত্যতা মানিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছেন। এ কারণে অনেকে বলেন যে, বার্নার্ড শ'র নাটকে প্রকৃত নাট্যরসের অভাব রহিয়াছে, ইহা বাদানুবাদের নাটক। কতকাংশে ঠিক হইলেও এ মত গ্রাহ্য নহে। শ'র নাটকে বাদানুবাদ, যুক্তিতর্ক আছে, ইহা ঠিকই ; কিন্তু ইহার কাহিনীও উপেক্ষণীয় নহে এবং ঘটনাবিন্যাসও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। সেইজন্য যখনই তাঁহার নাটক মঞ্চস্থ হয়, তখনই প্রেক্ষাগৃহ শ্রোতায় দর্শকে ভরিয়া ওঠে।

গলস্‌ওয়ার্দি প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক হিসাবে চিহ্নিত হইলেও তাঁহার নাটকের সংখ্যা কম নহে এবং তাহাদের মানও বেশ উন্নত। বিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক আবেষ্টনে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ মানুষের জীবনকে কিভাবে বিড়ম্বিত করিতেছে গলস্‌ওয়ার্দি তাঁহার নাটকে তাহারই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। Justice ('বিচার') নাটকে তিনি দেখাইয়াছেন যে, সমস্ত আনুষঙ্গিক ঘটনা ও অপরাধীর অভিপ্রায়ের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া আইনের আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী দণ্ডনীতি প্রয়োগ করিলে তাহাতে সুবিচার হয় না এবং সেই দণ্ড অপরাধীর চরিত্র সংশোধন

না করিয়া তাহার জীবনের করুণ, মর্মান্তিক পরিসমাপ্তি ঘটাইতে পারে। আবার Strife ('সংঘাত') নাটকে তিনি দেখাইয়াছেন যে, ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে উভয়পক্ষের অযৌক্তিক মনোভাবে, চরম উপায় অবলম্বনের মূঢ়তায় এবং নিছক জেদ ও একগুঁয়েমির ফলে শ্রেণীসংঘর্ষের তিক্ততা ও ব্যক্তিগত জীবনের ক্লেশ-যন্ত্রণা বাড়িয়া যায় মাত্র। কারণ, শেষ পর্যন্ত যখন আপোস-মীমাংসা হয়, তখন দেখা যায় যে, উভয়পক্ষের আপেক্ষিক অবস্থার কোনো পরিবর্তনই হয় নাই। তাঁহার The Silver Box ('রূপার কৌটা') নাটকে তিনি দেখাইয়াছেন যে, ধনীর দুলাল আর দরিদ্র বেকার যদি একই অপরাধ করে, আইনের বিচারে ধনীতনয় পাইয়া যায় বেকসুর খালাস আর বেকারকে তাহার অসহায় স্ত্রীপুত্র পরিবারকে ফেলিয়া রাখিয়া যাইতে হয় কারাগারে। গলস্ওয়ার্দির নাটকে অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি, দুর্বলের প্রতি অনুকম্পা, আভিজাত্যগর্বীর প্রতি অবজ্ঞা, ভণ্ডের প্রতি ঘৃণামিশ্রিত উপহাস সুপরিস্ফুট; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার নাটকগুলি কখনও একপেশে বা বার্নার্ড শ'র নাটকের মত প্রচারধর্মী হইয়া ওঠে নাই। অত্যাচারী ও অত্যাচারিত, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবহেলিত এইরূপ দুপক্ষেরই সপক্ষে ও বিপক্ষে যাহা বলিবার আছে তিনি সুকৌশল ঘটনাবিন্যাস ও যুক্তিপূর্ণ, সংযত কথোপকথনের দ্বারা তাহা তাঁহার শ্রোতৃবর্গের নিকট উপস্থাপিত করেন। এইজন্য তাঁহার নাটকে কলাকৌশলের দিক হইতে বিশেষ কোনো খুঁত না থাকিলেও সেগুলিতে নাটকোচিত উত্তাপের যথেষ্ট অভাব আর সেইজন্যই তাহারা সার্বজনিক জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যর্থ হইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে অসীম সম্ভাবনাময় প্রত্যাশা জাগাইয়া একজন আইরিশ নাট্যকার আবির্ভূত হন। তাঁহার নাম সিং (সিঙ্গ নহে) (J. M. Synge : ১৮৭১-১৯০৯)। কবি ইয়েট্স্ই তাঁহাকে নাটকরচনায় উদ্বুদ্ধ করেন। আয়র্ল্যাণ্ডের ঐতিহ্য সম্পদের পুনরুদ্ধার ও তাহার বর্তমান অবনতির উদ্ঘাটনই ছিল সিং-এর নাটকের বিষয়বস্তু। তাঁহার ক্ষুদ্র নাটিকা The Riders to the Sea ('সাগর-সওয়ার') হইল আয়র্ল্যাণ্ডের দীনহীন ধীবর সম্প্রদায়কে মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও কি ভাবে সমুদ্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঁচিতে ও মৃত্যুবরণ করিতে হয় তাহার এক মর্মস্পর্শী কাহিনী। তাঁহার সবচেয়ে বিখ্যাত নাটক The Playboy of the Western World ('মেকি বীর')। ইহা তীব্র ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন। এক তরুণ তাহার পিতার মাথায় আঘাত করিয়া পিতা নিহত হইয়াছেন ভাবিয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করে এবং গ্রামান্তরে পিতৃঘাতক বীর বলিয়া রাজোচিত অভ্যর্থনা ও সম্মান লাভ করে।

পরে, যখন তাহার পিতা জ্ঞানলাভ করিয়া তাহার খোঁজে ঐ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই গ্রামের সকলে—এমন কি তাহার নবলব্ধ প্রণয়িনী পর্যন্ত—সে পিতাকে হত্যা করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে। নাট্যকার দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, আমাদের মূল্যবোধ কিরূপ অযৌক্তিক ও অবাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আমাদের মূল্যায়নের পিছনে কী বিরাট ফাঁকি লুকাইয়া থাকে। লেখকের ব্যঙ্গ স্থানে স্থানে এত তীব্র, যে নাটকখানি যখন আয়র্ল্যাণ্ডের রাজধানী ডাবলিনে প্রথম মঞ্চস্থ হয় তখন সেখানে প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে রীতিমত মারামারি লাগিয়া যায়। সিং-এর ট্রাজেডিতে বহুদিনবিস্মৃত কবিকল্পনার সুর ও উচ্চগ্রামে বাঁধা হৃদয়াবেগের মূর্চ্ছনা শোনা যায়। দুঃখের বিষয়, তাঁহার অকালমৃত্যুতে তাঁহার ভিতরে যে প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছিল তাহা অপূর্ণই রহিয়া যায়।

দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু পর পর্যন্ত যে সমস্ত নাট্যকার ব্রিটিশ রঙ্গমঞ্চকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুইজনের নাম উল্লেখ্য—নোয়েল কাওয়ার্ড (Noel Coward : ১৮৯৯-১৯৭৩) এবং প্রিস্টলি (J. B. Pristley : ১৮৯০-)। নোয়েল কাওয়ার্ড কমেডি লেখক। তাঁহার কমেডিতে অলস ধনীসম্প্রদায় অথবা বেপরোয়া শিল্পীদের লঘুচিত্ত ও উদ্দাম জীবনযাত্রা এবং এই জীবনযাত্রার অন্তরালে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব লুক্কায়িত আছে তাহার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার নাটকের পাত্রপাত্রীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ এবং উদ্ভট অথচ প্রায়বাস্তব ঘটনাসংস্থানের জন্য তাঁহার নাটকগুলি সমস্তই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হইয়াছিল। কাওয়ার্ড ছিলেন অস্কার ওয়াইল্ডের সুযোগ্য উত্তরসাধক। তবে তাঁহার নাটকে হাস্যরস এত উত্তাল যে, তাহার অন্তরালে তাঁহার জীবনচর্যার বাণীটুকু যেন অবলুপ্ত হইয়া যায়। The Vortex ('ঘূর্ণিঝড়') ও The Design for Living ('জীবনচর্যা') তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম। প্রিস্টলির নাটকগুলি ট্রাজেডির রসে সিক্ত। কালপ্রবাহের রহস্য, জীবনে অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব ও প্রভাব, মানুষের কর্ম ও বিবেকের পরস্পরের সহিত সংঘাত, এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই তাঁহার রচনার ভিত্তিভূমি। তাঁহার নাটকে এই সকল বিষয়ের অভিক্ষেপ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থাকিলেও, লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ইহার দ্বারা তাঁহার রচনার নাটকীয়তা কখনই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে Time and the Conways ('কনওয়ে আর কাল')-এ সময়সংস্থানের বৈচিত্র্য, I have been Here Before ('আগেও ছিলাম') নাটকে জন্মান্তর ও ভাবীজীবনের মাখামাখি—এ সমস্তই শুধু নাটকে নহে,

ইংরাজী সাহিত্যেই নূতন সংযোজন। ইংরাজী সাহিত্যে প্রিস্টলির যথার্থ মূল্যায়ন এখনও হয় নাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যাঁহারা নাটক লিখিতেছেন তাঁহাদের সাহিত্য প্রয়াসের মূল্যায়ন করিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে অস্‌বোর্ন (John Osborne : ১৯২৯-), ওয়েস্কার (Arnold Wesker : ১৯৩২-) ও পিণ্টার (Harold Pinter : ১৯৩০-)-এর নাম করিতেই হইবে। ১৯৫৬-তে প্রকাশিত অস্‌বোর্নের Look Back in Anger ('রেগে তাকাই পিছন পানে') যুদ্ধান্তে সকল শ্রেণীর জীবনযাত্রাপ্রণালীতে যে সমস্ত অসুবিধা ও অসঙ্গতি দেখা যায়, এবং তাহার জন্য সমাজে যে নৈতিক অধোগতি ও চরম ভণ্ডামির প্রাদুর্ভাব হয়, তাহারই লেখচিত্র। ওয়েস্কারের The Kitchen ('রান্নাঘর'), Chilken Soup with Barley ('মুরগীর ঝোল')-এ এই গ্লানি ও ক্রোধ কিভাবে সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা দেখানো হইয়াছে।

বর্তমান জীবনের অর্থহীনতা ও বিচ্ছিন্নতার সবটুকু বাস্তবপন্থী নাটকে ফুটাইয়া তোলা যায় না, এই বোধ ও প্রতীতি হইতে যুদ্ধান্তে এক নূতন জাতীয় নাটকের সৃষ্টি হয়। ইহার নাম The Drama of the Absurd বা অসম্ভবের নাটক। এই নাটকের জন্ম ইউরোপ মহাদেশের মাটিতে হইলেও ইহা ইংলণ্ডেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ইংরাজী সাহিত্যে এই জাতীয় নাটকের পুরোধা Samuel Beckett (১৯০৬-)। তাঁহার নাটকগুলি প্রথমে ফরাসী ভাষায় লিখিত হইলেও লেখক নিজেই তাহাদিগকে ভাষান্তরিত করেন। অতএব সেগুলিকে ইংরাজী সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়াই ধরিতে হইবে। তাঁহার নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত Waiting for Godot ('ভগাই আসবে')। Godot বোধহয় ইংরাজী God বা ঈশ্বর এই কথাটিকেই বিকৃত করিয়া লেখা। লেখক তীব্র ব্যঙ্গ ও শ্লেষের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, ভগবান কি কেহ তাহা জানে না, অথচ সকলেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে এবং এই ভগবানের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতেই কিছু লোক হৃদয়হীন অমানুষের মত অপরের উপর অত্যাচার করিয়া চলিতেছে এবং অন্য সকলে বোবা নির্জীব প্রাণীর মত এই অত্যাচারের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছে। তাঁহার End Game ('শেষ খেলা') নাটকটিও এইরূপ বিষাক্ত এবং ঝাঁঝালো। জীবনের কোনো অর্থ নাই, মানুষ অন্ধ, অথর্ব, অসহায় এবং তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন পর্যন্ত নিরর্থক—এই তিক্ত সত্যই এই নাটকটির মূল বক্তব্য। মনে হয় যুদ্ধান্তে যে নূতন মূল্যমান সমাজে—বিশেষ করিয়া তরুণ সমাজে—চালু হয়, তাহার সহিত

আপোস করিবার অক্ষমতাই বেকেট ও অন্যান্য 'অসম্ভবের নাটক'-এর লেখকদিগকে এইরূপ তিক্ত, বিষাক্ত নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

এ পর্যন্ত বিংশ শতকের যে সমস্ত নাটকের কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি সমস্তই গদ্য নাটক এবং কমবেশী কথ্য ভাষায় লেখা। কিন্তু এই শতাব্দীতে কাব্য নাটকের সাফল্যমণ্ডিত পুনরুজ্জীবনও হয় এবং তাহার কথা কিছু না বলিলে এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

ছন্দোবদ্ধ ভাষায় অর্থাৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত নাটকের যুগ ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চার্লসের রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যায়। পরে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে রেস্টোরেশনের পর মাত্র কয়েকখানি নাটক ছন্দে লেখা হয়। ড্রাইডেন সমিল ছন্দেও তাঁহার কিছু কিছু নাটক লেখেন। কিন্তু সেই যুগের জনপ্রিয় সমস্ত কমেডির ভাষাই গদ্যে। গোল্ডস্মিথ, শেরিডানের কমেডিও গদ্যে। পরবর্তী যুগে অনেক কবি ছন্দে নাটক লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই নাটকগুলি হয় অভিনীত হয় নাই কিংবা অভিনীত হইলেও মঞ্চসাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে (অর্থাৎ ১৯৩০ হইতে ১৯৪০ এর ভিতরে) এই অবস্থার অবসান ঘটে। এ যুগের প্রথম মঞ্চসফল ছন্দোবদ্ধ নাটক টি. এস. এলিয়টের Murder in the Cathedral ('গির্জায় খুন') ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাণ্টারবেরী উৎসব উপলক্ষে রচিত ও অভিনীত হয়। ধর্মের গৌরব রক্ষার্থ টমাস বেকেটের স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি এবং তাহার ফলে অমরত্বলাভ, ইহাই এই নাটকের বিষয়বস্তু। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও সমস্ত প্রলোভন জয় ও ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ—বেকেটের চরিত্রের এই দিকটি নাট্যকার অত্যন্ত দক্ষতার সহিত মর্মস্পর্শীভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। নিছক ধর্মীয় ব্যাপার লইয়াও যে অতি উচ্চাঙ্গের নাটক সৃষ্ট হইতে পারে, 'মার্ডার ইন্ দি ক্যাথিড্রাল' তাহারই এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। পরে সামাজিক বিষয় লইয়াও এলিয়ট একাধিক ছন্দোনাট্য লেখেন। তাহার মধ্যে The Cocktail Party ('দি ককটেল পার্টি')-ই সবচেয়ে বিখ্যাত এবং আজ পর্যন্ত প্রায়ই ইহার অভিনয় হইয়া থাকে। এলিয়টের নাটকগুলি সামাজিক হইলেও, পাপ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত, ইহাই এই নাটকগুলির বিষয়বস্তু। এলিয়টের নাটকের উপর গ্রীক নাটকের প্রভাব সুপরিস্ফুট—বহু ক্ষেত্রেই তাঁহার নাটকের আখ্যানটি কোন না কোন গ্রীক নাটকের কাহিনীর বর্তমান সমাজে রূপান্তরীকরণ বলা যায়। এলিয়টের কবিতার মত এই নাটকগুলিতেও বহির্জগতের ঘটনাগুলির পিছনে এক রূপকাশ্রয়ী মনোজগতের ঘাতপ্রতিঘাত দেখা যায়।

'মার্ডার ইন্ দি ক্যাথিড্রাল'-এর সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া সে যুগের কবিরা যে সকল ছন্দোনাট্য রচনা করেন তাহার মধ্যে অডেন এবং ক্রিস্টোফার উডের The Ascent of F 6 ('পর্বতারোহণ'), The Dog Beneath the Skin ('চামড়ার তলায় কুকুর'), On the Frontier ('সীমান্তে') প্রভৃতি বিখ্যাত। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি নাৎসী জার্মানী ও হিটলারকে ব্যঙ্গ করিয়া লেখা। প্রথমটির উপর সেই যুগের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের মধ্যে মন-কষাকষির ও ফ্রয়েডের মনোবিকলন পদ্ধতির যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। ব্যঙ্গ, করুণা, গাম্ভীর্য, হাসিঠাট্টা সমস্ত মিলিয়া এই নাটকগুলি বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু সনাতন সত্য অপেক্ষা সাময়িক সত্যের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হওয়ায়, শিল্পকুশলতা বর্তমান থাকিলেও 'দি এ্যাসেন্ট অফ এফ সিক্স' ছাড়া ইহাদের মধ্যে অন্য কোনো নাটক যে শাশ্বত সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করিবে তাহা মনে হয় না।

এই কাব্য-নাটকের (বা ছন্দোবদ্ধ ভাষায় লিখিত কাব্যোৎকর্ষমণ্ডিত নাটকের) সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ক্রিস্টোফার ফ্রাই (Christopher Fry : ১৯০৭-)-এর নাটকের আবির্ভাবে। ভাষার উপর অসামান্য অধিকার, দৃষ্টিভঙ্গির অকল্পনীয় মৌলিকতা, ঘটনাবিন্যাস ও কাহিনী উদ্‌ঘাটনের অত্যাশ্চর্য দক্ষতা ফ্রাই-এর সব কয়খানি নাটককেই রসোত্তীর্ণ করিয়াছে। The First Born ('প্রথম সন্তান') ও অন্যান্য ইতিহাসাশ্রয়ী ট্রাজেডিগুলি শক্তিশালী হইলেও ফ্রাই-এর শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁহার কমেডিগুলি। The Lady's Not For Burning ('দি লেডি ইজ নট্ ফর বার্নিং'), Venus Observed ('ভেনাস অবসার্ভড্'), The Dark is Light Enough ('অন্ধকারেও আলো'), এবং A Yard of Sun ('এ ইয়ার্ড্ অফ সান')—এই চারিখানিকে তাঁহার ঋতুচতুষ্টয়ী নাটক বলা হয়। বিশ্ববিধান সম্পর্কে স্যামুয়েল বেকেটের সহিত ফ্রাই-এর দৃষ্টিভঙ্গির একটা মৌলিক মিল আছে, কিন্তু উভয় লেখকের প্রতিক্রিয়া এবং প্রকাশভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের। সমাজ ও সৃষ্টির মধ্যে কোনোরূপ সঙ্গতি, যুক্তিশীলতা বা অর্থ না পাইয়া বেকেট সমস্ত কিছুকেই আজগুবি, নিরর্থক, এমন কি অশ্লীল বলিয়া গজরাইতে থাকেন, ওদিকে ফ্রাই এ সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও সমস্ত কিছুই অম্লানবদনে মৃদু-হাস্যের সহিত স্বীকার করিয়া লন। ফ্রাই-এর দৃষ্টিভঙ্গির সহিত আমাদের উপনিষদকারদের দৃষ্টিভঙ্গির খানিকটা সাদৃশ্য আছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি বা শুনিতেছি, যে আনন্দে আমরা আত্মহারা হইতেছি, যে দুঃখে আমরা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছি, যে আদর্শবাদ আমাদের উদ্বুদ্ধ

করে, যে অন্যায় আমাদের ক্রোধে দৃপ্ত করে—শেষ বিচারে তাহারা কিছুই নয়; তবু উহা ছাড়া আমাদের আর কিছুই নাই, অতএব ইহাকে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে—ইহাই ফ্রাই-এর নাটকের বাণী। যে বিপদ, যে দুর্ঘটনাই ঘটুক না কেন—ফ্রাই-এর নায়ক-নায়িকারা তাহাকে অসীম কালের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের পটভূমিকায় স্থাপিত করিয়া তাহাদের অকিঞ্চিৎকরত্ব আবিষ্কার করেন ও অপরকে বুঝাইয়া দেন। সংলাপের তীক্ষ্ণতায় ও ঘটনাবিন্যাসের হাস্যকরতায় তাঁহার বাণীর এই গভীরতা অনেক সময়েই চাপা পড়িয়া যায়। মনে হয়, লেখক নিজেকে উপদেষ্টা বা ধর্মপ্রচারকের আসনে আসীন করিতে চান নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন যে, শ্রোতা বা দর্শকের অজান্তে তাঁহার বাণী তাহাদের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হউক, তাহাদের চিত্তকে সম্প্রসারিত করুক এবং তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বচ্ছ ও উদার করুক। ট্রাজেডির ক্যাথারসিস সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল যাহা বলিয়াছিলেন, মনে হয় কমেডি সম্বন্ধে ফ্রাইও একটু ভিন্ন অর্থে তাহাই বলিতে চাহিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে যখন বিংশ শতাব্দীর নাটকের ইতিহাস লেখা হইবে, নিঃসন্দেহে ক্রিস্টোফার ফ্রাই সেখানে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবেন।

৫

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে আরও তিনটি প্রকরণ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে—ছোটগল্প, একাঙ্ক নাটিকা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবন্ধ বা রম্যরচনা। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটিকে ইংরাজী সাহিত্যে নব আগন্তুক বলিলেও চলে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবন্ধ বা রম্যরচনা অবশ্য আডিসন-স্টীলের সময়েই ইংরাজী সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং ল্যাম্ব-হ্যাজলিটের সময়ে সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান করিয়া লয়, কিন্তু যে বহুমুখী স্রোতে ইহা জীবনের সকল ক্ষেত্র প্লাবিত করিতে পারে এবং যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা ইহার পক্ষে সম্ভব, তাহা এই বিংশ শতাব্দীরই আবিষ্কার। শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই যুগে বহু ছোট-বড় সাময়িক পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের সকলেরই এই প্রকার ছোট ছোট নিবন্ধের প্রয়োজন। সেই চাহিদা মিটাইবার জন্য বহু কুশলী ও শক্তিশালী লেখকও এই প্রকার লেখাকে তাঁহাদের রচনার অন্যতম বাহন করিয়া লন। এই প্রকার রচনায় ব্যক্তিগত জীবনের সামান্যতম অভিজ্ঞতা হইতে সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক আলোড়নের প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতের একফালি ছবি পর্যন্ত সমস্তই স্থান পাইয়াছে। তবে সাধারণতঃ ব্যক্তিজীবন বা সামাজিক জীবনের নির্বুদ্ধিতা, অযৌক্তিক কর্মপ্রণালী-অনুসরণই ইহার প্রধান উপজীব্য। সুতরাং করুণ-রসোদ্রেক বা ভীতিসঞ্চারপ্রয়াসী রম্যরচনার অভাব না

থাকিলেও, কৌতুকই এই জাতীয় রচনার মূল রস। শতাব্দীর প্রথম দিকে চেস্টারটন (G. K. Chesterton : ১৮৭৪-১৯৩৪), বেলক (Hilaire Belloc : ১৮৭০-১৯৫৩), লিণ্ড (Robert Lynd : ১৮৭৯-১৯৪৯), লুকাস্ (E. V. Lucas : ১৮৬৮-১৯৩৮) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। দ্বিতীয়ার্ধের লেখকদিগের মধ্যে অরওয়েল (George Orwell : ১৯০৩-১৯৫০) ও ওয়েন (John Wain : ১৯২৫-)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যে সমস্ত কারণে এই শতাব্দীতে রম্যরচনার বিস্তৃতি ঘটে, অনুরূপ কারণেই এই সময়ে সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রবেশ হয় এবং তাহা অকল্পনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাহার উপর বর্তমান যুগে জীবনের গতিবেগ অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুততর হইয়া ওঠায় এবং জীবনের তাগিদ মানুষের সময়ের উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করায়, সাধারণ লোকে বিরাট উপন্যাস পড়িবার অবসর করিয়া উঠিতে পারে না অথচ তাহার গল্প শুনিবার আগ্রহ আছে। মূলতঃ এই দ্বন্দ্ব হইতেই ছোটগল্পের উৎপত্তি। রুশ এবং ফরাসীদেশে বয়স্কজনপাঠ্য গভীর সাহিত্যরসসিক্ত ছোটগল্পের প্রচলন বহুদিন পূর্ব হইতেই ছিল। মোপাসাঁ, বালজাক, ডস্টিওফ্স্কি, টলস্টয়, চেকফ—সাহিত্যের এই সমস্ত দিক্‌পাল ফরাসী ও রুশ সাহিত্যকে ছোটগল্পে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডে ছোটগল্পের তেমন প্রচলন ছিল না। আডিসনের 'স্পেকটেটর'-এর কিছু কিছু রচনায় ছোটগল্পের রস থাকিলেও, ইহা সে সময়ে ইংরাজী সাহিত্যে নিজের বিশিষ্ট স্থানটি অর্জন করিয়া লইতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অস্কার ওয়াইল্ড যে সমস্ত ছোটগল্প লিখিয়াছিলেন তাহা প্রাপ্তবয়স্কের পাঠযোগ্য হইলেও তাহারা মূলতঃ কিশোর-কিশোরীদের জন্যই লিখিত হয়। বিংশ শতাব্দীর সূচনা হইতেই এই অবস্থার পরিবর্তন হয়।

এই যুগে প্রায় সমস্ত প্রথিতযশা ঔপন্যাসিকই যথেষ্ট ছোটগল্প লিখিয়াছেন। ভিক্টোরীয় যুগ পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যের বহু বিখ্যাত উপন্যাসই প্রথমে ধারাবাহিক-ভাবে সাময়িক পত্রিকায় এবং পরে উপন্যাসাকারে প্রকাশিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে এই প্রথার পরিবর্তন হয়। এখন হইতে উপন্যাসগুলি উপন্যাস আকারেই প্রকাশিত হইতে শুরু করে এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিতে তাহাদের স্থান অধিকার করে ছোটগল্প। যে সমস্ত ঔপন্যাসিক ছোটগল্প লিখিয়াছেন, উপন্যাসে তাঁহাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনাকৌশল পরিলক্ষিত হয়, তাঁহাদের ছোটগল্পগুলিও সচরাচর তাহা দ্বারা চিহ্নিত। তবে ছোটগল্পের পরিসর ক্ষুদ্রতর হওয়ায় এখানে অনুভূতির

তীব্রতা ও রসের ঘনত্ব আরও অনেক বেশী। বিশেষ করিয়া ফরস্টারের ছোটগল্পের কাব্যধর্মিতা ও প্রতীকী ব্যঞ্জনা, লরেন্সের ছোটগল্পে অশরীরী অনুভূতির শিহরণ ও মানুষের রক্তের গভীরে যে আদিম প্রাণবন্যা বহিতেছে তাহার আভাস সমারসেট মমের ছোটগল্পে। এই বিপুল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে অসংখ্য প্রকারের নরনারী বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন নীতিবোধ ও ধর্মবিশ্বাসের আওতায়, নানান ধরনের সুখ-দুঃখ, আনন্দবিষাদের মাধ্যমে সৃষ্টিরহস্যের বৈচিত্র্য উদ্ঘাটিত করিতেছে তাহার জীবনানুগ প্রতিচ্ছবি ছোটগল্পের বহুমুখিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দুই-চারিটি কথায় পরিবেশ সৃষ্টি এবং চরিত্রের অর্থোদ্ঘাটনে মমের দক্ষতা অতুলনীয়। মোপাসাঁর অনুকরণ বা অনুসরণকারী না হইয়াও, মম তাঁহার সমধর্মী।

কোনো কোনো লেখক আবার সাহিত্যের অন্য কোনো প্রকরণ লইয়া মাথা না ঘামাইয়া শুধুমাত্র ছোটগল্পকেই নিজেদের শিল্পকৃতির বাহন হিসাবে পছন্দ করিয়া লন এবং রসোত্তীর্ণ বহুসংখ্যক ছোটগল্প লিখিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে নিজেদের নাম চিরস্থায়িভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া যান। ইহাদের মধ্যে জেকবস্ (W. W. Jacobs : ১৮৬৩-১৯৪৩), মানরো (H. H. Munro : ১৮৭০-১৯১৬), এবং ক্যাথেরিন ম্যান্স্‌ফিল্ড (Katherine Mansfield : ১৮৮৮-১৯২৩) এই তিনজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জেকব্‌সের লেখা কৌতুকপ্রধান, তবে অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটনার মোড় ঘুরাইয়া চমকাইয়া দিতেও তিনি ওস্তাদ। মানরো "সাকী" এই ছদ্মনামে লিখিতেন এবং এই নামেই তিনি বেশী পরিচিত। তাঁহার গল্পে কৌতুকের অংশ বেশ থাকিলেও, ব্যঙ্গবিদ্রূপের ঝাঁঝও বেশ তীব্র। যে অম্লমধুর রস মধ্যবিত্ত সমাজের অতি প্রিয় তাহাই 'সাকী'র গল্পের প্রধান রস এবং এখানেই ছিল তাঁহার জনপ্রিয়তার উৎস। তবে তিনি করুণ রসের গল্পেও কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। ক্যাথেরিন ম্যান্স্‌ফিল্ড একেবারে স্বতন্ত্র পর্যায়ে পড়েন। তিনি ছিলেন জাতশিল্পী। অল্পপরিসরে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষায় বর্ণিত দৃশ্যটি হুবহু ফুটাইয়া তুলিতে এবং বর্ণিত চরিত্রের সঠিক মনোভাবটি পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে ম্যান্স্‌ফিল্ডের দক্ষতা অতুলনীয়। ক্যাথেরিন ছিলেন নিউজিল্যাণ্ডের মেয়ে। কৈশোরের প্রান্তে তিনি ইংলণ্ডে আসেন এবং একখানি সাহিত্যপত্রিকাতে চাকুরি লইয়া ইংলণ্ডেই থাকিয়া যান। পরে ঐ কাগজের সম্পাদকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং সেই সূত্রে তিনি সে যুগের সমস্ত উঠতি সাহিত্যিকদেরই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন। ক্ষয়রোগাক্রান্ত তাঁহার জীবনের শেষ অংশের অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে ইউরোপের নির্জন স্বাস্থ্যনিবাসে কাটাইতে হয়। ফলে

তিনি সাহিত্যে প্রকাশভঙ্গি লইয়া চিন্তা, পড়াশুনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার অখণ্ড অবসর পাইয়াছিলেন। এ বিষয়ে কীট্‌সের সহিত তাঁহার বেশ একটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কীটসের মত তিনিও নিজের রচনা সম্বন্ধে বিশেষ খুঁতখুঁতে ছিলেন এবং বার বার নিজের লেখা সংশোধিত করিতেন। কিন্তু তাঁহার সাহিত্যকৃতিতে কৃত্রিমতার বিন্দুমাত্র ছাপ নাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে শিশু ও কিশোর মনের বিরাট বিস্ময়, বয়স্কদের কথাবার্তা, ব্যবহার, চালচলন প্রভৃতিতে যে কৃত্রিমতা, পরস্পর-বিরোধ ও হৃদয়হীনতা দেখা যায় তাহার প্রতি শিশুমনের অসন্তোষ, বিদ্রোহ ইত্যাদি ম্যান্‌স্‌ফিল্ডের লেখায় অসামান্য জীবন্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তথাকথিত শিল্পিজীবনের হাস্যকর অসঙ্গতিগুলিও তিনি কোনো কোনো গল্পে নিখুঁতভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ক্যাথেরিন ম্যান্‌স্‌ফিল্ডের ছোটগল্পের পরিধি অতি সীমিত, একথা ঠিক; কিন্তু তিনি নিজের অভিজ্ঞতার বাহিরের জগতে পদার্পণ করিবার দুঃসাহস করিতে যান নাই বলিয়াই তাঁহার শিল্পকৃতি এত উচ্চমানের হইয়াছে।

পাঠকের সময়ের স্বল্পতার জন্য যেমন ছোটগল্পের উদ্ভব, দর্শক বা শ্রোতার সময়ের জন্যই যে তেমনি একাঙ্ক নাটিকা বা একাঙ্কিকার উদ্ভব তাহা বলা চলে না। দর্শক বা শ্রোতার সময়স্বল্পতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিংশ শতাব্দীর নাট্যকারেরা এলিজাবেথীয় ও তৎপরবর্তী যুগের পঞ্চাঙ্ক নাটকের পরিবর্তে তিন অঙ্কের নাটক লিখিতে শুরু করেন, এবং এ যুগের অধিকাংশ নাটকই তিন অঙ্কবিশিষ্ট। সময়-স্বল্পতা নহে, একাঙ্কিকার উদ্ভব ও প্রয়াসের অন্য দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, নাটক তিন অঙ্কে সংকুচিত হইবার ফলে কোনো কোনো দর্শক—বিশেষ করিয়া সাধারণ দর্শক মনে করিত যে তাহারা যে দর্শনী দিতেছে তদনুযায়ী দ্রষ্টব্য পাইতেছে না। তাহাদের মনোরঞ্জনের জন্য অনেক থিয়েটার কোম্পানী মূলনাটক আরম্ভ করিবার পূর্বে এই জাতীয় একাঙ্কিকার অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। যাহারা শুধুমাত্র মূল নাটকটি দেখিতেই উৎসুক, তাহারা একাঙ্কিকাটির অভিনয়ের পর প্রেক্ষাগৃহে আসিতে পারিত। দ্বিতীয়তঃ, এই যুগে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থিয়েটার কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহাদের কাহারও উদ্দেশ্য ছিল সমাজের দোষত্রুটি দেখাইয়া দিয়া সমাজসংস্কার, কেহ কেহ বা রাষ্ট্রব্যবস্থার অযৌক্তিকতা ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করাকেই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বাছিয়া লইয়াছিল। লণ্ডন, বার্মিংহাম, ম্যাঞ্চেস্টার, ডাবলিন প্রভৃতি সমস্ত জনবহুল নগরীতেই এই জাতীয় থিয়েটার কোম্পানী স্থাপিত হয়। তবে তাহাদের মধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় থিয়েটারই

সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী ছিল। কবি ইয়েটস্, নাট্যকার সিং প্রভৃতি ইহার সহিত সংযুক্ত ছিলেন। লেডী গ্রেগরী নামে এক মহিয়সী মহিলার অর্থানুকূল্যেই এই সংস্থাটি চালিত। লেডী গ্রেগরী নিজেও একাধিক উৎকৃষ্ট একাঙ্কিকা লিখিয়াছিলেন।

এই থিয়েটার কোম্পানীগুলির প্রচেষ্টা যে শুধু শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত তাহা নহে, অনেক সময়ে এগুলি ভ্রাম্যমাণ সংস্থারূপে শহর হইতে দূরে পল্লীঅঞ্চলে যেখানে শ্রোতৃসমাগমের সম্ভাবনা কম সেখানেও অভিনয় করিতে যাইত। সহজেই বুঝা যায় যে, অর্থসাচ্ছল্য না থাকায় ইহাদের ব্যয়সাপেক্ষ উপকরণবাহুল্য ছিল না এবং কুশলী নটনটী থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা স্বভাবতই অতি সীমিত ছিল। এই সমস্ত অনটনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এই একাঙ্কিকাগুলি লিখিত হইত। কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও ইহাদের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং ভাবের গভীরতা ও আবেদনের তীব্রতার কোনো অভাব ছিল না। মূর্চ্ছিত পিতাকে মৃত মনে করিয়া তাহার দুই কন্যার মধ্যে পিতার সম্পত্তি লইয়া অশোভন এবং হাস্যকর কলহ হইতে আত্মগোপনকারী আইরিশ বিদ্রোহী বীরের কিছু পুলিসের চোখে ধূলি দিয়া এবং পুলিসের কর্তাকে সম্মোহিত করিয়া পলায়ন, খনির নীচে খাদ চাপা পড়িয়া তরুণ শ্রমিক বালকের করুণ মৃত্যু হইতে কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তাঁহার জাহাজে নাবিকবিদ্রোহ এবং কলম্বাস কর্তৃক তাহার দমন, চোরকে সামনে পাইয়াও নির্বুদ্ধি কনেস্টবলের তাহাকে চিনিতে না পারা এবং তাহার পলায়নের পথ সুগম করিয়া দেওয়া হইতে আশ্রয়দাতা ধর্মযাজকের বহুমূল্য রূপার বাতিদান চুরি করিয়া পলায়নরত চোরকে পুলিসের গ্রেপ্তার করিয়া ধর্মযাজকের নিকট লইয়া আসিলে সেই উদার ধর্মযাজকের চোরকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার—ইত্যাদি অনেক কিছুই এই একাঙ্কিকাগুলি চলমান জীবনের উজ্জ্বল টুকরারূপে দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপিত করে। ইতিহাস, কিংবদন্তী, বাস্তব ঘটনা, কল্পিত কাহিনী, প্রসিদ্ধ দেশী বা বিদেশী উপন্যাসের অংশবিশেষ—সমস্ত কিছুই একাঙ্কিকার বিষয়বস্তু হইতে পারে। একাঙ্কিকার লেখকের নাম যদিও বা সাহিত্যের ইতিহাসে ক্ষোদিত না থাকে, সাহিত্যে এক নূতনতর স্বাদের প্রকরণ হিসাবে বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে এই নাটকগুলি নিশ্চয়ই একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

৬

ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস শেষ করিলে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া

যাইবে। সাহিত্য সমালোচনা বলিতে সাহিত্যের আদর্শ ও উদ্দেশ্য, সাহিত্য-সৃষ্টির কারণ, উৎস, অনুপ্রেরণা ও প্রণালী এবং সাহিত্যরসাস্বাদের যোগ্যতা, পদ্ধতি, আনন্দ প্রভৃতি সব কিছুর আলোচনাই বুঝায়।

ইংরাজী ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত করেন সার ফিলিপ সিডনী। তাঁহার The Apologie for Poetre or Defence of Poesy ('কাব্যের সপক্ষে') ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইলেও তাঁহার মৃত্যুর পর ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সিডনী কাব্যের স্বরূপ, কাব্যের শ্রেণীবিভাগ, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদির সহিত কাব্যের সম্বন্ধ, জীবনের উপর কাব্যের প্রভাব প্রভৃতি সমস্ত কিছুরই বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। নাটকেরও বিস্তৃত আলোচনা আছে। সিডনীর গ্রন্থে মৌলিক খুব বেশী কিছু নাই, তিনি প্রধানতঃ আরিস্টট্‌লকেই ইংরাজী পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। সিডনীর বিচারে তদানীন্তন কাব্য ও নাটকের মান ছিল অতি নিম্নস্তরের—মনে রাখিতে হইবে যে শেকৃশপিয়ারের যুগান্তকারী নাটক ইংলণ্ডের নাট্যমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিবার পূর্বেই সিডনীর মৃত্যু হইয়াছিল।

সাহিত্য সমালোচনায় সিডনীর পরই উল্লেখযোগ্য নাম ড্রাইডেনের। ড্রাইডেন তাঁহার Essay of Dramatic Poetry ('নাট্যকাব্যের উপর') নামক প্রবন্ধে চার বন্ধুর কথোপকথনের মাধ্যমে নাটকের সমস্ত দিক লইয়া বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। ক্লাসিকপন্থী ফরাসী নাটক ও রোমাণ্টিক এলিজাবেথীয় বা শেকশ্‌পীয়ারের নাটকের পারস্পরিক গুণ বিচার এই প্রবন্ধের এক বিশেষ ঐশ্বর্য। আরিস্টট্‌লের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াও ড্রাইডেন বলিয়াছেন যে, আরিস্টট্‌ল্ তাঁহার সমসাময়িক নাট্যকারদের নাটক দেখিয়াই তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি করিয়াছিলেন, সুতরাং সেই সকল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও ভাবীকালে যদি কোনো নাট্যকার রসোত্তীর্ণ নাটক রচনা করিতে পারেন, তাহাকে অস্বীকার করা মূঢ়তার নামান্তর মাত্র। শেকৃশপীয়ারের নাটকে নানাপ্রকার ছোটখাট ত্রুটিবিচ্যুতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও ড্রাইডেন শেকৃশপীয়ারকে সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই বিখ্যাত প্রবন্ধটি ছাড়াও ড্রাইডেন তাঁহার নানা কবিতায় ও নাটকে যে সকল মুখবন্ধ লিখিয়াছিলেন সাহিত্য সমালোচনা হিসাবে তাহাদের মূল্য অপরিসীম।

পোপের Essay on Criticism ('সমালোচনী')-এর কথা পূর্বেই (পৃঃ ১১১-১১২) বলা হইয়াছে। ডঃ জনসনের কাব্যরসাস্বাদ শক্তি কিছুটা সীমিত হইলেও

তাঁহার প্রখর বাস্তববোধ ও সাধারণ জ্ঞান তাঁহার সাহিত্য সমালোচনাকে সর্বদাই তীক্ষ্ণ ও অর্থবহ করিয়াছে (পৃঃ ১৩৫-১৩৬)।

অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইংলণ্ডে যত সাহিত্য সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ পরনির্ভর না হইলেও, মূলতঃ ক্লাসিকালপন্থী ছিল। আরিস্টট্‌ল, লঙিনাস্, হোরেস—ইঁহারাই ছিলেন এই সকল সমালোচকের আদর্শ। রোমান্টিক যুগে আসিয়া ইহার পরিবর্তন ঘটিল। সাহিত্যপাঠকের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া, মনস্তত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, সনাতন মানবিক আদর্শ প্রভৃতির সমন্বয়ে যে সাহিত্যবিচার তাহাই সাহিত্য সমালোচনা বলিয়া স্বীকৃত হইল। কোলরিজ তাঁহার Biographia Literaria ('সাহিত্যিকের জীবন') গ্রন্থে ও অন্যান্য রচনায় এই মতের প্রধান প্রবক্তা হইলেও, অন্যান্য কবি ও লেখকদেরও এ বিষয়ে সামান্য দান নাই। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে যে মুখবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার কথা আগেই (পৃঃ ১৮৪) উল্লেখিত হইয়াছে। কীট্‌স্ তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে যে সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে প্রকাশিত তাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধে মতামতের মূল্যও অসীম। শেলীর Defence of Poetry ('কাব্যের পক্ষে') রচনাটিও এই প্রসঙ্গে বিশেষ মূল্যবান বলিয়া উল্লেখ করা যায়। সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য ও প্রণালী সম্বন্ধে যুগমতের এই পরিবর্তন, কোনো বিশেষ সাহিত্যিকের কিংবা কোনো বিশেষ সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নেও পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টিভঙ্গির এই বিশিষ্টতা আমরা দেখিতে পাই ল্যাম্ব, হ্যাজলিট, ডি কুইন্সি প্রভৃতির সাহিত্য সমালোচনায় (পৃঃ ১৮৫-১৮৭)।

ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যালোচনায় শীর্ষস্থানীয় নাম কবি ম্যাথিউ আর্নল্ডের। তাঁহার সাহিত্যালোচনার মুখ্যবস্তু কবিতা, কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সাহিত্যের সকল প্রকরণের প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে। ম্যাথিউ আর্নল্ডের মতে, কবিতা হইল জীবনের পর্যালোচনা (Criticism of Life)। এই পর্যালোচনার মধ্যে জীবনের অর্থ বিশ্লেষণ, জীবনের যথাযথ চিত্রাঙ্কন ও জীবনে শ্রেয়ের আভাস, সব কিছুর আলোচনাই পড়ে। তিনি বলিতেন যে, সাহিত্যসাধকের জীবনকে নিষ্কম্পনেত্রে এবং সামগ্রিকভাবে দেখিবার ক্ষমতা থাকিলে, তবেই তাঁহার রচনার সাহিত্যিক মূল্য থাকিবে এবং তিনি পাঠককে ঠিক পথের নিশানা দিতে পারিবেন। ম্যাথিউ আর্নল্ডের মতে, ধর্ম মানবজীবনের

একদিককে মাত্র প্রভাবিত করে, আর কবিতা মানুষের সমস্ত সত্তাকেই আচ্ছন্ন করিতে পারে। সেইজন্য তিনি বলিয়াছেন যে, আধুনিক জগতে কবিতা ক্রমশঃই অধিক পরিমাণে ধর্মের স্থান অধিকার করিয়া লইতেছে। ম্যাথিউ আর্নল্ড সাধারণভাবে রোমাণ্টিক কবিদের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পরম ভক্ত হইলেও তিনি তাঁহাদের ত্রুটির প্রতি সজাগ ছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, রোমাণ্টিক কবিরা যথেষ্ট জানিতেন না, অর্থাৎ ম্যাথিউ আর্নল্ডের মতে শুধু আবেগ বা অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত কবিতা মনোরঞ্জক হইলেও, তাহা জ্ঞানসমৃদ্ধ না হইলে কখনও উচ্চপর্যায়ের সাহিত্য হইতে পারে না। এইজন্য শেলীর 'কবিতার সৌন্দর্য এবং তাঁহার আদর্শবাদের মহিমা স্বীকার করিয়াও তিনি শেলীর ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেন নাই। আর্নল্ড শেলীকে দেবদূত বলিয়াছেন বটে, কিন্তু শেলীর কবিতাকে অসীমশূন্যে দেবদূতের নিষ্ফল রঙীন পাখা ঝটপটানির সহিত তুলনা করিয়াছেন। ম্যাথিউ আর্নল্ডের সমালোচনায় কবিতার আঙ্গিকের কোনো আলোচনা নাই: কবিতার উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য কেমন করিয়া সাধিত হয় বা হইতে পারে, সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে কবিতার প্রভাব, এই সমস্ত জিনিসই আর্নল্ডের আলোচনার বিষয়বস্তু। তাঁহার সাহিত্য সমালোচনায় কিছুটা নীতিবাগীশী গন্ধ থাকিলেও, তাঁহার মতামত ও দৃষ্টি-ভঙ্গি শুধু যে উনবিংশ শতকের সাহিত্যিকদেরই গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা নহে, এই বিংশ শতাব্দীর বহু সাহিত্যসমালোচকও তাঁহার দৃষ্টিকোণ ও সাহিত্যসমালোচনা পদ্ধতির অনুরাগী ও সমর্থক।

ভিক্টোরীয় যুগের দ্বিতীয় প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ওয়াল্টার পেটার (পৃঃ ২৩৯-৪০)-এর মতবাদ আর্নল্ডের মতবাদের ঠিক বিপরীত। বস্তুতঃ, পেটার সাহিত্যে কলাকৈবল্যবাদ (art for art's sake) এই মতের প্রবক্তা। তাঁহার মতে, সাহিত্য-সৃষ্টির নৈতিক বা অপর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না বা থাকা উচিত নয়। সৌন্দর্যসৃষ্টিই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। পেটার তাঁহার নিজের সাহিত্য সমালোচনাতে সব সময়ে অবশ্য এই মতবাদের মর্যাদা রাখিতে পারেন নাই, তবুও এই মতবাদ এক শ্রেণীর কবি ও সাহিত্যস্রষ্টাদের—বিশেষ করিয়া মালার্মে, বোদেলিয়র প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত ইংরাজী লেখকদের—বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমের দিকেও অনেকে কলাকৈবল্যবাদের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন।

অস্কার ওয়াইল্ডের (পৃঃ ২৪৫) সাহিত্য সমালোচনা আয়তনে ক্ষীণ হইলেও

এবং তাহা যথাযথ স্বীকৃতি না পাইলেও, তাহার প্রভাব ছিল অপরিসীম। তবে ওয়াইল্ড সাহিত্য-সমালোচনাকে সাহিত্যস্রষ্টার দিক হইতে না দেখিয়া মুখ্যতঃ সাহিত্যপাঠকের দিক হইতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্য, সৃষ্টিকর্ম শেষ হইয়া যাইবার পর সৃষ্ট শিল্পের সহিত শিল্পীর আর কোনো সম্বন্ধ থাকে না; পাঠক বা সমালোচক তাহার উপর যে অর্থ আরোপ করিবেন, তাহাই তাহার ঠিক অর্থ। এই মতানুসারে, একই শিল্পকীর্তির একাধিক অর্থ থাকিতে পারে বা থাকে। আপাতদৃষ্টিতে এই মতবাদকে কিছুটা উদ্ভট মনে হইলেও, বিংশ শতকের এলিয়ট, রিচার্ড্স্, এম্সন প্রভৃতি প্রধান প্রধান সাহিত্যসমালোচকগণের উপর এই মতের প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট।

বিংশ শতকে ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এক বিরাট যুগান্তর ঘটে। এই শতকের প্রথমে আর্নল্ড, পেটার ও ওয়াইল্ডের যুগপৎ প্রভাবে ইংলণ্ডের সাহিত্যসমালোচনা পদ্ধতিতে একটা তালগোল পাকাইয়া গিয়াছিল। তথাকথিত সাহিত্যসমালোচকগণ কখনও ধোঁয়াটে দর্শন বা বস্তাপচা নীতিবোধ, কখনও ব্যক্তিগত রুচি বা রুচিবিকৃতি, কখনও বা কোন সাহিত্যকৃতির বহিরঙ্গ লইয়া কচাকচি করাকেই সাহিত্য সমালোচনা বলিতেন। এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এলিয়ট। এলিয়ট্ তাঁহার নিজস্ব পত্রিকা Criterion (পৃ ২৮৬-৮৭)-এ এবং অন্যত্র প্রকাশিত শতাধিক প্রবন্ধে, অন্যের লিখিত বহু পুস্তকের মুখবন্ধে এবং বিদ্বজ্জনসভায় প্রদত্ত বেশ কয়েকটি বক্তৃতায় বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সমালোচনাকে সমস্ত প্রকার মামুলীয়ানা, অনিশ্চয়তা ও আবেগপ্রবণতা হইতে উদ্ধার করিয়া ইহাকে এক সুনির্দিষ্ট ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। বস্তুতঃ, কবি এলিয়ট বা নাট্যকার এলিয়ট অপেক্ষা সাহিত্য-সমালোচনার পথনির্দেশক এলিয়টের দানই বোধহয় ইংরাজী সাহিত্যের পক্ষে বেশী মূল্যবান। মনে হয়, সমালোচক এলিয়টের প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্যই কবি এলিয়টের যতটুকু খ্যাতি প্রাপ্য, তাহা অপেক্ষা তিনি অনেক বেশী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

বিংশ শতকের সাহিত্য সমালোচনায় তিনটি বিশেষ ধারা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রথম, সাহিত্যস্রষ্টা তাঁহার কাজে যে সকল বাধার সম্মুখীন হন, তাহার এবং এই বাধা অতিক্রম করিবার উপায়ের আলোচনা। এলিয়ট এই শ্রেণীরই সমালোচক। সাহিত্যের উদ্দেশ্য, সাহিত্যসৃষ্টির প্রণালী, আঙ্গিকের প্রভাব, এই সমস্তই এ জাতীয় আলোচনার বিষয়বস্তু। ইংরাজী ভাষায় উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ

সাহিত্য-সমালোচকই সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের সমালোচনাও এই জাতের এবং এলিয়ট তাঁহাদের সমগোত্রীয়। সাহিত্যস্রষ্টা যখন সমালোচকের আসন গ্রহণ করেন, তখন দেখা যায় যে সচরাচর তিনি নিজে যে জাতীয় সাহিত্য রচনা করেন তাহার ওকালতি করিতেই তাঁহার অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হইয়া যায় এবং সমালোচনাও বেশ একটু একপেশে হইয়া পড়ে। ড্রাইডেন, পোপ, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, আর্নল্ড সকলের সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। এলিয়ট—বিশেষ করিয়া তাঁহার প্রথম জীবনের সমালোচনায়—ইহার ব্যতিক্রম নহেন। এলিয়ট অবশ্য ভুল স্বীকার করিয়া উত্তর জীবনে তাঁহার প্রথম জীবনের অনেক মতামত প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন।

আগেই বলা হইয়াছে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ডে সাহিত্য সমালোচনার মান অতি নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছিল ; শূন্যগর্ভ, গুরুগম্ভীর বাগাড়ম্বর এবং যুক্তিহীন আবেগপ্রকাশকেই সাহিত্য সমালোচনা মনে করা হইত এবং এই অবস্থার অবসান ঘটানোর প্রধান কৃতিত্ব এলিয়টের। এলিয়ট বলিলেন যে, কবির ব্যক্তিগত জীবন বা পারিপার্শ্বিকের আলোচনা অথবা সমালোচকের নিজের উচ্ছ্বাস বা বিদ্বেষ প্রকাশকে সাহিত্য সমালোচনা বলা চলে না। কোনো সাহিত্যকৃতিতে লেখক ঐতিহ্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া তাঁহার নিজের মৌলিকতা কতটা ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন তাহার উদ্ঘাটনই সাহিত্য সমালোচনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে তিনি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মতবাদ খণ্ডন করিয়া বলেন যে, লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির সংযত এবং সুষমাময় প্রকাশই কবিতা নহে, নিরাসক্তির সহিত লেখক কোনো অনুভূতির—সে অনুভূতি ব্যক্তিগত অনুভূতি নাও হইতে পারে—কতটা সার্থক রূপায়ণ করিতে পারিয়াছেন, তাহার উপরই কবিতার উৎকর্ষ নির্ভর করে। ম্যাথিউ আর্নল্ডের বক্তব্যকে খণ্ডন করিয়া এলিয়ট বলেন যে, কবিতার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, কবিতাকে কবিতা হিসাবেই ফুটিয়া উঠিতে হইবে। অবশ্য 'কবিতা হইয়া ফুটিয়া উঠা' যে কি জিনিস তাহা এলিয়ট কোথাও ব্যাখ্যা করেন নাই। আধুনিক জীবনের জটিলতা বাড়িয়া যাইবার জন্য আধুনিক কবিতাও যে জটিল হইতে বাধ্য, এলিয়টের এই উক্তিটিই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। নাটক লইয়া, বিশেষ করিয়া নাটকের ভাষা ছন্দোবদ্ধ হইবে কি না, এবং হইলে কথিত ভাষা হইতে তাহার দূরত্ব কতটুকু হইবে ইত্যাদি বিষয় লইয়াও এলিয়ট যথেষ্ট সমালোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার এই সমালোচনাই প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীতে ছন্দোনাট্য পুনরুজ্জীবনের বিশেষ বাতাবরণ সৃষ্টি করে। নাটক সম্বন্ধে

এলিয়ট আরও বলেন যে, নাটককে কবিতার মত দুরূহ হইলে চলিবে না, কারণ কবিতা একান্তে অধীত হইবার জন্য লেখা এবং বুঝিতে না পারিলেও পাঠক ইহা বারবার পড়িবে; এদিকে প্রেক্ষাগৃহে নাটক দেখিয়া বুঝা না গেলে, শ্রোতা বা দর্শক কেহই তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবে না। তাঁহার আরও বক্তব্য এই যে— কবিতার লক্ষ্য নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টি, আর নাটকের লক্ষ্য দর্শকের মধ্যে জীবন-সচেতনতাসঞ্চার। বোধ হয়, এই বোধ হইতেই এলিয়ট জীবনের শেষ পঁচিশ বৎসর কোনো কবিতা না লিখিলেও কয়েকটি নাটক লিখিয়াছেন। অবশ্য সাহিত্য ও সমাজ সমালোচনায় এলিয়ট যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উৎসাহী ছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত To Criticise the Critic ('সমালোচকের সমালোচনা') গ্রন্থ হইতে সুস্পষ্ট।

সাহিত্য সমালোচনার দ্বিতীয় ধারাটি প্রবাহিত হইয়াছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর হইতে। বর্তমানে অধিকাংশ ইংরাজী সাহিত্য-সমালোচকই অধ্যাপক, অথচ ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত এ জিনিস অকল্পনীয় ছিল। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ঠেকিলেও ইহার বিশেষ কারণ আছে। ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে—বিশেষ করিয়া প্রধান দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়, অক্সফোর্ডে ও কেম্ব্রিজে—ইংরাজী পঠনপাঠনের স্থান ছিল অতি গৌণ। অক্সফোর্ডে ইংরাজী অনার্সের পাঠক্রম চালু হয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং কেম্ব্রিজে মাত্র ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে। স্বভাবতঃই অধ্যাপকগণের সাহিত্য সমালোচনার বিশেষ কোনো সুযোগ—হয়ত প্রবৃত্তিও—ছিল না। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে ইংরাজী পঠনপাঠন গুরুত্ব লাভ করার পর এ অবস্থা পাল্টাইয়াছে। অক্সফোর্ডে গবেষণাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সাহিত্য সমালোচনাও প্রধানতঃ গবেষণাভিত্তিক। ইংরাজী সাহিত্যের পঠনপাঠনে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম হইলেও সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে ইহার স্থান স্বভাবতঃই অপরিসর। কেম্ব্রিজে কিন্তু সাহিত্য সমালোচনাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার বিশেষ চেষ্টা হয়। এই চেষ্টার পুরোধা ছিলেন এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিচার্ড্স্ (I. A. Richards : ১৮৯৩-)। ছাত্রদের সাহিত্যবোধ লইয়া পরীক্ষানিরীক্ষা করিবার সময়ে রিচার্ড্স্ দেখিলেন যে, অনেকেই বহু সহজ কবিতারও অর্থ বুঝিতে পারে না বা কিম্ভূতকিমাকার অর্থ করে, অথচ সাধারণ সাহিত্য-আলোচনার সময়ে মামুলী সাহিত্য সমালোচনার বুলিগুলি কপচাইয়া গড় গড় করিয়া বেশ খানিকটা লিখিয়া যাইতে পারে। এই অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিতে

হইবে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠের উপর জোর দিলেন। আলোচ্য বিষয়টি সতর্কভাবে (প্রয়োজন হইলে বার বার) পাঠ করিয়া তাহার অর্থবোধ, মর্মগ্রহণ, গঠনপ্রণালী বিশ্লেষণ, প্রতীকী মূল্য উদ্ঘাটন, সাহিত্যে তাহার স্থান নির্ণয় ইত্যাদিই সাহিত্য সমালোচনা বলিয়া গৃহীত হইল। রিচার্ড্‌স্ তাঁহার Principles of Criticism ('সমালোচনার রীতিনীতি') ও Practical Criticism ('হাতে-নাতে সমালোচনা') এই দুই গ্রন্থে সমালোচনার এই পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যেও অনেকে দেশবিদেশের অধ্যাপনার বহুক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়া গুরুর এই প্রণালীটির ব্যবহার বহুবিস্তৃত করিয়া তোলে। এই ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে বিখ্যাততম এম্‌সন (William Empson : ১৯০৬-)-এর নাম এই প্রসঙ্গে করিতেই হইবে। এম্‌সনের Seven Types of Ambiguity ('দ্ব্যর্থবোধের সপ্তপদ') স্থানে স্থানে অতিবুদ্ধির দীপ্তিতে কৃত্রিম মনে হইলেও সাহিত্যসমালোচনা ক্ষেত্রে একখানি যুগান্তকারী গ্রন্থ।

এলিয়ট ও রিচার্ডস্ পরস্পর বন্ধু ছিলেন এবং সাহিত্যসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ে দুইজনের সর্বদা মতৈক্য না থাকিলেও, এলিয়টের তত্ত্ব এবং রিচার্ডস্-এর পদ্ধতিই মোটামুটিভাবে বর্তমানের ইংরাজী সাহিত্যসমালোচনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

সাহিত্য সমালোচনার তৃতীয় ধারাটি রহিয়াছে সাময়িক সাহিত্যপত্রিকাগুলির পাতায় পাতায়। এই পত্রপত্রিকাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্যিকগোষ্ঠীকে ঘিরিয়া জন্মলাভ করিত। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই সংঘাত বাধিলেও এবং ইহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘজীবী না হইলেও, তাহাদের সকলের মিলিত প্রভাবই সমসাময়িক ও ভাবী দিনের সৃজনী সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্য সমালোচনার দিক নির্ণীত করে। বহু নূতন সাহিত্যিককে ইহারা পাঠকসমাজে উপস্থিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করে; লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণও সচরাচর ইহাদিগকে সমীহ করিয়া চলিতেন। সমকালীন ইংরাজী, এবং অনেক ক্ষেত্রে ইউরোপীয়, সাহিত্যই ছিল ইহাদের বিষয়বস্তু। এই জাতীয় পত্রিকার সম্পাদকগণের মধ্যে মারি (J. M. Murry : ১৮৮৯-১৯৫৭)-র নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি বিভিন্ন সময়ে বহু পত্রিকার সম্পাদনা করেন এবং যদিও প্রধানতঃ অর্থাভাবেই ইহাদের অধিকাংশই দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই, তবু সব কয়টিই ছিল উচ্চমানের অভিজাত পত্রিকা। 'রদম্' (১৯১১), 'ইগোইস্ট' (১৯১৩), 'অ্যাথিনিউম্' (১৯১৯) এবং 'অ্যাডেল্‌ফি' (১৯১৯)—এই সব পত্রিকাগুলির স্থাপনা ও সম্পাদনার কৃতিত্ব মারির। ১৯২৩ হইতে ১৯৪৮ এই পঁচিশ বৎসর মারি 'অ্যাডেল্‌ফি'র সম্পাদক ছিলেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত এলিয়টের সম্পাদিত 'ক্রাইটেরিয়ন'ও এই শ্রেণীর পত্রিকা। এলিয়টের সম্পাদনায় ইহা দীর্ঘস্থায়ীও হয়—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পত্রিকার মান অবনত করা অপেক্ষা ইহাকে তুলিয়া দেওয়াই শ্রেয় মনে করিয়া ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এলিয়ট ইহাকে তুলিয়া দেন। কিন্তু যতদিন 'ক্রাইটেরিয়ন' চালু ছিল, ততদিন ইহা যে ইংলণ্ডের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সাহিত্য পত্রিকা ছিল তাহা নহে, ইহা এক হিসাবে সমসাময়িক সাহিত্যের নিয়ন্ত্রক ও মাননিরূপক হিসাবেই কাজ করিত।

লিভিস (F. R. Leavis : ১৮৯৪-)-এর 'স্ক্রুটিনি' (Scrutiny) একটু অন্য জাতের পত্রিকা। সৃজনশীল সাহিত্যের প্রকাশ নহে, শুধুমাত্র সাহিত্য সমালোচনাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। লিভিস নিজে অধ্যাপক হইলেও তাঁহার সাহিত্যোৎসাহ ও সাহিত্য সমালোচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পার হইয়া সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি এলিয়ট ও রিচার্ড্‌সের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইলেও তাঁহার নিজের এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। অনেকটা আর্নল্ডের মতই তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের উপর সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে। তাঁহার এবং তাঁহার পত্রিকার সকল সমালোচনাই প্রধানতঃ এই ধারণা হইতে উৎসারিত। সমকালীন সাহিত্য, বিশেষ করিয়া কবিতা, লইয়া প্রবন্ধ লিখিলেও, ইংরাজী সাহিত্যের পূর্ববর্তী লেখকগণের পুনর্মূল্যায়নের দিকেই তাঁহার বেশী মনোযোগ। শেক্‌শ্‌পীয়ার, জেন অস্টেন, কিছু কিছু রোমান্টিক কবি ও ভিক্টোরীয় ঔপন্যাসিককে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা লইয়া বিচার করিলে তাঁহারা কি রূপ পরিগ্রহ করেন এবং সভ্যতার বর্তমান পর্যায়ে তাঁহাদের উপযোগিতাই বা কতটুকু, লিভিস ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্যবিচারের কোনো নূতন সূত্র বা মানদণ্ড উদ্ভাবন করিয়া তাহার সাহায্যে সাহিত্যিকদের বিচার করার চেষ্টা লিভিস করেন নাই, এবং এই দিক হইতে দেখিলে তাঁহার সমালোচনার মৌলিকত্বও হয়ত খুব বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার সমালোচনায় যে বুদ্ধির দীপ্তি, মননশীলতার প্রাখর্য ও বিশ্লেষণের চাতুর্য দেখা যায় তাহা শুধু যে তাঁহার পাঠকদিগকে মুগ্ধ করে তাহা নহে, তাহাদের অজান্তে তাহাদের সমালোচনাপদ্ধতিকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ১৯৩২ হইতে ১৯৫৩, এই দীর্ঘ একুশ বৎসর একটানা 'স্ক্রুটিনি'র সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া লিভিস ইংরাজী সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে অননুভূত অথচ বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করেন। 'স্ক্রুটিনি'র প্রভাব ও জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পত্রিকাটির

প্রকাশনা বন্ধ হইয়া যাইবার পরও উহার পুরাতন সংখ্যাগুলির জন্য এত প্রবল চাহিদা থাকে যে, উহার সব সংখ্যাগুলিকেই আবার পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত করিতে হয় এবং পৃথিবীর যে বিশ্ববিদ্যালয়েই ইংরাজী সাহিত্যের পঠনপাঠন হয় সেখানেই এই পুনর্মুদ্রিত 'স্ক্রুটিনি'গুলির দেখা মিলিবে। লিভিসের প্রধান প্রধান সমালোচনা গ্রন্থের মধ্যে New Bearings in English Poetry ('ইংরাজী কবিতার নূতন নিরিখ'), Revaluation ('পুনর্মূল্যায়ন') ও The Great Tradition ('সুমহান ঐতিহ্য') এই তিনখানির নাম করা যাইতে পারে।

বিংশ শতকে ইংরাজী সাহিত্য সমালোচনায় একটি নূতন সংযোজন—উপন্যাসের আলোচনা। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে উপন্যাসের প্রচলন হইতে তাহার পাঠক-সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে যদিও ভিক্টোরীয় যুগের মাঝামাঝি অন্যান্য সকল প্রকরণের সাহিত্যের পাঠকসংখ্যা অপেক্ষা বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তবুও একমাত্র ফিল্ডিং-এর 'টম্ জোন্‌স্'-এর প্রতি খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে ছাড়া উপন্যাসের উদ্দেশ্য, গঠনকৌশল, পাঠকের উপর প্রভাব, লেখক-পাঠক সম্বন্ধ, ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ, কথোপথনের যাথার্থ্য প্রভৃতির সম্বন্ধে অন্য কোথাও আর কেহ বিশেষ আলোচনা করেন নাই। মনে হয়, সাহিত্যিকগণ কাব্য ও নাটককে মাত্র সাহিত্যের মর্যাদা দিতেন, উপন্যাসকে মনে করিতেন সাধারণ লোকের চিত্তবিনোদনের জন্য লিখিত পুস্তকমাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই অবস্থার অবসান ঘটাইলেন ইউরোপপ্রবাসী আমেরিকান ঔপন্যাসিক জেম্‌স্ (Henry James : ১৮৪৩-১৯১৬)। জেমসের উপন্যাসগুলি প্রথম প্রথম তাদৃশ আদৃত না হইলেও পরবর্তীকালে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে ; কিন্তু তিনি আমেরিকান লেখক বলিয়া এই গ্রন্থে তাহাদের উল্লেখ করা হয় নাই। সে যাহা হউক, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার The Art of Fiction ('উপন্যাসের স্বরূপ') সমালোচনাগ্রন্থখানির উল্লেখ করিতেই হইবে। এই গ্রন্থে জেম্‌স্ উপন্যাসের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, কলাকৌশল, আকর্ষণ, পাঠক ও সমাজের উপর প্রভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের শেষের দিকে আমেরিকা হইতে তাঁহার উপন্যাসগুলির যে সংস্করণ বাহির হয়, সেগুলির মুখবন্ধেও তিনি উপন্যাস সম্বন্ধে নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, জেম্‌স্ নিজে যে জাতীয় উপন্যাস লিখিতেন, প্রধানতঃ তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার সমস্ত আলোচনা। লেখক ও তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের দৃষ্টিকোণই (point of view) ছিল জেমসের আলোচনার মুখ্যবস্তু। জেমসের মতে, উপন্যাসের গঠন, ঘটনাবিন্যাস, কথোপথন এই সমস্তের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সেই দৃষ্টিকোণকে পরিস্ফুট করা এবং

তাহার দ্বারা পাঠক ও সমাজকে সচেতন ও সংবেদনাশীল করিয়া তোলা। এ বিষয়ে জেমসের সহিত সম্পূর্ণ একমত না হইয়াও বলা যায় যে, সাহিত্যের একটি প্রকরণ হিসাবে উপন্যাসের যে বিশেষ গুরুত্ব আছে এবং উপন্যাসের উদ্দেশ্য ও কলাকৌশল লইয়া যে আলোচনারও প্রয়োজন আছে—এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম কৃতিত্ব জেমসের।

জেমসের বন্ধু পার্সিলাবক উপন্যাস লইয়া বিস্তর পড়াশুনা ও গবেষণা করিয়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে The Craft of Fiction ('উপন্যাসের কলাকৌশল') নামে যে পুস্তকখানি রচনা করেন, উপন্যাস সম্বন্ধে তাহা আজও একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। লরেন্স ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফও উপন্যাস সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। তবে তাঁহাদের সমালোচনা তাঁহারা নিজেরা যে ধাঁচের উপন্যাস লিখিতেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই লিখিত। লরেন্সের সমালোচনায় ফ্রয়েডের প্রভাব অতি সুপরিস্ফুট এবং তিনি যৌন আকর্ষণ ও যৌনবিকারের ব্যাপারটি লইয়া একটু বেশী বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। উলফের সম্বিৎপ্রবাহী উপন্যাসের স্বপক্ষে ওকালতি অত্যন্ত ঝাঁঝালো এবং বেশ খানিকটা একদর্শিতাদোষদুষ্ট। পুস্তকাকারে গ্রন্থিত উপন্যাস সম্বন্ধে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ফরস্টারের বক্তৃতামালা The Aspects of the Novel ('উপন্যাসের নানাদিক'), আয়তনে অপরিসর হইলেও উপন্যাস সমালোচনার ক্ষেত্রে একখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। উপন্যাস ও কাহিনী (story)-র মধ্যে যে প্রভেদ ফরস্টারই প্রথম তাহার দিকে পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফরস্টারের আলোচনায় উপন্যাসে তাল (rhythm), চিত্রকলা (imagery) ও প্রতীক (symbol) প্রভৃতির উপর একটু বেশী জোর দেওয়া হইলেও ইহাতে উপন্যাসের বিভিন্ন দিকের উপর নূতন আলোকপাত করা হইয়াছে। এ্যালেনের The English Novel মুখ্যতঃ ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ হইলেও ইহাতে ইংরাজী সাহিত্যে উপন্যাসের বিবর্তনের একটি সুলিখিত ইতিহাস আছে। কেট্‌লের Introduction to the English Novel-এ কমিউনিস্ট দৃষ্টিকোণ হইতে কয়েকখানি ইংরাজী উপন্যাসের সমালোচনা করা হইয়াছে। এই জাতীয় পুস্তকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাক বা নাই থাক, সাহিত্যক্ষেত্রে উপন্যাসের যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে এবং উপন্যাসের বহুল সমালোচনার যে প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে ইহারা তাহাই প্রমাণিত করিতেছে।

উপসংহারে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজী সাহিত্যের আজ দুর্দিন। সচরাচর দেখা যায় যে, কোনো জাতি যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা ও

অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার অধিকারী হয়, তখনই তাহাদের সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতির বিকাশ ও উন্নতি হয়। পেরিক্লিসের এথেন্স, অগাস্টাস্ সীজারের রোম, সমুদ্রগুপ্তের ভারতবর্ষ, প্রথম এলিজাবেথের ইংলণ্ড—সর্বত্র:এই একই কথা। বর্তমানে হৃত-সাম্রাজ্য ইংলণ্ড দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক শক্তি, তাহার আর্থিক অবস্থাও শোচনীয়। অপরদিকে, ক্ষমতা ও স্বাচ্ছল্যের কেন্দ্রবিন্দুটি যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকায় সরিয়া গিয়াছে এবং সেখানের সাহিত্যও লিখিত হয় ইংরাজী ভাষায়। এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংলণ্ডের পারিয়া ওঠা দুরূহ এবং সেইজন্যই মনে হয় ইংলণ্ডের অদূর ভবিষ্যতে তাহার সাহিত্য গরিমা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনাও খুব প্রবল নহে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও নির্দ্বিধায় একথা বলা যাইতে পারে যে, ইংলণ্ড যে সুমহান সাহিত্যিক ঐতিহ্যের অধিকারী, তাহার গৌরব কোনকালেই ম্লান হইবে না।

———

ইংরাজী সাহিত্যের কালানুক্রমিকা

আংলো-সাক্সন যুগ : ৪৫০—১০৫০

বেউল্‌ফ, উইড্‌সিথ, ডিওর্স ল্যামেন্ট, দি সীফেয়ারার। বিড (প্রথম ঐতিহাসিক—তাঁহার ইতিহাস অবশ্য ল্যাটিন ভাষায় লেখা), ক্যাডমন, কিনেউল্‌ফ, রাজা আলফ্রেড (ইংরাজী গদ্যের জনক)।

আংলো-নর্মান যুগ : ১০৬৬—১৩৫০

(প্রায় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত সাহিত্যই ফরাসী ভাষায় লেখা) রবিন হুড, সার প্যাট্রিক স্পেন্স্ প্রভৃতি লোকগাথাসমূহ, দি আউল অ্যাণ্ড দি নাইটিঙ্গেল, হ্যাভলক, হর্ন ইত্যাদি।

চসারের যুগ : ১৩৫০—১৪০০

জিওফ্রে চসার (ক্যান্টারবেরি টেল্‌স্), ল্যাংল্যাণ্ড (ভিশন অব পিয়ার্স প্লাউম্যান) পার্ল, গ্যাওয়েন অ্যাণ্ড দি গ্রীন নাইট, উইক্লিফ (বাইবেলের অনুবাদ), ম্যাণ্ডেভিল (ভ্রমণকাহিনী), গাওয়ার (কনফেসিও আমান্টিস্)।

চসারের পরবর্তী সাহিত্য : ১৪০০—১৫৫০

রাজা প্রথম জেমস, ডগলাস, ডানবার, গাথাকাব্য (চেভি চেজ, দি নাট-ব্রাউন মেইড্ ইত্যাদি), ম্যালরি (মর্ট ডি' আর্থার), মিস্ট্রি ও মিরাক্‌ল প্লে, মরালিটি প্লে, ইনটারলিউড ; প্রথম নাটক রালফ্ রয়স্টার ডয়স্টার, গর্বোডাক।

এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্য (প্রথমার্ধ) ১৫৫০—১৫৯০

কাব্য-সাহিত্য : ওয়াট, সারে, সার ফিলিপ সিড্‌নি, এডমণ্ড স্পেন্সার।

গদ্য-সাহিত্য : সার টমাস মোর, জন লিলি, সার ফিলিপ সিড্‌নি।

নাট্য-সাহিত্য : মার্লো, 'আর্ডেন অব ফিভারশাম'-এর রচয়িতা, কিড, লিলি, গ্রীন।

এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্য (দ্বিতীয়ার্ধ) : ১৫৯০—১৬২৫

নাট্য-সাহিত্য : শেক্‌শপিয়ার (নাটকসমূহ : প্রথম পর্যায়—টাইটাস আণ্ড্রোনিকাস, হেনরি দি সিক্সথ, লাভস্ লেবার লস্ট, কমেডি অব এরর্স, টু জেন্টলমেন অব ভেরোনা, রিচার্ড দি থার্ড, রিচার্ড দি সেকেণ্ড, কিং জন। দ্বিতীয়

পর্যায়—রোমিও এণ্ড জুলিয়েট, মিডসামার নাইটস্ ড্রিম, মার্চেণ্ট অব ভেনিস, হেনরি দি ফোর্থ—১ম ও ২য় খণ্ড, মেরি ওয়াইভস্ অব উইণ্ডসর, মাচ্ এডো অ্যাবউট্ নাথিং, অ্যাজ্ ইউ লাইক্ ইট, হেনরি দি ফিফ্‌থ্। তৃতীয় পর্যায়—টুয়েলক্‌থ্ নাইট, টেমিং অব দি শ্রু, জুলিয়াস সীজার, হ্যামলেট, ট্রয়লাস এণ্ড ক্রেসিডা, অল্‌স ওয়েল দ্যাট এণ্ডস্ ওয়েল, মেজার ফর মেজার, ওথেলো, কিং লিয়র, ম্যাকবেথ, অ্যাণ্টনি এণ্ড ক্লিওপেট্রা, টাইমন অব এথেন্স। চতুর্থ পর্যায়—করিওলেনাস, সিম্বেলাইন, উইণ্টার্স টেল, দি টেমপেস্ট, হেনরি দি এইটথ্, বেন জনসন, চ্যাপম্যান, ডেকার, বোমণ্ট, ফ্লেচার, হেউড, টমাস মিড্‌লটন, রোলি, ড্যানিয়েল ওয়েব্‌স্টার।

গদ্য-সাহিত্য : বেকন, রিচার্ড হুকার, বাইবেলের অনুবাদ, বার্টন, জন ফক্স, উইলিয়ম ক্যামডেন, জন নক্স, রিচার্ড হ্যাকলিউইট, টমাস নর্থ।

শেক্‌শপিয়ারের পরবর্তী নাট্যকারগণ : ১৬২৫—১৬৪২

বেন জনসন, ম্যাসিনজার, চ্যাপম্যান, ডেকার, বোমণ্ট ও ফ্লেচার, ওয়েবস্টার শার্লি, জন ফোর্ড ইত্যাদি।

সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্য : ১৬২৫—১৭০০

কাব্য-সাহিত্য : জন ডান, লাভ্‌লেস, হার্বার্ট, ভন্, ক্র্যাশ, হেরিক, মিলটন, এণ্ড মারভেল, কাউলি, ওয়ালার, ডেনহাম, ড্রাইডেন, বাটলার ইত্যাদি।

নাট্য-সাহিত্য : ড্রাইডেন, উইচারলি, ইথারেজ, কনগ্রিভ, ভ্যানব্রা, কার্কুহার, অটওয়ে ইত্যাদি।

গদ্য-সাহিত্য : সার টমাস ব্রাউন, জেরেমি টেলর, মিলটন, আইজাক ওয়ালটন, বুনিয়ান, ড্রাইডেন, পেপ্‌স্, কাউলি, সার উইলিয়ম টেম্প্‌ল ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতাব্দী : ১৭০০—১৭৯৮

কাব্য-সাহিত্য : পোপ, গোল্ডস্মিথ, টমসন, কুপার, গ্রে, কলিন্স, চ্যাটারটন, পার্সি, ইয়ং, ব্লেক, বার্ন্‌স্।

উপন্যাস-সাহিত্য : রিচার্ডসন, ফিলডিং, স্টার্ন, স্মলেট, গোল্ডস্মিথ, হোরেস ওয়ালপোল, মিসেস্ র‍্যাডক্লিফ, ম্যাথিউ লিউইস ইত্যাদি।

গদ্য-সাহিত্য : অ্যাডিসন, স্টীল, সুইফ্‌ট, গিবন, বার্ক, স্যামুয়েল জনসন, হিউম, কুপার, লর্ড চেস্টারফিল্ড, লেডি মেরি ওর্টলি মণ্টেগু ইত্যাদি।

নাট্য-সাহিত্য : কোলি সিবার, স্টীল, শেরিডান, গোল্ডস্মিথ।

রোমান্টিক যুগ : ১৭৯৮—১৮৩২

কাব্য-সাহিত্য : ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, সাদে, স্কট, বাইরন, শেলী, কীট্‌স প্রভৃতি।

গদ্য-সাহিত্য : ল্যাম্ব, কোলরিজ, হ্যাজলিট, ডি কুইন্সি, লে হাণ্ট, ল্যাণ্ডর প্রভৃতি।

উপন্যাস-সাহিত্য : মিস্ ফ্যানি বার্নে (মাদাম ডি' আরব্লে), জেন অস্টেন, সার ওয়াল্টার স্কট।

ভিক্টোরীয় যুগ : ১৮৩২—১৯০০

কাব্য-সাহিত্য : টেনিসন, ব্রাউনিং, এলিজাবেথ, ব্যারেট, ব্রাউনিং, ম্যাথিউ আর্নল্ড, ডি. জি. রসেটি, ক্রিস্টিনা রসেটি, মরিস, সুইনবার্ন প্রভৃতি।

উপন্যাস-সাহিত্য : ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট, এমিলি ব্রন্টি, শার্লট ব্রন্টি, মেরিডিথ, হার্ডি, কিংসলি, রীড, এণ্টনি ট্রোলোপ, উইলকি কলিন্স, স্টিভেনসন, জর্জ বরো, জর্জ গিসিং প্রভৃতি।

গদ্য-সাহিত্য : কার্লাইল, রাস্কিন, ম্যাথিউ আর্নল্ড, স্টিভেনসন, ওয়াল্টার পেটার, মেকলে, নিউম্যান, মিল, টমাস হাক্সলি প্রভৃতি।

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য : ১৯০১—

কাব্য-সাহিত্য : রবার্ট ব্রিজেস্, হপকিন্স. ইয়েট্‌স, ডেভিস, ডি লা মেয়ার, রিউপার্ট ব্রুক, স্যাসুন, ওয়েন, কিপলিং, মেসফিল্ড, হৌসম্যান, টি. এস. এলিয়ট, অডেন, স্পেণ্ডার, লুই ম্যাকনিস্, ডিলান টম্যাস ইত্যাদি।

উপন্যাস-সাহিত্য : গলস্‌ওয়ার্দি, বেনেট, এইচ. জি. ওয়েল্‌স, কনরাড, ফরস্টার, ডি. এইচ. লরেন্স, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, জেম্‌স জয়েস, আলডুস হাক্সলি, গ্র্যায়াম গ্রীন প্রভৃতি।

নাট্য-সাহিত্য : বার্নার্ড শ, গলসওয়ার্দি, সিং, প্রিস্টলি, টি. এস. এলিয়ট, অডেন, স্পেণ্ডার, ক্রিস্টোফার ফ্রাই, ওয়েস্কার প্রভৃতি।

কয়েকটি স্মরণীয় তারিখ

৫৯৭—অগাস্টিন ও অন্যান্য খ্রীষ্ট সন্ন্যাসীগণের ইংলণ্ডে আগমন এবং কেণ্টবাসীদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ

৭৫০ (?)—কিনেউলফের কাব্য-রচনা

৮৬০—আংলো-সাক্সন ক্রনিক্‌লের সূচনা

৯০১—রাজা আলফ্রেডের মৃত্যু

৯৯১—আংলো-সাক্সন যুগের শেষ কবিতা
'দি ব্যাট্‌ল অব মালডন' লিখিত

১০৬৬—নর্মান বিজয়

১০৮৬—'ডুমস্‌ডে বুক' সমাপ্ত

১০৯৬—ধর্মযুদ্ধ (ক্রুসেড্‌) শুরু

১১৪৭—দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ

১১৮৯—তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ

১২০০—লায়ামন-রচিত 'ব্রুট'

১২১৫—মহা সনন্দ (ম্যাগনা কার্টা)

১২৬৫—হাউস অব কমন্সের সূচনা

১৩৩৮—ফ্রান্সের সহিত শতবর্ষব্যাপী সংগ্রাম আরম্ভ

১৩৪০ (?)—চসারের-জন্মগ্রহণ

১৩৭৭—উইক্লিফ এবং ললার্ডগণ কর্তৃক ইংলণ্ডে ধর্ম-সংস্কার আরম্ভ

১৩৮২—ইংরাজী ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাইবেল

১৪০০—চসারের মৃত্যু

১৫৫৮—রানী এলিজাবেথের সিংহাসনারোহণ

১৫৬৪—শেক্‌শপিয়ারের জন্মগ্রহণ

১৫৭৬—ইংলণ্ডে প্রথম প্রেক্ষাগৃহ (থিয়েটার)

১৫৭৭—ড্রেকের ভূ-প্রদক্ষিণ

১৫৮৮—স্পেনের 'আর্মাডা'র পরাজয়

১৬০৩—এলিজাবেথের মৃত্যু ও প্রথম জেমসের রাজ্যলাভ

১৬০৮—মিলটনের জন্ম

১৬১১—রাজা জেমসের নির্দেশে বাইবেলের অনুবাদ

১৬২১—'অ্যানাটমি অব মেলাংকলি'—বার্টন

১৬২২—প্রথম নিয়মিত সংবাদপত্র 'দি উইকলি নিউজ'-এর প্রকাশ

১৬২৩—স্তোত্রপুস্তক (Hymn Book)

১৬২৫—প্রথম চার্লসের সিংহাসনারোহণ

১৬৩১—ড্রাইডনের জন্ম

১৬৪২—গৃহযুদ্ধ আরম্ভ

১৬৪২—রিলিজিও মেডিচি—ব্রাউন

১৬৪৪—অ্যারিওপ্যাজিটিকা—মিলটন

১৬৪৯—চার্লসের মৃত্যুদণ্ড

১৬৫১—লিভিয়াথান—হব্‌স

১৬৫৩—ক্রমওয়েল প্রটেক্টর হইলেন

১৬৫৩—'কমপ্লিট এ্যাংলার'—ওয়ালটন

১৬৬০—দ্বিতীয় চার্লসের রাজ্যলাভ—রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা (রেস্টোরেশন)

১৬৬২—'রয়াল সোসাইটি' স্থাপিত

১৬৬৭—'প্যারাডাইস লস্ট'—মিলটন

১৬৭১—'প্যারাডাইস রিগেন্‌ড'—মিলটন

১৬৭৪—মিলটনের মৃত্যু

১৬৭৮—'পিলগ্রিম্‌স্‌ প্রগ্রেস' বুনিয়ান

১৬৮১—'অ্যাব্যাস্যালম অ্যাণ্ড অ্যাকিটোফেল'—ড্রাইডেন

১৬৮৮—পোপের জন্ম

১৬৯৮—জেরেমি কোলিয়ার কর্তৃক রঙ্গমঞ্চের বিরূপ সমালোচনা

১৭০০—ড্রাইডেনের মৃত্যু

১৭০২—প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র

১৭০৯—'দি ট্যাটলার' প্রকাশিত

১৭০৯—স্যামুয়েল জনসনের জন্ম

১৭১১—'দি স্পেক্টেটর' প্রকাশিত

১৭১২—'রেপ অব দি লক'—পোপ

১৭১৯—'রবিনসন ক্রুসো'—ডি ফো

১৭২৬—'গালিভার্স ট্রাভেলস্'—সুইফ্‌ট
১৭৪০—'পামেলা' (প্রথম উপন্যাস)—রিচার্ডসন
১৭৪১—'জোসেফ এণ্ড্রুজ'—ফিল্‌ডিং
১৭৫৫—প্রথম পূর্ণাঙ্গ অভিধান—ডঃ জনসন
১৭৬০—তৃতীয় জর্জের সিংহাসনারোহণ
১৭৬০-৬৭—'ট্রিস্ট্রাম শ্যাণ্ডি'—স্টার্ন
১৭৬৬—'ভিকার অব ওয়েকফিল্ড'—গোল্ডস্মিথ
১৭৭০—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের জন্ম
১৭৭০—'ডেজার্টেড ভিলেজ'—গোল্ডস্মিথ
১৭৭২—কোলরিজের জন্ম
১৭৭৪-৭৫—বার্কের আমেরিকা-বিষয়ক বক্তৃতাবলী
১৭৭৬-৮৮—গিবনের রোম সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস
১৭৭৯-৮১—'লাইভস অব দি পোয়েটস'—ডঃ জনসন
১৭৮৩—ব্লেকের কবিতাবলী
১৭৮৬—বার্নসের প্রথম কবিতাবলী
১৭৮৮—বাইরনের জন্ম
১৭৮৯—ফরাসী বিপ্লব
১৭৯০—বার্কের ফরাসী-বিপ্লববিষয়ক বক্তৃতা
১৭৯১—বস্‌ওয়েল লিখিত 'জনসনের জীবনী'
১৭৯২—শেলীর জন্ম
১৭৯৫—কীটসের জন্ম
১৭৯৮—'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স'—ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজ
১৮০৭—'ইনটিমেশন্‌স অব ইম্মর্টালিটি'—ওয়ার্ডসওয়ার্থ
১৮০৯-১৮—'চাইল্ড হারল্ড'—বাইরন
১৮০৯—টেনিসনের জন্ম
১৮১১—থ্যাকারের জন্ম (কলিকাতায়)
১৮১২—ব্রাউনিং ও ডিকেন্স-এর জন্ম
১৮১৪-৩১—ওয়েভারলি উপন্যাসমূহ—স্কট
১৮১৬—'অ্যালাস্টর'—শেলী
১৮১৭—'বাওগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া'—কোলরিজ

১৮১৮-২০—'প্রমিথিউস আনবাউণ্ড'—শেলী

১৮২০—তৃতীয় জর্জের মৃত্যু

১৮২০-৩৩—'এসেজ্ অব ইলিয়া'—ল্যাম্ব

১৮২৮—মেরিডিথের জন্ম

১৮৩১—স্কটের শেষ পর্যায়ের উপন্যাসসমূহ

১৮৩২—ইংলণ্ডে শাসনসংস্কার আইন (রিফর্ম্ এ্যাক্ট) পাস

১৮৩৩—'সার্টর রিসার্টাস'—কার্লাইল

১৮৩৬-৬৫—ডিকেন্সের উপন্যাসসমূহ

১৮৩৭—ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনারোহণ

" —'ফরাসী বিপ্লব'—কার্লাইল

১৮৪০—টমাস হার্ডির জন্ম

১৮৪৩-৬০—'মডার্ন পেণ্টার্স'—রাস্কিন

১৮৪৭-৫৯—থ্যাকারের প্রধান উপন্যাসসমূহ

১৮৪৮—'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র প্রকাশ

১৮৫৩-৫৫—ম্যাথিউ আর্নল্ডের কবিতাবলী

১৮৫৬—বার্নার্ড শ-এর জন্ম

১৮৫৮-৭৬—জর্জ ইলিয়টের উপন্যাসসমূহ

১৮৫৯-৮৮—'ইডিলস অব দি কিং'—টেনিসন

১৮৫৯—'অরিজিন অব স্পিসিজ্—ডারউইন

১৮৬৫—ইয়েট্সের জন্ম

১৮৬৫—কিপ্লিংয়ের জন্ম

১৮৬৬—এইচ্. জি. ওয়েলসের জন্ম

১৮৬৭—গলসওয়ার্দির জন্ম

১৮৬৭-১৮৯৫—তিন খণ্ডে মার্ক্সের 'দি ক্যাপিটাল' প্রকাশ

১৮৬৮—'রিং এণ্ড দি বুক'—ব্রাউনিং

১৮৭৯—ফরস্টারের জন্ম

১৮৮৭—টি. এস. এলিয়টের জন্ম (আমেরিকায়)

১৮৯২—টেনিসনের মৃত্যু

১৯০১—ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ও সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসনারোহণ

১৯১০—পঞ্চম জর্জের সিংহাসনারোহণ

১৯১৪-১৮—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

১৯২২—'দি ওয়েস্টল্যাণ্ড' ও 'ইউলিসিস'-এর প্রকাশ

১৯২৪—'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'র প্রকাশ

১৯৩৫—'দি মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল'-এর প্রথম অভিনয় ও প্রকাশ

১৯৩৯—ইয়েট্সের মৃত্যু

১৯৩৯-৪৫—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯৪৪—বার্নাড শ-এর মৃত্যু

১৯৪৭—ভারতের স্বাধীনতালাভ ও ইংরাজসাম্রাজ্য ভাঙনের আরম্ভ

১৯৬৫—এলিয়টের মৃত্যু

১৯৭০—ফরস্টারের মৃত্যু

১৯৭৩—অডেনের মৃত্যু

বর্ণসূচী

অটওয়ে, টমাস, ৯৭
অডেন, ডব্লিউ. এইচ., ২৩৫
'অন লিবার্টি', ২৪১
'অন দি ইম্পর্ট্যান্স অব বিইং আর্নেস্ট' ২৪৩
'অন দি ফ্রন্টিয়ার' ২৭৪
'অনেস্ট হোর, দি', ৫৬
অরওয়েল, জর্জ, ২৭৬
'অর্ডিয়াল অব রিচার্ড ফেডারেল, দি', ২২৯
'-রক্যান', ৯৭
'অল ফর লাভ', ৯৭
অস্টেন, জেন, ১৯৬-৯৯
অসবোর্ন, জন, ২৭২

'আইড্লার, দি' ১৩৭
'আইডিয়াল অব এ ইউনিভারসিটি', ২৪১
'আইভ্যান্হো', ২১০
'আইলেস ইন গাজা', ২৬৩
'আই হ্যাভ বিন হিয়ার বিফোর', ২৭১-৭২
'আউল এণ্ড দি নাইটিঙ্গেল, দি,' ৯
'অ্যাটালান্টা ইন ক্যালিডন', ২২০
'অ্যাডভান্সমেণ্ট অব লার্নিং', ৩৭
'অ্যাডাম বিড' ২২৬-২৭
অ্যাডিসন, ১২৭-২৯
অ্যাডোনেইস, ১৫৮
'আণ্টু দিস্ লাস্ট', ২৩৭
'আণ্ডার দি গ্রীনউড ট্রি', ২৩০
'অ্যানাটমি অব মেলাংকলি', ৭০
'অ্যাপলজি ফর পোয়েট্রি' ৩১, ২৮০
'অ্যাপলজিয়া', ২৪১
'অ্যাপ্রিসিয়েশন্স্', ২৪০
অ্যাবসার্ড, ড্রামা অব দি, ২৭২
'অ্যাবস্যালম এণ্ড আকিটোফেল', ৮৯-৯০
'অ্যামব্রোসিও' ('দি মংক'), ১২৫
'অ্যামোরেট্টি', ৩৬
'আরকেডিয়া', ২৮
'আরডেন অব ফিভারশাম', ৪১
'অ্যারিওপ্যাজিটিকা', ৯৯
'আর্ন বেরিয়াল', ৯৭-৯৮
আর্নল্ড, ম্যাথিউ, ২১৭-২৩৭-৩৯, ২৮১-৮২
'আর্মস্ অ্যাণ্ড দি ম্যান', ২৬৮
'অ্যালকেমিস্ট দি', ৫৪
আলফ্রেড, ৬
'অ্যালাস্টর', ১৫৮
'অ্যাসেন্ট অব এফ্ সিক্স', ২৭৪
'অ্যাস্ট্রোফেল এণ্ড স্টেলা', ৩১

'ইউটোপিয়া', ৩৭-২৮
'ইউফিউস', ৩৮
'ইউলিসিস', ২৬৪-৬৫
'ইগোইস্ট দি', ২২৯-৩০
'ইডিল্স্ অব দি কিং', ২১৩

ইথারেজ, জর্জ, ৯৪
'ইন মেমোরিয়াম', ২০৯-২১২
ইনটারলিউড, ২৩
'ইনটেনশান্‌স্‌', ২৪৩
'ইভ অব সেণ্ট অ্যাগনিস', ১৫৮
'ইভেলিনা', ১৯৫
'ইম্যাজিনারি কনভার্সেশন্‌স্‌', ১৯৩
ইয়ং, এড্‌ওয়ার্ড, ১৪৬-৪৭
'ইয়র্কশায়ার ট্রাজেডি', ৫৮-৫৯
ইয়েট্‌স, ডব্লিউ. বি., ২৪৯-২৫০
'ইলিয়াড' (অনুবাদ : পোপ), ৯৮
'ইস্টওয়ার্ড হো', ৫৫

উইক্লিফ, জন, ৩৬
উইচারলি, উইলিয়াম, ৯৪-৯৫
'উইণ্ডসর ফরেস্ট', ১১০-১১
'উইমেন ইন লাভ', ২৬২
'উইমেন বিওয়্যার উইমেন', ৫৯
'উদরিং হাইট্‌স্‌', ২২৮
উপন্যাস, আবির্ভাব, ১১৯-২৬
উপন্যাস, সম্বিৎপ্রবাহী ২৫৫, ২৬৪-৬৬
উল্‌ফ্‌, ভার্জিনিয়া, ২৫৫

'এ উওম্যান অব নো ইম্পর্ট্যান্‌স', ২৪৩
'এ উওম্যান কিল্‌ড্‌ উইথ কাইণ্ডনেস', ৫৭
একাঙ্ক নাটক, ২৭৮-৭৯
'এনক আর্ডেন', ২১৩
'এণ্ড গেম', ২৭২
'এডিনবরা রিভিউ, দি', ২০৪
'এণ্ডিমিয়ন' (কীট্‌স), ১৫৮, ১৬৩
'এণ্ডিমিয়ন' (লিলি), ৪৪
'এ টেল অব টু সিটিজ', ২২৩
'এ নিউ ওয়ে টু পে ওল্‌ড ডেট্‌স', ৬৪
'এনসিয়েণ্ট ম্যারিনার, রাইম অব দি', ১৭২-৭৪
'এপিথালামিয়ন', ৩৬
'এপিপসাইকিডিয়ন', ১৫৮-১৬৭
'এপিসিন', ৫৪
'এপিসলস্‌ এণ্ড স্যাটায়ার্স', ১১৫
'এভরিম্যান', ২৩
'এভরিম্যান ইন হিজ হিউমার', ৫২-৫৪
'এভরিম্যান আউট অব হিজ হিউমার', ৫৪
এভলিন, জন, ১০১-০২
এমসন, উইলিয়াম, ২৮৫
'এমা' ১৯৭
এলিয়ট, জর্জ, ২২১, ২২৬-২৭
এলিয়ট, টি. এস, ২৫১-২৩৫, ২৮৩-৮৫
'এসে অন ক্রিটিসিজম', ১১১-১২
'এসে অব ম্যান', ১১৪-১৫
'এসেজ অব ইলিয়া', ১৮৮-৮৯

'ওড টু অটম', ১৬৪
'ওড টু ইভনিং', ১৪৪
'ওড টু এ নাইটিংগেল', ১৬১
'ওড টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড', ১৬৩
'ওডিসি' (অনুবাদ : পোপ), ৯৮
ওয়, এভলিন, ২৫৫, ২৬৪
ওয়াইল্ড, অস্কার, ২৪৩-৪৪

ওয়াট, টমাস, ২৯
'ওয়াণ্ডারার, দি,' ৪
ওয়ার্ডসওয়ার্থ, উইলিয়াম, ১৫৪-১৫৯
ওয়ালটন, আইজাক, ১০০
ওয়ালার, এডমাণ্ড, ৮৩
ওয়ালপোল, হোরেস, ১২৫, ১৩৭
'ওয়ে অব দি ওয়ার্লড, দি', ৯৫
'ওয়েটিং ফর গোদো', ২৭২
ওয়েন, উইলফ্রিড, ২৫১
ওয়েন, জন, ২৭৬
ওয়েবস্টার, জন, ৬০-৬২
ওয়েলস্, এইচ. জি., ২৫৪, ২৫৭
ওয়েস্কার, আর্নল্ড, ২৭২
'ওয়েস্টওয়ার্ড হো', ২৫২
'ওয়েস্টল্যাণ্ড, দি', ২৫২
'ওল্ড ওয়াইভ্স্ টেল, দি', ২৫৭-৫৮
'ওল্ড মর্টালিটি', ২০২
'ওসিয়ান', ১৪৪

'ককটেল পার্টি, দি', ২৭৩
'কংকোয়েস্ট অব গ্রানাডা, দি', ৯৬
কনগ্রিভ, উইলিয়াম, ৯৪-৯৫
'কন্‌ফেসনস্ অব অ্যান ওপিয়ামইটার', ১৯১
কনরাড, জোসেফ, ২৫৪, ২৫৮-৬০
'কমপ্লিট অ্যাংলার', ১০০
কলিন্স, উইলিয়ম, ১৪৩-৪৪
কলিন্স, উইল্‌কি, ২৩১-৩৩
কাউলি, অ্যাব্রাহাম, ৮৩, ১০২
কাওয়ার্ড, নোয়েল, ২৭১
'কাম্পাসপি', ৪৪
'কালচার এণ্ড অ্যানার্কি', ২৩৮-৩৯
কার্লাইল, টমাস, ২৩৫-৩৬
'কাস্‌ল অব ইনডোলেন্স', ১৪১
'কাস্‌ল অব ওট্রাণ্টো', ১২৫
কিংসলি, চার্লস, ২৩১-৩২
'কিচেন, দি', ২৭২
কিনেউল্‌ফ্‌, ৫
কিপলিং, রাডিয়ার্ড, ২৪৭, ২৪৯
কীট্‌স, জন, ১৫৭-৭০
কীড, টমাস, ৪২-৪৩
কুপার, উইলিয়াম, ১৩৭, ১৪২-৪৩
'কুপার্স হিল', ৮৪
'কুবলা খান', ১৭৫-৭৬
'কেইন', ১৫৭
'কেনিলওয়ার্থ', ২০১
'কোমাস', ৭৭
কোলরিজ, এস. টি., ১৫৬, ১৭২-৭৬, ১৮৩-৮৪
কোলিয়ার, জেরিমি, ৮৩
'কোয়াটার্লি রিভিউ, দি', ২০৪
'ক্যাটিলিন', ৫৭-৫৮
ক্যাডমন, ৫
'ক্যাণ্টারবেরি টেলস, দি', ১২
'ক্যারাকটার্স অব শেক্‌শপীয়ার্স প্লেজ', ১৮৬
'ক্রাউন অব দি ওয়াইল্ড অলিভ, দি', ২৩৭
'ক্রয়ষ্টার এণ্ড দি হার্থ, দি', ২৩২
'ক্লারিসা হার্লো', ১২১

'ক্লার্ক সণ্ডার্স', ১৮
ক্ল্যারেণ্ডন, এডওয়ার্ড, ১০১
ক্রাশ, রিচার্ড, ৭৫
'ক্রাইটেরিয়ন, দি', ২৮৩, ২৮৬-৮৭
ক্র্যাব, জর্জ, ১৮২
'ক্রিস্টাবেল', ১৭৪-৭৫

'গর্বোডাক', ৪০
গল্‌স্‌ওয়ার্দি, জন, ২৫৪-৫৬, ২৬৯-৭০
'গাওয়েন এণ্ড দি গ্রীন নাইট', ১৪-১৫
'গালিভার্স ট্রাভেল্‌স্‌' ১৩১-৩২
গিবন, এডওয়ার্ড, ১৩৩
গিসিং, জর্জ, ২৩১, ২৩৪
'গুড নেচার্ড ম্যান, দি', ১৫১
গে, জন, ১১৬
গোল্ডস্মিথ, অলিভার, ১১৮-১৯, ১২৪-২৫, ১৫১
'গ্যামার গার্টন্‌স্‌ নিড্‌ল্‌', ২৪
'গ্রংগার হিল', ১৪১-৪২
গ্রীন, রবার্ট, ৪৩
গ্রীন, গ্র্যায়াম. ২৫৭, ২৬৪
গ্রে, টমাস, ১৪৩-৪৪

চসার, জিওফ্রে, ১০-১২
'চাইল্ড হ্যারল্ড', ১৫৮
'চিকেন স্যুপ উইথ বার্লি', ২৭২
'চেঞ্জলিং, দি', ৬০
'চেভি চেজ', ২১
চেস্টারটন, জি. কে., ২৭৫
চেস্টারফিল্ড, লর্ড, ১৩৮
চ্যাটারটন, টমাস, ১৪৫-৪৬

জনসন, বেন, ৫১-৫৫, ৫৭-৫৮
জনসন, স্যামুয়েল, ১৩৪-৩৭
জয়েস, জেম্‌স্‌, ২৫৫, ২৬৪-৬৫
'জাস্টিস', ২৭০
'জু অব মাল্টা, দি', ৪৫
জুনিয়াস, ১৩৮
জেকব্‌স্‌, ডব্লিউ. ডব্লিউ., ২৭৭
'জেন আয়ার', ২২৭-২৯
'জেম্‌স্‌ ফোর্থ', ৪৩
জেমস্‌, হেনরি, ২৮৮
'জোসেফ এণ্ড্রুজ', ১২২

'টম জোন্স', ১২২-২৩
টমসন, জেমস, ১৪০-৪১
টমাস, ডিলান, ২৫৪
'টাইফুন', ২৫৯
'টাইম অ্যাণ্ড দি কনওয়েজ', ২৭১
'টিজ এ পিটি শি ইজ এ হোর', ৬৫
'টিনটার্ন অ্যাবি', ১৬৬
টিবল্ড, লিউইস্‌, ১১৪
'টু ইন এ টাওয়ার', ২৩০
'টু দি লাইটহাউস', ২৬৫-৬৬
টেনিসন, আলফ্রেড, ২১২-১৪
'টেব্‌ল্‌ টক', ১৯০
টেম্পল্‌ উইলিয়াম, ১০২
'টেল অব এ টাব, এ', ১৩০-৩১
'টেল অব টু সিটিজ, এ', ২২৩
টেলর, জেরিমি, ৯৮-৯৯

'টেলস অব ওয়াণ্ডার', ১২৫
'টেলস অব টেরর', ১২৫
'টেস্', ২৪০
'ট্যাটলার, দি', ১২৭-২৮
'ট্রাভেলার, দি', ১১৮
'ট্যাম্বারলেন', ৪৫
'ট্রয়ল্যাস এ্যাণ্ড ক্রেসিড', ১১
'ট্রায়াম্ফ অব লাইক', ১৬৭
'ট্রিস্ট্রাম শ্যাণ্ডি', ১২৩
'ট্রেজার আইল্যাণ্ড, দি', ২৩১
ট্রোলোপ, অ্যান্টনি, ২৩১-৩২

'ডক্টর ফস্টাস', ৪৫
'ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিস্টার হাইড', ২৩৩

'ডন জুয়ান', ১৫৭, ১৮১-৮২
'ডাচেস অব মালফি, দি', ৬১-৬২
ডান, জন, ৭২-৭৪
'ডানসিয়াড, দি', ১১৩-১৪
'ডায়না অব দি ক্রসওয়েজ,' ২৩০
ডায়ার, জন, ১৪১-৪২
ডারউইন, চার্লস, ১৯০
'ডার্ক ইজ লাইট এনাফ', ২৭৪
ডি আভেনাণ্ট, ৯৬
'ডিওরস্ ল্যামেণ্ট', ৪
ডি কুইন্সি, ১৯০-৯১
ডিকেন্স, চার্লস, ২২১-২৪
'ডিক্লাইন অ্যাণ্ড কল অব দি রোমান এম্পায়ার', ১৩৩
'ডিজাইন কর লিভিং, দি', ২৭১
'ডি প্রোন্ফাণ্ডিস', ২৪৩
ডি' ফো, ড্যানিয়েল, ১২০
ডি লা মেয়ার, ওয়াল্টার, ২৪৮-৪৯
ডেকার, টমাস, ৫৫-৫৬
ডেনহাম, জন, ৮৩
'ডেভিড কপারফিল্ড', ২২২-২৩
ডেভিস, ডব্লিউ. এইচ., ২৪৭
ড্রাইডেন, জন, ৮৭-৯২, ৯৬-৯৭, ২৮০
ড্রামাটিক মনোলোগ, ২১৫

থ্যাকারে, ডব্লিউ. এম., ২২১, ২২৪-২৬

'দি লেডী ইজ নট কর বার্নিং', ২৭৪

'নর্থাংগার অ্যাবি', ১৯৭
'নাইট অব দি বার্নিং পেসল, দি', ৫৬
'নাইট থট্স্', ১৪৬-৪৭
'নাট ব্রাউন মেইড, দি', ২১
'নিউ ওয়ে টু পে ওল্ড ডেট্স্, এ', ৬৪
নিউম্যান, জে. এইচ., ২৪০-৪১

'পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্ট', ২৬৩
'পামেলা', ১২০-২১
'পার্ল', ১৬
'পার্লামেণ্ট অব ফাউল্স্, দি', ১১
পার্সি, টমাস, ১৪৬
'পার্সুয়েশন' ১৯৭
'পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট', ২৩৬
'পিকউইক পেপার্স', ২২২
পিণ্টার, হ্যারল্ড, ২৭২

'পিলগ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেস', ১০০-১০১
'পিয়ার্স প্লাউম্যান, ভিসন অব', ১৩
পেটার, ওয়াল্টার, ২৩৯, ৪০, ২৮২
পেপস্, স্যামুয়েল, ১০১-১০২
পোপ, আলেকজাণ্ডার, ১১০-১৭
'প্যারাডাইস রিগেন্ড', ৮১
'প্যারাডাইস লস্ট', ৭৮-৮১
'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া, এ', ২৬১
'প্যাস্টোরালস', ১১০
'প্রমিথিউস আনবাউণ্ড', ১৫৮
'প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস', ১৯৭
প্রায়র, ম্যাথিউ, ১১৬
'প্রিন্সিপল্‌স্ অব ক্রিটিসিজ্‌ম', ২৮৬
'প্রিন্সেস, দি', ২১২
প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিগণ, ২১২, ২১৭-১৮
'প্রিলিউড, দি', ১৬৫-৬৬
প্রিস্টলি, জে. বি., ২৭১-৭২
'প্রোথালামিয়ন', ৩৬
'প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজ্‌ম', ২৮৬
'প্লেবয় অব দি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড, দি', ২৭০-৭১
'প্লেন ডিলার, দি', ৯৪-৯৫

'ফরসাইট সাগা, দি', ২৫৫-৫৬
ফরস্টার, ই. এম., ২৫৫, ২৬০-৬১, ২৮৯
'ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস', ২৩৫
'ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড', ২৩০
ফার্কুয়ার, জর্জ, ৯৪
'ফিনেগান্‌স্ ওয়েক', ২৬৫
ফিলডিং, হেনরি, ১২২-২৩
'ফিলাস্টার', ৫৬
'ফেয়ারি কুইন দি', ৩৪-৩৬
'ফোর কোয়ার্টেট্‌স্, দি', ২৫২
'ফেরেক্স অ্যাণ্ড পোরেক্স', ৪০
ফোর্ড, জন, ৬৫
ফ্রাই, ক্রিস্টোফার, ২৭৪
'ফ্রাকার বেকন এণ্ড ফ্রায়ার বাঙ্গে', ৪৩
ফ্লেচার, জন, ৫৬, ৬২

বরো, জর্জ, ২৩১, ২৩৩-৩৪
'বাইবেল' (অথরাইজড ভারসন), ৬৯-৭০
বাইরন, লর্ড, ১৫৭-৫৮, ১৮০-৮২
'বাওগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া', ২৮১
বাটলার, স্যামুয়েল, ৮৫
বার্ক, এডমাণ্ড, ১৩৩-৩৪
বার্টন, রবার্ট, ৭০
বার্নস্, রবার্ট, ১৪৭-৪৮
বার্নে, ফ্যানি, ১৯৫-৯৭
বার্নেট, গিলবার্ট, ১০১
বুনিয়ান, জন, ১০০-১০১
'বেউল্‌ফ্', ২-৪
বেকন, লর্ড, ৬৬-৬৮
বেকেট, স্যামুয়েল, ২৭২-৭৩
বেনেট, আর্নল্ড, ২৫৪, ২৫৬-৫৭
বেলক, হিলাইর, ২৭৬
বোমন্ট, ৫৬, ৬২
'বো স্ট্রাটাজেম, দি', ৯৪
'ব্যাটল অব দি বুকস, দি', ১৩০-৩১
'ব্যাটল অব ব্রুনাবার', ৪

'ব্যাটল অব ম্যালডন', ৪
ব্যালাড, ১৯-২১
ব্রন্টি, এমিলি, ২২০-২২, ২২৭-২৯
ব্রন্টি, শার্লট, ২২১, ২২৭-২৯
'ব্রাইড অব ল্যামারমুর, দি', ২০১
ব্রাউন, সার টমাস, ৯৭-৯৮
ব্রাউনিং, মিসেস, ২২০-২১
ব্রাউনিং, রবার্ট, ২১১-১৭
ব্রিজেস, রবার্ট, ২৪৭-৪৯
ব্রুক, রুপার্ট, ২৫১
'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড, দি', ২৬৪
'ব্রোকেন হার্ট, দি', ৬৫-৬৬
ব্লেক, উইলিয়াম, ১৪৮-৫০
'ব্ল্যাকউড্স্ ম্যাগাজিন, দি', ২০৪

ভন, হেনরি, ৭৫
'ভলপোনি', ৫৪-৫৫
'ভার্জিনিবাস পিওরেস্কি', ২৩৯
'ভিসন অব পায়ার্স প্লাউম্যান', ১৩
'ভেনাস অবজার্ভ্ড', ২৭৪
'ভেনাস প্রিজারভড্', ৯৭
'ভোর্টেক্স, দি', ২১৭
ভ্যানবার্গ, জন, ৯৪
'ভ্যানিটি অব হিউম্যান উইশেজ', ১১৮
'ভ্যানিটি ফেয়ার', ২২৫

'মডার্ণ পেণ্টার্স', ২৩৭
'মংক, দি', ১২৬
মণ্টেগু, লেডি মেরি ওয়ার্টলী, ১৩৮
'মরাল এসেজ', ১১৫
'মরালিটি প্লে', ২৩
'মর্ট ডি' আর্থার', ৩৬
মরিস, উইলিয়াম, ২১৭
মারি, মিডলটন, ২৮৬
'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল', ২৭৩
মার্ভেল, অ্যাণ্ড্রু, ৮২-৮৩
মার্লো, ক্রিস্টোফার, ৪৪-৪৫
মাসিঞ্জার, ফিলিপ, ৬৩-৬৪
মার্স্টন, জন, ৫৫
মিডলটন, টমাস, ৫৯
মিল, জেম্স্ স্টুয়ার্ট, ২৪০-৪১
'মিল অন দি ফ্লস', ২২৬
মিলটন, জন, ৭৬-৮২
'মিস্টিরিয়াস ইউডলফো', ১২৫
'মিসেস ড্যালোওয়ে', ২৬৫-৬৬
'মিষ্ট্রি ও মিরাকল্ প্লে', ২২
মেকলে, টি. বি., ২৪০-৪১
'মেড অব অনার, দি', ৬৫
'মেডাল, দি', ৮৮-৮৯
'মেড্স ট্র্যাজেডি, দি', ৬২-৬৩
মেরিডিথ, জর্জ, ২২৯-৩০
মেসফিল্ড, জন, ২৪৮-৪৯
মোর, সার টমাস, ৩৭-৩৮
ম্যাকনীস, লুই, ২৫৩
ম্যাকফার্সন, জেমস, ১৪৪-৪৫
'ম্যাক ফ্লেকনো', ৯০
'ম্যান অব মোড, দি', ৯৪
'ম্যান অ্যাণ্ড সুপারম্যান', ২৬৮
'ম্যানফ্রেড', ১৫৭
'ম্যানসফিল্ড পার্ক', ১৯৭

ম্যানসফিল্ড, ক্যাথেরিন, ২৭৭
'ম্যারেজ অব হেভন অ্যাণ্ড হেল', ১৪৯-৫০
'ম্যারেজ আ-লা-মোড', ৯৪
ম্যালরি, সার টমাস, ৩৬-৩৭
ম্যাসিনজার, ফিলিপ, ৬৩-৬৫

'রবিনসন ক্রুসো', ১২০
'রমোলা', ২২৭
রয়াল সোসাইটি, ৮৪
রসেটি, ডি. জি., ২১৭-১৯
রসেটি, সি., ২১৭-১৯
'রাইডার্স টু দি সী', ২৭০
'রাইভ্যালস, দি', ১৫২
রাওলে, উইলিয়াম, ৫৯-৬০
রাউলি (?), ১৪৫
'রাসেলাস', ১৩৭
রাস্কিন, জন, ২৩৬-৩৭
রিচার্ডস্, আই. এ., ২৮৫-৮৬
রিচার্ডসন, স্যামুয়েল, ১২০-২২
'রিটার্ন অব দি নেটিভ, দি', ২৩০
'রিভ্যালুয়েশন', ২৮৭
'রিভোল্ট অব দি টার্টাস', ১৯১
'রিলিজিও মেডিচি', ৯৭
'রিলিজিও লেইচি', ৯০
'রিল্যাপস্, দি' ৯৪
'রুইন, দি', ৪
'রেনবো, দি', ২৬২
'রেপ অব দি লক, দি', ১১৩-১৪
'রেলিক্স্ অব এনশেণ্ট ইংলিশ পোয়েট্রি', ১৪৬
রেসটোরেশন কমেডি, ৯৩-৯৫
'রোমান অ্যাকটর, দি', ৬৪-৬৫
'রোমানি রাই, দি', ২০৩
র‍্যাডক্লিফ, মিসেস, ১২৫-২৬
'র‍্যাম্বলার, দি', ১৩৭
'রালফ রয়স্টার ডয়স্টার', ২৪

'লজ্ অব এক্লেজিয়াস্টিকাল পলিটি, দি', ৬৮
'লণ্ডন', ১১৮
'লণ্ডন ম্যাগাজিন, দি', ২০৪
লভলেস, রিচার্ড, ৭৪-৭৫
'লর্ড জিম', ২৫৯
লরেন্স, ডি. এইচ., ২৫৫, ২৬১-৬৩
'লাভ সং অব জে. অ্যালফ্রেড প্রুফ্রক, দি', ২৫১-৫২
লিণ্ড, রবার্ট, ২৭৬
লিভিস, এফ. আর ২৮৭
'লিরিক্যাল ব্যালাড্স্', ১৫৬-৫৭
লিলি, জন, ৩৮, ৪৩-৪৪
'লিসিডাস', ৭৭
লুইস, সি. ডি., ২৫৩
লুইস, ম্যাথিউ, ১২৫
'লুক ব্যাক ইন অ্যাংগার', ২৭২
লুকাস, ই. ভি., ২৭৬
'লেকচার্স অন ইংলিশ পোয়েট্স্', ১৮৬
'লেডী উইণ্ডারমিয়ার্স ফ্যান', ২৪৩
'লেডী চ্যাটার্লিজ লাভার', ২৬২-৬৩
ল্যাংল্যাণ্ড, উইলিয়াম, ১৩-১৪
ল্যাণ্ডর, ডব্লিউ. এস., ১৯২-৯৪

'ল্যাভেংগ্রো', ২৩৩
ল্যাম্ব, চার্লস, ১৮২-৮৫, ১৮৮-৮৯

শ, বার্নার্ড, ২৬৭-৬৯
শার্লি, জেমস্‌, ৬৩
'শী স্টুপস্ টু কংকার', ১৫১
'শু মেকার্স হলিডে, দি', ৫৫
শেক্‌শপিয়ার, উইলিয়াম, ৪৬-৫১
'শেফার্ডস ক্যালেণ্ডার, দি', ৩৬
শেরিডান, আর. বি., ১৫১-৫২
শেলী, পি. বি., ১৫৭-৭০, ১৭৯-৮০

'সনস্ এণ্ড লাভার্স', ২৬২
'সং অব ইটালি, এ', ২২০
'সংস অব ইনোসেন্স', ১৪৮
'সংস অব এক্সপিরিয়েন্স', ১৪৮
'সংস বিফোর সানরাইজ', ২২০
'সাইলাস মার্নার', ২২৬
সাকলিং, জন, ৭৪-৭৫
"সাকী", ২৭৭
সাদে, রবার্ট, ১৫৬
'সার প্যাট্রিক স্পেন্স', ২১
সারে, আর্ল অব, ৩০
'সার্টর রেসার্টাস', ২৩৬
'সালোমি', ২৪৪
সিং, জে. এম., ২৭০-৭১
'সিজ অব রোড্স, দি', ৯৬
'সিজেনাস', ৫৭-৫৮
সিডনি, সার ফিলিপ, ৩১-৩২, ২৮০
সিবার, কোলি, ১১৪
'সিলভার বক্স', ২৭০
'সিসেম অ্যাণ্ড দি লিলিজ, দি', ২৩৭
'সীফেয়ারার, দি', ৪
সুইনবার্ন, এ. সি., ২১৯-২০
সুইফ্‌ট, জোনাথান, ১২৯-৩৩
'সেণ্ট জোন', ২৬৯
'সেন্টিমেণ্টাল জার্নি, এ' ১২৩
'সেন্স এণ্ড সেন্সিবিলিটি', ১৯৭
'সেন্সি', ১৫৮
'সোরাব অ্যাণ্ড রুস্তম', ২১৭
স্কট, সার ওয়াল্টার, ১৫৬-৫৭, ১৮০, ১৯৯-২০৩
'স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডাল, দি', ১৫২-৫৩
'স্ক্রুটিনি', ২৮৭-৮৮
স্টার্ন, লরেন্স, ১২৩
স্টিভেনসন, আর. এল., ২৩১, ২৩৩, ২৩০
স্টীল, রিচার্ড, ১২৭-২৯
'স্টোন্স্ অব ভেনিস', ২৩৭
'স্ট্রাইক', ২৭০
'স্পেকটেটর', ১০৯, ১২৮-২৯
স্পেণ্ডার, স্টিফেন, ২৫৩
স্পেন্সার, এডমাণ্ড, ৩২-৩৬
'স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি, দি', ৪২
স্মালেট, টোবিয়াস, ১২৩-২৪
'স্যাটায়ার্স এণ্ড এপিস্‌লস', ১১৫
'স্যামসন অ্যাগনিস্টিস', ৮১-৮২
'স্রপশায়ার ল্যাড, এ', ২৪৮

হপকিন্স, জি. এম., ২৫০
'হর্ন', ৯

'হাইড্রিওটাফিয়া', ৯৭-৯৮
'হাইণ্ড এণ্ড দি প্যান্থার, দি', ১৯০-৯১
'হাইপেরিয়ন', ১৫৮, ১৬৩
'হাউস অব ফেম, দি', ১১
হাউসম্যান, এ. ই., ২৪৭-৪৮
'হাওয়ার্ডস্ এণ্ড', ২৬১
হাক্সলি, আলডুস, ২৫৫, ২৬৩-৬৪
হাক্সলি, টমাস, ২৪০-৪১
হাণ্ট, লে, ১৯১-৯২
'হাম্‌ফ্রি ক্লিংকার', ১২৪
'হার্ট অব মিড্‌লোথিয়ান, দি', ২০২
হার্ডি, টমাস, ২২১, ২৭০-৭১, ২৪৭-৪৮
হারবার্ট, জর্জ, ৭৫
হিউম, ডেভিড, ১৩৭
'হীরো অ্যাণ্ড হীরো ওয়ার্শিপ', ২৩৪
হীরোয়িক ট্রাজেডি, ১৬
হুকার, রিচার্ড, ৬৮-৬৯
'হুডিব্রাস', ৮৫
হেউড, টমাস, ৫৭
'হেনরি এসমণ্ড', ২২৫
হেরিক, রবার্ট, ৭৫-৭৬
'হেলাস', ১৫৮
'হোয়াইট ডেভিল, দি', ৬০
'হোলি লিভিং এণ্ড হোলি ডাইং', ৯৮-৯৯
হ্যাজলিট, উইলিয়াম, ১৮২-৮৩, ১৮৫-৮৬, ১৮৯-৯০
'হ্যাভলক', ৯